NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

STUDY MATERIAL

EPS

PAPER - III

MODULES 9-12

ELECTIVE POL. SCIENCE
HONOURS

প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোনও বিষয়ে সাম্মানিক (Honours) স্তরে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এ-ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়ণের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে সাম্মানিক মানের পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে — যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এই সব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন ; যখনই কোনো শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনো শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এরপর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হতে পারবে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ-ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক—অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার
উপাচার্য

সপ্তম পুনর্মুদ্রণ : আগস্ট, 2019

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations of the
Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

পরিচিতি

বিষয় ঃ ঐচ্ছিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান (তৃতীয় পত্র), সাম্মানিক স্তর

পাঠক্রম ঃ পর্যায় ঃ ই. পি. এস্. — ৯

	রচনা	সম্পাদনা
একক ৩৩-৩৬	ড. রাখকৃষ্ণ দে	অধ্যাপক শোভনলাল দত্তগুপ্ত

পাঠক্রম ঃ পর্যায় ঃ ই. পি. এস্. — ১০

	রচনা	সম্পাদনা
একক ৩৭-৩৮	অধ্যাপিকা শান্তি মুখার্জী	ড. রাধারমণ চক্রবর্তী
একক ৩৯-৪০	অধ্যাপিকা জয়ন্তী গুণ (মুখার্জী)	ঐ

পাঠক্রম ঃ পর্যায় ঃ ই. পি. এস্. — ১১

একক ৪১-৪৪	ড. নীতিশ দাশগুপ্ত	অধ্যাপক জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়

পাঠক্রম ঃ পর্যায় ঃ ই. পি. এস্. — ১২

একক ৪৫	ড. চিত্রিতা চৌধুরী	ড. রাধারমণ চক্রবর্তী
একক ৪৬-৪৭	অধ্যাপক কৃত্যপ্রিয় ঘোষ	অধ্যাপিকা ভারতী মুখার্জী
একক ৪৮	ড. চিত্রিতা চৌধুরী	ড. রাধারমণ চক্রবর্তী

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোন অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

মোহন কুমার চট্টোপাধ্যায়
নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

ই. পি. এস.—৩

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ঐচ্ছিক পাঠক্রম

পর্যায়
৯

একক ৩৩ □ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র : মূল ধারণা সমূহ 7—34

একক ৩৪ □ মহাভারতের শান্তিপর্বের রাজনৈতিক ধারণাসমূহ 35—64

একক ৩৫ □ ইসলামীয় রাষ্ট্রতত্ত্ব ও মুসলমান আমলের ভারতের রাজনৈতিক চিন্তা 65—91

একক ৩৬ □ সুফিবাদ ও ভক্তি আন্দোলন 92—133

পর্যায়
১০

একক ৩৭ □ রাজা রামমোহন রায় 134—145

একক ৩৮ □ স্বামী বিবেকানন্দ 146—155

একক ৩৯ □ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 156—173

একক ৪০ □ শ্রী অরবিন্দ 174—188

পর্যায়
১১

একক ৪১ □ বাল গঙ্গাধর তিলক 189—201

একক ৪২ □ মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী 202—219

একক ৪৩ □ ভীমরাও রামজী আম্বেদকর 220—231

একক ৪৪ □ জয়প্রকাশ নারায়ণ 232—244

পর্যায়
১২

একক ৪৫ □ মানবেন্দ্রনাথ রায় 245—255

একক ৪৬ □ জওহরলাল নেহরু 256—267

একক ৪৭ □ সুভাষচন্দ্র বসু 268—278

একক ৪৮ □ রামমনোহর লোহিয়া 279—289

একক ৩৩ ☐ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ঃ মূল ধারণাসমূহ

গঠন

৩৩.০ উদ্দেশ্য
৩৩.১ প্রস্তাবনা
৩৩.২ অর্থশাস্ত্র পরিচিতি
৩৩.২.১ বিদ্যাসমূহের প্রকারভেদ—অর্থশাস্ত্রের সংজ্ঞা
৩৩.৩ রাষ্ট্রের উদ্ভব
৩৩.৩.১ রাষ্ট্রের প্রকৃতি
৩৩.৩.২ রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ
৩৩.৪ সপ্তাঙ্গতত্ত্ব—রাষ্ট্রের সাতটি উপাদান
৩৩.৪.১ স্বামী
৩৩.৪.২ অমাত্য
৩৩.৪.৩ জনপদ
৩৩.৪.৪ দুর্গ
৩৩.৪.৫ কোষ
৩৩.৪.৬ দণ্ড
৩৩.৪.৭ মিত্র
৩৩.৪.৮ উপাদানগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক ও গুরুত্ব
৩৩.৪.৯ উপাদানগুলির সংকট বা ব্যাধি
৩৩.৫ রাজতন্ত্র
৩৩.৫.১ রাজার গুণ
৩৩.৫.২ রাজার কর্তব্য
৩৩.৬ প্রজাবিদ্রোহ
৩৩.৬.১ প্রজাবিদ্রোহের কারণ
৩৩.৬.২ প্রজাবিদ্রোহের ধরন
৩৩.৭ বৈদেশিক সম্পর্ক পরিচালনা
৩৩.৭.১ মূলনীতিসমূহ
৩৩.৭.২ সন্ধি
৩৩.৭.৩ যুদ্ধ
৩৩.৭.৪ দূতের কাজসমূহ
৩৩.৮ সারাংশ
৩৩.৯ অনুশীলনী
৩৩.১০ গ্রন্থপঞ্জী

৩৩.০ উদ্দেশ্য

প্রাচীন ভারতের রাজনীতিচর্চার অন্যতম আকরগ্রন্থ হ'ল কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র। এই গ্রন্থটি আলোচনার মধ্যে প্রাচীনভারতের রাজনীতি চর্চা সম্পর্কে আমরা পরিচিত হব। এই এককটি পাঠ করে আমরা যে সমস্ত বিষয়গুলি জানতে পারব তা হ'ল—

- প্রাচীনভারতের বিদ্যাচর্চার বিভিন্ন শাখার মধ্যে রাজনীতি সম্পর্কিত আলোচনা
- রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে কৌটিল্যের বক্তব্য
- রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও প্রকারভেদ
- রাষ্ট্রের উপাদান তথা প্রকৃতিগুলি কী কী
- রাষ্ট্রের বিভিন্ন উপাদানগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক ও সংকট
- রাজতন্ত্রের স্বরূপ, রাজার কর্তব্য
- প্রজাবিদ্রোহের কারণ ও ধরন সম্পর্কে কৌটিল্যের মত
- বৈদেশিক সম্পর্ক পরিচালনার মূল নীতিসমূহ, সন্ধি ও যুদ্ধের স্বরূপ, দূতের কাজগুলি কী কী
- আজকের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কৌটিল্যের রাজনৈতিক ধারণা, বিশেষ করে বৈদেশিক সম্পর্ক পরিচালনা সংক্রান্ত ধারণার কোনও প্রাসঙ্গিকতা আছে কিনা সে সম্পর্কে আমরা মতামত তৈরী করতে পারব।

৩৩.১ প্রস্তাবনা

প্রাচীনভারতের রাজনীতিচর্চার অন্যতম নিদর্শন হ'ল কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র। ১৯০৯ সালে গ্রন্থটি প্রথম ডঃ আর শ্যামশাস্ত্রীর প্রচেষ্টায় প্রকাশিত হ'লে পণ্ডিতমহলে এক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এতদিন ইউরোপীয় তাত্ত্বিকগণ মনে করতেন, রাজনীতিচর্চার শুরু হয়েছিল গ্রীসে এবং ভারতীয়গণ, মূলত অধ্যাত্ম প্রবণজাত। এই গ্রন্থটি প্রকাশের পর ভারতীয় তাত্ত্বিকদের মধ্যে এক বিপরীত প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। ঔপনিবেশিক শাসনে ক্ষুব্ধ অথচ ঐ শাসনের মতাদর্শে পালিত ভারতীয় পণ্ডিতগণ প্রমাণ করতে থাকেন ভারতেও গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, প্রভৃতি ধারণাগুলি (যা পাশ্চাত্য ধারণাগুলিরই নির্মাণ) ভারতেও প্রাচীনকাল থেকে ছিল। কৌটিল্য কোন্ সময়ের মানুষ বা কৌটিল্য নামে আদৌ কোনও ব্যক্তি ছিলেন কিনা, থাকলেও মোটামুটিভাবে ধরে নেওয়া হয় কৌটিল্য চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সময় অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের তাত্ত্বিক। এই এককে আমরা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রগ্রন্থটির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করব।

গ্রন্থটির 'অর্থশাস্ত্র' নামকরণ কেন করা হ'ল সে সম্পর্কে আমরা প্রথমে আলোচনা করব। রাষ্ট্রের উদ্ভব ও প্রকৃতি সম্পর্কে কৌটিল্যের চিন্তাভাবনা আমাদের আলোচনার মূল বিষয়। কৌটিল্য যে সময় রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করছেন সে সময়টি হ'ল কৌম সমাজ থেকে রাজতন্ত্র গড়ে ওঠার সময়। স্বাভাবিকভাবেই

রাজার গুণ, কর্তব্য প্রভৃতি বিষযগুলি কৌটিল্যের আলোচনায় প্রধান স্থান নিয়েছে। যুদ্ধজয়ে তথা রাষ্ট্রের সম্প্রসারণে এবং এক শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠনে ইচ্ছুক রাজার কী ধরনের নীতি অনুসরণ করা উচিত সেই বিষয়টিই কৌটিল্যের মূল আলোচ্য বিষয়ে। সে সময় বিভিন্ন ছোট ছোট রাষ্ট্র যেমন ছিল, এই সমস্ত রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থাও ছিল বিভিন্ন ধরনের। এই সমস্ত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সম্পর্ক পরিচালনার ধরন কীরূপ হওয়া উচিত সে সম্পর্কেও কৌটিল্য বিস্তারিত আলোচনা করেন। প্রজাদের বিদ্রোহের বিষয়টিও কৌটিল্যের দৃষ্টি এড়ায়নি। আমাদের আলোচনায় এ সমস্ত বিষয়গুলিই স্থান পেয়েছে। বর্তমান কালের রাজনীতির পর্যালোচনায় কৌটিল্যের আলোচিত অনেক বিষয়ই অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। এ কারণে অর্থশাস্ত্র এযুগেও রাজনীতিশাস্ত্রের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে একইভাবে আকর্ষণীয়।

৩৩.২ অর্থশাস্ত্র পরিচিতি

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত দীর্ঘ সময় জুড়ে আধুনিককালে আমরা রাষ্ট্র বলতে যা বুঝি তার বৈশিষ্ট্যগুলি ক্রমশ ভারতে প্রকট হ'তে থাকে। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতকেই আদিম কৌম সমাজ রূপান্তরিত হয়ে কৌম সমাজের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের রূপ নেয়। কৌম সমাজের প্রধান বা 'রাজন' প্রাতিষ্ঠানিক রাজায় পরিণত হয়; এই পরিবর্তন অবশ্য সব জায়গায় সমানভাবে হয়নি। পরবর্তী শতকগুলিতে কৌমতন্ত্র, কৌম সাধারণতন্ত্র ও রাজতন্ত্রের পাশাপাশি অবস্থান লক্ষ্য করি। বৌদ্ধগ্রন্থ অনুযায়ী আমরা জানতে পারি কৌম জনপদ থেকে শাক্য, মল্ল, লিচ্ছবি, বিদেহ প্রভৃতি কৌম সাধারণতন্ত্র গড়ে ওঠে। মহাভারতে ও পাণিনির রচনাতেও আমরা এরকম বহু কৌম সাধারণতন্ত্রের নাম পাই। এ ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাজা নামমাত্র শাসক, যিনি গোটা গোষ্ঠীর সদস্য বা গোষ্ঠী প্রধানদের দ্বারা মনোনীত হ'তেন। নীতি নির্ধারণ ও কাজকর্ম পরিচালনার দায়িত্ব থেকে যায় গোষ্ঠীর বয়স্ক মানুষ বা গোষ্ঠীপ্রধানদের নিয়ে গঠিত কৌম সংসদের হাতে।

এই ধরনের কৌম সাধারণতন্ত্রের পাশাপাশি চরম কর্তৃত্বসম্পন্ন রাজতন্ত্রও গড়ে উঠতে থাকে। বৌদ্ধগ্রন্থে আমরা যে ১৬ মহাজনপদের নাম পাই তার মধ্যে কয়েকটি কৌমজনপদ ছাড়া বাকী অধিকাংশই রাজতন্ত্র। এসময় অবন্তী, বৎস, কৌশল মগধ প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলি গড়ে উঠতে থাকে; মানুষজনও ক্রমশ পশু শিকার, পশুপালন প্রভৃতি জীবিকা থেকে সরে আসতে থাকে এবং কৃষিকেই প্রধান জীবিকা হিসেবে নেয়। এর ফলে ভ্রাম্যমান জীবনের পরিবর্তে স্থায়ীভাবে বসবাসও শুরু হয়। গ্রাম, জনপদ গড়ে উঠতে থাকে; উদ্বৃত্ত ফসলের বন্টন, জমির মালিকানা প্রভৃতি ব্যাপারে কর্তৃত্বসম্পন্ন রাষ্ট্রের প্রয়োজনও দেখা দেয়। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে নন্দবংশ, মৌর্যবংশ থেকে শুরু করে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ-ষষ্ঠ শতকে গুপ্তবংশ পর্যন্ত দীর্ঘ সময় জুড়ে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র গড়ে উঠতে থাকে। উত্তর-বৈদিক ধর্মসূত্রে, বৌদ্ধগ্রন্থে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে, মহাভারতে, রামায়ণে, মনুসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য, রাজার ক্ষমতা ও দায়িত্ব, রাজার সঙ্গে প্রজার সম্পর্ক, রাজস্ব ব্যবস্থা, সমাজের অনুশাসন প্রভৃতি বিষয়গুলি আলোচিত হ'তে থাকে। এ সমস্ত গ্রন্থগুলির মধ্যে রাজনীতি বিষয়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হ'ল কৌটিল্যের; 'অর্থশাস্ত্র' যা এই এককে আমরা আলোচনা করব।

প্রাচীন ভারতের রাজনীতিচর্চার অন্যতম আকর গ্রন্থ হিসেবে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র গ্রন্থটি বিবেচিত হ'লেও গ্রন্থটির বর্তমান রূপ আমরা জানতে পারি মাত্র ৯২ বছর আগে। ১৯০৯ সালে মহীশূরের পণ্ডিত আর শ্যামশাস্ত্রী মহাশয় এই গ্রন্থটির প্রথম একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন। এর আগে কোনও কোনও প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে বা টীকায় গ্রন্থটির বা গ্রন্থকারের নাম উল্লেখ থাকলেও গ্রন্থটি আমাদের কাছে ছিল অনাবিষ্কৃত। পনেরটি অধিকরণে বিন্যস্ত, ১৫০টি অধ্যায়ে বিভক্ত এই গ্রন্থটিতে ১৮০টি আলোচ্য বিষয় রয়েছে। প্রাচীনভারতের মানুষজন যে রাজনীতির চর্চা করতেন এবং এই চর্চা যে কতটা উন্নত মানের ছিল তা আমরা গ্রন্থটি পড়ে জানতে পারি। এতদিন পর্যন্ত আমাদের ধারণা ছিল যে প্রাচীন ভারতীয়রা শুধুমাত্র ধর্ম চর্চা করতেন এবং রাজনীতি সম্পর্কে ছিলেন পুরোমাত্রায় অনাগ্রহী। এই গ্রন্থটির আবিষ্কার আমাদের সেই ভুল ধারণাকে পাল্টে দেয়।

কিন্তু অর্থশাস্ত্র গ্রন্থটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থটির রচনাকাল এবং গ্রন্থকারের নাম নিয়ে তর্কবিতর্ক শুরু হয়। ভিনসেন্ট স্মিথ, জ্যাকোবি, টমাস মেয়ার, হপকিন্স, প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এবং আর শ্যামশাস্ত্রী, গণপতিশাস্ত্রী, জয়সওয়াল প্রমুখ ভারতীয় পণ্ডিতগণ অর্থশাস্ত্রগ্রন্থটিকে কৌটিল্য কর্তৃক খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ-শতকে রচিত বলে মনে করেন। এই কৌটিল্য ছিলেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের (যার রাজত্বকাল আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৩-২৯৮) প্রধানমন্ত্রী যিনি বিষ্ণুগুপ্ত বা চাণক্য নামেও পরিচিত। গ্রন্থটির পঞ্চদশ, অর্থাৎ শেষ অধিকরণের শেষাংশে উল্লেখ রয়েছে, 'যিনি ক্রোধের বশবর্তী হয়ে শস্ত্র, শাস্ত্র ও নন্দরাজগতা ভূমি শীঘ্র উদ্ধার করেছিলেন তিনিই এই শাস্ত্র প্রণয়ন করেছেন। গ্রন্থটির একেবারে শেষে বলা হয়েছে, 'শাস্ত্র সমূহের ভাষ্যকারগণের মধ্যে বহুরকমের মতপার্থক্য লক্ষ্য করে বিষ্ণুগুপ্ত স্বয়ং সূত্রের মাধ্যমে এই গ্রন্থের ভাষ্য ও রচনা করেছেন। ডঃ রাধাগোবিন্দ বসাক-এর মতে, মৌর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পূর্বে অথবা মগধের সিংহাসনে মৌর্যরাজ চন্দ্রগুপ্তকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে কৌটিল্য মহামন্ত্রীর কর্তব্য থেকে অবসর নিয়ে এই অর্থশাস্ত্র গ্রন্থটি রচনা করেন। ভিনসেন্ট স্মিথ-ও এই মত পোষণ করেন যে, অর্থশাস্ত্র মৌর্যযুগেরই রচনা এবং সেই সময়কার রাজনৈতিক ব্যবস্থারই প্রতিফলন, যদিও এর কোনও কোনও অংশ পরবর্তীকালে প্রক্ষিপ্ত হয়ে থাকবে।

উপরোক্ত মতের বিরোধিতা করেন জলি, উইন্টারনিজ, কিথ প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিত এবং ইউ. এন. ঘোষাল, ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, ডঃ অতীশ বসু প্রমুখ ভারতীয় পণ্ডিতগণ। এইসব পণ্ডিতদের মতে, অর্থশাস্ত্র গ্রন্থটি খ্রীষ্টীয় তৃতীয়-চতুর্থ শতকে সংকলন করা হয়েছে। এই মতের সমর্থনে তাঁরা যে সমস্ত যুক্তি গুলি দেখান তা হ'ল (১) গ্রন্থটিতে মৌর্য সম্রাটের নাম কোথাও উল্লেখ নেই, (২) প্লিনী বা মেগাস্থিনিস প্রমুখ যে সমস্ত গ্রীক পর্যটক ভারতে সে সময় এসেছিলেন তাঁদের বিবরণেও কৌটিল্যের বা এই গ্রন্থের কোনও নাম নেই (৩) এই গ্রন্থে রসায়ন, খনি বিদ্যার যে সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ আছে তা, খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে ভারতীয়দের কাছে ছিল সম্পূর্ণ অজানা। সুতরাং, এই সব পণ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, অর্থশাস্ত্র গ্রন্থটি কৌটিল্যের সিদ্ধান্তসমূহ যা পরবর্তীকালে কৌটিল্যের কোনও শিষ্য বা শিষ্যসংঘ সংকলন করে থাকবেন।

তাছাড়া, মৌর্য প্রধানমন্ত্রী চাণক্য বা বিষ্ণুগুপ্ত এবং কৌটিল্য একই ব্যক্তি কিনা সে নিয়েও পণ্ডিতদের মধ্যে সংশয় রয়েছে। সাধারণত মনে করা হয়, কৌটিল্য শব্দটি নিন্দাবাচক 'কুটিল' শব্দ থেকে এসেছে। গ্রন্থটিতে রাজার কূটনীতি, জটিল ও কুটিল উপায় সমূহ আলোচিত হয়েছে এবং একারণে গ্রন্থকারকে কৌটিল্য বলে উল্লেখ করা হয়। দ্বিতীয় মতটি হ'ল কৌটিল্য শব্দটি একটি গোত্রনাম 'কুটল' থেকে এসেছে।

কুটল বংশে জন্ম বলেই চাণক্যের অপর নাম কৌটিল্য। তৃতীয় মতে, সে সময় ভারতে কুটল নামে এক লিপির প্রচলন ছিল। কুটল লিপি থেকে কৌটিল্য নামটি এসে থাকতে পারে।

অর্থশাস্ত্র ও এই গ্রন্থের রচয়িতা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে এসব মতপার্থক্য থাকলেও এই মতটাই বহু প্রচলিত যে, অর্থশাস্ত্র গ্রন্থটি কৌটিল্যেরই রচনা এবং গ্রন্থটি খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকেই রচিত হয়। আমরা এই মতটিকে গ্রহণ করেই অর্থশাস্ত্র আলোচনায় অগ্রসর হব।

৩৩.২.১ বিদ্যাসমূহের প্রকারভেদ ঃ অর্থশাস্ত্রের সংজ্ঞা

অর্থশাস্ত্রের 'বিনয়াধিকারিক' নামে প্রথম অধিকরণের দ্বিতীয় অধ্যায়ে কৌটিল্য সে সময়ের ও তার আগের সময়ের বিভিন্ন বিদ্যাকে ব্যাখ্যা করে চারটি ভাগে ভাগ করেন। (১) আন্বীক্ষিকী বা দর্শনবিদ্যা (২) ত্রয়ী বা ঋক, যজু ও সামবেদ বিদ্যা (৩) বার্তা বা কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য বিষয়ে বিদ্যা এবং (৪) দণ্ডনীতি বা রাজবিদ্যা। এ ব্যাপারে অবশ্য তিনি মানব, অর্থাৎ মনুর শিষ্যদের বার্হস্পত্য বা বৃহস্পতির শিষ্যদের এবং ঔশনস বা শুক্রাচার্যের শিষ্যদের মত আলোচনা করেন এবং সেই সমস্ত মতের সীমাবদ্ধতা উল্লেখ করে নিজের মত হাজির করেন; যেমন, মনুর শিষ্যদের ধারণা ছিল আন্বীক্ষিকী বা দর্শন ত্রয়ীবিদ্যার অন্তর্গত; সেহেতু বিদ্যা তিন ধরনের। আবার, বৃহস্পতির শিষ্যগণ বিদ্যাকে বার্তা ও দণ্ডনীতি এই দু'ভাবে ভাগ করেন। আবার, শুক্রাচার্যের শিষ্যগণ শুধুমাত্র দণ্ডনীতিকেই একমাত্র বিদ্যা বলে স্বীকার করেন। কৌটিল্যের মতে, মানুষের সামগ্রিক জ্ঞান লাভের জন্য উপরোক্ত চারটি বিষয় সম্পর্কেই জানা দরকার।

আন্বীক্ষিকী বিদ্যার মধ্যে কৌটিল্য তিনটি শাস্ত্রের উল্লেখ করেন— সাংখ্য শাস্ত্র, যোগ শাস্ত্র ও লোকায়ত শাস্ত্র। এখানে লক্ষ করার বিষয় হ'ল কৌটিল্য লোকায়ত শাস্ত্রকেও সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। তাছাড়া, কৌটিল্য আন্বীক্ষিকী বা দর্শন/যুক্তিবিদ্যাকে অন্য সব বিদ্যার প্রদীপ স্বরূপ বলে উল্লেখ করেন ; কারণ, দর্শন মানুষের বুদ্ধিকে অবিচলিত রাখে এবং মানুষের জ্ঞান বাক্য প্রয়োগ ও কার্যকারণ বিষয়ে দক্ষতা সৃষ্টি করে।

ত্রয়ী বিদ্যার মধ্যে রয়েছে ঋক্, সাম ও যর্জুবেদ। অথর্ববেদ ও ইতিহাসকে তিনি বেদ পর্যায়ে উল্লেখ করেন। শিক্ষা বা বর্ণের উচ্চারণ সম্পর্কিত শাস্ত্র, কল্প বা যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান সম্পর্কিত শাস্ত্র, ব্যাকরণ বা শব্দের অনুশাসন, নিরুক্ত বা শব্দনির্বচনের উপদেশমূলক শাস্ত্র, ছন্দ নির্ণয়ের শাস্ত্র ও জ্যোতিষশাস্ত্র---এই ছয়টি শাস্ত্রকেও কৌটিল্য বেদের অঙ্গ বলে মনে করেন।

বার্তা বিদ্যার মধ্যে রয়েছে কৃষি, গবাদি পশুপালন ও বাণিজ্য সম্পর্কে বিদ্যা। এই বিদ্যা ধান, পশু, নগদ টাকা, সোনা, রূপো, তামা, বনজসম্পদ শ্রম প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করে। এই বিদ্যার দ্বারা রাজা নিজপক্ষকে ও শত্রুপক্ষকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে।

কৌটিল্যের মতে, উপরোক্ত তিনটি বিদ্যার অর্জন ও বাস্তবে প্রয়োগ সম্ভবপর হয় দণ্ডের মাধ্যমে। এই দণ্ড পরিচালন নীতি বা প্রকৃতি সম্পর্কিত যে শাস্ত্র তাই দণ্ডনীতি বা রাজনীতি শাস্ত্র। অর্থশাস্ত্রের শেষ অধ্যায়ে কৌটিল্য এই শাস্ত্রটিকে 'অর্থশাস্ত্র' নামে অভিহিত করেন। এর কারণ হ'ল, মানুষের বৃত্তি বা জীবিকাকে অর্থ বলা হয়। আবার বসবাসকারী মানুষের জমির নামও অর্থ। সুতরাং, যে শাস্ত্র এই জমির দখল ও পরিচালনার উপায় ঠিক করে তার নাম 'অর্থশাস্ত্র'। এই শাস্ত্র লেখাই হয়েছে জমির দখল ও রক্ষার জন্য এবং এই শাস্ত্র

মানুষের মনে ধর্ম, অর্থ ও কামের প্রবৃত্তি ঘটায় ও তাদের রক্ষার বিধান করে এবং অর্থের বিরোধী অধর্ম সমূহের নাশ করে। 'অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থের প্রথম প্রয়োজন সম্পর্কেও উল্লেখ করেন। দণ্ডনীতি অলব্ধ বস্তুকে লাভ করায়, লব্ধ বস্তুকে রক্ষা করায়, রক্ষিত বস্তুকে বর্ধিত করায় এবং বৃদ্ধি প্রাপ্ত বস্তুকে উপযুক্ত পাত্রে বিনিযুক্ত করায়। সুশৃঙ্খলভাবে সমাজব্যবস্থার পরিচালনও ঘটে দণ্ডনীতির মাধ্যমে।

আপনি নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন, আমাদের আলোচনায় অর্থশাস্ত্র, রাজনীতিশাস্ত্র, দণ্ডনীতি, দন্ডনীতিশাস্ত্র প্রভৃতি শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়েছে কোনও রকম পার্থক্য না করেই। আসলে প্রাচীন ভারতে রাজনীতি চর্চার বিষয়টি রাজধর্ম, রাজ্যশাস্ত্র, দণ্ডনীতি, দণ্ডনীতিশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র প্রভৃতি নামে ব্যবহার করা হ'ত। রাজধর্ম, অর্থাৎ রাজার ধর্ম তথা কর্তব্যসমূহ, রাজ্যশাস্ত্র বা রাজ্যবিষয়কশাস্ত্র প্রভৃতি শব্দগুলির ব্যবহার স্পষ্টতই শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে কোনও সমস্যা তৈরী করে না। রাজতন্ত্রই যেহেতু সে সময়ের স্বাভাবিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা, সেহেতু রাজধর্ম, রাজ্যশাস্ত্র শব্দগুলির ব্যবহারও স্বাভাবিক। রাজনীতিবিজ্ঞানকেও দণ্ডনীতিশাস্ত্র নামে উল্লেখ করার ব্যাপারে যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে। রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হ'ল ক্ষমতার প্রয়োগ; রাষ্ট্রের এলাকার সম্প্রসারণ, রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বজায় রাখা, রাষ্ট্র পরিচালনা প্রভৃতি বিভিন্ন ব্যাপারে ক্ষমতার প্রয়োজন। দণ্ড শব্দটির দ্বারা এই রাষ্ট্রক্ষমতাকেই বোঝানো হয়েছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে দণ্ডশব্দটি শুধুমাত্র নেতিবাচক অর্থে ব্যবহার করা হয়নি। দণ্ডের মাধ্যমে সমাজে শৃঙ্খলা বজায় থাকে; পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রকে মেনে চলার প্রবণতা তৈরী করে। দণ্ডের মাধ্যমেই ধর্ম, অর্থ, কাম রক্ষা পায়। এ কারণে কৌটিল্য রাজনীতির বিষয়টিকে দণ্ডনীতি বা দণ্ডনীতিশাস্ত্র হিসেবে উল্লেখ করেন। অথচ কৌটিল্য তাঁর গ্রন্থের নামকরণ করেন 'অর্থশাস্ত্র'। গ্রন্থটির শুরুই করেছেন তিনি এভাবে—'পৃথিবীর' (অর্থাৎ বসবাসকারী মানুষের জমির) অর্জন ও তার রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে আগেকার আচার্যগণ যে সমস্ত অর্থশাস্ত্র রচনা করে গেছেন সেইগুলি সংগ্রহ করেই এই অর্থশাস্ত্রখানি, রচনা করা হয়েছে। গ্রন্থের শেষে আমরা অর্থনীতিশাস্ত্রের একটি সংজ্ঞা পাই যা আমরা আগেই বলেছি। শেষের সংজ্ঞাটির বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, অর্থ শব্দটি একদিকে যেমন বৃত্তি বা জীবিকাকে বোঝায় অপরদিকে মনুষ্যযুক্ত ভূমি বা বসবাসকারী মানুষের ভৌগোলিক এলাকাকে বোঝায়। শেষের অর্থটি গ্রহণ করলে অর্থশাস্ত্রকে রাজনীতিশাস্ত্র হিসেবে উল্লেখ করতে কোনও অসুবিধে হয় না। যেহেতু রাষ্ট্রই জমির দখল, রক্ষণাবেক্ষণ-এর দায়িত্ব নেয়, জনগণের জীবিকার ব্যবস্থা করে, সেহেতু রাষ্ট্র সম্পর্কে আলোচনাই কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের বিষয়বস্তু।

এ প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয়েও আমাদের জানা প্রয়োজন। কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে দন্ড শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহার করেছেন। আমরা জানি, আক্ষরিক অর্থে দণ্ড বলতে বোঝায় শলাকা। এই বস্তুটি দিয়ে প্রাচীনকালে শাসক সম্ভবত অপরাধীকে শাস্তি দিত। একারণে দণ্ড শব্দটির পরবর্তীকালে রাষ্ট্রশক্তির সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়। অর্থশাস্ত্রের প্রথম অধিকরণে দণ্ড শব্দটির দ্বারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকেই বোঝানো হয়েছে। আবার চতুর্থ ও পঞ্চম অধিকরণে দণ্ড শব্দটির দ্বারা শাস্তি বিধানের বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থটির অন্যত্র, বিশেষ করে, নবম ও দশম অধিকরণে দণ্ড শব্দটি দ্বারা সৈন্য বাহিনীকে বোঝানো হয়েছে। অর্থশাস্ত্রে দণ্ড শব্দটির ব্যবহার যেভাবে ঘটেছে তাতে শব্দটির দ্বারা (১) দণ্ডনীতিশাস্ত্র (২) রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ও প্রশাসন (৩) বিচার ব্যবস্থা ও শাস্তি বিধাননীতি এবং (৪) সেনাবলকে বোঝানো হয়েছে।

৩৩.৩ রাষ্ট্রের উদ্ভব

গ্রীসের রাষ্ট্রদার্শনিক প্লেটোর 'রিপাবলিক' বা ইংলণ্ডের টমাস হবস এর 'লেভিয়াথান' এর মতো কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' রাষ্ট্রের কোনও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ হাজির করেনি। রাষ্ট্রের উদ্ভব, প্রকৃতি বা কাজ সম্পর্কে কোনও তাত্ত্বিক আলোচনার পরিবর্তে বাস্তবে রাষ্ট্র কিভাবে পরিচালিত হবে সে সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়াই এ গ্রন্থের লক্ষ্য; প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনাই প্রধান বিবেচ্য বিষয়। তা সত্ত্বেও রাষ্ট্রের উদ্ভব, রাষ্ট্রকে মেনে চলার কারণ, ব্যক্তির সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক, রাষ্ট্রের কার্যাবলী প্রভৃতি বিষয়গুলি অসংলগ্নভাবে আলোচিত হয়েছে বিভিন্ন অধ্যায়ে। এভাবেই রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে অর্থশাস্ত্রের ধারণাটি পাই কৌটিল্যের মুখ থেকে নয়---রাজার প্রতি প্রজাদের আনুগত্যের স্বরূপ জানার জন্য 'সত্রি' নামক গুপ্তচরদের মাধ্যমে উপস্থাপিত বক্তব্যে। প্রজারা রাজানুরক্ত না রাজবিরোধী তা জানার জন্য রাজা গুপ্তচর নিয়োগ করবেন। এই সমস্ত গুপ্তচর তীর্থস্থান, সভাঘর, খাদ্য ও পানীয়স্থান, দোকান, পূজা ও দলবদ্ধ কর্মীদের মাঝে পরস্পরের মধ্যে সাজানো মিথ্যা ঝগড়া করবেন এবং প্রজাদের মনোভাব বুঝবেন। এইরকম এক ঝগড়ার বক্তব্য হিসেবে রাষ্ট্র সৃষ্টি সম্পর্কে বক্তব্যটি হাজির হয়েছে; কৌটিল্যের নিজস্ব শৃঙ্খলাবদ্ধ তত্ত্ব হিসেবে নয়। সম্ভবত কৌটিল্য এভাবে সে সময়ের জনশ্রুতিকেই তুলে ধরেছেন।

অর্থশাস্ত্রের প্রথম অধিকরণের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে যে বিবরণ রয়েছে তা থেকে রাষ্ট্রের তথা রাজতন্ত্রের উদ্ভবের কারণ জানা যায়। কৌটিল্যের কাছে রাজতন্ত্রই যেহেতু স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান তাই রাষ্ট্রের এবং রাজতন্ত্রের উদ্ভব সমার্থক। রাষ্ট্রের উদ্ভবের আগে ছিল এক 'মাৎস্যন্যায়' অবস্থা। মাৎস্যন্যায় বলতে বোঝায় এমন এক অবস্থা যেখানে বড় বড় মাছ ছোট ছোট মাছকে গিলে নেয় অতি সাধারণভাবে। ঠিক সেভাবেই এক অরাজক অবস্থায় শক্তিশালী মানুষেরা দুর্বল মানুষের উপর অত্যাচার করে। এরকম অবস্থায় মানুষের পক্ষে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাপন সম্ভব নয়। তাই তারা বৈবস্বত মনুকে নিজেদের রাজা করেছিল এবং তারা এরকম নিয়ম করেছিল যে রাজা তাদের কাছ থেকে উৎপাদিত ধানের ছয় ভাগের এক ভাগ ও বিক্রয় যোগ্য দ্রব্যের (পণ্যের) দশ ভাগের এক ভাগ এবং হিরণ্য বা নগদ টাকা কর বাবদ পাবেন। এই করের বিনিময়ে রাজা প্রজাদের নিরাপত্তা ও মঙ্গল (যোগক্ষেম) এর ব্যবস্থা করবেন। এই কর রক্ষা কাজের জন্য রাজার প্রাপ্য বলে বনের ঋষিরাও তাঁদের সংগৃহীত ধান্যাদি থেকে ছয়ভাগের এক ভাগ রাজাকে দেবেন। রাজা যেহেতু প্রজাদের নিরাপত্তা বিধান ও দুষ্টের দমন করে থাকেন সেহেতু প্রজাদের উচিত তাদের উপর চাপানো কর এবং দণ্ড মেনে নেওয়া নতুবা তারা পাপের ভাগী হয়।

উপরের বক্তব্যের মধ্যে পশ্চিমী রাষ্ট্রতত্ত্বের সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তিগণ---টমাস হবস (খ্রী: ১৫৮৮-১৬৭৯) জন লক (খ্রী: ১৬৩২-১৭০৪) বা রুশোর (খ্রী: ১৭১২-১৭৭৮) সামাজিক চুক্তি মতবাদের সুর হয়ত শুনতে পাবেন। রাষ্ট্র সৃষ্টির আগের অবস্থাকে টমাস হবস ঘৃণ্য পাশবিক, কদর্য ও স্বল্পায়ু হিসেবে বর্ণনা করেন। প্রাকৃতিক এই ভয়ঙ্কর 'জোর যার মুলুক তার' অবস্থার সঙ্গে মাৎস্যন্যায় অবস্থার মিল রয়েছে যথেষ্ট। হবস এর মতে, এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য মানুষ নিজেদের মধ্যে একটি চুক্তি করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এক সার্বভৌমের হাতে তুলে দেয়। ব্যক্তিরা রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা মেনে চলবে নতুবা তাদের পুনরায় সেই প্রাকৃতিক অবস্থায় ফিরে যেতে হবে। চুক্তির শর্ত যেহেতু এক পক্ষের, অর্থাৎ রাজা বা সার্বভৌম

এই চুক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয় সেহেতু সার্বভৌমের ক্ষমতা চূড়ান্ত, অপ্রতিহত ও অবিভাজ্য। এভাবে ষোড়শ শতকে চুক্তিবাদী তাত্ত্বিক টমাস হবস রাষ্ট্রের উদ্ভব ও রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য সম্পর্কে এক সুশৃঙ্খল তত্ত্ব রচনা করেন। এই তত্ত্ব রচনার দু'হাজার বছর আগে ভারতে কৌটিল্য রাষ্ট্রের উদ্ভবের পিছনে অনুরূপ এক তত্ত্বের সন্ধান করেন। সমসাময়িক গ্রীক দর্শনেও অবশ্য এরকম এক তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। কৌটিল্যের মাৎসন্যায় এবং হবস এর প্রকৃতি-রাজ্যের রূপ একই---উভয়ই প্রাক্ সামাজিক অবস্থা। এই প্রাকৃতিক অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যই রাষ্ট্র তথা রাজার সৃষ্টি। কিন্তু কৌটিল্যের কাছে আনুগত্যের প্রশ্নটি হ'ল কর প্রদানের অনুমতি---উৎপাদিত ফসল, পণ্য ও অর্থের নির্দিষ্ট পরিমাণ সংগ্রহের অনুমতি। ইংলণ্ডে সদ্য উদ্ভূত পুঁজিপতি শ্রেণীর ভাষ্যকার টমাস হবস এর কাছে এই প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়নি; অথচ, কৌটিল্য যথার্থভাবেই মনে করেন----রাষ্ট্র সৃষ্টির পিছনে উদ্বৃত্ত শ্রমের ধারণা বর্তমান। কৃষিভিত্তিক সমাজের এই উদ্বৃত্ত শ্রম কৃষকের ফসলের একাংশ রাজার প্রাপ্য। এভাবে কৃষিভিত্তিক সমাজের উদ্বৃত্ত শ্রম থেকেই রাষ্ট্রের উদ্ভব। এদিক থেকে কৌটিল্যের তত্ত্ব অনেক বেশী বাস্তবানুগ। অর্থশাস্ত্রে উত্থাপিত এই ধারণা আরো ব্যাপকভাবে এবং বহু জায়গায় আলোচিত হয়েছে মহাভারতের মধ্যে।

৩৩.৩.১ রাষ্ট্রের প্রকৃতি

রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কিত আলোচনায় আমরা দেখেছি রাজা প্রজাদের কাছ থেকে কর সংগ্রহের বিনিময়ে প্রজাদের নিরাপত্তা ও মঙ্গল বিধান করবেন। নিরাপত্তা ও মঙ্গল বিধানের জন্য রাজা কখনও প্রজাদিগকে অনুগ্রহ কখনও নিগ্রহ করে থাকেন। এ কারণে রাজাকে ইন্দ্র ও যম স্থানীয় বলে কল্পনা করা হয়েছে। কোনও প্রজার পক্ষেই রাজাকে অপমান করা বা অমান্য করা উচিত নয়। বলা হয়েছে যে, রাজাকে যে অমান্য করে তাকে শুধু রাজদণ্ড নয়, দৈবদণ্ডও স্পর্শ করে।

দ্বিতীয়ত, প্রথম রাজা হিসেবেই মনুকে উল্লেখ করা হয়েছে। মনু হ'লেন বিশশ্বতের পুত্র। সূর্যের আবার অপর নাম বিশশ্বত। এদিক থেকে সূর্যের পুত্র হিসেবে মনুকে প্রথম রাজা হিসেবে উল্লেখ করার মধ্য দিয়ে সমগ্র সৌরজগতের মধ্যমণি রূপে রাজতন্ত্রকে গণ্য করা হয়েছে।

তৃতীয়ত, এই জগতের রাজতন্ত্রের সঙ্গে ঐশ্বরিক জগতের রাজতন্ত্রের এক সাদৃশ্য কল্পনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, রাজার অবস্থান ঐশ্বরিক জগতের ইন্দ্র ও যমের অনুরূপ; কারণ ইন্দ্রের মতো তিনি যেমন করুণা প্রদর্শন করেন তেমনই যমের মতো দণ্ড বিধানের ব্যবস্থা করে থাকেন।

চতুর্থত, কৌটিল্যের রাজা অনিয়ন্ত্রিত, অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী নন; কারণ, মানুষ রাজার হাতে ক্ষমতা অর্পণ করেছে তাদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য। প্রথম অধিকরণের ১৯তম অধ্যায়ে বলা হয়েছে, প্রজার সুখেই রাজার সুখ এবং প্রজার হিতেই রাজার হিত; যা রাজার প্রিয় তা রাজার হিত নয়। কিন্তু প্রজাদিগের যেটা প্রিয় সেটাই রাজার হিত। প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শনে রাজার কর্তৃত্বকে যতটা অধিকার হিসেবে দেখা হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশী দায়িত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। রাজার ক্ষমতাকে অপ্রতিহত করার পরিবর্তে অছি স্বরূপ দেখা হয়েছে। যোগক্ষেম বহন, চতুর্বর্ণাশ্রম ধর্ম রক্ষা প্রভৃতি দায়িত্বপালনের জন্যই রাজতন্ত্র বা রাষ্ট্রকর্তৃত্বকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। হ'তে পারে যাঁরা নীতিশাস্ত্রগুলি রচনা

করেছেন বা ব্যাখ্যা করেছেন তাঁরা ব্রাহ্মণ, তাঁরা উদ্বৃত্তের উপর জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। রাজার পক্ষে বিভিন্ন ধরনের দায়িত্ব পালনের কথা বলে তাঁরা রাজতন্ত্রকে সংযত করতে চেয়েছেন।

উপরের আলোচনা থেকে এ ধরনের সিদ্ধান্তে আসা ভুল হবে যে, কৌটিল্য এক ধর্মাশ্রয়ী রাষ্ট্রের রূপায়ণ করেছেন। তিনি অর্থশাস্ত্রে কোন ধর্মীয় সংগঠন বা সংস্থার উল্লেখ করেননি - যে সংস্থা রাষ্ট্রের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে এবং ধর্মীয় স্বার্থ বা অনুশাসনগুলি বলবৎ করবে। তিনি সকল ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপকে সমর্থন করে গেছেন। রাষ্ট্র কীভাবে শক্তিশালী হবে এবং রাষ্ট্রের প্রসার ঘটাবে সে বিষয়ে আলোচনাই কৌটিল্যের অন্যতম লক্ষ্য।

পঞ্চমত, রাষ্ট্রকর্তৃত্বের প্রতীক হিসেবে কৌটিল্য দণ্ড-এর উল্লেখ করেন। দণ্ডের মাধ্যমেই প্রজাদের পালন ও রাষ্ট্রকর্তৃত্বের প্রয়োগ ঘটে। এই দণ্ডনীতিই অলব্ধ বস্তুকে লাভ করায়, লব্ধবস্তুকে রক্ষা করায়, রক্ষিত বস্তুকে বর্ধিত করায় এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বস্তুকে উপযুক্ত পাত্রে বিনিযুক্ত করায়। এই দণ্ডের অভাবেই মাৎসন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়। কৌটিল্য দণ্ডকে এত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করলেও দণ্ডের প্রয়োগ সম্পর্কে রাজাকে যথেষ্ট সর্তক হ'তে বলেন। দণ্ডের প্রয়োগ হবে শুধুমাত্র প্রজাদের হিতসাধনের জন্য; অনিষ্ট করার জন্য নয়। কৌটিল্যের মতে, যিনি অল্প অপরাধে উগ্রদন্ড প্রয়োগ করেন তিনি সকলের উদ্বেগের কারণ হন। আবার যে রাজা মহা অপরাধে মৃদু দণ্ড প্রয়োগ করেন তিনি স্বয়ং পরাভব প্রাপ্ত হন। কিন্তু যে রাজা অপরাধের অনুরূপ উচিত দণ্ড প্রয়োগ করেন তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র হন। "কাম ক্রোধ বা অজ্ঞতাবশত যে দণ্ড অযথা প্রযুক্ত হয় তা বানপ্রস্থ ও পরিব্রাজকদেরও কোপ উৎপাদন করে, গৃহস্থের তো কথাই নাই।'

ষষ্ঠত, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে যেহেতু রাজাই প্রধান সেহেতু ইউ.এন. ঘোষাল এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে রাষ্ট্র এবং রাজা তথা স্বামী সমার্থক। কাঙলে অবশ্য এই মতকে পুরোপুরি স্বীকার করতে নারাজ। কাঙলের মতে, কৌটিল্য বর্ণিত রাষ্ট্রের ব্যয়ের তালিকার (ব্যয় শরীর ২.৬.১১) ১৫টি বিষয়ের (রাধাগোবিন্দ বসাকের হিসেবে ২৪টি) মধ্যে প্রথম চারটি বিষয় রাজার ব্যক্তিগত ব্যয় সম্পর্কিত; বাকি বিষয়গুলি রাষ্ট্র সম্পর্কিত। তাছাড়া, রাজা স্বয়ং, তাঁর পত্নীগণ ও রাজপুত্ররা কী রত্ন ও ভূমি লাভ করছেন তার হিসেব রাষ্ট্রের নিবন্ধপুস্তকে লিপিবদ্ধ করাবেন। এর থেকে মনে হয় রাজা এবং রাষ্ট্র সমার্থক নয়।

সপ্তমত, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে রাষ্ট্রের তিন ধরনের শক্তি তথা ক্ষমতার উল্লেখ পাওয়া যায়; যথা, উৎসাহশক্তি অর্থাৎ রাজার উৎসাহ ও ব্যক্তিগত গুণাবলী, শৌর্য বীর্য ইত্যাদি। প্রভাবশক্তি অর্থাৎ কোশ (অর্থ) ও দণ্ড (সেনা) এবং মন্ত্রশক্তি তথা মন্ত্রণাশক্তি। কৌটিল্যের সময়ের অন্যান্য পণ্ডিতদের মত ছিল এই তিনশক্তির মধ্যে প্রথমটি; অর্থাৎ রাজার উৎসাহ এবং ব্যক্তিগত গুণাবলীই প্রধান; কারণ, শৌর্য-বীর্যের অধিকারী দৈহিক বলসম্পন্ন ও অস্ত্রবিদ্যায় অভিজ্ঞ রাজার পক্ষে অন্য রাজ্যকে পরাস্ত করা সম্ভবপর হয়। কৌটিল্যের মতে উৎসাহশক্তি এবং প্রভাবশক্তির (কোষ ও সেনা) মধ্যে প্রভাবশক্তিই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ, কারণ অর্থ ও সেনায় সমৃদ্ধ রাজা শত্রুপক্ষের বীরদেরকেও প্রচুর ধনদানের মাধ্যমে বশ করতে পারেন এবং নিজ সেনার সাহায্যে অপর পক্ষকে পরাজিত করতে পারেন। অনুরূপভাবে বলা যায়, প্রভাবশক্তি ও মন্ত্রশক্তির মধ্যে মন্ত্রশক্তিই প্রধান, কারণ প্রজ্ঞা ও শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন রাজা অনায়াসেই মন্ত্রণা থেকে উদ্ভূত সিদ্ধান্ত

দ্বারা উৎসাহ ও প্রভাবশক্তি সম্পন্ন শত্রুরাজগণকে পরাভূত করতে পারেন। আবার শক্তি দেশ ও কালের মধ্যে কোন্‌টি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ সে সম্পর্কেও অন্যান্য পণ্ডিতদের মত খণ্ডন করে কৌটিল্য বলেন, শক্তি, দেশ ও কাল—এই তিনের প্রত্যেকটিকেই সমান প্রাধান্য দিতে হবে; কারণ, তিনটিই কার্যসাধন বিষয়ে একে অপরের পরিপূরক।

৩৩.৩.২ রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ

রাষ্ট্রের প্রকৃতি আলোচনার সময় আমরা দেখেছি, রাজতন্ত্রই কৌটিল্যের কাছে স্বাভাবিক শাসনব্যবস্থা। রাজা বাছাই-এর ব্যাপারে বৈদিক সূত্রে যে রত্নিন, সভা, সমিতির উল্লেখ পাওয়া যায় অর্থশাস্ত্রে তার কোনও উল্লেখ নেই। সম্ভবত কৌটিল্যের সময়ে রাজতন্ত্র বৈদিক যুগের তুলনায় অনেক বেশী দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। বৌদ্ধ শাস্ত্র সমূহেও রাজতন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। স্বাভাবিকভাবেই কৌটিল্যের আলোচনাতে রাজতন্ত্রই কাম্য শাসনব্যবস্থা।

অর্থশাস্ত্রে রাজতন্ত্র ছাড়াও আরো কয়েক ধরনের শাসনব্যবস্থার উল্লেখ রয়েছে। অষ্টম অধিকরণের দ্বিতীয় অধ্যায়ে দ্বৈরাজ্য এবং বৈরাজ্য—এই দু'ধরনের শাসনব্যবস্থাকে রাজতন্ত্রেরই ব্যাধি বা বিচ্যুতি জনিত শাসনব্যবস্থা হিসেবে কৌটিল্য উল্লেখ করেন। দ্বৈরাজ্য বলতে রাজ্যের বিভাজন বা দুই রাজ্যের উপস্থিতি নয়। দ্বৈরাজ্য বলতে কৌটিল্য বুঝিয়েছেন একই রাজ্যে দুই শাসকের উপস্থিতি, যেমন শাসক হিসেবে পিতা পুত্র বা দুই ভাই এর উপস্থিতি। পিতা-পুত্র বা দুই ভাই এর মধ্যে বিরোধের কারণে দ্বৈরাজ্য গড়ে ওঠে।

বৈরাজ্য হ'ল বিদেশীশাসক কর্তৃক কোনও রাজ্যের শাসন। কোনও বিদেশী রাজা ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে কোনও রাজ্য অধিকার করে সেই রাজ্যের শাসককে সরিয়ে যখন নিজে শাসন ক্ষমতা দখল করে তখন সেই পরাধীন রাজ্যকে বলা হয় বৈরাজ্য। কে. পি. জয়সওয়াল বৈরাজ্য শব্দটিকে রাজাশূন্য বা রাজাবিহীন রাজ্য হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। অপরদিকে, এইচ. কে. দেব শব্দটিকে ব্যাখ্যা করেছেন অভিজাততন্ত্র হিসেবে। এই উভয় ব্যাখ্যাকেই খণ্ডন করে কাঙলে দেখান যে, কৌটিল্য ব্যবহৃত বৈরাজ্য শব্দটির দ্বারা রাজাবিহীন বা অভিজাততন্ত্রের পরিবর্তে বিদেশী শাসক কর্তৃক অধিগৃহীত রাজ্যকে বোঝানো হয়েছে।

দ্বৈরাজ্য এবং বৈরাজ্যের মধ্যে কোন্‌টি কম ক্ষতিকারক সে সম্পর্কে কৌটিল্য আলোচনার সূত্রপাত করেন অষ্টম অধিকরণে। কৌটিল্যের সমসাময়িক পণ্ডিতদের মতে, বৈরাজ্য অপেক্ষা দ্বৈরাজ্য অধিকতর ক্ষতিকারক, কারণ দ্বৈরাজ্যে দুই রাজার উপস্থিতির জন্যে যদি উভয় রাজার মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয় তাহলে রাষ্ট্রেরও ক্ষতি হয়। কিন্তু বৈরাজ্য (যা অন্য রাজার বিজিত রাজ্য) প্রজাদের মন জয়ের জন্য চেষ্টা করে এবং জনকল্যাণকর হয়। কৌটিল্য এই মতের বিরোধিতা করে বলেন, পিতা ও পুত্রের মধ্যে বা দুই ভাইএর মধ্যে বিরোধের ফলে দ্বৈরাজ্য সৃষ্টি হয় কিন্তু এই রাজ্য সমান যোগক্ষেম বিশিষ্ট থাকে বলে অমাত্যগণ অধীন থাকে। কিন্তু বৈরাজ্যে বিজয়ী রাজা অপরের রাজ্য দখল করে 'এ রাজ্য তো আসলে আমার নয়' এরূপ মনে করে দণ্ড ও কর স্থাপন করে প্রজাদের কষ্টের কারণ হয়; অথবা অন্য রাজার কাছে অর্থের বিনিময়ে রাজ্য বিক্রয় করে অথবা প্রজারা বিরক্ত বুঝতে পারলে সে রাজ্য ত্যাগ করে। এককথায় বৈরাজ্যের রাজা নিজের রাজ্য হিসেবে প্রজাদের মঙ্গল করেন না। এ কারণেই কৌটিল্য দ্বৈরাজ্য অপেক্ষা বৈরাজ্যকে বেশি ক্ষতিকারক বলে মনে করেন।

'কূল' বা 'কুল সংঘ' দ্বারা পরিচালিত আর এক ধরনের রাষ্ট্রের উল্লেখ অর্থশাস্ত্রে রয়েছে। যখন কোনও রাজার উত্তরাধিকারী নিয়ে সংশয় বা অসুবিধে (যেমন নাবালকত্ব বা অযোগ্যতাজনিত কারণে) দেখা দেয় তখন রাষ্ট্র পরিচালিত হয় 'কূল সংঘ' দ্বারা (১.১৭)। ডঃ রাধাগোবিন্দ বসাক-এর মতে, এখানে 'কুল' শব্দের দ্বারা রাজার বহু পুত্রসংঘকে বা পুত্র না থাকলে কুলবৃদ্ধদেরকে বোঝানো হয়েছে। কৌটিল্যের মতে, এই ধরনের কূলসংঘ অত্যন্ত শক্তিশালী হয় এবং প্রজাপীড়ন না করে অনেকদিন রাষ্ট্রক্ষমতায় টিকে থাকে (১.১৭)। কিন্তু অষ্টম অধিকরণের তৃতীয় অধ্যায়ে সংঘ সমূহের কুফল সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এ ধরনের শাসনে পরস্পরের মধ্যে ভেদ উপস্থিত হয় এবং এর ফলে রাষ্ট্রের বিনাশ ঘটে।

একাদশ অধিকরণে কুলসংঘ ছাড়াও আর এক ধরনের সংঘ শাসনের কথা বলা হয়েছে। এই শাসন হল 'সংঘবৃত্ত' এর শাসন। এই বিষয়টি উপস্থাপনের উদ্দেশ্য হ'ল কিভাবে বিজিগীষু (বিজয়ে ইচ্ছুক) রাজা সংঘকে সহায়করূপে পেতে পারে তা দেখানো। কৌটিল্যের মতে, সংহত বা একত্রভাবে শক্তি সম্পন্ন হয়ে অবস্থিত সংঘসমূহ শত্রুগণের দ্বারা পরাজিত হয় না। একারণে সংঘকে সহায়ক হিসেবে পাওয়া গেলে বিজিগীষু রাজার পক্ষে সেই লাভ দণ্ড বা সৈন্য বা মিত্রলাভ অপেক্ষা অধিকতর কাম্য। সুতরাং, বিজিগীষু রাজা সংঘসমূহকে সাম ও দান প্রয়োগ করে নিজের আয়ত্বে রাখবেন এবং প্রতিকূল হ'লে সংঘসমূহকে ভেদ ও দণ্ড প্রয়োগ করে শাসনে রাখবেন।

সংঘগঠনের ধরন সম্পর্কে কোনও বিস্তারিত আলোচনা অর্থশাস্ত্রে নেই। অবশ্য একাদশ অধিকরণে দু'ধরনের সংঘের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। এক ধরনের সংঘ হ'ল কৃষি, পশুপালন অথবা বাণিজ্য যাদের জীবিকা কিন্তু প্রয়োজনে অস্ত্র ধরতেও সক্ষম এরকম লোকদের নিয়ে সংঘ। এই ধরনের সংঘকে বলা হয়েছে বার্ত্তাশস্ত্রোপজীবিন। এই ধরনের সংঘের উদাহরণ হ'ল কম্বোজ ও সুরাষ্ট্র দেশের সংঘ সমূহ। দ্বিতীয় ধরনের সংঘকে বলা হয় রাজশব্দোপজীবিন, অর্থাৎ রাজার উপাধি বা পদের দ্বারা যারা জীবিকা নির্বাহ করেন। সম্ভবত এ ধরনের সংঘ শাসনে শাসকগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সকলেই রাজা বলে পরিচিত হন। লিচ্ছিবিক (যাদের প্রাচীন রাজধানী ছিল বৈশালী) ব্রজিক (পালিতে বজ্জিক) মল্লক (প্রাচীন রাজধানী পাবা) মদ্রক, কুকুর, কুরু ও পাঞ্চালদেশীয় শ্রেণী বা সংঘীরা রাজনামধারী সংঘোপজীবী। এই উভয় ধরনের সংঘেই একাধিক শাসক থাকেন। এ কারণে বিজিগীষু রাজা কীভাবে সংঘ শাসকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে সংঘকে অনুকূলে নিয়ে আসবেন সেই বিষয়ে আলোচনাই স্থান পেয়েছে একাদশ অধ্যায়ে। অবশ্য, এই অধিকরণেরই শেষ সূত্রে কৌটিল্য পরামর্শ দিয়েছেন কীভাবে সংঘ এই ভেদবুদ্ধি অতিক্রম করে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখবে। বলা হয়েছে, সংঘগুলি রাজার ভেদবুদ্ধি সম্পর্কে যথেষ্ট সর্তক থাকবে। সংঘমুখ্য ন্যায় অনুসারে সকলের হিতকারী ও প্রিয় হয়ে সংঘ-মধ্যে অনুদ্ধত থাকবেন এবং নিজ চিন্তার কাছাকাছি জনসমূহকে নিজের কাছে রেখে সংঘের সব মানুষের মতানুবর্তী হয়ে থাকবেন। এই সাবধানবাণী থেকে মনে হয়, কৌটিল্য পুরোপুরি সংঘ শাসনের বিরোধী ছিলেন না। সংঘ প্রধানগণ কীভাবে সংঘ-মধ্যে প্রধান স্থান দখল করেন সে সম্পর্কে অবশ্য কোনও উল্লেখ নেই। কাঙলে মনে করেন, সম্ভবত প্রধানগণ কয়েকটি নির্দিষ্ট পরিবার থেকেই বাছাই হতেন। গোড়ার দিকে সম্ভবত বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রধানগণ মিলিত হয়ে এই সংঘ পরিচালনা করতেন।

৩৩.৪ সপ্তাঙ্গ তত্ত্ব—রাষ্ট্রের সাতটি উপাদান

প্রাক্ বৈদিক বা বৈদিক যুগে রাষ্ট্র সম্পর্কে কোনও সুস্পষ্ট এবং সুসংবদ্ধ বিশ্লেষণ পাওয়া যায় না। সম্ভবত এ সময় পর্যন্ত রাষ্ট্র সমাজজীবনে দৃঢ়মূল হয়ে ওঠেনি। ধর্মসূত্রে রাজা, অমাত্য প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার থাকলেও শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে রাষ্ট্রের বিষয়টি আলোচিত হয়নি। কিন্তু বেদ পরবর্তীযুগে ক্রমশ নির্দিষ্ট ভৌগলিক এলাকাযুক্ত এবং সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্র গড়ে উঠতে থাকে। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে আমরা ষোড়শ মহাজনপদের পরিচয় পাই বুদ্ধের সময় কোশল ও মগধ রাষ্ট্রের সমৃদ্ধি ঘটে। রাষ্ট্রের এই বিকাশ চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রেও প্রতিফলিত হয়। এসময়কার কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে আমরা প্রথম রাষ্ট্র সম্পর্কে এক সুসংবদ্ধ ও গভীর আলোচনা লক্ষ্য করি।

অর্থশাস্ত্রের 'মণ্ডলযোনি' নামক ষষ্ঠ অধিকরণের প্রথম অধ্যায়ে কৌটিল্য রাষ্ট্রের সাতটি উপাদানের কথা বলেন---'স্বাম্যমাত্যজনপদ, দুর্গ, কোশ, দণ্ড, মিত্রানি প্রকৃতয়ঃ'। কৌটিল্যের এই বক্তব্যে রাষ্ট্রের সাতটি উপাদান বা অঙ্গের পরিচয় আমরা পাই। যেমন স্বামী, অমাত্য, জনপদ, দুর্গ, কোষ দণ্ড এবং মিত্র। কৌটিল্য অবশ্য উপাদানের পরিবর্তে প্রকৃতি শব্দটি ব্যবহার করেছেন, কারণ এই উপাদানগুলি পরস্পরের প্রকৃষ্টভাবে উপকার সাধক বলে এদের নাম প্রকৃতি। অষ্টম অধিকরণের দ্বিতীয় অধ্যায় সপ্ত প্রকৃতিকে কৌটিল্য দু'টি বর্গে ভাগ করেন, যথা রাজা এবং রাজ্য। কৌটিল্যের সময়কার বা তার পরের অন্যান্য গ্রন্থেও যেমন মনুশ্রুতি, অগ্নিপুরাণ, কালিকাপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে এই সাতটি উপাদানের উল্লেখ রয়েছে; এ কারণে বিষয়টিকে রাষ্ট্রসম্পর্কে সপ্তাঙ্গ তত্ত্ব নামেও উল্লেখ করা হয়। আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে রচিত বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণে স্বামী এবং অমাত্যের পরিবর্তে সাম এবং দান শব্দ দু'টির উল্লেখ রয়েছে। মহাভারতের শান্তিপর্বে রাষ্ট্রের আটটি অঙ্গের (অষ্টাঙ্গিক রাজ্য) কথা বলা হয়েছে এবং অষ্টম অঙ্গ হিসেবে পুরশ্রেণীর উল্লেখ রয়েছে। আমরা এখানে রাষ্ট্রের এই সাতটি উপাদান সম্পর্কে আলোচনা করব।

৩৩.৪.১ স্বামী

রাষ্ট্রের প্রথম এবং প্রধান উপাদান হিসেবে স্বামীর উল্লেখ করা হয়েছে। রাজা বা শাসক এর পরিবর্তে স্বামী শব্দটি ব্যবহার এর মধ্য দিয়ে কৌটিল্য সম্ভবত প্রধান বা প্রভু অর্থেই ব্যবহার করেছেন। কৌটিল্য স্বামীর কতকগুলি গুণের কথা বলেছেন, যেমন বংশগতগুণ, প্রজ্ঞাগুণ, উৎসাহগুণ এবং আত্মগুণ। বংশগত গুণের কথা বলে কৌটিল্য সম্ভবত রাজতন্ত্র এবং অভিজাততন্ত্রকেই সমর্থন করেছেন। কৌটিল্যের আলোচনায় স্বামীর ক্ষমতার চেয়ে দায়িত্ব এবং কর্তব্যের বিষয়টিই প্রধান স্থান পেয়েছে। এ বিষয়ে আমরা পরে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব।

৩৩.৪.২ অমাত্য

অমাত্য শব্দটির ব্যবহার অর্থশাস্ত্রে এবং সে সময়ের অন্যান্য গ্রন্থেও লক্ষ্য করা যায়। সাধারণভাবে অমাত্য বলতে মন্ত্রীকেই বোঝায়। কিন্তু প্রাচীনকালে সম্ভবত অমাত্য ও মন্ত্রীদের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। মন্ত্রী বলতে বোঝায় অল্পসংখ্যক ব্যক্তি অপরদিকে অমাত্য বলতে অনেক ব্যক্তিকে—উভয়েই অবশ্য পরামর্শদানে, বা রাজ্যের কার্যপরিচালনায় রাজার সহায়ক। মহাভারতের শান্তিপর্বে যেখানে অমাত্যের সংখ্যা ৩৭, মন্ত্রীর

সংখ্যা সেখানে মাত্র ৮জন ঠিক করা হয়েছে---যদিও এই সংখ্যা মহাভারতে সবজায়গায় একই বলা নেই। অর্থশাস্ত্রে অমাত্য বলতে বোঝানো হয়েছে স্থায়ী এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণ, যেমন প্রধান পুরোহিত, মন্ত্রীগণ, রাজস্ব সচিব, কোষাধ্যক্ষ, দেওয়ানী এবং ফৌজদারী বিষয়ক প্রশাসক, অন্তঃপুররক্ষক এবং বিভিন্ন বিভাগের প্রধানগণ। অপরদিকে, মন্ত্রীগণ শুধুমাত্র রাজাকে মন্ত্রণাদানে যুক্ত থাকতেন। স্বাভাবিকভাবেই কৌটিল্য মন্ত্রীদের সংখ্যা তিন থেকে চার এর মধ্যে সীমিত রাখতে চেয়েছেন। অপরদিকে, অমাত্যগণের সংখ্যা নির্দিষ্টকরণের পরিবর্তে প্রয়োজন ও সামর্থ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে চেয়েছেন।

পালিগ্রন্থেও অমক্ক শব্দটির ব্যবহার করা হয়েছে এবং বলা বাহুল্য, কৌটিল্যের অমাত্য এবং পালি গ্রন্থে অমক্ক একই অর্থবহ। জাতক গ্রন্থে শতাধিক অমাত্য নিয়োগের ব্যবস্থা হয়েছে যেখানে অমাত্যগণ গ্রামের প্রধান, লবণ ক্রয়-বিক্রয়ের তত্ত্বাবধায়ক, বিচারক, জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক বিষয়ের পথ প্রদর্শক এবং জরিপবিদ হিসেবে কাজ পরিচালনা করেন। রামশরণ শর্মার মতে, প্রথমদিকে অমাত্যগণ ছিলেন স্বামীর তথা রাজার বন্ধু, সহচর পার্ষদ কিন্তু পরবর্তীকালে, বিশেষ করে মৌর্যযুগে, অমাত্যগণ রাজার কর্মচারীতে পরিণত হন। জাতক বর্ণিত অমাত্যদের মতো কৌটিল্য কথিত অমাত্যগণও কৃষিপরিদর্শন, দুর্গরক্ষা, জনপদের কল্যাণ, দুর্যোগ প্রতিরোধ, রাজস্ব সংগ্রহ, দোষী ব্যক্তির শাস্তিবিধান প্রভৃতি কাজগুলি সম্পাদন করেন। এককথায়, অমাত্যগণ সরকারী যন্ত্র স্বরূপ। মৌর্য পরবর্তী যুগে অমাত্য শব্দের পরিবর্তে সচিব শব্দটির ব্যবহার ঘটতে থাকে। রুদ্রদামন লিপিতে মতি সচিব এবং কর্মসচিব শব্দের উল্লেখ রয়েছে।

কৌটিল্য অমাত্যদের যোগ্যতার প্রসঙ্গে পঁচিশটি গুণ সম্পদের এক বিশাল তালিকা পেশ করেছেন; যেমন, স্বদেশীয়, উচ্চবংশজাত, বিভিন্ন কলায় পারদর্শী, বাগ্মী, সহনশীল, সচ্চরিত্রসম্পন্ন ইত্যাদি। এই সমস্ত গুণগুলি যে অমাত্যের মধ্যে রয়েছে তিনি উত্তম শ্রেণীর অমাত্য। গুণগুলির চারভাগের একভাগ যার নেই তিনি মধ্যম শ্রেণীর অমাত্য এবং যার এই গুণগুলির অর্ধেকও নেই তিনি অধম শ্রেণীর অমাত্য। অমাত্যদের গুণ এবং তাদের কাজের ধরন ও গতিবিধি সম্পর্কে রাজা সবসময় অবহিত হবেন গুপ্তচরের মাধ্যমে।

কৌটিল্যের কাছে মন্ত্রীগণ এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মন্ত্রীগণ রাজার মন্ত্রণাদাতা; রাষ্ট্রের তিনশক্তির মধ্যে মন্ত্রণাশক্তিই প্রধান। নীতি নির্ধারণ করা, আর্থিক ব্যবস্থা পর্যালোচনা করা, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবিলা—সব ব্যাপারেই রাজার উচিত যোগ্য মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করা।

৩৩.৪.৩ জনপদ

রাষ্ট্রের তৃতীয় উপাদানটি হ'ল জনপদ। প্রাচীনযুগে রাষ্ট্র শব্দটির পরিবর্তে জনপদ শব্দটির প্রচলন ছিল বেশী। মনুস্মৃতি, বিষ্ণুপুরাণ ও মহাভারতের শান্তিপর্বে সপ্তাঙ্গ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে জনপদ শব্দটির ব্যবহার করা হয়েছে। কামন্দকীয় নীতিসারে রাষ্ট্রশব্দটির মাঝে মাঝে ব্যবহার ঘটেছে, আবার গুপ্তযুগে, যেমন যাজ্ঞবল্কসূত্রে, শুধুমাত্র 'জন' শব্দটির ব্যবহার করা হয়েছে.

পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রতত্ত্বে রাষ্ট্রের উপাদান হিসেবে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের কথা বলা হয়েছে এবং জনসংখ্যাকে অপর একটি উপাদান ধরা হয়েছে। কিন্তু প্রাচীন ভারতে, যেমন অর্থশাস্ত্রে, জনপদ শব্দটির মাধ্যমে নির্দিষ্ট ভূখণ্ড এবং জনসংখ্যা এই দু'টি উপাদানকে একসঙ্গে বোঝানো হয়েছে। তাছাড়া, ভূখণ্ড বলতে এখানে

শুধুমাত্র জমি নয়; সুন্দর আবহাওয়াযুক্ত গোচারণ ও সমৃদ্ধ কৃষিযোগ্য জমিকেই ধরা হয়েছে। এখানে থাকবে পরিশ্রমী কৃষক যারা কর এবং শাস্তিবহনে সক্ষম। জনসংখ্যার মধ্যে একদিকে থাকবে অল্পসংখ্যার জ্ঞানবান প্রভু এবং বহু সংখ্যায় নিম্নজাতভুক্ত ব্যক্তি যারা প্রকৃতিতে হবে অনুগত। অর্থশাস্ত্রে জনসংখ্যার সঠিক সংখ্যার উল্লেখ না থাকলেও নতুন জনপদ গঠনের ক্ষেত্রে কৌটিল্য বলেন, প্রতিটি গ্রাম গড়ে উঠবে এক থেকে পাঁচশত পরিবার নিয়ে এবং স্থানিক এবং জনপদের সবচেয়ে বড় একক গড়ে উঠবে আটশত গ্রাম নিয়ে। কামন্দক আরো স্পষ্টভাবে বলেন, জনসংখ্যার মধ্যে থাকবে শূদ্র, কারিগর, ব্যবসায়ী এবং পরিশ্রমী উদ্যোগী কৃষক। গুপ্তযুগের বিভিন্ন পুরাণেও জনসংখ্যার প্রকৃতি সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে, যেমন মৎসপুরাণে বলা হয়েছে রাজা এমন এক দেশে বাস করবেন যেখানে বৈশ্য এবং শূদ্রদের আধিক্য থাকবে; থাকবে অল্পসংখ্যায় ব্রাহ্মণ, অধিক পরিমাণে ভাড়াটে শ্রমিক।

আপনি নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন, প্রাতিটি শাস্ত্রেই জনসংখ্যার মধ্যে অধিক পরিমাণে পরিশ্রমী ও উদ্যোগী জনের থাকার কথা বলা হয়েছে। আসলে এ সময় অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটতে থাকে। কৃষিব্যবস্থা ক্রমশ স্থায়ী এবং সমৃদ্ধ হ'তে থাকে। উদ্বৃত্ত ফসলকে কেন্দ্র করেই ক্রমশ রাষ্ট্রের ও তার সরকারী ব্যবস্থাপনার প্রসার ঘটে। একে কেন্দ্র করেই সমাজে প্রাধান্য স্থাপনের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। গড়ে উঠতে থাকে এক নতুন সামাজিক বিন্যাস যা বর্ণভিত্তিক এবং পরে জাতভিত্তিক স্তর-বিন্যাসের রূপ নেয়। এই স্তর-বিন্যাসে প্রভু এবং ব্রাহ্মণ উচ্চজাতভুক্ত, কায়িক শ্রম থেকে মুক্ত, উদ্বৃত্তের উপর নির্ভরশীল, যাদের সংখ্যাও তুলনায় কম। অপরদিকে, কায়িক শ্রমজীবি ব্যাপক মানুষ যারা কৃষক, কারিগর, ভাড়াটে শ্রমিক নামে পরিচিত। এর মাঝে রয়েছে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য এক বিশাল কর্মীবাহিনী ও সেনাবাহিনী। এই সব নিয়েই কৌটিল্যের জনপদ।

৩৩.৪.৪ দুর্গ

রাষ্ট্রের চতুর্থ উপাদানটিকে কৌটিল্য দুর্গ বলে উল্লেখ করেন। মনুসংহিতায় অবশ্য দুর্গের পরিবর্তে পুর শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে রাষ্ট্রের তৃতীয় উপাদান হিসেবে। সাধারণত দুর্গ বলতে গড়, কেল্লা বোঝায়। কিন্তু এখানে দুর্গ শব্দটির দ্বারা রাজধানী, নগর, দুর্গকে বোঝানো হয়েছে। অর্থশাস্ত্রে দুর্গবিধান এবং দুর্গনিবেশ---এই দু'টি শব্দেরও উল্লেখ রয়েছে। প্রথমটির মধ্যে দুর্গের গঠন এবং দ্বিতীয়টির মধ্যে রাজধানীর পরিকল্পনা ও নকশা সম্পর্কিত আলোচনা স্থান পেয়েছে। মহাভারতের শান্তিপর্বে জনপদ এবং পুর এই দু'টি শব্দের পার্থক্য করে বলা হয়েছে, জনপদ বলতে গোটা রাজ্য এবং পুর বলতে রাজধানী বোঝায়। পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রচর্চায় রাষ্ট্রের উপাদান হিসেবে দুর্গের উল্লেখ না থাকলেও গ্রীক দার্শনিক আরিস্টটল (Aristotle, 384-322 B.C.) 'Politics' গ্রন্থে রাষ্ট্রের মধ্যে রাজধানীর অবস্থান কোথায় হবে সে সম্পর্কে আলোচনা করেন। আরিস্টটলের মতো কৌটিল্যও মনে করেন, রাষ্ট্রের কেন্দ্রস্থলে রাজধানী স্থাপিত হবে, বিভিন্ন জাতগোষ্ঠী এবং কারিগর, এমনকি দেবদেবীদের মন্দিরও, সুনির্দিষ্ট এলাকাভিত্তিক স্থানে গড়ে উঠবে। রাজধানীতে বিভিন্ন ধরনের কারিগরের অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর কারণ, সম্ভবত, একদিকে সামরিক ও কৃষির প্রয়োজনে কারিগর অপরিহার্য এবং দ্বিতীয়ত কারিগররা রাজস্ব প্রদানের মাধ্যমে রাজকোষকে স্ফীত করে তোলে। দুর্গের মধ্যে বিভিন্ন ভেষজ দ্রব্য ও গাছগাছড়া যেমন থাকবে যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্যও মজুত থাকবে। বিভিন্ন

ধাতব পদার্থে সমৃদ্ধ থাকবে দুর্গ। দুর্গের গঠন ও জনবিন্যাসের এক বিস্তারিত বিবরণও দিয়েছেন কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে।

৩৩.৪.৫ কোষ

রাষ্ট্রের পঞ্চম উপাদান হিসেবে কৌটিল্য কোষ এর উল্লেখ করেন। রাজকোষ বা ধনভাণ্ডারের নিয়ন্ত্রক হবেন রাজা স্বয়ং। রাষ্ট্রের প্রয়োজনে বৈধ এবং ন্যায়সম্মতভাবে ধনসম্পদ সংগ্রহ করা রাজার অন্যতম দায়িত্ব। এমনকি কোন্ কোন্ উৎস থেকে ধনসঞ্চয় হ'তে পারে কৌটিল্য তারও এক বিশদ তালিকা পেশ করেন। দুর্গ, জনপদ, খনি, বাড়ী ও উদ্যান, বন, পশু এবং বনিকপথ এই সাতটি উৎসের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়। যেমন, দুর্গের মধ্যেই রয়েছে পথশুল্ক, জরিমানা, বৃত্তিকর প্রভৃতি বিষয়। রাজকোষে সোনা, রূপা, মণিমুক্তা, অন্যান্য মূল্যবান ধাতু, খাদ্য দ্রব্য ইত্যাদির সংগ্রহ এমন পর্যাপ্ত হবে যাতে যে কোন দুর্বিপাক, যেমন যুদ্ধ, মহামারী, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি ঘটনার মোকাবিলা করা যায়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে রাজার সংগৃহীত রাজঅন্তঃপুর ছাড়াও প্রশাসনিক ও সামরিক প্রয়োজনে রাজকোষ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; নতুবা রাজকর্মচারী ও সামরিক বাহিনীকে অনুগত রাখা যাবে না। বস্তুত, রাষ্ট্রের যে কোনও কাজই যে রাজকোষের উপর নির্ভর করে তা কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রের অষ্টম অধিকরণে প্রথম অধ্যায়ে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন।

রাষ্ট্রের আয় ও ব্যয়ের তদারকি করার জন্য এক বিশাল কর্মচারী বাহিনীর কথাও কৌটিল্য বলেন। এই কর্মচারীদের প্রধান থাকবেন রাজার কাছে। রাজকোষ যাতে সুরক্ষিত থাকে, রাষ্ট্রীয় অর্থের যাতে অপচয় না হয়, কর্মচারীরা যাতে রাজকোষ অত্মস্যাৎ না করে তার জন্য তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিদের তথা গুপ্তচরদের সাহায্য নেবেন।

৩৩.৪.৬ দণ্ড

দণ্ড হচ্ছে রাষ্ট্রের ষষ্ঠ উপাদান। দণ্ড শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হ'লেও রাষ্ট্রের উপাদান হিসেবে দণ্ড শব্দটির ব্যবহার করা হয়েছে সেনাবাহিনীকে বোঝাতে। কৌটিল্যের মতে, দণ্ডের মধ্যে বংশানুক্রমিক এবং ভাড়াটে এই দু'রকমের সৈনিকই থাকবে। সৈন্যবাহিনীতে পদাতিক, অশ্বারোহী, রথারোহী ও হস্তিবাহিনী থাকবে। বনাঞ্চল এবং অন্যান্য দুর্গম অঞ্চলের জন্য দক্ষ বাহিনী দরকার। ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ শাস্ত্রে ক্ষত্রিয়কে সৈন্যবাহিনীর উপযুক্ত এবং যুদ্ধই ক্ষত্রিয়ের জাত-কাজ বলা হয়েছে। মনুসংহিতায় বা মহাভারতে অবশ্য রাষ্ট্রের আপৎকালীন অবস্থায় ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যকেও সৈন্যবাহিনীতে যোগদানের কথা বলা হয়েছে। কৌটিল্য অবশ্য বৈশ্য ও শূদ্রকেও সৈন্যবাহিনীতে নিয়োগের পক্ষপাতী। সম্ভবত কৌটিল্য যখন অর্থশাস্ত্র রচনা করেন তখনও জাত-ভিত্তিক সমাজব্যবস্থা দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এ কারনে বংশানুক্রমিক সৈনিকের কথা বললেও ভাড়াটে সৈনিকও কৌটিল্যের রচনায় স্থান পেয়েছে। সৈনিকের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি বলেন, সৈনিক হবে দক্ষ, ধৈর্যবান, জয়পরাজয় সম্পর্কে বিগতমনা, রাজানুগত এবং রাজার আজ্ঞাবহ। সৈনিক ও তার পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণ ও ভরণপোষণের দায়িত্ব থাকবে রাষ্ট্রের হাতে।

৩৩.৪.৭ মিত্র

রাষ্ট্রের সপ্তম ও সর্বশেষ উপাদান হ'ল মিত্র যা অন্যান্য শাস্ত্রে সুহৃদ নামে উল্লেখ করা হয়েছে। কৌটিল্যের মতে, সৈনিকের মতো মিত্রও হবে বংশানুক্রমিক, প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্খী, যে কোনও বিপদে সাহায্যদানকারী। শঠতা, লোভ, মিথ্যা বলা, কৃত্রিমতা প্রভৃতি শত্রুর বৈশিষ্ট্য—মিত্রের নয়। বিদেশনীতির আলোচনায় কৌটিল্য সেই সমস্ত রাজাকে মিত্র হিসেবে গণ্য করেছেন যাঁরা বিজিগীষু রাজার সঙ্গে মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হয়ে যুদ্ধে সহায়তা করেন। বিষয়টি সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত ভাবে পরে আলোচনা করব।

৩৩.৪.৮ রাষ্ট্রের উপাদানগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক ও আপেক্ষিক গুরুত্ব

রাষ্ট্রের বিভিন্ন উপাদানগুলির উল্লেখের পর উপাদানগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক ও গুরুত্ব সম্পর্কেও কৌটিল্য আলোচনা করেন। এ ব্যাপারে তিনি সে সময়কার অন্যান্য পণ্ডিতদের বক্তব্য তুলে ধরেন। ভরদ্বাজ রাষ্ট্রের উপাদানগুলির মধ্যে অমাত্যকে মূল চালিকাশক্তি হিসেবে উল্লেখ করেন, কারণ, গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত অমাত্যগণের সাহায্যেই নেওয়া হয়। কৌটিল্য এই মতের বিরোধীতা করে বলেন, সমস্ত উপাদানগুলির মধ্যে স্বামীই প্রধান, কারণ স্বামী বা রাজা যদি দক্ষ এবং যোগ্য হন তাহলে অন্য উপাদানগুলিকেও যোগ্য করে তুলতে পারেন। তাছাড়া, অমাত্য, সৈনিক ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কর্মচারী রাজনির্দেশেই নিযুক্ত হন। রাজাই রাষ্ট্রশক্তির প্রতীক এবং অন্যান্য উপাদানগুলির কাছ থেকে আনুগত্য আদায় করেন। অষ্টম অধিকরণের দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লেখিত 'রাজা রাজ্যমিতি প্রকৃতি সংক্ষেপ', এই বাক্যটির দ্বারা, গণপতি শাস্ত্রী এবং ইউ.এন. ঘোষালের মতে, রাজা এবং রাজ্যকে সমার্থক হিসেবেই দেখা হয়েছেক্ষে ; বলাবাহুল্য, মৌর্যযুগে রাজতন্ত্রের প্রাধান্য কৌটিল্যের তত্ত্বের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে।

অন্যান্য উপাদানগুলির মধ্যে কোন্‌টি বেশী গুরুত্বপূর্ণ সে সম্পর্কে কৌটিল্যের মত হ'ল, আগের উপাদানটি পরের উপাদানের তুলনায় বেশী গুরুত্বপূর্ণ, যেমন মিত্রের তুলনায় দণ্ড, দণ্ডের তুলনায় কোষ, কোষের তুলনায় দুর্গ, দুর্গের তুলনায় জনপদ, জনপদের তুলনায় অমাত্য এবং অমাত্যের তুলনায় স্বামী অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।

মৌর্যপরবর্তী এবং গুপ্তযুগের রাজনৈতিক চিন্তায় উক্ত উপাদানগুলির আপেক্ষিক গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। মনু কৌটিল্যের মতকে গ্রহণ করেও বলেন, কোনও এক বিশেষ সময়ে কোনও কোনও উপাদান বেশীগুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। মনুসংহিতার নবম অধ্যায় (২৯৫ এবং ২৯৭ শ্লোক), কামন্দকীয় নীতিসারে এবং মহাভারতের শান্তিপর্বে বিভিন্ন উপাদানগুলির পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। মনু তো দণ্ডকেই প্রকৃত রাজা বলে ব্যাখ্যা করেন। মনুভাষ্যে দেখা যায়, দণ্ডই জনগণের শাসক, রক্ষক ও ধর্মের তত্ত্বাবধায়ক। শান্তিপর্বেও বলা হয়েছে, ক্ষত্রিয়দের ক্ষমতাহীন থাকা উচিত নয়; কারণ, এতে ক্ষত্রিয় এবং প্রজা কারও সমৃদ্ধি ঘটে না (মহাভারত-শান্তিপর্ব ১৪-১৪)। রামশরণ শর্মা দেখিয়েছেন, শান্তিপর্বের চতুর্দশ অধ্যায়ে অন্তত ৪৮টি শ্লোক রয়েছে যেখানে দণ্ডের গুরুত্ব আলোচিত হয়েছে। শান্তিপর্বে পঞ্চদশ অধ্যায়ে ৩৭ থেকে ৪৫ নং শ্লোকের মূল বক্তব্য হ'ল, যদি দণ্ড কার্যকরী না হয় তাহলে রাষ্ট্রের অন্যান্য উপাদানগুলিকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে তোলে। শান্তিপর্বে ১২১ অধ্যায়ে বলা হয়েছে, প্রজাগণ প্রতিদিন দণ্ড দ্বারাই প্রতিপালিত হয়ে রাজাকে সমুন্নত করে। অতএব দণ্ডই সর্বপ্রধান। অবশ্যই এই

দণ্ডের ব্যবহার হবে ধর্মাশ্রিত ও আইনানুগ- মনুর ভাষায়, শাস্ত্রসম্মত ও মন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী। পরবর্তীকালে রচিত যাজ্ঞবল্ক্য সূত্রেও দণ্ডের উপর সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। রামশরণ শর্মার মতে, মৌর্যযুগের পরে সামন্ত ব্যবস্থার উদ্ভব ও প্রসারের ফলে রাজতন্ত্রের কর্তৃত্বের হ্রাস ঘটতে থাকে। এর সঙ্গে রাজাকে অন্যতম উপাদান হিসেবে না দেখে বা রাজা ও রাজ্য সমার্থক মনে করার পরিবর্তে অন্যান্য উপাদানগুলির উপর গুরুত্ব আরোপিত হতে থাকে। তাছাড়া মৌয পরবর্তীযুগে একদিকে বাইরের শত্রুর অবদমন অপরিদিকে দেশের ভিতরে বিদ্রোহ দমনের জন্য দণ্ডের উপরই বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়।

৩৩.৪.৯ উপাদানগুলির সংকট বা ব্যাথি

রাষ্ট্রের সাতটি উপাদান এবং এই উপাদানগুলির মধ্যে কোন্‌টি বেশী গুরুত্বপূর্ণ সে সম্পর্কে আমরা কৌটিল্যের মতামত জেনেছি। এই উপাদানগুলির বিভিন্ন সমস্যা বা সংকট সম্পর্কেও কৌটিল্য 'অর্থশাস্ত্র ' গ্রন্থে অষ্টম অধিকরণে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। এই অধিকরণটির নাম হল 'ব্যাসনাধিকারিক'। যা কল্যাণের বা ভালোর পথ থেকে কোনও কিছুকে ভ্রষ্ট করে তাই হ'ল ব্যসন। অর্থাৎ স্বামী, অমাত্য, জনপদ প্রভৃতি সাতটি উপাদানের সমস্যা বা সংকট দেখা দিতে পারে এবং এর ফলে রাষ্ট্রও সংকটের মুখে পড়ে। এই সমস্যা কৌটিল্যের মতে দৈবজনিত বা মনুষ্য সৃষ্ট হতে পারে। আগুন, বন্যা, রোগ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতিকে কৌটিল্য দৈবজনিত সমস্যা বলেছেন। মানুষের তৈরী সমস্যাকে আভ্যন্তরীণ এবং বহিরাগত এই দু'ভাবে তিনি ভাগ করেন। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে এই সংকট দেখা দেয় অমাত্য, সৈন্য, রাজকর্মচারী ইত্যাদির মাধ্যমে। বহিরাগতভাবে এই সমস্যা দেখা দেয় যখন দেশ কোনও শত্রুরাজ্য দ্বারা আক্রান্ত হয়। দেশের সম্পদ লুণ্ঠন, হত্যা, আগুন লাগানো প্রভৃতির মাধ্যমে শত্রুপক্ষ দেশের মধ্যে সংকট সৃষ্টি করে।

রাষ্ট্রের সাতটি উপাদানের মধ্যে কোন উপাদানটি দোষযুক্ত হলে রাষ্ট্রের পক্ষে বেশী ক্ষতি হয়---সে সম্পর্কে কৌটিল্য সমসাময়িক পণ্ডিতদের মত তুলে ধরেছেন এবং অন্যান্য মতগুলিকে বাতিল করে নিজের মত প্রকাশ করেছেন। কৌটিল্যের মতে, রাষ্ট্রের উপাদানগুলির মধ্যে পরের তুলনায় আগের উপাদানটি যেমন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষতির দিক থেকেও পরের তুলনায় আগের উপাদানটি দোষযুক্ত হ'লে রাষ্ট্রের পক্ষে বেশী ক্ষতি হয়। ভরদ্বাজ এর মতে, দোষযুক্ত স্বামী (রাজা) এবং অমাত্য এই দু'য়ের মধ্যে দোষযুক্ত অমাত্যই বেশী বিপজ্জনক, কারণ রাজাকে মন্ত্রণা দান, মন্ত্রণার ফলাফল নির্ণয় আয়-ব্যয়ের ব্যবস্থা, শাস্তিদান, সেনাবাহিনী সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া, রাজা ও রাজ্যের রক্ষা এসব কাজ অমাত্যরাই করে থাকেন। সুতরাং, অমাত্যের অভাবে ডানাকাটা পাখির মত রাজা অসহায় হয়ে পড়বেন। কৌটিল্য এই মতের বিরোধিতা করে বলেন অমাত্যের দোষের চেয়ে রাজার দোষই বেশী ক্ষতিকর। কারণ, রাজাই মন্ত্রী, অমাত্য, অন্যান্য গুরুত্ব কর্মচারীদের নিয়োগ ও কাজের তদারকি করে থাকেন এবং তাদের নিয়ন্ত্রণ ও উন্নতির ব্যবস্থা রাজার হাতে রয়েছে। এমনকি, অমাত্যগণ দোষী হ'লে রাজা অন্য অমাত্যকে নিয়োগ করতে পারেন। এ কারণে রাজাই হ'লেন প্রধান এবং রাজার দোষ রাষ্ট্রের পক্ষে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিকর।

আচার্য বিশালাক্ষ অমাত্য ও জনপদ এই দু'য়ের দোষের মধ্যে জনপদের দোষকেই বেশী ক্ষতিকর বলে

উল্লেখ করেন; কারণ কোষ দণ্ড, খনিজ ও ধাতব পদার্থসমূহ, ফসল, কারিগর প্রভৃতি জনপদ থেকেই পাওয়া যায়। কৌটিল্যের মতে, জনপদের সবরকমের কাজ ঠিকভাবে পরিচালনা, নতুন গ্রাম প্রতিষ্ঠা, রাজ্য রক্ষা ও সমৃদ্ধি ঘটানো, জরিমানা ও কর সংগ্রহের মাধ্যমে জনপদের উপকার করা--- এ সমস্ত কাজ অমাত্যগণই করে থাকেন। সেহেতু জনপদের তুলনায় অমাত্যদের দোষ দেশের পক্ষে বেশী ক্ষতিকর।

এভাবে কৌটিল্য দুর্গের তুলনায় জনপদের দোষ, কোষের তুলনায় দুর্গের দোষ, দণ্ডের তুলনায় কোষের দোষ এবং মিত্রের তুলনায় দণ্ডের দোষকে রাষ্ট্রের পক্ষে বেশী ক্ষতিকর বলে মত প্রকাশ করেন। গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর ন্যায়তত্ত্ব আলোচনার মত কৌটিল্য সে সময়কার বিভিন্ন পণ্ডিতের বক্তব্যকে হাজির করেছেন এবং সেই সমস্ত বক্তব্যকে যুক্তির সাহায্যে বাতিল করে নিজের মত উপস্থিত করেছেন। কৌটিল্যের মতে, আগের উপাদানটি পরের উপাদানটির তুলনায় বেশী ক্ষতিকর। অবশ্য তিনি একথাও বলেন, যদি দেখা যায় একটি উপাদানের দোষের ফলে সেই দোষ অন্যান্য উপাদানগুলির ও দোষের কারণ হয় তাহলে সেই উপাদানটি বেশী ক্ষতিকর বলে বিবেচিত হবে।

৩৩.৫ রাজতন্ত্র

ভারতের ইতিহাসে বৈদিক পরবর্তী যুগে যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল রাজতন্ত্রের প্রসার। অর্থশাস্ত্র এ সময়েরই নির্দেশ স্বরূপ এক শাস্ত্র। স্বাভাবিকভাবেই রাজার বাছাইকরণ, রাজার গুণ, দায়িত্ব প্রভৃতি বিষয়গুলি কৌটিল্যের আলোচনায় প্রধান জায়গা জুড়ে রয়েছে।

অর্থশাস্ত্রের আলোচনা থেকে মনে হয় বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রই কৌটিল্যের কাম্য শাসনব্যবস্থা। একারণে রাজ সিংহাসনে উত্তরাধিকারের বিষয়টি কৌটিল্যের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে পুত্র উপযুক্ত আত্মগুণসম্পন্ন তাকেই রাজা যুবরাজের পদে বসাবেন। কৌটিল্য রাজপুত্রদের গুণ অনুসারে বুদ্ধিমান, আহার্যবুদ্ধি ও দুর্বুদ্ধি---এই তিন ভাগে ভাগ করেন। উপযুক্ত গুরুর দ্বারা শিক্ষিত হয়ে যে পুত্র কেবলমাত্র ধর্ম ও অর্থ সম্পর্কে শিক্ষা নেয় এবং সেইরূপ আচরণও করে তাকে বুদ্ধিমানপুত্র বলা হয়। যে পুত্র ধর্ম ও অর্থ সম্পর্কে শিক্ষা নিয়ে সেইভাবে আচরণ করে না তাকে আহার্যবুদ্ধিপুত্র বলে। আর যে পুত্র দুর্বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হয় সেই পুত্রকে দুর্বুদ্ধিপুত্র বলা হয়। সেই দুর্বুদ্ধিপুত্র যদি বড় পুত্র এমনকি একমাত্র পুত্রও হয় তাহলেও রাজা তাকে রাজপদে বসাবেন না। যদি রাজার একাধিক পুত্র থাকে তাহলে সেই দুর্বুদ্ধিসম্পন্ন পুত্রকে দেশের প্রান্তে আটক রেখে অন্য পুত্রকে রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব দেবেন। যদি রাজা কোনও পুত্রকে উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনীত না করে মারা যান তাহলে অমাত্যগণ রাজবংশেরই আত্মগুণসম্পন্ন রাজকুমারকে রাজপদে বসাবেন। যদি কোনও রাজপুত্র আত্মগুণ সম্পন্ন না হ'ল তাহলে রাজকন্যাকে বা রানীকে রাজপদে বসাবেন। এক্ষেত্রে কৌটিল্যের যুক্তি হল রাজপুত্র/রাজকন্যা/রানী তো ধ্বজরূপী মাত্র; অমাত্যরাই বাস্তবিক স্বামী স্থানীয়। দ্বিতীয়ত, রাজা সাধারণত আগেকার নিয়মকানুনই মেনে চলেন কিন্তু রাজবংশের বাইরে কাউকে রাজা করলে সেই নতুন রাজা প্রথা না মেনে স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠতে পারেন। এভাবে কৌটিল্য শুধু রাজতন্ত্রকেই সমর্থন করেন নি, বংশানুক্রমিক ধারাবাহিক রাজতন্ত্রকেই সমর্থন করেছেন।

৩৩.৬.১ রাজার গুণ

ষষ্ঠ অধিকরণের প্রথম অধ্যায়ে কৌটিল্য রাজার কয়েকটি গুণের উল্লেখ করেন। এই গুণগুলিকে আভিগামিকগুণ, প্রজাগুণ, উৎসাহগুণ, আত্মসম্পদ প্রভৃতি নামে ভাগ করা হয়েছে। আভিগামিক গুণের মধ্যে কৌটিল্য ১৬টি গুণের উল্লেখ করেন যেমন; রাজা হবেন উঁচুবংশের, সত্যবাদী, দাতা, কৃতজ্ঞ, অপরের কাছে জ্ঞানগ্রহণে আগ্রহী ইত্যাদি। রাজার ৮টি প্রজাগুণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল শাস্ত্র সম্পর্কে উৎসাহ, শৌর্য্য, দৃঢ়তা, শীঘ্রতা ও সব কাজে নৈপুণ্য। উপরের গুণগুলি ছাড়াও রাজা আত্মসম্পদে বলীয়ান হবেন। এই আত্মসম্পদগুলি হ'ল বাগ্মীতা, উন্নতচিত্ত, যুদ্ধ ও সন্ধি ব্যাপারে জ্ঞানসম্পন্ন, আত্মসংযমী, বিনয়ী, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি ছয় রিপুর নিয়ন্ত্রণকারী, প্রিয়বাদী ইত্যাদি।

বলাবাহুল্য, উপরের গুণগুলির উল্লেখের মাধ্যমে কৌটিল্য এক চরম আদর্শানুগ রাজার বিবরণ দিয়েছেন যা বাস্তবে আদৌ সম্ভবপর নয়। কৌটিল্যও এ ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন এবং এ কারণে তিনি শাসকের যথাযথ শিক্ষার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। রাজাকে অবশ্যই বিভিন্ন বিষয়ে, যেমন, আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী, বার্তা ও দন্ডনীতি সম্পর্কে উপযুক্ত জ্ঞানসম্পন্ন হ'তে হবে। উপনয়নের পর যুবরাজ উপযুক্ত গুরুর কাছে শিক্ষা নেবেন। দিনের কোন্ সময়ে কোন্ বিদ্যা যুবরাজ নেবেন সে সম্পর্কেও কৌটিল্য এক বড়রকমের তালিকা পেশ করেন; যেমন, দিনের প্রথমদিকে যুবরাজ যুদ্ধবিদ্যা শিখবেন এবং দিনের শেষ দিকে ইতিহাস শিক্ষা নেবেন। এখানে ইতিহাস বলতে কৌটিল্য পুরাণ, ইতিবৃত্ত, শাস্ত্রগ্রন্থ, ন্যায়গ্রন্থ, অর্থশাস্ত্র সব কিছুকেই বুঝিয়েছেন। কৌটিল্যের মতে, যা ভালোভাবে বোঝা যায়নি তা তিনি বারবার শুনবেন; কারণ বারবার শুনতে শুনতে প্রজ্ঞা তথা জ্ঞানের বিকাশ হয়। প্রজ্ঞা থেকে জ্ঞানের বিষয়টি সম্পর্কে আগ্রহ বা যোগ বাড়ে। যোগ বা আগ্রহ থেকে আত্মজ্ঞান হয়।

৩৩.৫.২ রাজার কর্তব্য

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে রাজা রাষ্ট্রের কেন্দ্রবিন্দু হ'লেও স্বৈরাচারী শাসক নন। কৌটিল্য বারবার বিভিন্ন অধ্যায়ে রাজার কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন; যেমন, রাজা অভিজ্ঞ বয়স্কদের কাছ থেকে জ্ঞান নেবেন, গুপ্তপুরুষদের নিয়োগের মাধ্যমে রাজ্যের অভ্যন্তরে ও অন্যান্যদের ব্যাপারে খবরাখবর নেবেন। নিজে ভালো হয়ে প্রজাদেরও ভালো হ'তে বলবেন। প্রজাদের কাছে প্রিয় হবেন এবং প্রজাদের ভালো করার মাধ্যমে নিজের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করবেন। রাজা যদি নিজের কাজে উদ্যোগী হন তাহলে অমাত্য ও অন্যান্য কর্মচারীরাও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হবেন। রাজার একদিনের তথা ২৪ ঘন্টার যে কাজের তালিকা কৌটিল্য দেখিয়েছেন তা একদিকে যেমন বিস্ময়কর অন্যদিকে বিষয়বৈচিত্রে পূর্ণ; যেমন, রাজা দিনের আটভাগের প্রথমভাগে গতদিনের আয়ব্যয়ের হিসেব ও গতরাত্রের প্রহরার কাজ দেখবেন; দ্বিতীয়ভাগে পুরবাসী ও জনপদবাসীদের কাজ দেখবেন; তৃতীয়ভাগে স্নান, ভোজন ও বেদাধ্যয়ন করবেন; চতুর্থভাগে নগদ টাকার হিসেব নিকেশ করবেন ও অধ্যক্ষদের কাজে নিযুক্ত করবেন; পঞ্চমভাগে মন্ত্রীপরিষদের সঙ্গে মন্ত্রণা করবেন এবং অমাত্য ও গুপ্তচরদের উপর নজর রাখবেন; ষষ্ঠভাগে স্বচ্ছন্দ-বিহার বা মন্ত্রণা করবেন; সপ্তমভাগে হাতি, ঘোড়া, রথ ও অস্ত্র সকল দেখবেন; অষ্টম ভাগে সেনাপতির সঙ্গে যুদ্ধ বিষয়ে আলোচনা করবেন; দিনের শেষে তিনি সন্ধ্যাকালীন উপাসনা করবেন। ঠিক একইভাবে রাত্রের অষ্টমভাগের বিষয়েও কৌটিল্য

এক বিস্তারিত বিবরণ দেন।

রাজকার্য পরিচালনার ব্যাপারে ও কৌটিল্য প্রজাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগর কথা বলেন। সভায় যাতে প্রজারা সহজে রাজার কাছে উপস্থিত হ'তে পারে এবং অভিযোগ জানাতে পারে সে ব্যাপারে রাজাকে ব্যবস্থা করতে হবে। কৌটিল্য বারবার মনে করিয়ে দিতে চান রাজার পক্ষে উদ্যোগ বা সবসময় কাজে ব্যস্ত থাকা ব্রত স্বরূপ; কাজ রাজার কাছে যজ্ঞস্বরূপ; সমান ব্যবহার রাজার পক্ষে দক্ষিণাস্বরূপ; প্রজার মঙ্গলই রাজার মঙ্গল। এ ব্যাপারে কৌটিল্য ধর্মের দোহাইও দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, প্রজারক্ষক রাজার স্বধর্ম পালন রাজাকে স্বর্গপ্রাপ্তির অধিকারী করে এবং প্রজাগণের মিথ্যাদণ্ডের প্রণয়নকারী রাজা নরক প্রাপ্তির অধিকারী হন। (অর্থশাস্ত্র ৩.১.৪১)।

৩৩.৬ প্রজা বিদ্রোহ

রাষ্ট্রের প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখেছি কৌটিল্য রাষ্ট্রের ক্ষমতা বা দণ্ডের প্রয়োগ সম্পর্কে রাজাকে যথেষ্ট সতর্ক হ'তে বলেন; কারণ, অন্যায়ভাবে দণ্ডের প্রয়োগ হ'লে প্রজারা অসন্তুষ্ট হতে পারে, বিদ্রোহী হয়ে উঠতে পারে; এমনকি অন্য রাজার সঙ্গে হাত মিলিয়ে রাজাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারে। এ কারণে প্রজাবিদ্রোহের বিষয়টি কৌটিল্যের আলোচনায় যথেষ্ট গুরুত্বসহকারেই আলোচিত হয়েছে।

৩৩.৬.১ প্রজা বিদ্রোহের কারণ

প্রকৃতি অনুসারে প্রজাদের কৌটিল্য তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেন; যথা ক্ষীণ, লোভী ও বিক্ষুব্ধ প্রজা। এদের মধ্যে ক্ষীণের তুলনায় লোভী এবং লোভীর তুলনায় বিক্ষুব্ধ প্রজাই রাষ্ট্রের পক্ষে অধিকতর বিপদজনক। কারণ, ক্ষীণপ্রজা শাস্তি ও উচ্ছেদের ভয়ে অনুগত থাকতে বা পলায়নে পছন্দ করে। লোভীপ্রজা লোভের জন্য অসন্তুষ্ট হয়ে শত্রু দ্বারা বশীভূত হ'তে পারে কিন্তু বিক্ষুব্ধ প্রজারা শত্রুর আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে নিজ রাজার প্রতি আক্রমণেরও আয়োজন করে। সপ্তম অধিকরণের পঞ্চম অধ্যায়ে রাজার সেই সমস্ত কাজগুলির উল্লেখ করা হয়েছে যার ফলে প্রজাগণ বিদ্রোহী হয়ে উঠতে পারে। এই কাজগুলি হ'ল যথাক্রমে (১) বিদ্যাদি সম্পন্ন সৎ মানুষের প্রতি অবজ্ঞা ও অসৎ মানুষের প্রতি অনুগ্রহ দেখানো; (২) অনুচিত ও অধর্মযুক্ত হিংসাত্মক কাজের প্রচলন; (৩) অধর্মযুক্ত, অর্থাৎ অন্যায় কাজের প্রতি আসক্তি ও ন্যায় কাজের প্রত্যাখ্যান (৪) অনর্থযুক্ত কাজ করা ও করণীয় কাজ থেকে বিরত থাকা, (৫) ভৃত্যদের বেতন ও অন্যান্য দেয় বস্তুগুলি না দেওয়া ও অন্যের কাছ থেকে বলপূর্বক সম্পদ বা ঘুষ নেওয়া, (৬) শাস্তিযুক্ত ব্যক্তির শাস্তিমকুব বা হ্রাস এবং শাস্তির বর্হিভূত ব্যক্তিকে শাস্তিদান, (৭) চোর ইত্যাদি দুষ্ট ব্যক্তিদের নিজের পাশে রাখা এবং গুণী ও যোগ্যব্যক্তিদের দূরে রাখা; (৮) অনর্থকারী কাজের সম্পাদন এবং অর্থযুক্ত কাজে অনীহা; (৯) চুরি থেকে প্রজাদের রক্ষা করতে ব্যর্থ হওয়া বা নিজে অপহরণকারী হওয়া; (১০) পুরুষকারের ও কাজের সম্যক অনুষ্ঠানজনিত গুণের নিন্দা; (১১) যোগ্য কর্মাধ্যক্ষগণের উপর দোষারোপ এবং পুরোহিতাদি মান্য ব্যক্তিদের অবমাননা; (১২) বিদ্যা দ্বারা বৃদ্ধগণের মধ্যে সংশয়বৃদ্ধি ও অসত্যকথা দ্বারা বিরোধ ঘটানো; (১৩) উপকারের বিনিময়ে অপকার করা ও নিত্যকরণীয় কাজ থেকে বিরত থাকা; (১৪) রাজার আলস্য বা ভুল বশত যোগ (অলব্ধের লাভ) এবং ক্ষেম (লব্ধের প্রতিপালন) এর নাশ। রাজার এ ধরণের কাজগুলি প্রজাদের

মধ্যে অসন্তোষ বৃদ্ধি করে ও প্রজাদের বিদ্রোহী করে তোলে। এব্যাপারে কৌটিল্যের পরামর্শ হ'ল রাজা কখনই প্রজাদের অসন্তোষের কারণগুলি উৎপাদন করবেন না---সেগুলি উৎপাদিত হ'লেও তৎক্ষণাৎ তিনি তার প্রতিকার করবেন।

বিদ্রোহের বিভিন্ন কারণ ও ধরন সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনার লক্ষ্য হ'ল রাজাকে সতর্ক করে দেওয়া যাতে এ ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব না হয় বা হ'লেও কীভাবে রাজা তার মোকাবিলা করবেন। কৌটিল্য বিদ্রোহকে সমর্থন করেননি---বিদ্রোহকে এক অবাঞ্ছিত পথ বলেই মনে করেছেন। কৌটিল্যের মতে, যে কোনও রাজা, এমনকি দোষযুক্ত হ'লেও, রাজ্যপরিচালনার আগেকার নিয়মকানুনই মেনে চলেন। কিন্তু নতুন রাজা কোনরকম প্রথা না মেনে সেচ্ছাচারী হয়ে উঠতে পারেন। তাছাড়া, রাজা দোষযুক্ত বা দুর্বল হ'লেও আভিজাত্যের কারণে অন্যান্য রাজকর্মচারীগণ, অমাত্যগণ, সেনাগণ রাজাকে মেনে চলে। এখানে কৌটিল্যের মনোভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ঐশ্বর্যের স্বভাবই হ'ল আভিজাত্যের অনুবর্তন করা। ঐশ্বর্যশালী ও অভিজাত বংশে জন্মজ রাজাকে প্রজারা মেনে চলবে কিন্তু রাজা নীচকুলজাত হ'লে অন্যান্যরা সুযোগ পেলেই অসহযোগী হয়ে ওঠে। এভাবে কৌটিল্য আভিজাত্যপূর্ণ রাজতন্ত্রকেই সমর্থন করে গেছেন।

৩৩.৬.২ প্রজাবিদ্রোহের ধরন

কৌটিল্য রাজার বিরুদ্ধে দু'ধরনের বিদ্রোহের সম্ভাবনার কথা বলেন। (এক) মন্ত্রী, পুরোহিত, সেনাপতি ও যুবরাজ---এই চারজনের বা চারজনের সঙ্গে যে কোনও এক বা একাধিক জনের নেতৃত্বে বিদ্রোহ যাকে কৌটিল্য অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ বলেছেন। মন্ত্রী, পুরোহিত, সেনাপতি ও যুবরাজ ছাড়া অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা যে বিদ্রোহ সৃষ্টি করে তা অন্তরামাত্যজনিত বিদ্রোহ বলে। এই দু'ধরনের বিদ্রোহই অভ্যন্তর বিদ্রোহ যা দেশের ভিতর থেকেই সৃষ্ট হয়। এই দু'ধরনের বিদ্রোহের মধ্যে প্রথম ধরনের বিদ্রোহ রাজার নিজের দোষে বা অপরের ক্ষমতালোভে হ'তে পারে। যদি রাজার নিজের দোষে এ বিদ্রোহ ঘটে তাহলে রাজা সেই দোষ কাটিয়ে উঠে বিদ্রোহের মোকাবিলা করবেন। অপরদিকে, মন্ত্রী পুরোহিত, সেনাপতি বা যুবরাজ এর ক্ষমতার লোভে যদি এ বিদ্রোহ হয় তাহলে রাজা এই বিদ্রোহ দমনে তাদের ক্ষমতা ও অপরাধ অনুসারে দণ্ডদানের ব্যবস্থা করবেন। যেমন, পুরোহিত যদি অপরাধী হন তাহলে মৃত্যুর পরিবর্তে তার দণ্ড হবে হয় বন্দী করা বা দেশ থেকে বিতাড়িত করা। যুবরাজ যদি অপরাধী হয় এবং যদি রাজার অন্য কোনও গুণবান পুত্র থাকে তাহলে সেই যুবরাজের শাস্তি হবে বন্দী করা অথবা হত্যা করা। এর আগে অবশ্য রাজা বিভিন্ন ধরনের সুযোগ দিয়ে বশে আনার চেষ্টা করবেন। নতুবা সেই বিদ্রোহীকে সৈন্যের অধিনায়ক করে যুদ্ধে পাঠাবেন এবং যুদ্ধে পাওয়া জিনিষপত্র তার অধিকারভুক্ত করার অনুমতি দেবেন। অন্যান্য রাজকর্মচারীরা যে বিদ্রোহের সামিল হয় তা দমনের জন্য রাজা সাম, দান, ভেদ এবং দণ্ড এই চার ধরনের ব্যবস্থার মধ্যে প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করবেন।

অন্য রাষ্ট্রের প্রধান সীমান্তবর্তী এলাকার প্রধান, বনাঞ্চল প্রধান প্রমুখ ব্যক্তিদের সৃষ্ট বিদ্রোহকে বাহ্য বা বহিরাগত বিদ্রোহ বলে। এ ধরনের বিদ্রোহ দেখা দিলে রাজা এই বিদ্রোহ দমনে পরস্পরের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করবেন। অথবা নিজ মিত্রদ্বারা তাকে মিত্রতাজালে বদ্ধ করবেন।

কৌটিল্যের মতে, অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক এই দু'ধরনের বিদ্রোহের মধ্যে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহই বেশী

ভয়াবহ এবং অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের মধ্যে একেবারে নিকটজনের কাছ থেকে বিদ্রোহ আরো বেশী ভয়াবহ। যে কোনও ধরনের বিদ্রোহের মোকাবিলাতে রাজা সাম, দান (অর্থদান, করমুক্তি বা বিশেষ পদ দানও বোঝায়) ভেদ (বিভেদ সৃষ্টির মাধ্যমে বিদ্রোহীকে দুর্বল করা) এবং দণ্ড (প্রয়োজনে হত্যা)---এই চার ধরনের ব্যবস্থার মধ্যে যেটি উপযুক্ত মনে করবেন তার প্রয়োগ করবেন।

প্রকৃতি অনুসারে বিদ্রোহকে কৌটিল্য আবার দু'ভাগে ভাগ করেন—শুদ্ধ ও মিশ্র বিদ্রোহ। বিদ্রোহ শুধুমাত্র দেশের অভ্যন্তর বা বাহ্যিক হ'লে তা শুদ্ধ বিদ্রোহ; যে ক্ষেত্রে বিদ্রোহ দেশদ্রোহী ও বহিঃশত্রুর মধ্যে মিলিত প্রচেষ্টার হয় তাকে মিশ্র বিদ্রোহ বলে। যে কোনও বিদ্রোহেই অবশ্য রাজা জনগণের উপর ক্ষমতা প্রয়োগের পরিবর্তে অন্যান্য উপায়সমূহ, যথা সাম, দান ও ভেদ প্রয়োগ করবেন; কারণ, অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রয়োগে প্রজাগণ আরো বিদ্রোহী হয়ে উঠতে পারে।

৩৩.৭ বৈদেশিক সম্পর্ক পরিচালনা

প্রাচীন ভারতে বৈদিকযুগের শেষের দিকে নির্দিষ্ট ভৌগলিক সীমানা নিয়ে রাষ্ট্রের অবস্থা গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়টিও গুরুত্ব পেতে থাকে। কোনও রাষ্ট্রের শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা, রাষ্ট্রের সীমানার প্রসার ঘটানো প্রভৃতি বিষয়গুলি যে অন্য রাষ্ট্রের অবস্থান, গতি-প্রকৃতি প্রভৃতি বিষয়ের উপর নির্ভর করে সে সম্পর্কে সে সময়ের রাজা এবং পণ্ডিতগণ ক্রমশ সচেতন হ'তে থাকেন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ও মহাভারতের শান্তিপর্বে আমরা এই চিন্তা চেতনারই প্রকাশ লক্ষ করি। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে, বিশেষ করে অধিকরণের দ্বিতীয় অধ্যায় এবং সপ্তম অধিকরণ জুড়ে, অন্যরাজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক পরিচালনার বিষয়টি আলোচিত হয়েছে।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে অন্যরাজের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়টি আলোচিত হয়েছে বিজিগীষু (যিনি সাম, দান, কোষ ও দণ্ড প্রয়োগের মাধ্যমে শত্রুকে জয় করতে ইচ্ছুক) রাজাকে কেন্দ্র করে। নিজের ক্ষমতা ও রাজ্যের এলাকা বাড়াতে ইচ্ছুক রাজা কীভাবে অন্য রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক পরিচালনা করবেন সেই বিষয়টি কৌটিল্য আলোচনা করেছেন 'রাজমণ্ডল' তত্ত্বের মাধ্যমে---যেখানে রাজা চারপাশেই শত্রু ও মিত্র দিয়ে ঘেরা। এই রাজমণ্ডলে বা বৃত্তে মোট রাষ্ট্রের সংখ্যা কত সে সম্পর্কে অর্থশাস্ত্র গ্রন্থেই দু'টি ধারণা রয়েছে। একটা ধারণা অনুসারে দশটি রাষ্ট্র নিয়ে গড়ে ওঠা দশ রাজমণ্ডল এবং মধ্যম ও উদাসীন এই দু'টি নিয়ে অর্থাৎ মোট ১২টি রাষ্ট্র নিয়ে গড়ে ওঠে দ্বাদশ রাজমণ্ডল। এই ১২টি রাষ্ট্রের প্রকৃতি নিয়ে আমরা আলোচনা করবো।

(১) বিজিগীষু রাজা, অর্থাৎ যিনি নিজের ক্ষমতা বাড়াতে ইচ্ছুক;

(২) অরি, অর্থাৎ বিজিগীষু রাজার বন্ধু যার রাজ্যের সীমানা বিজিগীষু রাজার বন্ধুর সীমানার পর;

(৩) মিত্র, অর্থাৎ বিজিগীষু রাজার বন্ধু যার রাজ্যের সীমানা শত্রু রাজ্য সীমানার পরে;

(৪) অরি মিত্র বা শত্রু বন্ধু — শত্রুর বন্ধু যার রাজ্য সীমানা বিজিগীষু রাজার বন্ধুর সীমানার পর;

(৫) মিত্রমিত্র---বিজিগীষু রাজার মিত্রের মিত্র যার অবস্থান শত্রুর মিত্রের রাজ্যের সীমানার পরে;

(৬) অরি মিত্র মিত্র---শত্রুর মিত্রের মিত্র যার রাজ্য সীমানা বিজিগীষু রাজার মিত্র মিত্রের রাজ্য সীমানার পরেই;

বিজিগীষু রাজার পিছনে থাকেন

(১) পার্ষ্ণিগ্রাহ যিনি শত্রুর মঙ্গলের জন্য বিজিগীষু রাজার পার্ষ্ণি অর্থাৎ পিছনে থাকেন এবং সে কারণে বিজিগীষু রাজার শত্রু।

(২) আক্রন্দ যিনি বিজিগীষু রাজার মঙ্গলের জন্য পার্ষ্ণিগ্রাহকে বাধা দিতে পারেন। সুতরাং তিনি বিজিগীষু রাজার বন্ধু;

(৩) পার্ষ্ণিগ্রাহসার যিনি পার্ষ্ণিগ্রাহকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন, একারণে তিনি বিজিগীষু রাজার শত্রু;

আক্রন্দাসার, যিনি আক্রন্দের সাহায্যে এগিয়ে আসেন। ইনি বিজিগীষু রাজার ও বন্ধু।

এই দশজন ছাড়াও আরো দু'জন রাজা রয়েছেন যাদের কৌটিল্য মধ্যম এবং উদাসীন রাজা বলে উল্লেখ করেন। মধ্যম রাজা হ'লেন সেই ধরনের রাজা যিনি বিজিগীষু এবং তাঁর শত্রুরাজা উভয়ে তুলনায় বেশী ক্ষমতাশালী এবং উভয়কেই সাহায্য করতে পারেন। আর যে রাজা বিজিগীষু, শত্রুরাজা এবং মধ্যম রাজা থেকে দূরত্ব বজায় রেখে অবস্থান করেন, বেশী ক্ষমতাশালী এবং যিনি উপরোক্ত সব রাজাকেই সাহায্য করতে বা দমন করতে পারেন তিনি হলেন উদাসীন রাজা।

এই দ্বাদশ রাজার আবার প্রত্যেকেরই অমাত্য, জনপদ, দূর্গ, কোষ এবং দণ্ড প্রভৃতি পাঁচটি উপাদান বা প্রকৃতি রয়েছে। সুতরাং, ১২ জন রাজা এবং প্রত্যেক রাজার পাঁচটি করে উপাদান বা প্রকৃতি মোট ৭২টি (১২ + ৫ X ১২) উপাদান নিয়ে কৌটিল্যের আন্তঃরাজ্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। সুতরাং, বিজিগীষু রাজা বিদেশ সম্পর্ক পরিচালনার ক্ষেত্রে এই ৭২টি উপাদান ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে সচেতন থাকবেন।

কৌটিল্যের মতে, বিজিগীষু রাজার শত্রু বা মিত্রের প্রকৃতি বা স্বভাবও একই রকমের নয়। বিজিগীষু রাজার রাজ্য সীমানার কাছাকাছি যে শত্রুরাজা তিনি বিজিগীষু রাজার সহজ বা স্বাভাবিক শত্রু। আবার, রাজার সমান বংশে জাত যে শত্রু সেই রাজাও বিজিগীষু রাজার সহজ বা স্বাভাবিক শত্রু। অপরদিকে যে শত্রু নিজেই বিরোধীতায় এগিয়ে আসে বা অন্য রাজার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিরোধী হয়ে ওঠে সেই রাজা বিজিগীষু রাজার কৃত্রিম বা সাময়িক শত্রু।

একইভাবে, বিজিগীষু রাজার রাজ্য সীমানার এক রাজ্যের ব্যবধানে (শত্রু রাজ্যের পরেই যার অবস্থান) তিনি সহজ বা স্বাভাবিক মিত্র। মা বা বাবার বংশের সম্পর্কের মিত্র ও স্বাভাবিক বা সহজ মিত্র। অপরদিকে, যে মিত্র নিজের ধর্ম ও জীবনের জন্য বিজিগীষু রাজার আশ্রয় নেয় সেই মিত্র হ'ল বিজিগীষু রাজার কৃত্রিম বা সাময়িক মিত্র। এই মিত্রের প্রকৃতি অনুসারে বিজিগীষু রাজা তাঁর বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ ও পরিচালনা

করবেন এবং দেশীয় রাজনীতিতে সিদ্ধান্ত নেবেন।

৩৩.৭.১ মূলনীতিসমূহ

বৈদেশিক সম্পর্ক পরিচালনার ব্যাপারে কৌটিল্য ছয়টি নীতির (ষাড়গুণ্য) কথা বলেন। এগুলি হ'ল ঃ সন্ধি, বিগ্রহ, আসন, যান, সংশ্রয় এবং দ্বৈধীভাব। দু'দেশের রাজার মধ্যে কতকগুলো শর্ত মেনে যদি চুক্তি হয় তার নাম সন্ধি বা শান্তির নীতি। শত্রুর সঙ্গে বিরোধের নাম বিগ্রহ; অন্য রাজার প্রতি নিরপেক্ষ অবস্থানের নাম আসন; অন্যরাজ্যের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠানো বা আক্রমনের নাম যান; অন্যরাজার কাছে আশ্রয় নেওয়ার নাম সংশয় এবং একই সময়ে এক রাজার প্রতি যুদ্ধ অন্যরাজার সঙ্গে সন্ধি---এই দুই নীতি গ্রহণের নাম দ্বৈধীভাব।

বাতব্যাধির মতে বৈদেশিক সম্পর্ক পরিচালনার মাত্র দু'টি নীতিই রয়েছে — হয় সন্ধি নয়তো যুদ্ধ। এই মত বাতিল করে কৌটিল্য বলেন, বৈদেশিক সম্পর্কের বিভিন্ন পরিস্থিতির মোকাবিলায় ছ'টি নীতিই গুরুত্বপূর্ণ এবং রাজা কোন নীতি অনুসারে কাজ করবেন তা নির্ভর করবে সেই সময়কার রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর। যেমন, নিজেকে শত্রুর চেয়ে দুর্বল মনে করলে বিজিগীষু রাজা শত্রুর সঙ্গে সন্ধি করবেন আর নিজেকে তুলনায় শক্তিশালী বলে মনে করলে যুদ্ধই হবে রাজার উপযুক্ত নীতি। সমান ক্ষমতা সম্পন্ন দুই রাজার মধ্যে আসন বা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানই কাম্য। অপরদিকে, নিজেকে খুবই দুর্বল মনে করলে সংশ্রয় বা অন্য রাজার কাছে আশ্রয় সম্ভাবনা থাকে এবং সেই সাহায্য পাওয়ার পর শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করা যেতে পারে এরকম মনে করলে রাজা দ্বৈধীভাব অনুসরণ করবেন। এই ছয়নীতির মধ্যে যে নীতি অনুসরণ করলে নিজের দুর্গ সীমানা, বাণিজ্যপথ, খনি, বন প্রভৃতি রক্ষা এবং শত্রুপক্ষের উপরোক্ত বিষয়গুলি ধ্বংস করতে পারবেন সেই নীতিই বিজিগীষু রাজা অনুসরণ করবেন।

৩৩.৭.২ সন্ধি

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পরিচালনায় কৌটিল্য সন্ধির উপর বেশ জোর দিয়েছেন। কৌটিল্যের মতে কোনও রাজা তখনই সন্ধি করবেন যখন তিনি নিজেকে অন্য পক্ষের তুলনায় কম শক্তিশালী বলে মনে করবেন। সন্ধির শর্তের ধরন অনুযায়ী সন্ধিকে দণ্ডোপনত সন্ধি, কোষোপনত সন্ধি এবং দেশোপনত সন্ধি---এই তিনভাগে ভাগ করা হয়। যদি সন্ধির শর্ত অনুযায়ী সৈন্য সমর্পন করতে হয় তাহলে সেই সন্ধিকে দণ্ডোপনত সন্ধি বলে। যদি সন্ধির শর্ত অনুযায়ী অর্থ সম্পদ হস্তান্তর করতে হয় তাহলে সেই সন্ধি হল কোষাপনত সন্ধি। আর যদি সন্ধির শর্ত অনুযায়ী কোনও এলাকা দিতে হয় তাহলে সেই সন্ধিকে দেশোপনত সন্ধি বলে। সন্ধি কিভাবে করা হচ্ছে সেই অনুযায়ী সন্ধিকে আবার পরিপনিত সন্ধি এবং অপরিপনিত সন্ধি— এই দুভাবে ভাগ করা হয়। যদি সন্ধির শর্তের মধ্যে কোনও কাজের ব্যাপারে নির্দেশ থাকে তাহলে সেই সন্ধি হয় পরিপনিত সন্ধি। যদি সন্ধির মধ্যে দেশ কাল বা কাজের কোনও শর্ত না থাকে এবং শুধুমাত্র কথাবার্তার বিশ্বাস এর উপর সন্ধি হয় তাহলে সে সন্ধিকে অপরিপনিত সন্ধি বলে।

দণ্ডোপনত সন্ধি আবার তিন ধরনের হ'তে পারে। যথা আত্মামিষ সন্ধি, পুরুষান্তর সন্ধি এবং অদৃষ্ট পুরুষ সন্ধি। নির্দিষ্ট সংখ্যার সৈন্য ও অর্থ নিয়ে দুর্বল রাজা যখন শক্তিশালী শত্রু রাজার কাছে হাজির হয়

এবং তার সেবা করে তখন সেই সন্ধিকে আত্মামিষ (আত্ম + আমিষ অর্থাৎ নিজেই ভোজা) সন্ধি বলে। সেনাপতি ও রাজপুত্রকে শক্তিশালী শত্রুরাজার কাছে পাঠিয়ে যে সন্ধি হয় সেই সন্ধিকে পুরাযাত্তর সন্ধি বলে। শত্রুরাজার কাজের জন্য দুর্বল রাজা যখন একাকী কোনও স্থানে যেতে বাধ্য হয় তখন সেই চুক্তিকে অদৃষ্টপূর্ব সন্ধি বলে।

কোষোপনত সন্ধি চার রকমের হ'তে পারে। যে সন্ধিতে অমাত্যদের শক্তিশালী শত্রুর হাত থেকে অর্থ দিয়ে মুক্ত করা হয় তখন সেই সন্ধিকে পরিচয় সন্ধি বলে। এই সন্ধিতে যদি অর্থ শোধকরার ব্যাপারটি কিস্তিতে কিস্তিতে দেবার ব্যবস্থা থাকে তাহলে সেই সন্ধি হয় উপগ্রহ সন্ধি। আবার, যদি দেয় অর্থ নির্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে দেবার ব্যবস্থা থাকে তাহলে সেই সন্ধিকে বলে অত্যয় সন্ধি। যদি সুবিধামত সময়ে অর্থ দেবার সুযোগ থাকে তাহলে সেই চুক্তিকে সুবর্ণসন্ধি বলে। এর বিপরীত, অর্থাৎ যখন সমস্ত অর্থ সেই মুহূর্তই দিতে হবে বলে চুক্তি হয় তখন সেই সন্ধিকে কপাল সন্ধি বলে।

দেশোপনত সন্ধিও চার রকমের হয়। যথা আদিষ্ট সন্ধি, উচ্ছিন্ন সন্ধি, আক্রয় সন্ধি ও পরদূষণ সন্ধি। দেশ ও অমাত্যদের রক্ষার জন্য যে সন্ধিতে ভূমির একাংশ হস্তান্তর করা হয় সেই সন্ধিকে আদিষ্ট সন্ধি বলে। যে সমস্ত ভূমি থেকে আগেই ফসল তুলে নেওয়া হয়েছে সেই সব ভূমি শত্রুকে দিয়ে সন্ধি করলে তাকে উচ্ছিন্ন সন্ধি বলে। কোন ভূমির উৎপন্ন ফসল দিয়ে পরে সেই জমি ছাড়িয়ে নেবার ব্যবস্থা যদি চুক্তিতে থাকে তাহলে সেই সন্ধির নাম অবক্রয় সন্ধি। কিন্তু যে সন্ধিতে ভূমি থেকে উৎপন্ন ফসল দিয়েও তার সঙ্গে আরো কিছু দেবার শর্ত থাকে তাহলে সেই সন্ধিকে পরদূষণ সন্ধি বলে।

উপরোক্ত সমস্ত সন্ধিগুলি দুর্বল রাজা সময় ও স্থান বিবেচনা করে করবেন। কৌটিল্যের মতে, যদিও বলা হয় সন্ধি দুর্বল রাজার পক্ষে কাম্য তা সত্ত্বেও শক্তিশালী রাজাও কয়েকটি বিশেষ দিক বিবেচনা করে সন্ধি করতে পারেন। কৌটিল্য এরকম ১৪টি বিশেষ দিকের উল্লেখ করেছেন; যেমন, সন্ধির মাধ্যমে নিজ দুর্গের রক্ষা ও শত্রু দুর্গের ধ্বংস করা, শত্রুরাজের মধ্যে বিভেদ তৈরী করা ইত্যাদি।

সন্ধির ব্যাপারে আরেকটি বিষয়ও জানা প্রয়োজন। প্রতিটি সন্ধিই এক সাময়িক ব্যবস্থা এবং তা সাধারণত দুর্বল রাজার জন্যই। রাজার ক্ষমতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সন্ধির শর্ত মানার ব্যাপারেও অনিশ্চয়তা দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। কৌটিল্যের আগেকার পণ্ডিতদের মতে, কথা বা শপথ দিয়ে যে সন্ধি হয় সেই সন্ধির কোনও নিশ্চয়তা নেই। একমাত্র যে সন্ধিতে কোনও জামিন রাখা হয় সেই সন্ধিরই নিশ্চয়তা থাকে। কৌটিল্য এই মতের বিরোধীতা করে বলেন, সত্য কথা ও শপথ দিয়ে যে সন্ধি হয় সেই সন্ধির স্থায়িত্ব বেশী কারণ এক্ষেত্রে সন্ধি ভঙ্গকারীর ইহলোকে (সত্য ভঙ্গ জনিত অপবাদ) এবং পরলোকে (নরকপাতের) ভয় থাকে। মানুষের মনে বিশ্বাস ও সংস্কার যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সে ব্যাপারে বাস্তববাদী তাত্ত্বিক কৌটিল্য যথেষ্ট সজাগ।

৩৩.৭.৩ যুদ্ধ

নিজেকে শত্রুর তুলনায় দুর্বল মনে করলে বিজিগীষু রাজা যেমন সন্ধি করবেন অপরদিকে নিজেকে বেশী শক্তিশালী মনে করলে বিজিগীষু রাজার পক্ষে বিগ্রহ করাই উপযুক্ত। বিগ্রহ বলতে বোঝায় সংঘাত বা সংকট যা আত্মরক্ষায় বা অন্য রাজ্য গ্রাস করতে ব্যবহার করা হয়। বিজিগীষু রাজা নিম্নোক্ত কারণে বিগ্রহ

করতে পারেন—(১) নিজ জনপদে অনেক যোদ্ধা আছে বা অন্যান্য শ্রেণী আছে (২) রাজার সৈন্যদুর্গ, বনদুর্গ ও নদীদুর্গ রয়েছে এবং একটি মাত্র দ্বার দিয়ে সুরক্ষিত হওয়ায় জনপদ শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করতে সমর্থ (৩) রাজা নিজের দুর্ভেদ্য সীমান্ত দুর্গ থেকে শত্রুর দুর্গ ধ্বংস করতে সক্ষম (৪) শত্রু যখন নানা প্রকার অসুবিধায় সম্মুখীন ও হতাশ (৫) শত্রু অন্য জায়গায় যুদ্ধে ব্যস্ত। মোট কথা, বিজিগীষু রাজা সব সময় লক্ষ রাখবেন যাতে বিগ্রহের মাধ্যমে তার রাজ্যের বৃদ্ধি ও উন্নতি হতে পারে।

৩৩.৭.৪ দূতের কাজ

অন্য রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক ও যোগাযোগ বজায় রাখার কাজটি সম্পাদিত হবে দূতের মাধ্যমে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে দূতের বিষয়টি এতই গুরুত্বসহকারে আলোকিত হয়েছে যে, কৌটিল্য দূতকে চণ্ডাল হ'লেও অবধ্য বলে উল্লেখ করেন। কাজের ধরন ও প্রকৃতি অনুযায়ী দূত দু'রকমের হয়--- (১) ভিন্ন রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক পরিচালনায় নিযুক্ত দূত; (২) ভিন্নরাজ্যের দূতের কাজ লক্ষ্য করার জন্য নিযুক্ত প্রতিদূত। দূতের ক্ষমতার প্রকৃতি অনুসারে আবার দূতকে তিনভাগে ভাগ করা হয়। (১) নিসৃষ্টার্থ দূত যিনি সব রকমের অমাত্যগুণসম্পন্ন এবং প্রচুর ক্ষমতার অধিকারী; (২) পরিমিতার্থ দূত যার নিসৃষ্টার্থ দূতের গুণের চার ভাগের এক ভাগ কম থাকে এবং তুলনামূলকভাবে কম ক্ষমতাসম্পন্ন (৩) শাসনহর দূত---যে সব দূতের নিসৃষ্টার্থ দূতের গুণের অর্ধেক কম থাকে। এধরনের দূত নিছক খবরাখবর পৌঁছে দেবার কাজ করে।

কৌটিল্যের মতে, মন্ত্রণার বিষয়টি ঠিক হওয়ার পরেই দূত পাঠানোর বিষয়টি স্থির হওয়া দরকার। শত্রুরাজাকে কী বলতে হবে শত্রু রাজার উত্তরে তিনি কী বলবেন, কিভাবে শত্রু রাজাকে নিজের বশে নিয়ে আসবেন—এসব সম্পর্কে দূতের ভালো জ্ঞান থাকা দরকার। কৌটিল্য দূতের কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বেরও উল্লেখ করেন---(১) নিজ রাজার খবর শত্রুরাজার কাছে জানানো (২) আগে যে সমস্ত চুক্তি বা সন্ধি হয়েছে সেগুলি রক্ষা করা (৩) নিজ রাজার প্রতাপ দেখানো (৪) শত্রুরাজ্যের মধ্যে মিত্র সংগ্রহ (৫) শত্রুর কর্মচারীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা (৬) শত্রুর মিত্রদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা (৭) শত্রু এলাকার গুপ্তচর পাঠানো (৮) শত্রুর বন্ধু ও সম্পদ অপহরণ (৯) গোপনে সংবাদ সংগ্রহ (১০) জামিন ব্যক্তিদের মুক্তিতে সাহায্য করা (১১) গোপন কাজকর্ম পরিচালনা করা। (১২) শত্রুর শাসক, সীমানা রক্ষক ও গুরুত্বপূর্ণ রাজকর্মচারীর সঙ্গে যোগাযোগ ও বন্ধুত্ব গড়ে তোলা (১৩) শত্রুপক্ষের সৈন্য, দুর্গ, জনপদ, কোষ ইত্যাদির পরিমাণ, অবস্থান, জনগণের জীবিকার ধরন, শাসনকাজের ধরন, রাজার স্বভাব ও দোষ প্রভৃতি বিষয়েও দূত খবর নেবেন। প্রয়োজন হ'লে ছদ্মবেশ ধারণ করেও তিনি খবর সংগ্রহ করবেন। চিকিৎসকের বেশে, সাধারণ বেশে এবং দরকার হ'লে ভিক্ষুক, মাতাল, পাগল, ঘুমন্ত ব্যক্তির ভান করে ও শত্রুর সব তথ্য সংগ্রহ করবেন। এ ব্যাপারে দূত অবশ্যই গোপনীয়তা বজায় রাখবেন। এ কারণে তিনি মদ্য, কাম ইত্যাদি থেকে বিরত থাকবেন। এমনকি তিনি একাকী নিদ্রা যাবেন, কেননা অনেক সময় ঘুমন্ত অবস্থায় প্রলাপ এর মাধ্যমে মন্ত্রণা প্রকাশ পেতে পারে।

যদি কোনও কারণে শত্রু রাজা দূতকে আটক করে, অথাৎ নিজের দেশে ফিরে যেতে না দেয় তাহলে দূত এর কারণ সম্পর্কে চিন্তা করবেন এবং এক্ষেত্রে কী করা উচিত সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবেন। যে সমস্ত কারণগুলি সম্পর্কে তিনি বিশেষভাবে চিন্তা করবেন তা হ'ল ঃ—(১) দূতের নিজ রাজার কোনও বিপদ

ঘটানোর জন্য (২) শত্রুরাজা দূতকে আটকে নিজের কোনও বিপদের প্রতিকার করার জন্য। (৩) দূতের রাজ্যে অমাত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ রাজকর্মচারীদের মধ্যে বিদ্রোহ ঘটানোর জন্য (৪) শত্রুরাজা নিজের রাজ্যের অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন করার জন্য (৫) দূতের প্রভু রাজার কোনও পরিকল্পিত আক্রমণ রদ করার জন্য। এ সমস্ত কারণের মধ্যে কোন্ কারণে দূতকে আটক করা হয়েছে সে সম্পর্কে দূত নিজেই বিবেচনা করে ঠিক করবেন তিনি আটক অবস্থাতে কাটাবেন নাকি আটক অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার ব্যাপারে তৎপর হবেন। মোট কথা নিজ প্রভুর অভিষ্ট সাধনই দূতের অন্যতম প্রধান কর্তব্য।

৩৩.৮ সারাংশ

এই এককটিতে অর্থশাস্ত্রের যে আলোচনাটি করা হ'ল, তা থেকে প্রাচীন ভারতের রাজনীতিচর্চার ক্ষেত্রে এই মহাগ্রন্থের তাত্ত্বিক গুরুত্ব ও তাৎপর্যটি বোঝা গেল। রাষ্ট্রের উদ্ভব, প্রকৃতি, প্রকারভেদ, উপাদান, উপাদানগুলির পারস্পারিক সম্পর্ক, রাজতন্ত্রের স্বরূপ, রাজার কর্তব্য, প্রজাবিদ্রোহের কারণ ও ধরন, বৈদেশিক সম্পর্ক পরিচালনার ক্ষেত্রে নীতিসমূহ, সন্ধি ও যুদ্ধের স্বরূপ, দূতের ভূমিকা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই আলোচনার অন্তর্গত। সর্বোপরি, আলোচিত হ'ল বর্তমানকালেও এই গ্রন্থের প্রাসঙ্গিকতার বিষয়টি।

৩৩.৯ অনুশীলনী

রচনাত্মক প্রশ্ন

(১) কৌটিল্য বিদ্যাসমূহের যে শ্রেণীবিভাগ করেছেন তার উল্লেখ করুন।

(২) রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে কৌটিল্যের বক্তব্য ব্যাখ্যা করুন।

(৩) কৌটিল্য যে সপ্তাঙ্গতত্ত্বের কথা বলেছেন তা অত্যন্ত সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।

(৪) বৈদেশিক সম্পর্ক পরিচালনার মূলনীতিগুলি কী কী?

(৫) কৌটিল্যের মতে সন্ধি কয় প্রকার?

সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন

(১) কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র বলতে কী বুঝিয়েছেন?

(২) কৌটিল্যের মতে প্রজাবিদ্রোহের কারণগুলি কী কী?

(৩) কৌটিল্য দণ্ডনীতি বলতে কী বুঝিয়েছেন?

(৪) কৌটিল্যের মতে দূতের কাজগুলি কী কী?

(৫) কৌটিল্য কীভাবে রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ করেছেন?

৩৩.১০ গ্রন্থপঞ্জী

১। নৃসিংহ প্রসাদ ভাদুড়ী : (১৯৯৮) দণ্ডনীতি, কলিকাতা, সাহিত্যসংসদ,

২। ডঃ রাধাগোবিন্দ বসাক : (১৯৬৭) কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র (২ খণ্ড), কলিকাতা, জেনারেল প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স,

3. A. S. Altekar (1949/1992) State and Government in Ancient India. Delhi, Motilal Banarasidass.

4. L. N. Rangarajan : (1987/1992) The Arthasastra, Delhi, Penguin Books , India,

5. R. P. Kangle : (1972/1988) Kautiliya Arthasastra, Vol. I, II, III, Delhi, Motilal Banarasidass,

6. U. N. Ghosal : (1959) A History of Indian Political Ideas, Bombay, O.U.P.,

একক ৩৪ □ মহাভারতের শান্তিপর্বের রাজনৈতিক ধারণাসমূহ

গঠন

৩৪.০ উদ্দেশ্য
৩৪.১ প্রস্তাবনা
৩৪.২ শান্তিপর্ব পরিচিতি
৩৪.৩ দণ্ডনীতিশাস্ত্র ঃ সংজ্ঞা
৩৪.৩.১ দণ্ডনীতিশাস্ত্র ঃ রচনার কারণ
৩৪.৩.২ দণ্ডনীতিশাস্ত্রের বিষয়বস্তু
৩৪.৪ রাষ্ট্রের উদ্ভব
৩৪.১ রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে প্রথম মত
৩৪.২ রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে দ্বিতীয় মত
৩৪.৩ রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে বক্তব্যের মূল্যায়ন
৩৪.৫ রাজধর্ম ঃ রাজার অধিকার ও কর্তব্য
৩৪.৫.১ রাজাকে মেনে চলার কারণ
৩৪.৫.২ বিদ্রোহ
৩৪.৬ রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রকারভেদ ঃ গণরাজ্য
৩৪.৭ রাষ্ট্রের প্রকৃতি বা উপাদানসমূহ ঃ সপ্তাঙ্গতত্ত্ব
৩৪.৭.১ রাজা
৩৪.৭.২ মন্ত্রী
৩৪.৭.৩ কোষ
৩৪.৭.৪ দণ্ড
৩৪.৭.৫ মিত্র
৩৪.৭.৬ পুর বা দূর্গ
৩৪.৮ অন্য রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক
৩৪.৮.১ সন্ধি
৩৪.৮.২ যুদ্ধ
৩৪.৯ সারাংশ
৩৪.১০ অনুশীলনী
৩৪.১১ গ্রন্থপঞ্জী

৩৪.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি মহাভারতের শান্তিপর্বকে অবলম্বন করে প্রাচীন ভারতের রাজনীতিচর্চার বিষয়টির সঙ্গে পরিচিত হবার উদ্দেশ্যে লিখিত হয়েছে। এই এককটির মাধ্যমে আমরা যে সমস্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে জানতে পারব তা হ'ল—

(১) প্রাচীন ভারতে 'বিশেষ করে শান্তিপর্বের সময়ে' রাজনীতিচর্চার বিষয় ও ধরন কী রকম ছিল।

(২) রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে রাজতন্ত্রের প্রকৃতি কীরকম ছিল; অন্য কোনও রাজনৈতিক ব্যবস্থা ছিল কিনা;

(৩) রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে সে যুগের মানুষের ভাবনা-চিন্তা কেমন ছিল;

(৪) রাজার পদটির স্বরূপ; রাজার অধিকার ও কর্তব্যসমূহ;

(৫) রাজাকে মেনে চলার কারণ কী কী;

(৬) রাষ্ট্রের বিভিন্ন উপাদান বা প্রকৃতিগুলি কী কী;

(৭) এক রাজ্যের সঙ্গে অন্য রাজ্যের সম্পর্ক কেমন ছিল;

(৮) এই সমস্ত বিষয়গুলি জানার সঙ্গে সঙ্গে আমরা আজকের রাজনৈতিক ব্যবস্থার দিকে তাকাব এবং দেখব আজকের যুগে ঐ সমস্ত বিষয়গুলির কোনও গুরুত্ব আছে কিনা। আমাদের আজকের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানে এই আলোচনা থেকে কোনও সাহায্য পেতে পারি কিনা সে বিষয়ে আমরা ধারণা করতে পারব।

৩৪.১ প্রস্তাবনা

প্রাচীন ভারতের রাজনীতিপর্বের অন্যতম আকর গ্রন্থ হ'ল মহাভারত। ১৮টি পর্বে বিভক্ত এবং মহাকাব্য হিসেবে পরিচিত এই বিশাল গ্রন্থের দ্বাদশ পর্বটি হ'ল শান্তিপর্ব। শান্তিপর্বে বর্ণিত রাজনৈতিক ধারণার বিশ্লেষণই আমাদের মূল লক্ষ্য। পণ্ডিতগণ মনে করেন, সুবিশাল মহাভারত গ্রন্থটি আঠশো বছরেরও বেশী সময় ধরে সংকলিত হয়েছে। প্রায় খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০ বছর থেকে খ্রীষ্টাব্দ ৪০০ বছর পর্যন্ত সময় ধরে চলে এই গ্রন্থের বিস্তার।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র গ্রন্থটিতে আমরা রাজনীতি সম্পর্কিত বিষয়গুলি একজায়গায় সুশৃঙ্খলভাবে আলোচিত হ'তে দেখেছি। কিন্তু মহাভারতের অন্যান্য পর্বের মতো শান্তিপর্বেও রাজনীতিচর্চার বিষয়গুলি বিভিন্ন অধ্যায়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। কোনও নির্দিষ্ট বিষয় শিরোনাম দিয়ে আলোচনা না করে অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপদেশছলে এই বিষয়গুলি উল্লেখিত হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উপদেশ দিচ্ছেন পিতামহ ভীষ্ম পাণ্ডবরাজ যুধিষ্ঠিরকে। এছাড়া অন্যান্যদের কাছ থেকেও উপদেশ হিসেবে বিষয়গুলি এসেছে। কখনও দেবতা, কখনও মানুষ, কখনও অন্যান্য জীবজন্তুর কথোপকথন, প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক চিন্তাকে প্রকাশ করা হয়েছে।

আমরা প্রথমে রাজনীতিশাস্ত্র হিসেবে দণ্ডনীতিশাস্ত্রের উদ্ভব ও বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করব। পরে দেখব রাষ্ট্রের সৃষ্টির পিছনে কোন্ কোন্ কারণ রয়েছে। মহাভারতের শান্তিপর্বে রাষ্ট্র সৃষ্টি ও রাজতন্ত্রের উদ্ভবকে সমানভাবে দেখার জন্য রাজতন্ত্র, রাজার অধিকার ও কর্তব্যের বিষয়গুলি আমাদের আলোচনায় স্থান পাবে। রাজতন্ত্র ছাড়া অন্য কোনও রাজনৈতিক ব্যবস্থা ছিল কিনা সে সম্পর্কে জানাও আমাদের লক্ষ্য থাকবে। রাজ্য সম্পর্কে কৌটিল্যের সপ্তাঙ্গতত্ত্বের আলোচনার মতো কোনও সুশৃঙ্খল আলোচনা না থাকলেও রাজা, অমাত্য, কোষ, দুর্গ, মিত্র প্রভৃতি বিষয়গুলি শান্তিপর্বের বিভিন্ন জায়গায় আলোচিত হয়েছে। বিভিন্ন অধ্যায়ে আলোচিত অংশগুলিকে নিয়ে আমরা বিষয় অনুসারে সাজিয়ে নেব। সবশেষে আমরা দেখব, সে যুগে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক কিভাবে পরিচালিত হ'ত। প্রসঙ্গে আমরা সন্ধি ও যুদ্ধ এই দু'টি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেব। প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক চর্চার উপর আলোচনা করতে গিয়ে যেহেতু কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ও মহাভারতের শান্তিপর্বকে বাছাই করা হয়েছে সেহেতু শান্তিপর্বের আলোচনায় কৌটিল্যের ধারণাও প্রসঙ্গক্রমে এসে যাবে। এসময়ে রাজনৈতিক ধারণার পিছনে কীধরনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো ছিল, সমাজ পরিবর্তনের ধরনই বা কীরূপ---এই প্রশ্নগুলি মাঝে মাঝে আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠবে।

৩৪.২ শান্তিপর্ব পরিচিতি

প্রাচীনভারতের রাজনীতিচর্চার অন্যতম আকরগ্রন্থ হিসেবে সুবিশাল মহাকাব্য মহাভারতের নাম উল্লেখ করা যায়। ১৮টি পর্বে বিভক্ত এই মহাকাব্যটির বিভিন্ন পর্বে রাজনীতিচর্চার নিদর্শন থাকলেও রাজনীতির বিষয়সমূহ যেমন স্থান পেয়েছে; ধর্ম, নীতি, সমাজ, সংসার প্রভৃতি বিষয়গুলিও আলোচিত হয়েছে এবং এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিভিন্ন উপাখ্যান যা মহাভারতের আয়তনকে আরোও বাড়িয়ে তুলেছে। আনুমানিক ৮০০ বছর ধরে এটি সংকলিত হয় বলে অনেকের ধারণা। প্রথম পর্বেই (আদিপর্ব) মহাভারতকে ইতিহাস, কাব্য, পুরাণ, সংহিতা, বেদ, পুরাণরূপ পূর্ণচন্দ্র, শ্রুতিরূপ জ্যোৎস্না প্রভৃতি বিভিন্ন নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আদিপর্বের ৫৬ অধ্যায়ে ২১ নং শ্লোকে মহাভারত নিজেকে অর্থশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র বলে পরিচয় দিয়েছে। সুকুমারী ভট্টাচার্যের মতে, মহাভারত শাস্ত্রগ্রন্থ ও ইতিহাসরূপেই পরিচিত হ'তে চেয়েছে, কারণ তখনকার ভারতবর্ষ জ্ঞান ও উপলব্ধির যে দু'টি প্রকাশকে চিনত---শাস্ত্র ও ইতিহাস, সে দু'টি আখ্যাই সে মহাভারতকে দিয়েছে। বুদ্ধদেব বসুও মহাভারতকে কোনও গোষ্ঠীগত, গুহাবদ্ধ, ধর্মপুস্তক হিসেবে না দেখে ভারতভূমিতে উদ্ভূত সবগুলি চিন্তাধারার মিশ্রণ হিসেবে দেখেছেন।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের আলোচনায় আমরা দেখেছি রাজনীতি সম্পর্কিত বিষয়গুলি একজায়গায় সুশৃঙ্খলভাবে আলোচিত হ'তে। কিন্তু মহাভারতের অন্যান্য পর্বের মতো শান্তিপর্বেও রাজনীতির বিষয়গুলি বিভিন্ন অধ্যায়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। কোনও নির্দিষ্ট বিষয় শিরোনাম দিয়ে আলোচনা না করে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উপদেশের ছলে রাজনীতির বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছে। এখানে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের মতো বিতর্কের মধ্য দিয়ে নয়, পারস্পরিক মত খণ্ডনের মাধ্যমে নয়, বক্তা ও শ্রোতার পরিবেশে রাজনৈতিক বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছে। সেদিক থেকে কৌটিলের অর্থশাস্ত্রের কাঠামো বিন্যাস ও শান্তির্বের কাঠামো-বিন্যাস ভিন্ন। এর ফলে, একই বিষয়ে বিভিন্ন অধ্যায়ে বক্তব্যের ভিন্নতাও মাঝে মাঝে ধরা পড়ে।

৩৪.৩ দণ্ডনীতিশাস্ত্র ঃ সংজ্ঞা

কৌটিল্যের রাজনীতি-চিন্তা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখেছি বর্তমান যুগে রাজনীতিবিজ্ঞান বলতে যা বোঝায় কৌটিল্য তাকে অর্থশাস্ত্র বা দণ্ডনীতি শাস্ত্র বলে উল্লেখ করেছেন। মহাভারতের শান্তিপর্বেও রাজনীতিবিজ্ঞানকে দণ্ডনীতিশাস্ত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে। শান্তিপর্বের ৫৯নং অধ্যায়ে একটি আখ্যানের মধ্য দিয়ে দণ্ডনীতি শাস্ত্রের সংজ্ঞা, উদ্ভবের কাহিনী ও বিষয়বস্তু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। রাজা বা রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বেই দেবতা ব্রহ্মা এই দণ্ডনীতিশাস্ত্র প্রণয়ন করেন। তারপর এই শাস্ত্রের প্রয়োগকর্তা হিসেবে রাজাকে মনোনীত করেন। জগতে দণ্ডবিধানের জন্য প্রয়োজন কতকগুলো নীতির—যা দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করবে। ৭৮নং শ্লোকে বলা হয়েছে, রাজা এই শাস্ত্রানুসারে প্রজাদের মধ্যে দণ্ডবিধান করবেন বলে বা দণ্ডের দ্বারা জগৎকে সৎপথে স্থাপন করবেন বলে এই শাস্ত্র দণ্ডনীতি নামে বিখ্যাত হবে। এই শাস্ত্র ত্রিভুবনে সব জায়গাতেই বিস্তার লাভ করবে। প্রথমে এই শাস্ত্রের অধ্যায় সংখ্যা ছিল এক লক্ষ। দেবতা মহাদেব প্রথম এই দণ্ডনীতিশাস্ত্র ব্রহ্মার কাছ থেকে গ্রহণ করেন এবং মানুষের আয়ু কম বলে ব্রহ্মার রচিত এই দণ্ডনীতিশাস্ত্র দশ হাজার অধ্যায়ে সংক্ষিপ্ত করেন। এর পর ভগবান ইন্দ্র যথাক্রমে পাঁচ হাজার অধ্যায়ে, বৃহস্পতি তিন হাজার অধ্যায়ে এবং শুক্রাচার্য এক হাজার অধ্যায়ে সংক্ষিপ্ত করেন। আপনি নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন অর্থশাস্ত্র বা দণ্ডনীতিশাস্ত্রটির রচয়িতা হিসেবে বিষ্ণুগুপ্তের নাম উল্লেখ করা হয়েছিল অর্থশাস্ত্র গ্রন্থটির শেষে। মহাভারতের শান্তিপর্বে দণ্ডনীতিশাস্ত্রটির রচয়িতা এবং পরবর্তীকালের সংকলন হিসেবে দেবতাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। আসলে মহাভারতের যুগে মানবিক মূল্যবোধ ও নীতিগুলি, সামাজিক অনুশাসনগুলি মেনে চলার জন্য ধর্মের দোহাই দেওয়া শুরু হয়েছে। দেবতাকে এর স্রষ্টা বলা হয়েছে যাতে করে মানুষ এগুলি মেনে চলে।

৩৪.৩.১ দণ্ডনীতিশাস্ত্র রচনার কারণ

আমাদের মনে হ'তেই পারে হঠাৎ ভগবান ব্রহ্মা দন্ডনীতিশাস্ত্র রচনা করতে গেলেন কেন? শান্তিপর্বের ৫৯ অধ্যায় ভগবান ব্রহ্মা কর্তৃক দণ্ডনীতিশাস্ত্র রচনার কারণটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, সত্যযুগে (আমরা জানি ভারতীয় দর্শনে সৃষ্টির ইতিহাসকে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চার যুগে ভাগ করা হয়) পৃথিবীতে প্রথমে রাজ্য, রাজা, দণ্ড, শাসক, শাসিত বলে কিছু ছিল না। মানুষ কতকগুলি নীতি নিয়মকে অনুসরণ করে চলত। কিন্তু ক্রমে মানুষের মধ্যে মোহের জন্ম হওয়ায় ক্রমশ জ্ঞান ও ধর্মের লোপ পায় এবং এর ফলে মানুষ লোভী, পরের ধন গ্রহণকারী, কামপরায়ণ, বিষয়সম্পত্তিতে আসক্ত ও কাজ-অকাজ বিবেকশূন্য হয়ে ওঠে। তখন দেবগণ অত্যন্ত শংকিতমনে ব্রহ্মার কাছে হাজির হয়ে বলেন, লোভ, মোহ ইত্যাদি নীচ বৃত্তিসমূহ নরলোকে বা মর্ত্যে (স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল—এই তিন লোক বা ত্রিভূবন নিয়ে বিশ্ব গঠিত বলে প্রাচীন ভারতীয়রা মনে করতেন) সনাতন বেদ গ্রাস করাতে আমরা ভীত হয়েছি। বেদ ধ্বংস হওয়াতে ধর্মও বিনষ্ট হয়েছে। এর ফলে আমরাও মানুষের মতো হয়ে পড়ছি। মানুষ আমাদের (দেবগণের) উদ্দেশ্যে মর্ত্য থেকে আকাশ পথে হোমের আহুতি পাঠাতো এবং আমরা (দেবতারা) স্বর্গ থেকে মর্ত্যে হোমের ফলস্বরূপ বৃষ্টি বর্ষণ করতাম। কিন্তু এখন মানুষ আর হোম না করায় আমাদের (দেবতাদের) খাদ্যের

অভাব হচ্ছে। এতএব যাতে এই প্রাকৃতিক নিয়মের ধ্বংস না হয় তার জন্য আপনি নিজবুদ্ধি বলে এক উপায় স্থির করুন (১২/৫৯/১৪-২৭)।

দেবতাদের কাছ থেকে এভাবে অনুরুদ্ধ হয়ে ব্রহ্মা প্রথমে দণ্ডনীতিশাস্ত্র রচনা করেন। এই শাস্ত্রের দ্বারা যেহেতু জগতের যাবতীয় লোকজন দণ্ড-প্রভাবে নিজেদের লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে সেহেতু এই শাস্ত্রের নাম দণ্ডনীতিশাস্ত্র (১২/৫৯/৭৮)। এই শাস্ত্রকে আবার অন্যতম ধর্মশাস্ত্র হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে; কারণ, এই শাস্ত্র দ্বারাই ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ লাভ হয়। ধর্মের অন্য নাম বৃষ। কারণ বৃষ শব্দটি এসেছে বৃষ ধাতু থেকে যার অর্থ হ'ল বর্ষণ বা সৃজন করা। ধর্ম দ্বারাই সমাজ-সৃজন সম্ভবপর হয় বলে ধর্মের তথা দণ্ডের অপরনাম বৃষ। ১১২ অধ্যায়ে ২৫ নং শ্লোকে অবশ্য দেবী সরস্বতীকে দণ্ডনীতির রচয়িতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এখানেও দণ্ডনীতিশাস্ত্রের উদ্ভবের কারণ প্রজাদের ঔদ্ধত্য থেকে রক্ষা করার জন্য। সেটা জগৎকে নিয়মের মধ্যে আবদ্ধ রাখার জন্য, প্রজাদের মধ্যে বর্ণসঙ্কর বন্ধ করার জন্য (এ কারণটি ৫৯ অধ্যায়ে বলা হয়নি) বলা হয়েছে।

উপরের এই আলোচনা থেকে আমরা কয়েকটি বিষয় জানতে পারি : (১) রাষ্ট্র বা রাজা সৃষ্টির মানুষ অরাজক অবস্থায় বাস করত।

(২) এই অরাজক অবস্থা কিন্তু বিশৃঙ্খল অবস্থা ছিলনা, কারণ এই অরাজক অবস্থাতেও কতকগুলো নিয়ম মানুষ মেনে চলত; ফলে বেদ ও ধর্ম রক্ষা পেত।

(৩) ক্রমশ মানুষ লোভী হওয়ায়, বিষয়-সম্পত্তি সম্পর্কে আসক্ত হওয়ায়, বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয়।

(৪) এই বিশৃঙ্খল অবস্থার ফলে দেবতাদেরও অসুবিধা হয়, কারণ মানুষ দেবতাদের প্রতি হোম নিবেদন না করায় দেবতাদের অন্নাভাব দেখা দেয়।

(৫) দেবতাদের এই অন্নাভাব দূর করার জন্য দেবতাদের কাছ থেকে অনুরুদ্ধ হয়ে ভগবান ব্রহ্মা দণ্ডনীতিশাস্ত্রের রচনা করেন। পরে দণ্ডনীতিশাস্ত্রের প্রয়োগকারী হিসেবে রাজাকে মনোনীত করেন। অন্যভাবে বলা যায়, রাজার বা শাসকের অন্নাভাব থেকে রাজা বা শাসককে মুক্ত করার জন্যই দণ্ডনীতিশাস্ত্র। এই রূপকটির মধ্যে দিয়ে শাসকের সঙ্গে শাসিতের সম্পর্ক, কর্তৃত্বের উদ্ভব প্রভৃতি বিষয়গুলি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মানুষের কাছ থেকে পাওয়া হোম, আহুতি যেমন দেবতাদের খাদ্যের যোগান, সেরূপ প্রজাদের কাছ থেকে কর বা খাজনা রাজার খাদ্য যোগান দেয়। শাসক ও শাসিতের এই সম্পর্কটিকে বজায় রাখার জন্য তাই দণ্ডনীতিশাস্ত্রের একান্ত প্রয়োজন।

৩৪.৩.২ দণ্ডনীতিশাস্ত্রের বিষয়বস্তু

শান্তিপর্বের ৫৯ অধ্যায়ে ২৯ নং শ্লোক থেকে ৭৯ নং শ্লোক পর্যন্ত ৫১টি শ্লোকে দণ্ডনীতিশাস্ত্রের বিষয়বস্তু উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিটি শ্লোকে আবার বিষয়বস্তুর সংখ্যা এক বা একাধিক। এর ফলে, দণ্ডনীতিশাস্ত্রে যে বিষয়বস্তুর উল্লেখ করা হয়েছে তা সুবিশাল; ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—প্রভৃতি বিষয়ের যাবতীয় দিকই এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়। এর মধ্যে কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ আমরা এখানে করব।

(১) দণ্ডের উদ্ভব, স্বরূপ সম্পর্কিত আলোচনা।

(২) রাষ্ট্রের উদ্ভব, প্রকৃতি।

(৩) রাজপদের উদ্ভব, রাজার গুণ, দায়িত্ব।

(৪) রাষ্ট্রের বিভিন্ন উপাদান—সপ্তাঙ্গ তত্ত্ব, রাষ্ট্রের কার্যাবলী।

(৫) সমাজের স্তরবিন্যাস, স্তর-বিন্যস্ত সমাজে প্রতিটি বর্ণের দায়িত্বও কর্তব্য।

(৬) সন্ধি, সন্ধির প্রকারভেদ।

(৭) যুদ্ধ—যুদ্ধ পরিচালনার নীতিসমূহ, যুদ্ধ-কৌশল।

(৮) রাজার সৈন্যবল (যা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের মতো শান্তিপট ও দণ্ড নামে অভিহিত)।

(৯) মন্ত্রণার প্রয়োজন, প্রকৃতি।

(১০) অন্য রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক পরিচালনার নীতিসমূহ।

(১১) শাসনকার্য পরিচালনার বিভিন্ন বিভাগ।

(১২) ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের প্রকৃতি।

(১৩) ৭২ প্রকার শারীরিক চিকিৎসা—বিভিন্ন দেশ, জাতি ও কুলের বিবরণ ও ধর্ম।

(১৪) কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়।

উপরের এই সংক্ষিপ্ত তালিকা থেকেই বোঝা যায়, আমাদের যুগের রাজনীতিচর্চার যে আলোচ্য বিষয় তার তুলনায় প্রাচীন ভারতের রাজনীতিচর্চার বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা কোনও অংশেই কম ছিল না।

৩৪.৪ রাষ্ট্রের উদ্ভব

মহাভারতের শান্তিপর্ব পরিচিতিতে আমরা দেখেছি আটশো বছরেরও বেশী সময় ধরে মহাভারতের সংকলনের কাজটি চলতে থাকে। এর ফলে, মহাভারতের আয়তন যেমন বাড়ে বিভিন্ন সময়ে সংযোজনের ফলে কোনও বিষয়ের উপর একাধিক মতও লক্ষ্য করা যায়। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হ'ল রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে শান্তিপর্বের বিভিন্ন অধ্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্যের উপস্থিতি। বিভিন্ন অধ্যায়ে রাষ্ট্রের উদ্ভবের বিষয়টি আলোচিত হ'লেও ৫৯ এবং ৬৭ নং অধ্যায় দু'টি এ ব্যাপারে বিশেষ, গুরুত্বপূর্ণ। এই দুই অধ্যায়ে রাষ্ট্রের উদ্ভব এবং রাজতন্ত্রের উদ্ভবকে সমার্থক হিসেবে দেখানো হয়েছে। তাছাড়া, উভয় অধ্যায়েই রাষ্ট্রের তথা রাজতন্ত্রের উদ্ভবের পূর্বেকার অবস্থাকে অরাজক অবস্থা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সর্বোপরি, উভয় অধ্যায়েই রাষ্ট্র তথা রাজতন্ত্রের উদ্ভবের কারণ হিসেবে ধর্ম তথা দণ্ডনীতি (রাজনীতি)কে রক্ষা ও প্রয়োগের বিষয়টির উল্লেখ করা হয়েছে। এই মিলগুলি থাকা সত্ত্বেও উভয় অধ্যায়ের মধ্যে বেশ কিছু ব্যাপারে বক্তব্যের পার্থক্য থাকায় আমরা দু'টি অধ্যায়ের মতই আলোচনা করব।

৩৪.৪.১ রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে প্রথম মত

শান্তিপর্বের ৫৯ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠির পিতামহ ভীষ্মকে রাজা পদটির উদ্ভবের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নটি ছিল খুবই সরল। যুধিষ্ঠির প্রশ্ন করেন, রাজার হাত, পা, ঠোঁট, পিঠ, মুখ, রক্ত, মাংস, নিশ্বাস, উচ্ছ্বাস, ইন্দ্রিয়, সুখ, দুঃখ, জন্ম, মরণ সব কিছুই প্রজাদের মতই। তবে রাজা কীরূপে একাকী অসংখ্য বিশিষ্ট, বুদ্ধিসম্পন্ন, মহাবল, পরাক্রান্ত মানুষের ওপর আধিপত্য বজায় রেখে গোটা পৃথিবী পালন করতে সমর্থ হন? এই প্রশ্নের উত্তরে পিতামহ ভীষ্ম রাজতন্ত্রের তথা রাষ্ট্রের উদ্ভবের কারণ বিশ্লেষণ করেন। ভীষ্ম বলেন, প্রথমে রাজ্য, রাজা, দণ্ড তথা শাসক ও দণ্ডার্হ ব্যক্তি তথা শাসিত বলে কিছু ছিল না। মানুষ কতকগুলি নিয়ম তথা ধর্ম অনুসরণ করে জীবন কাটাত। কিন্তু এভাবে কিছুদিন কাটানোর পর শেষে নিজেদের রক্ষণাবেক্ষণ কষ্টকর হয়ে উঠল; কারণ, এসময় মানুষ ক্রমশ মোহে আচ্ছন্ন হ'তে থাকে এবং মোহ মানুষের জ্ঞান ও ধর্মকে নষ্ট করে। ফলে, মানুষ ক্রমেই লোভী, অপরের ধন আত্মসাৎ করতে আগ্রহী, কামপরায়ণ, ইন্দ্রিয়াসক্ত হয়ে পড়ে। এভাবে বেদ ও ধর্ম বিনষ্ট হ'লে দেবগণ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন। ব্রহ্মা এভাবে অনুরুদ্ধ হয়ে সমাজে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও ধর্ম সংস্থাপনের জন্য একলক্ষ অধ্যায়যুক্ত এক নীতিশাস্ত্র রচনা করেন। এই শাস্ত্র দ্বারা মানুষ যেহেতু দণ্ডপ্রভাবে নিজ নিজ লক্ষ্য সাধনে এবং দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন সম্ভবপর হবে, সেকারণে এই নীতিশাস্ত্রটি দণ্ডনীতিশাস্ত্র নামে অভিহিত হয়। বলাবাহুল্য; শান্তিপর্বে ধর্মশাস্ত্র নীতিশাস্ত্র, ও দণ্ডশাস্ত্রের মধ্যে কোনও পার্থক্য করা হয়নি। ব্রহ্মা যে দণ্ডনীতিশাস্ত্র রচনা করলেন সেই শাস্ত্র ক্রমশ সংক্ষিপ্ত হয়ে এক হাজার অধ্যায়-যুক্ত হয়। এই একহাজার অধ্যায়যুক্ত দণ্ডনীতিশাস্ত্র রক্ষা ও প্রয়োগের জন্য ভগবান বিষ্ণু বিরজা নামে এক মানসপুত্র সৃষ্টি করেন। কিন্তু বিরজা রাজ্যপালনের বা রাজা হওয়ার পরিবর্তে সন্ন্যাস ধর্মে অনুরক্ত হ'লে তার পুত্র কীর্তিমান-এর উপর এই ভার পড়ে। কিন্তু, কীর্তিমান ও কীর্তিমানের পুত্র কর্দম রাজ্যভার নিতে অসম্মত হন এবং তপস্যাকেই প্রধান ব্রত হিসেবে নেন। কর্দমের পুত্র অনঙ্গ দণ্ডনীতি বিশারদ ও প্রজাপালনে তৎপর ছিলেন। কিন্তু, অনঙ্গের মৃত্যুর পর তার পুত্র অতিবল সুশাসক ছিলেন না। কারণ, তিনি ছিলেন অতিমাত্রায় ইন্দ্রিয়ের প্রতি আসক্ত। অতিবল-এর পুত্র বেন যথাযথভাবে ধর্ম তথা দণ্ডনীতিশাস্ত্র প্রয়োগে ব্যর্থ হওয়ায় মহর্ষিগণ মন্ত্রপূত কুশ দ্বারা বেনকে হত্যা করেন। এরপর উক্ত মহর্ষিগণ মন্ত্রপ্রভাবে বেন এর দক্ষিণ উরু ভেদ করাতে এক খর্বাকার, তাম্রলোচন ও দগ্ধকাষ্ঠের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণের এক মানুষ জন্ম নিলে মহর্ষিগণ 'এই স্থানে নিষন্ন হও' বলে আদেশ করলেন। এই মানুষেরই বংশধরগণ পর্বত; বনবাসী নিষ্ঠুর প্রকৃতির ব্যাধ নিষাদ নামে পরিচিত হন। মহর্ষিগণ পুনরায় বেন এর দক্ষিণ হস্ত ভেদ করলে এক খড়্গ কবচধারী দণ্ডনীতিকুশল ইন্দ্রের ন্যায় পরম পুরুষ জন্ম নিলেন। ঐ ব্যক্তিই পৃথু নামে পরিচিত। এই পৃথুর উপরই দেবতা ও মহর্ষিগণ রাজ্যপরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করেন। পৃথু যথাযথভাবে দণ্ডনীতিশাস্ত্র অনুসারে প্রজারঞ্জন করতেন বলে রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন এবং ব্রাহ্মণগণকে ক্ষত বা বিনাশ থেকে রক্ষা করতেন বলে ক্ষত্রিয় নামে পরিচিত হন (১২/৫৯/১২৫-১২৬)।

৩৪.৪.২ রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে দ্বিতীয় মত

রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে দ্বিতীয় ধারণাটি পাই শান্তিপর্বের ৬৭তম অধ্যায়ে। এই অধ্যায়েও যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে ভীষ্ম রাষ্ট্রের উদ্ভবের প্রসঙ্গটি উপস্থাপিত করেছেন। এখানে বলা হয়েছে, রাজ্য-মধ্যে রাজাকে

অভিষিক্ত করাই প্রধান কর্তব্য, কারণ রাজ্য অরাজক ও বলশূন্য হ'লে দস্যুরা তা আক্রমণ করে; ধর্মের অবলুপ্তি ঘটে এবং প্রজারা পরস্পরের সঙ্গে হিংসায় লিপ্ত হয়। উপমা দিয়ে বলা হয়েছে, যদি পৃথিবীর মধ্যে রাজা দণ্ড ধারণ না করেন তাহলে জলের মধ্যে বড় মাছেরা যেমন ছোট ছোট মাছগুলিকে খেয়ে ফেলে সেরূপ বলবান ব্যক্তিরা দুর্বল ব্যক্তিদের উপর অত্যাচার করবে। এভাবেই প্রথমে পৃথিবী যখন রাজাহীন ছিল তখন মানুষ পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করতে শুরু করে। সমাজে শান্তি শৃঙ্খলাও নষ্ট হয়। এসময় কয়েকজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি একজায়গায় সমবেত হয়ে এই নিয়ম স্থির করলেন যে, যে ব্যক্তি নিষ্ঠুরভাষী, উগ্রস্বভাবের ও পরের সম্পদ অপহরণের চেষ্টা করবে আমরা সেইসব মানুষদের পরিত্যাগ করব। এভাবে নিয়ম নির্ধারণের পর কয়েকদিন ভালোভাবে চললেও এই নিয়ম অনুসরণ ও বলবৎ করার ব্যাপারে অসুবিধা দেখা দেয়। তখন সবাই মিলে লোকপিতামহ ব্রহ্মার কাছে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করে ঃ "আমরা রাজার অভাবে বিনষ্ট হচ্ছি; অতএব আপনি আমাদের একজন রাজা ঠিক করে দিন। আমরা সকলে তাকে পূজা করব এবং তিনিও আমাদের প্রতিপালন করবেন"। এভাবে সকলে ব্রহ্মাকে অনুরোধ করলে ব্রহ্মা মনুকে রাজা হিসেবে নিযুক্ত করেন। কিন্তু মনু এই দায়িত্বভার নিতে অস্বীকার করেন। কারণ রাজ্যশাসন বিশেষ করে মিথ্যাপরায়ণ মানুষকে স্বধর্মে স্থাপন করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। এর জন্য রাজাকে পাপকাজও করতে হ'তে পারে যা মনুর পক্ষে করা সম্ভব নয়। কিন্তু যখন মানুষেরা মনুকে করপ্রদানে (পশু ও সোনার পঞ্চাশভাগের একভাগ এবং ধানের দশ ভাগের এক ভাগ), কন্যাপ্রদানে (বিরোধ, দ্যূতক্রীড়া ও শুল্ক প্রসঙ্গে অপরাধী হ'লে) যোদ্ধা প্রদানে (যারা অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগ ও বাহনে প্রধান) এবং ধর্মের (প্রশাসন কর্তৃক অনুষ্ঠিত ধর্মের চারভাগের এক ভাগ পুণ্য) ভাগ দিতে স্বীকৃত হ'লেন, তখন মনু রাজ্যভার গ্রহণে ও ধর্ম অনুসারে প্রজাপালনে এবং পাপের শাস্তিদানের মাধ্যমে প্রজাদের নিজ নিজ কর্মে নিযুক্ত করার ব্যাপারে সম্মত হন।

৩৪.৪.৩ রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে বক্তব্যের মূল্যায়ন

রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে শান্তিপর্বের দু'টি অধ্যায় বর্ণিত এই দু'টি আখ্যানের মধ্যে বক্তব্যের ভিন্নতা থাকলেও কয়েকটি ব্যাপারে মতৈক্য দেখা যায়। যেমন, উভয় আখ্যানেই রাষ্ট্রের উদ্ভবের সঙ্গে রাজতন্ত্রের উদ্ভবের বিষয়টিকে এক করে দেখা হয়েছে। প্রজাদের অন্যতম কর্তব্যই হচ্ছে রাজ্য-মধ্যে রাজাকে স্থাপন করা। সম্ভবত খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতকে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে যে কৌমতন্ত্র বা কৌমসাধারণতন্ত্র ছিল তার পরিবর্তে শান্তিপর্বে একমাত্র রাজতন্ত্রকেই কাম্য শাসনব্যবস্থা বলে স্বীকার করা হয়। দ্বিতীয়ত, উভয় আখ্যানেই রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার পূর্বের অবস্থাকে এক অরাজক অবস্থা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই অরাজক অবস্থার প্রকৃতি নির্ণয়ে অবশ্য উভয় আখ্যানের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ৫৯ নং অধ্যায়ে বলা হয়েছে, পৃথিবীতে এসময় রাজ্য রাজা দণ্ড না থাকলেও মানুষ কতকগুলি নিয়মরীতি মেনে চলত। পরে মানুষ মোহাচ্ছন্ন হওয়ায় বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ৬৭ অধ্যায়ে বর্ণিত চিত্রটি ঠিক এর বিপরীত, অর্থাৎ প্রথমে এক বিশৃঙ্খল অবস্থার কথা বলা হয়েছে; সেই বিশৃঙ্খল অবস্থা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য মানুষ এই নিয়ম স্থির করে যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী ব্যক্তিদের তারা পরিত্যাগ করবে। এভাবে কিছুদিন চলার পর নিয়ম অনুসরণ করা ও বলবৎ করার ব্যাপারে তারা রাজার প্রয়োজন অনুভব করে। তৃতীয়ত, উভয় ক্ষেত্রেই রাজার মনোনয়ন দেবতাদের কর্তৃক নির্ধারিত হয়েছে। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই রাজা প্রজাপালনে সমর্থ কিনা সেটাই ছিল প্রধান বিষয়। ৫৯নং অধ্যায়ের বর্ণনা

অনুযায়ী প্রথমে দণ্ডনীতিশাস্ত্রের প্রবর্তন হয়; পরে সেই নীতিশাস্ত্রের ধারক ও বাহক হিসেবে রাজাকে বাছাই করা হয়। রাজা বেন যথাযথভাবে ধর্ম তথা দণ্ডনীতি প্রয়োগে অযোগ্য হওয়ায় মহর্ষিগণ তাকে ধ্বংস করেন। বস্তুত, বিভিন্ন অধ্যায়ে রাজার কর্তব্য ও রাজধর্মের বিষয়টি যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে তাতে রাজাকে প্রজাপালক হিসেবে দেখা হয়েছে। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন-এর জন্যই তিনি দণ্ডনীতি অনুসারে দণ্ড প্রয়োগ করবেন। রাজা এক্ষেত্রে অছিস্বরূপ। চতুর্থত, ৫৯নং অধ্যায়ে লক্ষ্য করি বিরজার উপর রাজ্যপালনের দায়িত্বভার অর্পন করলে তিনি এই দায়িত্ব পালনে অসম্মত হন। ৬৭ অধ্যায়েও মনু প্রথমে রাজ্যের শাসন পরিচালনাকে পাপ কাজ বলে প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু প্রজারা কর প্রদানে স্বীকৃত হ'লে ও আইন মানতে প্রতিশ্রুত হ'লে তবেই মনু রাজ্যভার নেন। করের ধরন অনুযায়ী বোঝা যায় সে সময় সমাজ ছিল মূলত পশুপালক ও কৃষি-ভিত্তিক সমাজ। সোনার ব্যবহার এক বাজারধর্মী অর্থব্যবস্থার অস্তিত্বকেও তুলে ধরে। তাছাড়া, রাজার রাজত্ব গ্রহণের পূর্বে প্রজাদের প্রতিশ্রুত হওয়ার বিষয়টি আনুগত্যের এক নতুন তাৎপর্য বহন করে। শান্তিপর্বের অন্যত্রও আমরা লক্ষ্য করি বানপ্রস্থে যাবার পূর্বে ধৃতরাষ্ট্র প্রজাদের কাছে অনুমতি নিচ্ছেন এবং নিজের ভুল কাজের জন্য ক্ষমা চাইছেন। রাজ্যের দায়িত্বভার নেবার আগেও রাজা মহর্ষিদের কাছে হাত জোড় করে বলছেন—'আপনারা উপযুক্ত মনে করে যে কাজ করতে আদেশ করবেন আমি সেই কাজই সম্পন্ন করব। সে ব্যাপারে আমার বিচার করা উচিত নয়' (১২/৫৯/১০২)। মহর্ষিগণও রাজাকে পরামর্শ দিলেন পৃথিবীতে সকলকেই ব্রহ্মারূপে পালন করতে, দণ্ডনীতিশাস্ত্র অনুসরণ করে চলতে, কখনও স্বেচ্ছাচারী না হ'তে, ব্রাহ্মণগণকে দৈহিক দণ্ডবিধান না দিতে এবং সকলকে বর্ণশঙ্কর থেকে রক্ষা করতে (১২/৫৯/১০১-১০৮)। রাজাও এ ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে রাজ্য শাসন পরিচালনার দায়িত্ব নিলেন।

রাষ্ট্রের উদ্ভব এবং রাজার দায়িত্ব নেবার ব্যাপারে শান্তিপর্বে আর একটি বিষয়ের বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। বিষয়টি হ'ল—প্রজাদের স্বধর্মে স্থাপন করা ও বর্ণশঙ্কর বন্ধ করার বিষয়টি। শান্তিপর্বে আমরা সমাজের যে চেহারাটা পাই তা' চার বর্ণে বিন্যস্ত সমাজ। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই তিন বর্ণের মানুষ দ্বিজ বলে পরিচিত এবং বেদ অধ্যয়ন, দান ও যজ্ঞ করার অধিকারী। এই তিন বর্ণের মধ্যে আবার ব্রাহ্মণরাই একমাত্র অপরকে বেদ অধ্যয়নের এবং যাজনের অধিকারী। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে দান, অধ্যয়ন ও যজ্ঞ ধর্মজনক হ'লেও যুদ্ধই অধিকতর ধর্মপথ। বৈশ্যের পক্ষেও দান, অধ্যয়ন ও যজ্ঞ করার অধিকার থাকলেও পশুপালনই প্রধান ধর্ম। ঈশ্বর প্রজা সৃষ্টি করে তার মঙ্গলের ভার ব্রাহ্মণকে, প্রতিপালন এবং রক্ষার ভার ক্ষত্রিয়কে দিয়েছেন। বিধাতা পশু সৃষ্টি করে তার ভার দিয়েছেন বৈশ্যদের। সুতরাং পশুপালন ছাড়া অন্য কাজ বৈশ্যের ধর্মবিরুদ্ধ। বৈশ্য অন্যের পশুপালন করতেও পারেন এবং সেক্ষেত্রে তিনি পশুপালনের পুরস্কার হিসেবে পশু/পশুর দুগ্ধের ভাগ পাবেন (১২/৫৯/৯-২৬)। ঈশ্বর শূদ্রকে উক্ত তিন বর্ণের দাস হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং, অন্য তিন বর্ণের সেবা করা শূদ্রের অন্যতম ধর্ম। এমনকি শূদ্রের কোনও প্রকার ধনসঞ্চয়ের অধিকারও নেই। উক্ত তিনবর্ণের ব্যবহৃত পোষাক ব্যবহার করতে এবং জীবিকার জন্য নির্ভরশীল হবে ঐ তিন বর্ণেরই উপর। এমনকি প্রভু কোনও বিপদে পড়লেও শূদ্র তার প্রভুকে পরিত্যাগ করবে না। বরঞ্চ কোনও কারণে প্রভু নিঃস্ব হয়ে পড়লে শূদ্র অন্য স্থান থেকে ধনসংগ্রহ করে তার প্রভুর ভরণপোষন করবে (১২/৫৯/২৮-৩৭)। অবশ্য দুর্ভিক্ষ, খরা প্রভৃতি আপৎকালীন সময়ে যখন বর্ণ অনুযায়ী কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করা যায় না তখন বর্ণ অনুয়ায়ী কাজ না করলে কোনও দোষের হয় না। যেমন, এ সময় ব্রাহ্মণগণ

চুরি করলেও অগৌরবের হয় না। ১৪১ নং অধ্যায়ে বিশ্বামিত্র কর্তৃক এক চণ্ডালের ঘর থেকে কুকুরের মাংস চুরির কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে অনাহারে প্রাণত্যাগ ও অভক্ষ ভক্ষণপূর্বক প্রাণ রক্ষা করে ধর্মোপার্জন— এই দুয়ের মধ্যে দ্বিতীয়টি অবশ্য কর্তব্য এবং এতে কোনও দোষ হয় না (১২/১৪১/৮৬-৮৮)। অবশ্য এক্ষেত্রেও এক বর্ণগত নিয়ম ঠিক করা হয়েছে; যেমন, প্রথমে নিচুবর্ণের সম্পত্তি চুরি করা; কিন্তু নিচু বর্ণের মানুষের কাছে কিছু না পাওয়া গেলে তখনই নিজ বর্ণের কোনও ব্যক্তির সম্পত্তি চুরি করা এবং এ ধরনের কাজ অন্যায় বলে বিবেচিত হবে না (১২/১৪১/৩৯-৪০)। ৪২ এবং ৪৭ নং শ্লোকে ব্রাহ্মণকেই অপর তিন শ্রেণীর স্রষ্টা বলা হয়েছে। অন্য জায়গায় প্রজাপতি ব্রহ্মার শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ থেকে বিভিন্ন বর্ণের সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে; যেমন ব্রহ্মার মাথা, হাত, পেট ও পা থেকে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। এই চার বর্ণ ছাড়াও শান্তিপর্বে বনবাসী, পাহাড়বাসী জনগোষ্ঠীর (যা ম্লেচ্ছ, নিষাদ, অসুর প্রভৃতি নামে পরিচিত) উল্লেখ রয়েছে।

আসলে বৈদিক সমাজ যখন এদেশীয় সমাজের সঙ্গে সংঘাত ও সমন্বয়-এর মধ্যে দিয়ে ক্রমশ স্তরবিন্যস্ত সমাজে রূপান্তরিত হ'তে থাকে তখন এই স্তরবিন্যস্ত সমাজে উৎপাদনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংযোগহীন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়বর্ণ সমাজের প্রধান শাসক রূপে বিবেচিত হয়। সেই সময়কার সমাজ যেহেতু মূলত পশুপালক ও কৃষি-সমাজ সেহেতু পশুর মালিক ও পালক হিসেবে এবং কৃষক হিসেবে বৈশ্যকেও সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা হয়। কিন্তু শূদ্ররা (যারা অধিকাংশই আর্যদের দ্বারা পরাজিত জনগোষ্ঠী) এই তিন বর্ণের দাস বা শুশ্রুষাকারী হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। সব রকমের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত এই শূদ্রশ্রেণীর অবস্থানও তাই সমাজের একেবারে নিচুতলায়। এরকম এক সমাজকে রক্ষা করার জন্য তাই স্বাভাবিকভাবেই দরকার এক রাষ্ট্র ও রাষ্ট্র কর্তৃত্বের যা এই সমাজ বিন্যাসকে রক্ষা করবে এবং যাতে করে বিবাহ ইত্যাদির মাধ্যমে মিশ্রণ না ঘটে তার জন্য কঠোর ব্যবস্থা নেবে। রাষ্ট্রের এবং রাষ্ট্র কর্তৃত্বের উদ্ভব তাই অত্যন্ত জরুরী এই বৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে। রাষ্ট্রের উদ্ভবের আখ্যানগুলির মধ্য দিয়ে ইতিহাসের এই চরম সত্যটাকেই তুলে ধরা হয়েছে।

৩৪.৫ রাজধর্ম, রাজার অধিকার ও কর্তব্য

রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখেছি, দণ্ডনীতি অনুসরণ করে রাজধর্ম পালনই রাজার অন্যতম কর্তব্য। বস্তুত, শান্তিপর্বের প্রতিটি অধ্যায়েই রাজার ধর্ম ও কর্তব্য সম্পর্কে কোনও না কোনও উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এই সমস্ত উপদেশাবলীর মধ্যে যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উপদেশগুলিই প্রধান স্থান অধিকার করে রয়েছে। এই সমস্ত উপদেশগুলিতে রাজার ক্ষমতাকে অধিকার হিসেবে না দেখে কর্তব্য হিসেবেই দেখা হয়েছে। দণ্ডনীতির ধারক ও বাহক হিসেবেই রাজার সৃষ্টি। ৬৪তম অধ্যায়ের ৩০ নং শ্লোকে রাজধর্মকেই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলা হয়েছে। ব্রাহ্মণাদি চার বর্ণের ধর্মসাধনের মূল রাজধর্ম। অন্য তিন বর্ণের যাবতীয় ধর্ম ও লোকাচার রাজধর্মের দ্বারাই রক্ষিত হয়। উপমা দিয়ে বলা হয়েছে, যেমন সকল প্রাণীর পায়ের ছাপ হাতীর পায়ের ছাপে মুছে যায় সেরকম সমস্ত ধর্মই রাজধর্মে বিলীন হয়। ৫৯ অধ্যায়ের ১৪৪নং শ্লোকে রাজা ও দেবতাকে সমান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ৫৬ অধ্যায়ে আবার দেবতার তুলনায় রাজাকে প্রধান বলা হয়েছে। কারণ, দৈব্য ফলসিদ্ধি পরোক্ষ কিন্তু রাজক্ষমতা প্রত্যক্ষ ফল উৎপাদন করে ;

অর্থাৎ, দেবতা তুষ্ট বা রুষ্ট হ'লে আমরা বুঝতে পারি না, কিন্তু রাজা তুষ্ট বা রুষ্ট হ'লে তার ফল আমরা সরাসরি জানতে পারি।

আবার, অর্থশাস্ত্রের ন্যায় শান্তিপর্বেও রাজ্য ও রাজতন্ত্রকে সমার্থক হিসেবে দেখা হয়েছে। শান্তিপর্বে রাজতন্ত্র শুধুমাত্র মানুষের সমাজেই অপরিহার্য নয়। স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল---এই ত্রিভুবনেও রাজতন্ত্রের অস্তিত্ব রয়েছে। ১২২ নং অধ্যায়ে বলা হয়েছে দণ্ডনীতির সৃষ্টির পর মহাদেব ইন্দ্রকে দেবগণের, যমকে পিতৃগণের, কুবেরকে ধন ও রাক্ষসগণের, সুমেরুকে পর্বতসমূহের, সমুদ্রকে নদীকুলের, বরুণকে জল ও অসুরগণের , মৃত্যুকে প্রাণের, ভাস্কর ও হুতাশনকে তেজের, ঈশানকে রুদ্রগণের, বশিষ্ঠকে বিপ্রগণেব, নিশাকরকে নক্ষত্রমণ্ডলের, অংশুমানকে লতাজালের, কুমারকে ভূতগণের, কামকে মৃত্যু ও সুখ-দুঃখের এবং ক্ষুপকে সমুদয় মানুষের রাজা করেন।

শান্তিপর্বের ৫৭ নং অধ্যায়ে রাজার কর্তব্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, রাজার পক্ষে উদ্যোগী হওয়া অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি স্বামী (রাজা) অমাত্য, সুহৃৎ, কোষ, দেশ, দুর্গ ও সৈন্য---রাজ্যের এই সাতটি অঙ্গের বিরুদ্ধ আচরণ করবে সেই ব্যক্তি গুরুই হন বা মিত্রই হন, অবশ্যই রাজার বধ্য হবেন।

রাজার কর্তব্য সবসময় কোষাগারকে পরিপূর্ণ রাখা। তিনি ন্যায় বিচারে যম এবং ধনসংগ্রহে কুবের এর মতো হবেন। ৭১ নং অধ্যায়ে বলা হয়েছে, রাজা প্রজাদিগের শস্যের ছয় ভাগের এক ভাগ এবং সুরক্ষিত বণিকদের দেওয়া ধন গ্রহণ করে অর্থসংগ্রহ করবেন (১২/৭১/১০)। লোভের বশবর্তী হয়ে রাজা কখনও ধনসঞ্চয় করবেন না। উপমা সহকারে বলা হয়েছে, দুগ্ধলাভে ইচ্ছুক ব্যক্তি গাভীর স্তনমণ্ডলকে কর্তন করলে যেমন দুগ্ধলাভে সমর্থ হয় না সেরূপ রাজা প্রজাদিগকে নিপীড়ন করলে কখনই সম্পত্তিশালী হ'তে পারে না (১২/৭১/১৬)।

৫৮ নং অধ্যায়ে বলা হয়েছে, গুপ্তচর ও অন্যান্য রাজকর্মচারীদের বিরক্ত না করে যথাসময়ে বেতনদান, অসৎপথ অনুসরণ না করে যুক্তি অনুসারে প্রজাদের করগ্রহণ, প্রজাদের হিতসাধন, জীবন ও গৃহকে সুরক্ষিত করা প্রভৃতি কাজগুলি রাজা যত্ন করে করবেন (১২/৫৮/৫-১০)। অন্যান্য জনকল্যাণকর কর্মসূচীর কথাও বলা হয়েছে। যেমন, অনাথদের প্রতিপালন, বৃদ্ধদের শুশ্রূষা, দরিদ্র ও বিধবাদের জীবিকার ব্যবস্থা করা , সৎপাত্রে ধনদান, অসৎলোকের কাছ থেকে ধন সংগ্রহ করে সৎলোকেদের মধ্যে বিতরণ প্রভৃতি কাজগুলিও রাজার কর্তব্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে (১২/৫৭/১৯-২৪)।

বিচারকার্য সম্পাদনের ব্যাপারে রাজা যথেষ্ট সতর্ক হবেন। বিনা বিচারে যেন কেউ শাস্তি না পায়, একের অপরাধে অন্য ব্যক্তি শাস্তি না পায়। একমাত্র বিশেষভাবে পর্যালোচনা করেই কোনও ব্যক্তিকে শাস্তিদান অথবা মুক্তিদেওয়া---প্রভৃতি বিষয়গুলি রাজা দেখবেন। বিচারকালে উভয় পক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণ করা রাজার কর্তব্য। অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি নিরাশ্রয় হয় এবং তার যদি সাক্ষ্যবল না থাকে তাহ'লে তার বিষয়টি বিশেষভাবে পর্যালোচনা করা উচিত। বিচার করতে গিয়ে যার যেরূপ দোষ প্রমাণ হবে রাজা তার প্রতি সেরূপ শাস্তি দেবেন। অবশ্য, এ ব্যাপারে শান্তিপর্বে ধন ও বর্ণ বিশেষে শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে বৈষম্যমূলক আচরণের কথাও বলা হয়েছে। যেমন, ধনাঢ্য ব্যক্তিদের ধনদণ্ড, নির্ধনদের কারাদণ্ড এবং দুর্বৃত্তদের দৈহিক

দণ্ড দ্বারা শাসন করা রাজার কর্তব্য। অথচ ব্রাহ্মণ যদি দোষী হয় তাহলে মৃদু তিরষ্কার করাই উচিত। অবশ্য ৫৬ নং অধ্যায়ের ৩২ নং শ্লোকে অপরাধী ব্রাহ্মণকে হত্যা করার চেয়ে রাজ্য থেকে বের করে দেবার কথা বলা হয়েছে। ব্রাহ্মণকে দৈহিক আঘাত করা যাবে তখনই যখন ধর্মপরায়ণ রাজা বেদ-বেদান্ত পারগ ব্রাহ্মণকে অস্ত্র নিয়ে আসতে দেখবেন। এরকম অবস্থায় ব্রাহ্মণকে নিগ্রহ করলেও অধর্মের হবে না। (১৩/৫৬/২৯)

বিজিত রাজার প্রতি বিজেতা রাজার কীরূপ ব্যবহার করা উচিত সে সম্পর্কে ৯৬ অধ্যায়ে কতকগুলি কর্তব্যের কথা বলা হয়েছে। যেমন, রাজার পক্ষে বিজয় বাসনা করা কর্তব্য কিন্তু যিনি নিজের মঙ্গল কামনা করবেন তিনি কোনও অধর্মের আশ্রয় নেবেন না। যুদ্ধে বর্মহীন, অস্ত্রহীন ও শরণাগত রাজা/যোদ্ধাকে রাজা হত্যা করবেন না। এরকম ক্ষেত্রে রাজা সেই ব্যক্তিকে বন্দী করে এক বছর পর্যন্ত সময় ধরে অনুকূলে আনার চেষ্টা করবেন। কিন্তু এক বছর পর সেই ব্যক্তি অনুগত হ'তে অস্বীকার করলে রাজা তাকে মুক্তি দেবেন। শত্রুর কন্যার ক্ষেত্রেও একই নিয়ম বলবৎ হবে। অর্থাৎ রাজা শত্রুকন্যাকে নিজগৃহে এনে নিজের স্ত্রী করার জন্য এক বছর ধরে উপদেশ দেবেন। কিন্তু এর মধ্যে যদি সেই রমণী স্ত্রী হতে রাজী না হন তাহলে তাকেও মুক্তি দেবেন (১২/৯৬/৪-৫)। বিজয়ী রাজার কর্তব্য হ'ল তিনি মধুর বাক্য বলে এবং যুদ্ধে অর্জিত বস্তুসকল অনার্য ম্লেচ্ছাদি সকল প্রজাদিগকে দিয়ে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করবেন। এই ব্যবস্থাকেই রাজার সর্বোত্তম নীতি বলে উল্লেখ করা হয়েছে (১২/৯৬/১২)। যুদ্ধে যেহেতু অনেককেই হত্যা করতে হয় সেহেতু ক্ষাত্রধর্মকে সবচেয়ে পাপজনক ধর্ম বলা হয়েছে এবং এ কারণেই যুদ্ধ জয়ের পর যজ্ঞানুষ্ঠান, প্রজাদের দান ও সাধুসন্তদের অনুগ্রহ করে রাজার পাপস্খলনের কথা বলা হয়েছে (১২/৯৭/৯)।

রাজার অধিকার ও কর্তব্য নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে একটা প্রশ্ন আমাদের মনে বারবার আসে। সেই প্রশ্নটা হ'ল---রাজা (ক্ষত্রিয়) এবং ব্রাহ্মণ এই দুই ব্যক্তির (বর্ণের) মধ্যে কে বেশী প্রভাবশালী। বর্ণের বিন্যাস অনুযায়ী ব্রাহ্মণ্যধর্মের অবস্থান সবার উপরে। ৭৩ অধ্যায়ে ব্রাহ্মণ সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। রাজারও উচিত কোন ব্রাহ্মণকে প্রথমে পুরোহিত পদে অভিষিক্ত করে তবেই রাজ্যভার নেওয়া (১২/৭৩/২৯-৩১)। ব্রহ্মা প্রথমে ব্রাহ্মণকেই সৃষ্টি করেন এবং দণ্ডের ভার দেন। সেই দণ্ডের ভার ব্রাহ্মণ অর্পণ করে ক্ষত্রিয় হাতে। সুতরাং, এদিক থেকেও মনে হয়, ব্রাহ্মণের প্রাধান্যই বেশী। তাছাড়া, ব্রাহ্মণগণকে সকল প্রকার ক্ষতি থেকে রক্ষা করেন বলেই রাজা ক্ষত্রিয় নামে পরিচিত (১২/৫৯/১২৫)। কিন্তু এরূপ বক্তব্যের পাশাপাশি বেশ কিছু বক্তব্য রয়েছে যা রাজার প্রাধান্যকেই প্রধান বলে প্রমাণ করে; যেমন, রাজাকে দেবগণ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেছেন বলে কেহই রাজার আদেশ লঙ্ঘন করে না। এই জগৎ একমাত্র রাজার অধীনেই থাকে। রাজার উপর জগতের শাসন চলে না (১২/৫৯/১৩৫)। ৫৬ নং অধ্যায়ে যদিও ব্রাহ্মণদের কখন ও দণ্ড দেওয়া উচিত নয় বলা হয়েছে (১২/৫৬/২২) কিন্তু ২৭ নং শ্লোকে ব্রাহ্মণকে নিজ বাহুবলে নিগ্রহ করার কথাও বলা হয়েছে, যদি রাজা দেখেন সেই ব্রাহ্মণ ত্রিলোক বিনাশ করতে উদ্যত হয়। ২৯নং শ্লোকে বলা হয়েছে কোনও ব্রাহ্মণ যদি যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করে তাহলেও রাজা তাকে বধ করবেন। ৩২ নং শ্লোকে অবশ্য বলা হয়েছে অপরাধী ব্রাহ্মণকে হত্যা করার চেয়ে রাজ্য থেকে বিতাড়িত করবেন। সুতরাং এই সমস্ত শ্লোকগুলি থেকে প্রমাণিত হয় রাজক্ষমতাই প্রধান।

রাজা ও ব্রাহ্মণ এই দু'য়ের মধ্যে কে প্রধান এই প্রশ্নে শান্তিপর্বে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য রয়েছে এবং এই পরস্পরবিরোধী বক্তব্যের জন্য কখনও রাজাকে কখনও ব্রাহ্মণকে প্রধান বলে মনে হয়। আমাদের মনে

হয় শান্তিপর্বে রাজা এবং ব্রাহ্মণ এই দু'য়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠতার বিচারের চেয়ে উভয়ের মধ্যে পরস্পর সহযোগিতার বিষয়েই বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। রাজা (ক্ষত্রিয়) এবং ব্রাহ্মণের স্বার্থ পরস্পরের পরিপূরক। উভয় শ্রেণীই সমাজের উদ্বৃত্ত ভোগ-দখলকারী; প্রাধান্যকারী শ্রেণী। অন্যান্য শ্রেণীগুলির মধ্যে প্রাধান্য বজায় রাখতে গেলে তাই এই দুই শ্রেণীর মধ্যে সহযোগিতা ও বোঝাপড়া একান্ত জরুরী। ৭৩ নং অধ্যায়ের শেষ শ্লোকটিতে তাই বলা হয়েছে---ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের উন্নতি সাধন করেন; আবার ক্ষত্রিয় থেকে ব্রাহ্মণের উন্নতি হয় (১২/৭৩/৩২)। আর স্বার্থ বোঝাপড়ার দায়িত্বটা শান্তিপর্ব রাজার উপরই অর্পণ করেছে। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হলে প্রজাদের দুঃসহ দুঃখ দেখা দেয়— এটা জেনে রাজা অবশ্যই বহু বিদ্যাসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে পুরোহিত করবেন (১২/৭৩/২৮)।

৩৪.৫.১ রাজাকে মান্য করার কারণ

রাজার অধিকার ও কর্তব্য নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখেছি প্রজাদের মঙ্গলসাধনই রাজার অন্যতম ধর্ম। রাজা দণ্ডনীতি অনুসারে শাসন করেন এবং প্রজারাও নিরাপদে জীবনযাপন করেন। কিন্তু প্রজারা রাজাকে মানতে বাধ্য হবে কেন? প্রশ্নটি আমাদের মনে যেমন রেখাপাত করে শান্তিপর্বেও এই প্রশ্নটি সম্পর্কে ৬৭ এবং ৬৮নং অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। রাজাকে মেনে চলার কারণ সম্পর্কে শান্তিপর্বের বক্তব্যকে আমরা এখন আলোচনা করব।

প্রথমত, রাষ্ট্রসৃষ্টির সময়েই প্রজারা রাজাকে মানবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখেছি প্রথমে মনু রাজ্যের ভার নিতে অস্বীকার করেন। কিন্তু প্রজারা কর, সৈন্য ইত্যাদি দিয়ে রাজাকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিলে তবেই মনু রাজপদে বসতে রাজী হন।

দ্বিতীয়ত, রাজাই প্রজাদের অরাজক অবস্থা থেকে মুক্ত করে প্রজাদের ধর্ম, অর্থ কাম ও মোক্ষ সাধনের সহায়ক হন। এ কারণেই প্রজাদের প্রথম কর্তব্যই হ'ল রাজা হিসেবে একজনকে প্রতিষ্ঠিত করা। এমনকি, যে সমস্ত রাজ্যে রাজা ও সৈন্যসামন্ত থাকে না সেই রাজ্য অন্য কোনও রাজা কর্তৃক আক্রান্ত হলে প্রজাদের উচিত সেই রাজাকে সম্মানপূর্বক গ্রহণ করা, কারণ অরাজক রাজ্যে বাস করার চেয়ে বেশী ক্ষতিকর আর কিছুই নেই (১২/৬৭/৬-৭)।

তৃতীয়ত, প্রজারা যদি রাজাকে সহজেই মেনে চলে তাহলে প্রজাদের রাজার উৎপীড়ন সহ্য করতে হয় না। উপমা দিয়ে বলা হয়েছে, যে গরুর দুধ দোহন করা কষ্টকর সেই গরু গোপালকের প্রহারে গুরুতর কষ্ট পায়। কিন্তু যে গরুর দুধ দোহন করার ব্যাপারে কষ্ট করতে হয় না সেই গরুকে প্রহারও সহ্য করতে হয় না (১২/৬৭/৯)।

চতুর্থত, রাজা প্রজাদের পাপ মোচন করেন। প্রজারা যে সমস্ত অন্যায় কাজ করে থাকে সেই অন্যায় কাজের জন্য প্রজাদের পাপ হয়। রাজা শাস্তিদানের মাধ্যমে প্রজাদের সেই পাপ লাঘব করেন (১২/৬৮/৯)।

পঞ্চমত, রাজাকে মেনে চলার কারণ হিসেবে রাজার প্রতি দেবত্বও আরোপ করা হয়েছে। বলা হয়েছে,

রাজা মানুষরূপী দেবতা। সুতরাং, রাজাকে মানুষ হিসেবে দেখা বা অবজ্ঞা করা উচিত নয়। রাজা প্রয়োজনবোধে অগ্নি, আদিত্য, মৃত্যু, কুবের ও যম --- এই পাঁচ মূর্তি ধারণ করতে পারেন (১২/৬৮/৪১)। যে প্রজা মনে মনেও রাজার অনিষ্ট চিন্তা করে তাকে নিঃসন্দেহে ইহলোকে কষ্ট ভোগ ও পরলোকে নরকে যেতে হয়। (১২/৬৮/৩৯)।

৫৯নং শ্লোকে অবশ্য প্রজাদের গুরুত্বও উল্লেখ করা হয়েছে। রাজা প্রজাদের প্রধান শরীর; আবার প্রজারাও রাজার অতুলনীয় শরীর। রাজা ছাড়া যেমন রাজ্য হ'তে পারে না সেরূপ রাজ্য ছাড়াও রাজা হতে পারে না। রাজা যাতে স্বৈরাচারী হয়ে উঠতে না পারে তার জন্য রাজাকেও ধর্মের ভয় দেখানো হয়েছে---'রাজাও ইন্দ্রিয় দমন, সত্য ব্যবহারও প্রজারঞ্জন সহকারে পৃথিবী শাসন করে এবং প্রধান যজ্ঞানুষ্ঠানের গুণে অত্যন্ত যশস্বী হয়ে স্বর্গলোকে স্থায়ী স্থান লাভ করেন (১২/৬৮/৬১)।

৩৪.৫.২ বিদ্রোহ

রাজাকে মেনে চলার জন্য অনেকরকমের উপদেশ দিলেও প্রজারা যে রাজার বিরুদ্ধাচরণ করতে পারে সে সম্পর্কে শান্তিপর্বের রচয়িতা যথেষ্ট সচেতন। এ কারণে প্রজা বিদ্রোহ ঘটলে রাজার কি করণীয় সে সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করা হয়েছে। শান্তিপর্বে দু'ধরনের বিদ্রোহের কথা বলা হয়েছে— আভ্যন্তরীণ এবং বহিরাগত। আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ আবার তিন ধরনের হ'তে পারে (১) রাজার নিকট আত্মীয়, জ্ঞাতি গোষ্ঠী কর্তৃক বিদ্রোহ (২) অমাত্যগণ কর্তৃক বিদ্রোহ (৩) প্রজা বিদ্রোহ। ৮১নং অধ্যায়ে বলা হয়েছে যদি রাজার জ্ঞাতিগোষ্ঠী দ্বারা বিদ্রোহ দেখা যায় তাহলে সেই বিদ্রোহ দমনে কষ্টসাধ্য কাজ করতে গিয়ে হয় বিপুল ধনক্ষয় নতুবা অসংখ্য লোকের প্রাণহানি হবে। সেক্ষেত্রে ক্ষমা, সরলতা, মৃদুতা প্রদর্শন, যথাশক্তি অন্নদান ও উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করে রাজা সেই বিদ্রোহ দমন করবেন। এই পদ্ধতিকে 'অলৌহনির্মিত হৃদয় বিদারক মৃদু অস্ত্র' বলে শান্তিপর্বে উল্লেখ করা হয়েছে (১২/৮১/২১)।

যদি দেখা যায় অমাত্যগণ বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে তাহলে প্রথমেই অমাত্যগণকে দোষী সাব্যস্ত না করে রাজার উচিত ধীরে ধীরে অমাত্যগণের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া। তারপর অমাত্যদের সকলের দোষ একে একে প্রমাণ করে প্রত্যেককে বিনাশ করা উচিত। সকলের প্রতি একসঙ্গে দোষারোপ করলে সকল অমাত্য মিলিত হয়ে রাজশক্তিকে দুর্বল করতে পারে (১২/৮২/৬১) অমাত্যদের মধ্যে বিরোধ ঘটিয়ে মন্ত্রীদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা উৎপাদন করে হীনবল করা এবং একজন দোষী অমাত্য দিয়ে অপর দোষী অমাত্যকে বিনষ্ট করা উচিত (১২/৮২/৬৩-৬৫)।

যদি কোনও কারণে প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে তাহলে ব্রাহ্মণগণই রাজার প্রধান অবলম্বন হবে। অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের সাহায্য নিয়ে রাজা সে বিদ্রোহ দমন করবেন; কিন্তু বিদ্রোহ দমনের পরে বিদ্রোহী প্রজাদের সঙ্গে রাজা ভাল ব্যবহার করবেন ও মঙ্গল করবেন। কারণ, এর ফলে বিদ্রোহী প্রজাগণ ক্রমশ ধর্মসম্মত নিজ নিজ কাজে যুক্ত হবে (১২/৭৮/১৬-১৭)।

আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ছাড়াও রাজ্যে বাইরের শত্রুরা দেশের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে। এরকম হলে রাজা সমস্ত বর্ণের মানুষেরই সাহায্য নেবেন। এমনকি এ ক্ষেত্রে শূদ্রবর্ণের প্রজারাও অস্ত্রধারণে দোষী বলে বিবেচিত হবে না (১২/৭৮/১৮)।

কিন্তু যদি রাজা নিজেই অত্যাচারী হয়ে থাকেন তাহলে ব্রাহ্মণেরা তপস্যা, ব্রহ্মচর্য, অস্ত্র ও দৈহিক শক্তি দ্বারা অথবা কূটকৌশলে রাজাকে ধর্ম অনুযায়ী শাসন করতে বাধ্য করবে। এই ক্ষমতা একমাত্র ব্রাহ্মণরাই প্রয়োগ করবে। কারণ, ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণ থেকেই সৃষ্ট হয়েছে (১২/৭৮/২১)। এখানে লক্ষ্য করার ব্যাপার হ'ল ব্রাহ্মণদের অস্ত্র ধারণ নিষিদ্ধ হ'লেও এক্ষেত্রে অস্ত্রধারণকে বৈধ বলা হয়েছে। তাছাড়া, রাজার প্রতি ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্যান্য বর্ণের অস্ত্রধারণকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

কিন্তু ৭৮নং অধ্যায়ে ৩৮ থেকে ৪৪ নং শ্লোক বিশ্লেষণ করলে এক ভিন্ন চিত্র পাওয়া যায়। এই শ্লোকগুলিতে উপরের অনুশাসনগুলি বজায় রাখা হয়নি। শূদ্রের অস্ত্রধারণকেও সমর্থন করা হয়েছে। এমনকি , শূদ্রের বা বৈশ্যের রাজা হওয়ার সম্ভাবনাকেও স্বীকার করা হয়েছে। বলা হয়েছে, রাজা বা ক্ষত্রিয়গণ বিপথগামী হয়ে পড়লে যদি ব্রাহ্মণ বা বৈশ্য এমনকি শূদ্র সম্ভূত কোনও বলবান ব্যক্তি সেই প্রতিকূল অবস্থার প্রতিকার করতে সমর্থ হয় এবং ধর্ম রক্ষার জন্য ধর্মানুসারে দণ্ড ধারণ করে অনিষ্ট সৃষ্টিকারী দস্যুদের হাত থেকে প্রজাদের রক্ষা করতে পারে তাহলে ক্ষত্রিয় না হয়েও সেই বলশালী ব্যক্তি এমনকি শূদ্র হ'লেও রাজার সম্মান পাবার যোগ্য (১২/৭৮/৩৮)। ভারবহনে অক্ষম বৃষের ন্যায় যে রাজা রাজ্য রক্ষা করতে পারে না সেই অক্ষম রাজার কোন প্রয়োজন নেই (১৩/৭৮/৪১)। উপমা সহকারে বলা হয়েছে, কাঠের হাতি কাজে অক্ষম পুরুষ, অনুর্বর জমি, নপুংসক মানুষ, বৃষ্টি দিতে ব্যর্থ মেঘ যেমন নিষ্ফল, সেরকম বেদপাঠে বিমুখ ব্রাহ্মণ ও রক্ষার কাজে অসমর্থ রাজা সকল দিক থেকে অর্থহীন এবং অপ্রয়োজনীয় (১২/৭৮/৪২-৪৩)। অনাথ,, দুস্য দ্বারা অত্যাচারিত, বিভিন্ন কষ্টে জর্জরিত, ক্লিষ্ট মানুষ যে পুরুষ প্রধানকে আশ্রয় করে যথা সুখে জীবন যাপন করতে পারে সেই পুরুষ প্রধানকেই প্রজারা আপন বন্ধুর মতো মনে করবে ও শ্রদ্ধা করবে এবং সেই ব্যক্তিই রাজা সম্মান লাভের যোগ্য (১২/৭৮/৩৯-৪০)। যিনি সবসময় সৎব্যক্তিদের রক্ষা ও অসৎব্যক্তিদের শাস্তিদানের মাধ্যমে অসৎকাজ থেকে বিরত করতে পারেন সেই ব্যক্তিই রাজপদের যোগ্য; কারণ সেই ব্যক্তি দ্বারাই এই গোটা জগৎ সুরক্ষিত হয়ে থাকে ও সনাতন ধর্ম বজায় থাকে (১২/৭৮/৪৫) । এই শ্লোকগুলি থেকে মনে হয় অযোগ্য রাজার বিরুদ্ধে প্রজাদের অস্ত্রধারণকে পুরোপুরি অস্বীকার করা হয়নি। তাছাড়া ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্ররাও রাজপদের যোগ্য হ'তে পারে। সম্ভবত, এসময় পর্যন্ত বর্ণব্যবস্থার কড়াকড়ি চরম জায়গায় পৌঁছায়নি। নতুবা এরকম শ্লোকগুলি শান্তিপর্বে স্থান পেত কিনা সন্দেহ।

৩৪.৬ রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রকারভেদ—গণরাজ্য

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের মতো শান্তিপর্বেও রাজতন্ত্রই প্রধান ও কাম্য রাজনৈতিক ব্যবস্থা। রাজ্য এবং রাজাকে সমার্থক হিসেবেই দেখা হয়েছে। একারণে উভয় গ্রন্থেই রাজতন্ত্রের উদ্ভব, রাজার গুণ, কর্তব্য, যুদ্ধবিবাদ, নির্দেশ প্রভৃতিই মূল আলোচনার বিষয়। কিন্তু কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের মতো শান্তিপর্বেও অন্য রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে গণরাজ্য বা সংঘ রাষ্ট্রের উল্লেখ করা হয়েছে। শান্তিপর্বের ১০৫নং অধ্যায়ে এই গণরাজ্য বা সংঘরাজ্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বলাবাহুল্য, গণরাজ্যকে রাজতন্ত্রের এক বিপরীত বা ভিন্ন ব্যবস্থা হিসেবেই তুলে ধরা হয়েছে। এই অধ্যায়টিতে গণরাজ্যের প্রকৃতি ও সুফল সম্পর্কে যেমন প্রশংসা করা হয়েছে, গণরাজ্যের ত্রুটিগুলি সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

সংঘবদ্ধতা ও ঐক্যকেই গণরাজ্যের ভিত্তি বলা হয়েছে (১২/১০৫/১৪,১৮)। এই ঐক্যের ফলে রাজ্যের ক্ষমতা ও দৃঢ়তা বাড়ে। রাজ্য পরিচালনা সহজ বা এবং অভিষ্ট লক্ষ্যসমূহ পূরণ হয় (১২/১০৫/২০,২১) এবং সহজেই সংকটের মোকাবিলা করতে পারে। সংঘবদ্ধ লোকেদের মধ্যে সহযোগিতার ফলে রাজ্যের উন্নতি হয়। গণরাজ্যের সদস্যগণই গুপ্তচর বা দূতের কাজ, মন্ত্রণা করা, নিয়ম তৈরী করা, অর্থ সংগ্রহ করা---সব বিষয়েই উদ্যোগী হয় এবং সক্রিয় অংশ নেয় (১২/১০৫/১৯)। রাজতন্ত্রের ন্যায় গণরাজ্য যেহেতু বংশানুক্রমিক শাসন নয় সেহেতু গণরাজ্যের শ্রেষ্ঠ পুরুষদের সন্তান বা ভ্রাতারা যদি কোনও অন্যায় করে তাহলে তাদেরও শাস্তি পেতে হয়। জ্ঞানবৃদ্ধ পুরুষরাই রাজ্য পরিচালনায় মুখ্য ভূমিকা নেয়। সবসময় উপযুক্ত শিক্ষকের কাছ থেকে শিক্ষা নিয়ে এবং শিক্ষা শেষে রাজ্যপরিচালনার কাজে নতুনদের যুক্ত করে গণরাজ্য তার ধারাবাহিকতা বজায় রাখে। গণের সব লোকেরাই মন্ত্রণার অধিকারী হয় না। গণের প্রধান ব্যক্তিরাই একমাত্র পরস্পর মিলিত হয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয় (১২/১০৫/২৩-২৪)।

শান্তিপর্বের এই অধ্যায়টিতে গণরাজ্যের শুধু প্রসংশাই করা হয়নি; রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রধান রাজাকে গণ বা সংঘের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের কথা বলা হয়েছে (১২/১০৫/১৫)। ২৩নং শ্লোকে যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে গণরাজ্যের প্রধান ব্যক্তিদের সম্মান করতে, কারণ রাজ্যপরিচালনার প্রচুর দায়িত্ব এই সমস্ত ব্যক্তিদের উপর ন্যস্ত থাকে। তাছাড়া, ঐক্যবদ্ধ গণরাজ্যকে বাইরের শত্রুদের পক্ষে পরাজিত করা কষ্টকর (১২/১০৫/২৮)। সুতরাং, রাজার উচিত হ'ল গণরাজ্যের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্কে আবদ্ধ হওয়া।

গণরাজ্য অত্যন্ত শক্তিশালী রাজ্য হিসেবে প্রশংসিত হ'লেও গণরাজ্যের ত্রুটিগুলি সম্পর্কেও এই অধ্যায়টিতে আলোচনা করা হয়েছে। ঐক্য যেমন গণরাজ্যের ভিত্তি, অনৈক্য গণরাজ্যের ধ্বংসের কারণ। পরস্পরের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হ'লে ভিন্ন ভিন্ন মত গড়ে ওঠে ও পৃথক পৃথক বহু দলের সৃষ্টি হয়। এর ফলে, গণরাজ্যে প্রধান ব্যক্তিগণ স্ব স্ব প্রধান হয়ে পড়েন এবং গণরাজ্যের পরিচালনা কষ্টকর হয়ে ওঠে (১২/১০৫/২৪,২৫)। বিভিন্ন কুলগোষ্ঠী বা বংশে যে সমস্ত ঝগড়া বিবাদ দেখা দেয় তা যদি কুলগোষ্ঠীর বয়স্ক ব্যক্তিরা উপেক্ষা করেন বা মীমাংসা করতে ব্যর্থ হন তাহলে সেই সব ঝগড়া বিবাদ বিভিন্ন কুল বা বংশের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে (১২/১০৫/৩০-৩২)।

দ্বিতীয়ত, ক্রোধ, মোহ বা লোভ গণরাজ্যের বিভিন্ন কুল বা গোষ্ঠীর মধ্যে শত্রুতার সৃষ্টি করে। প্রথমে একজন মানুষ লোভের বশবর্তী হয়। এর প্রতিক্রিয়ায় অন্যদের মধ্যেও এই প্রবণতা দেখা যায়। এভাবে সকলেই লোভ ও ক্রোধের বশবর্তী হয়ে রাজ্যের সম্পত্তি আত্মসাৎ করতে থাকে। নিজেদের মধ্যে খুনোখুনিও শুরু হয়। ফলে দেশের মধ্যে এক চরম অরাজকতা দেখা দেয় (১২/১০৫/১১-১৩)।

তৃতীয়ত, ২২নং শ্লোকে বলা হয়েছে, গণরাজ্যের লোকেদের মধ্যে যদি ক্রোধ, ভেদ, ভয়, আঘাতে অপরকে দুর্বল করা বা হত্যা করার প্রবৃত্তি গড়ে ওঠে তাহলে তাড়াতাড়ি গণরাজ্য শত্রুর দ্বারা পরাজিত হয়। গণরাজ্যের মধ্যেকার বিরোধ গণরাজ্যেকে দুর্বল করে তোলে এবং এর ফলে শত্রুসৈন্যের সঙ্গে মেকাবিলা করতে পারে না। তাছাড়া, গণরাজ্যর সৈন্যরা যদি ঠিক সময়ে ভোজন ও বেতন না পায় তাহলে তারা বিচ্ছিন্ন হ'তে থাকে এবং শত্রু পক্ষে যোগ দিতে থাকে (১২/১০৫/১৩)।

সর্বোপরি, গণরাজ্য সাম্যনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বর্ণগত বা কুলগত বৈষম্য থাকে না। বংশগত

ও বর্ণগত বৈষম্য না থাকায় গণরাজ্যের সব মানুষ সমান হ'তে পারে কিন্তু উদ্যোগ, বুদ্ধি, রূপ ও সম্পত্তিতে সকলের এক হওয়া অসম্ভব। উদ্যোগ, বুদ্ধি, রূপ ও সম্পত্তির ভিন্নতাকে স্বীকার না করায় গণরাজ্যে উদ্যোগের অভাব যেমন ঘটে অপরদিকে এই ভিন্নতার ফলে শত্রুরা গণরাজ্যের মানুষের মধ্যে সহজেই বিভেদ সৃষ্টি করতে পারে। এর ফলে গণরাজ্য এক বড় সংকটের সম্মুখীন হয়।

উপরের এই আলোচনায় আমরা গণরাজ্যের সুবিধা ও অসুবিধা সমূহ দেখেছি। এই অসুবিধাগুলির মধ্যে বেশ কিছু অসুবিধা আমাদের আজকের এই গণতন্ত্রের মধ্যেও আমরা লক্ষ্য করি; যেমন অনৈক্য, দলাদলি, জাতীয় সম্পত্তি আত্মসাৎ প্রভৃতি প্রবণতা আমাদের গণতন্ত্রেও অত্যন্ত প্রকট। যদি আমরা গণতন্ত্রের সমস্যাগুলি জানতে পারি তাহলে সেই সমস্যাগুলি মোকাবিলা করার জন্য আমরা তৎপর হ'তে পারব।

৩৪.৭ রাষ্ট্রের প্রকৃতি বা উপাদানসমূহ—সপ্তাঙ্গতত্ত্ব

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা রাষ্ট্রের প্রকৃতি বা উপাদান (সপ্তাঙ্গতত্ত্ব) সম্পর্কে এক বিস্তারিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ আলোচনা দেখতে পাই। মহাভারতের শান্তিপর্বে রাষ্ট্রের প্রকৃতি বা উপাদান সম্পর্কে এই সপ্তাঙ্গতত্ত্বের উল্লেখ থাকলেও বিস্তারিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে আলোচনা হয়নি। ৬৯নং অধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিতে গিয়ে ভীষ্মদেব রাষ্ট্রের সপ্তাঙ্গের তথা সপ্ত প্রকৃতির উল্লেখ করেন। এগুলি হ'ল---রাজা স্বয়ং, অমাত্য, কোষ, দণ্ড, মিত্র, জনপদ ও পুর। এখানে দুর্গ শব্দটি ব্যবহারের পরিবর্তে পুর শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। দুর্গ, পুর, রাজধানী শব্দগুলির অর্থ এখানে একই। আবার ১২১নং অধ্যায়ে রাষ্ট্রের সপ্ত প্রকৃতি ও অষ্ট অঙ্গযুক্ত বল এর কথা বলা হয়েছে। সপ্তপ্রকৃতির নাম আমরা আগেই পেয়েছি। অষ্টঅঙ্গযুক্ত বল বলতে হাতি, ঘোড়া, রথ, পদাতিক বাহিনী, নৌকা, বেতনভোগী কর্মচারী, দেশের প্রজা ও পশুকে বোঝানো হয়েছে। এই অষ্ট অঙ্গযুক্ত বল হ'ল রাজার আহার্য বল। এছাড়া, রাজার চার ধরনের প্রকৃতি বল রয়েছে যেমন---কুল বা বংশ, ধনসম্পদ, মন্ত্রী ও বুদ্ধি (১২/১২১/৪৩-৪৭)। শান্তিপর্বের বিভিন্ন অধ্যায়ে বর্ণিত রাষ্ট্রের এই সপ্তপ্রকৃতির বিষয়ে আলোচনা করব। তবে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে প্রতিটি প্রকৃতি বা উপাদান নিয়ে যে ধরনের শৃঙ্খলাবদ্ধ আলোচনা রয়েছে শান্তিপর্বে সেরকমের আলোচনা করা হয়নি। বিভিন্ন অধ্যায়ে ছড়িয়ে থাকা বিষয়গুলিকে এক জায়গায় নিয়ে এসে আলোচনা করতে হবে। জনপদ নিয়ে কোনও বিস্তারিত আলোচনা না থাকায় আমরা এই বিষয়টি বাদ দেব।

৩৪.৭.১ রাজা

কৌটিল্যের সপ্তাঙ্গ তত্ত্বে স্বামী তথা রাজাই প্রধান উপাদান। শান্তিপর্বে যদিও রাজধর্মকে প্রধান বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তথাপি রাজার পরিবর্তে দণ্ডই এখানে প্রধান। দণ্ডই রাজ্যের প্রধান উপাদান এবং অন্যান্য সব উপাদানগুলির উৎপত্তির কারণ। ঈশ্বর যত্নসহকারে প্রজাপতিপালন ও সব বর্ণের মানুষকে নিজ নিজ ধর্মে সংস্থাপনের জন্য, অর্থাৎ বর্ণ অনুযায়ী নিজ নিজ কাজ করার জন্য রাজার হাতে যে দণ্ডকে অর্পণ করেছেন তার চেয়ে অধিক পূজনীয় বলে রাজার আর কিছু নেই (১২/১২১/৪৮)। রাজার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আমরা এর আগেই আলোচনা করেছি। এখানে আমরা রাজার সঙ্গে পুরোহিতের সম্পর্কের বিষয়টি আলোচনা

করব। কারণ, শান্তিপর্বের বেশ কিছু অধ্যায়ে কখনও রাজাকে (ক্ষত্রিয়কে) কখনও পুরোহিতকে (ব্রাহ্মণকে) প্রধান বলা হয়েছে।

পুরোহিত-এর বিষয়টি সপ্তাঙ্গের মধ্যে আলোচিত না হ'লেও বেশ কিছু অধ্যায়ে পুরোহিতকে রাষ্ট্রের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন ৭৩নং অধ্যায়েও প্রথম শ্লোকেই বলা হয়েছে রাজা ধর্ম অনুযায়ী যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একজন বহুদর্শী পুরোহিতকে নিয়োগ করবেন (১২/৭৩/১)। রাজা এবং পুরোহিত পরস্পরের অভিন্ন বন্ধু হয়েই জন্মগ্রহণ করেন। রাজা এবং পুরোহিত (ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণ) এর মধ্যে সদ্ভাব থাকলে প্রজারা সুখী হয় এবং উভয়ের মধ্যে বিরোধ থাকলে প্রজারা বিনষ্ট হয় (১২/৭৩/১২) রাজপুরোহিত ধর্ম ও মন্ত্রনিপুণ এবং রাজা ধার্মিক ও মন্ত্রবেত্তা হ'লে প্রজাদের সবদিক থেকে মঙ্গল হয়। ৭৪নং অধ্যায়ে বলা হয়েছে, রাজ্যের রক্ষা ও বৃদ্ধি রাজার অধীন আবার রাজার বৃদ্ধি ও রক্ষা পুরোহিতের অধীন। ব্রহ্মা একই উপাদানে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়কে সৃষ্টি করেছেন। আবার কোনও কোনও শ্লোকে বলা হয়েছে ব্রাহ্মণই ক্ষত্রিয়কে সৃষ্টি করেছে। আসলে শান্তিপর্বে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়কে পরস্পরের পরিপূরক হিসেবেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ব্রাহ্মণের মন্ত্রবল এবং রাজার তথা ক্ষত্রিয়ের অস্ত্রবল ও বাহুবল এক সাথে মিলিত হ'লে প্রজাদের পালন/শাসন সহজ হয় (১২/৭৪/১৪-১৫)। বর্তমান যুগেও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় মতাদর্শের ভূমিকাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা হয়। স্বাভাবিকভাবেই রাজার সহায়ক গোষ্ঠী হিসেবে ব্রাহ্মণের ভূমিকাকে তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা হয়েছে। ব্রাহ্মণ (পুরোহিত) এবং ক্ষত্রিয় (রাজাকে) পরস্পর পরস্পরের উন্নতির কারণ তথা সহায়ক হিসেবে ব্যাখ্যা করার মধ্যে বাস্তবতাকে স্বীকার করা হয়েছে। ৭৯নং অধ্যায়ে পুরোহিতকে অন্যতম অমাত্য হিসেবে গণ্য করা হ'লেও ৮৩নং অধ্যায়ে পুরোহিত এবং অমাত্য-- এই দু'টি পদকে ভিন্ন হিসেবে দেখা হয়েছে। বলা হয়েছে, অমাত্যদের সঙ্গে মন্ত্রনা গ্রহণের পর রাজা ধর্ম, অর্থ ও কামে অভিজ্ঞ পুরোহিতের কাছে সেই মন্ত্রণা সম্পর্কে আলোচনা করবেন এবং পুরোহিতের পরামর্শ অনুসারে সেই মন্ত্রণা যদি কাজের উপযোগী হয় তাহলে রাজা তা অনুসরণ করবেন (১২/৮৩/৫৪)।

৩৪.৭.২ মন্ত্রী

শান্তিপর্বের ৮০নং অধ্যায়টি শুরু হয়েছে যুধিষ্ঠিরের একটি প্রশ্ন দিয়ে---এক একটি সংসারে অত্যন্ত অল্প কাজ থাকলেও তা কোনও একজন মানুষের পক্ষে করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে; এর চেয়ে রাজার কাজ অনেক বেশী। সুতরাং, একাকী রাজা কিভাবে সে কাজ করবে? এই প্রশ্নের উত্তরে রাজার কাজে সহায়তা করার জন্য যুধিষ্ঠিরকে উপযুক্ত গুণসম্পন্ন মন্ত্রী নিয়োগের কথা বলা হয়েছে। ৮৩নং অধ্যায়েও রাজার পরামর্শ বা মন্ত্রণাদাতা হিসেবে সভাসদ ও অমাত্যের কথা বলা হয়েচে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে অমাত্য ও মন্ত্রী পদ দু'টি ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হ'লেও এখানে অমাত্য ও মন্ত্রী পদ দু'টি একই অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। মন্ত্রীদের রাজা নিয়োগ করবেন। কিন্তু কী ধরনের গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকে রাজা মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করবেন সে সম্পর্কে অনেক অধ্যায়েই মন্ত্রীর অনেক গুণেরই উল্লেখ করা হয়েছে। সৎকুলে জন্ম, সৎস্বভাব সম্পন্ন, ইঙ্গিতজ্ঞ, দয়ালু, দেশ ও কাল অনুসারে কাজ করতে সক্ষম, রাজার প্রতি অনুগত—এই সমস্ত গুণ সম্পন্ন ব্যক্তিকেই রাজা মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করবেন। ৮৩নং অধ্যায়ে ২৪ থেকে ৪০ শ্লোকে অর্থাৎ ১৭টি শ্লোকের

মাধ্যমে কোন্ কোন্ ব্যক্তি মন্ত্রী হওয়ার অযোগ্য সে সম্পর্কে রাজাকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। যেমন, বলহীন মন্ত্রী কর্তব্য ঠিক করতে সমর্থ হয় না এবং সব কাজেই সন্দেহ করে (১২/৮৩/২৫)।

শান্তিপর্বে রাজার তিন ধরনের মন্ত্রীর কথা বলা হয়েছে। একজন প্রধানমন্ত্রী, ঘনিষ্টভাবে মন্ত্রণার যোগ্য তিনজন মন্ত্রী নিয়ে মোট পাঁচ মন্ত্রী থাকবেন। ৮৩নং অধ্যায়ের ২১-২২ নং শ্লোকে বলা হয়েছে, 'যাদের বুদ্ধি বিষয়সম্পন্ন ও স্বভাব সুন্দর হয় এবং তেজ, ধৈর্য, ক্ষমা, পবিত্রতা, অনুরাগ, পদমর্যাদা অনুরূপ কার্যকলাপ ও মেধা থাকে---এ সমস্ত গুণগুলি পরীক্ষা করে সবসময়ে দৃঢ় সংসল্প, কার্যভার বহনে সক্ষম ও কপটতাশূন্য পাঁচজন মন্ত্রীকে নিয়োগ করবেন। এই সমস্ত মন্ত্রীদের মধ্যে কোন্ কোন্ মন্ত্রী রাজার সঙ্গে মন্ত্রণার উপযুক্ত নয় সেই বিষয়টিও এই অধ্যায়ের ৩৫ থেকে ৪০ নং শ্লোকে বলা হয়েছে। যেমন, যে মন্ত্রী, পিতার ধর্মবিরুদ্ধ আচরণ করে কোথাও দণ্ডিত হয়েছেন সেই মন্ত্রী সকলের প্রিয় হ'লেও গুপ্ত মন্ত্রণার যোগ্য নয় (১২/৮৩/৩৯)। শান্তিপর্বে মন্ত্রীর চেয়ে মন্ত্রণাকেই বেশী গুরুত্বপূর্ণ বলা হয়েছে। রাজ্যের মূল হ'ল গুপ্তচর এবং এতে মন্ত্রণাই প্রধান। মন্ত্রীরা যেহেতু বেতনের জন্যই রাজাকে অনুসরণ করেন, সেহেতু মন্ত্রীদের রাজ্যের মূল বা সার বলা যায় না (১২/৮৩/৪১)।

মন্ত্রণার বিষয়ে তিনজন মন্ত্রীর কথা বলা হ'লেও রাজা মন্ত্রীদের প্রধান হিসেবে একজনকে বাছাই করবেন। ৮০ নং অধ্যায়ের ২৫নং শ্লোকে যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিতে গিয়ে ভীষ্মদেব সর্তক করে দেন---দুই বা তিনজনকে প্রধানমন্ত্রী করা উচিত নয়। কারণ তারা পরষ্পরকে সহ্য করে না এবং একই বিষয়ে সবসময় নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ ঘটায়। যিনি শক্তিশালী, যশস্বী, সদাচারী; যিনি স্বেচ্ছায় অনর্থ ঘটাবেন না এবং যিনি কাম, ক্রোধ, লোভ ও ভয়ের জন্য নিজ কর্তব্য থেকে সরে আসবেন না, এমন দক্ষ ও বাকপটু লোককেই রাজা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করবেন (১২/৮০/২৬-২৭)। অবশ্য, মন্ত্রীদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত নয়। মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শের পর রাজা ধর্ম, অর্থ ও কামে অভিজ্ঞ পুরোহিতের সঙ্গে পরামর্শ করবেন এবং রাজা যদি সেই মন্ত্রণা কাজের উপযোগী বলে মনে করেন তবেই সেই মন্ত্রণা গ্রহণ করবেন (১২/৮৩/৫৩-৫৪)।

৮৫ নং অধ্যায়ে অবশ্য ৩৮ জন মন্ত্রী নিয়োগের কথা বলা হয়েছে। বর্তমানে কয়েকটি সম্প্রদায়ের আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা যেমন আইন সভায় করা হয় সেভাবেই রাজার মন্ত্রীসভায় বিভিন্ন বর্ণের আসন সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে। অবশ্য এই সংরক্ষণ জনসংখ্যার অনুপাতে কিনা সে সম্পর্কে কোনও কিছু বলা নেই। এই অধ্যায়ে বলা হয়েছে, বিদ্বান, চতুর, গৃহস্থ ও পবিত্র চারজন ব্রাহ্মণ, বলবান ও অস্ত্রধারণে সক্ষম আটজন ক্ষত্রিয়, ধনবান একুশ জন বৈশ্য এবং উপরোক্ত তিন বর্ণের সেবায় যুক্ত ও শিক্ষিত তিন জন শূদ্র, অনুরাগাদি অষ্টগুণযুক্ত একজন সূত ও একজন পৌরাণিক—এই ৩৮জন ব্যক্তিকে রাজা মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করবেন। এদের প্রত্যেকেরই বয়স পঞ্চাশ এর কম হওয়া চলবে না। এই ৩৮ জন মন্ত্রীর মধ্যে ৮জন উপস্থিত হ'লেই রাজা তাদের কাছে মন্ত্রণার প্রস্তাব করবেন। তারপর রাজা সেই মন্ত্রণার সিদ্ধান্ত রাজ্য মধ্যে প্রচার করবেন এবং প্রবীণ শাসনকর্তাদের জানিয়ে দেবেন (১২/৮৫/৭-১২)।

মন্ত্রীদের নিয়োগের পর তাদের কাজ ও গতিবিধির উপর নজর রাখা রাজার কর্তব্য। মন্ত্রীদের নিয়োগের পর রাজা বিশ্বস্ত, স্বদেশজাত, স্থির প্রকৃতির ও সবরকমের সুপরীক্ষিত কর্মচারীদের দ্বারা মন্ত্রীগণের দোষ ও গুণ সম্পর্কে খোঁজখবর নেবেন। যদি দেখা যায় কোনও মন্ত্রী অসৎ তাহলে তিনি তার ব্যবস্থা নেবেন। যদি রাজা দেখেন অনেক মন্ত্রীই অসৎ তাহলে সব মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে রাজা এক সঙ্গে কোনও ব্যবস্থা

নেবেন না, কারণ তাতে মন্ত্রীরা একযোগে বিদ্রোহী হয়ে উঠতে পারে। এক্ষেত্রে রাজা মন্ত্রীদের হাত থেকে ক্রমশ ক্ষমতা কেড়ে নেবেন এবং এক মন্ত্রীর সঙ্গে অন্য মন্ত্রীর বিরোধ ঘটিয়ে দুর্বল করবেন এবং তারপরে শাস্তি দেওয়াই রাজার উচিত (১২/৮২/৬০-৬৫)।

৩৪.৭.৩ কোষ

যে কোনও রাজনৈতিক ব্যবস্থাতেই কোষ, অর্থাৎ অর্থ, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শান্তিপর্বে ও রাষ্ট্রের কাজ পরিচালনা ও সমৃদ্ধির জন্য কোষের গুরুত্বকে স্বীকার করা হয়েছে। বলা হয়েছে, কোষ দ্বারাই ধর্মের বৃদ্ধি হয় ও রাজ্য পরিবর্দ্ধিত হয়। সুতরাং কোষ সংগ্রহ করে বিবেচনাপূর্বক ব্যয় করা রাজার প্রধান ধর্ম (১২/১৩৩/২)। এমনকি ধর্মের তুলনায় অর্থকে প্রধান বলা হয়েছে; কারণ, ধর্ম ও অর্থ উভয়েই প্রত্যক্ষ সুখ কিন্তু সংসার জগতে ধর্ম-অধর্মের ফল প্রত্যক্ষ করা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্ভবপর হয় না কিন্তু অর্থের ফল প্রত্যক্ষ ভাবে বোঝা যায় (১২/১৩৪/১-২)।

কোষ ও রাজনৈতিক ক্ষমতা---রাজনৈতিক ক্ষমতার সঙ্গে কোষের সম্পর্কও অত্যন্ত ঘনিষ্ট। ক্ষমতা না থাকলে অর্থ রক্ষা করা যায় না আবার অর্থ না থাকলে ক্ষমতার অস্তিত্বও বিপন্ন হয় (১২/১৩৩/৪)। ধর্ম, অর্থ, ক্ষমতার মধ্যে অর্থই প্রধান। ধর্ম ও ক্ষমতার মধ্যে ক্ষমতাই প্রধান; কারণ ক্ষমতা থেকেই ধর্ম উদ্ভূত হয়; অর্থাৎ ধর্ম ক্ষমতার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। যেমন, বলবান পুরুষ দুষ্কর্ম করলেও তা সৎকর্ম বলে বিবেচিত হয় (১২/১৩৪/৬,৮)। আবার, ক্ষমতার চেয়ে অর্থ বেশী ক্ষমতাশালী কারণ সম্পত্তি থাকলে ক্ষমতা আয়ত্বহয় এবং বল আয়ত্ব হ'লে উপযুক্ত মন্ত্রীগণকে পাওয়া যায়। যে রাজার নিকট ধনভাণ্ডার নেই সেই রাজাকে সাধারণ মানুষও অবহেলা করে; রাজার কাছে অল্প অর্থ নিয়ে সন্তুষ্ট হয় না এবং রাজার কাজ করতেও উৎসাহিত হয় না (১২/১৩৩/৬)। অর্থের-দ্বারা রাজার দোষ-ত্রুটিও ঢাকা পড়ে (১২/১৩৩/৭)। এক কথায়, যে রাজার অর্থ নেই, সেই রাজার মৃত্যুর মতই কষ্ট করে দিন কাটে। অতএব, রাজার অর্থ, সেনা ও মিত্রের সংখ্যা বাড়ানো কর্তব্য। অর্থদ্বারা ইহলোক, সত্য ও ধর্ম--সবকিছুই আয়ত্ব করা যায় (১২/১৩৩/৪৩)।

অর্থসংগ্রহের যৌক্তিকতা---রাজার অর্থের প্রয়োজন হ'লেও প্রজারা রাজাকে অর্থ দেবে কেন, অর্থাৎ অর্থ সংগ্রহের যৌক্তিকতা কি? এই প্রশ্নটি শান্তিপর্বে আলোচিত হয়েছে। বলা হয়েছে, রাজা যেহেতু প্রজাদের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করেন সেহেতু তিনি প্রজাদের কাছ থেকে কর সংগ্রহের অধিকারী। রাষ্ট্রের উদ্ভবের আলোচনাতেও দেখা যায়, প্রথমে মনু রাজ্যভার নিতে অস্বীকার করেন। কিন্তু মানুষেরা কর দিতে স্বীকার করলে তবেই মনু রাজ্যভার নিতে রাজী হন। বস্তুত, রাষ্ট্রের উদ্ভবের সঙ্গে করপ্রদানের ব্যাপারটি অত্যন্ত ঘনিষ্ট ভাবে যুক্ত। ৮৮নং অধ্যায়ে বলা হয়েছে, ধর্মার্থী রাজা সব সময়েই প্রজাদের মঙ্গল কামনায় তৎপর হয়ে দেশ, কাল, বুদ্ধি ও ক্ষমতা অনুসারে প্রজাদের প্রতিপালন ও মঙ্গলজনক কাজ করবেন। এই কাজগুলি করার জন্য যে অর্থের দরকার তা প্রজারা কর হিসেবে দেবে।

কোষ সংগ্রহের নীতি---অর্থ বা কোষ রাজার পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হ'লেও কোষ সংগ্রহের ব্যাপারে যথেষ্ট সাবধান হবেন এবং রাজার পক্ষে মধ্যপন্থা অবলম্বন করাই ভালো, কারণ, অতি

ধর্মপ্রাণ, নরম স্বভাবের রাজার পক্ষে কোষ সংগ্রহ করা যায় না; আবার অত্যন্ত লোভী ও হিংস্র রাজার পক্ষে কোষ সংগ্রহে প্রজা-অসন্তোষ তথা বিদ্রোহ দেখা দিতে পারে। ৮৭ নং অধ্যায়ে বলা হয়েছে, রাজা ও করদাতা উভয়েরই যাতে সুবিধা হয় সেরকম বিবেচনা করে করগ্রহণের নিয়ম রাজার ঠিক করা উচিত। ৮৮নং অধ্যায়ে করসংগ্রহের ব্যাপারে একটি উপমা দিয়ে বলা হয়েছে, ভ্রমর যেমন ফুলে আঘাত না করে তা থেকে মধু সংগ্রহ করে, মানুষ যেমন গরুর বাঁট থেকে বা বাছুরকে খুব কষ্ট না দিয়ে দুধ দোহন করে, জোঁক যেমন মানুষের গা থেকে আস্তে আস্তে রক্ত শোষণ করে এবং বাঘিনী যেমন তার বাচ্চাদের দাঁত দিয়ে ধরে একস্থান থেকে অন্যস্থানে নিয়ে যায় কিন্তু তাদের আঘাত করে না, রাজাও সেভাবে প্রজাদের অত্যাচার বা নিঃস্ব না করে কোমল উপায়ে কর গ্রহণ করবেন। রাজা প্রথমে কম পরিমাণ কর স্থির করে প্রজাদের উন্নতির দিকে নজর দেবেন এবং প্রজাদের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে করের পরিমাণ বাড়িয়ে যাবেন। উপমা দিয়ে বলা হয়েছে, যেভাবে বাছুরকে ক্রমশ বেশী বেশী ভার বইতে দেওয়া হয় সেভাবে রাজাও ক্রমশ বেশী বেশী কর চাপিয়ে প্রজাদের সহ্যসীমা বাড়াবেন। গোপালক যেমন প্রথমে আদর করে বাছুরের গলায় দড়ি পরায় সেরকমভাবে রাজাও নরমভাবে যত্ন নিয়ে প্রজাদের উপর কর ধার্য করবেন। একবার গলায় দড়ি পরাতে পারলে গরু যেমন আর দুর্দান্ত হবে না সেরকম একবার কর ধার্য করতে পারলে প্রজারাও আর দুর্দান্ত হবে না। তারপর রাজা উপযুক্ত উপায়ে সেই প্রজাদের কাছ থেকে নিয়মিত কর নিতে থাকবেন। অবশ্য, রাজাকে সতর্ক করে বলা হয়েছে, রাজা অস্থানে বা অসময়ে প্রজাদের উপর কর বসাবেন না। যথাকালে যথানিয়মে মিষ্টি কথা বলে প্রজাদের উপর করের বোঝা চাপাবেন।

কোষের উৎস---কোষবৃদ্ধির উপায় হিসেবে শান্তিপর্বে রাজাকে নিজরাজ্য ও পররাজ্য থেকে অর্থসংগ্রহের কথা বলা হয়েছে। যুদ্ধ জয়ের মাধ্যমে রাজা পররাজ্য থেকে কোষ সংগ্রহ করবেন। নিজ রাজ্য থেকে কোষ সংগ্রহের বড় উৎস হ'ল কর সংগ্রহ করা। কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্প থেকে রাজা কর সংগ্রহ করবেন। কৃষি-করই রাজার কোষ সংগ্রহের বড় উৎস। প্রজাদের উৎপাদিত ফসলের ছয় ভাগের এক ভাগ রাজা কর হিসেবে সংগ্রহ করবেন। কৃষি-কর ছাড়া রাজা বণিকদের কাছ থেকে ক্রয়-বিক্রয় কর, পণ্য আমদানি ও রপ্তানির উপর কর, জল ও স্থল পথকর এবং শিল্পজীবিদের উৎপাদন পরীক্ষা করে তাদের কাছ থেকে কর সংগ্রহ করবেন। ৬৯ নং অধ্যায়ে আবার বলা হয়েছে, সোনার খনি, নুন উৎপাদনের স্থান, খেয়া-ঘাট, বনের হাতি ধরার উপর রাজা কর স্থাপন করবেন। বৈশ্য বর্ণের মানুষ যেহেতু কৃষি ও বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত সেহেতু রাজা বৈশ্যদের উন্নতির জন্য ব্যবস্থা নেবেন।

কর গ্রহণ ছাড়াও রাজা অপরাধীব্যক্তিদের কাছ থেকে শাস্তিস্বরূপ অর্থ আদায় করবেন।

এছাড়া প্রাচীর নির্মাণ, সৈন্যদের ভরণপোষণ, যুদ্ধের ভয় দেখিয়ে রাজা অর্থসংগ্রহ করবেন। অবশ্য ব্রাহ্মণের কাছ থেকে কর সংগ্রহ করা রাজার উচিত নয়।

যখন দেশে দুর্ভিক্ষ, খরা প্রভৃতি আপৎকালীন অবস্থা দেখা দেয় তখন রাজা কর সংগ্রহের পরিবর্তে নিজ কোষে সংগৃহীত ধন ব্যয় করে রাজ্য রক্ষা করবেন। আবার রাজ্যের প্রজারাও রাজার কোনও আপৎকালে অতিরিক্ত কর দিয়ে রাজাকে রক্ষা করবেন।

কোষ সংগ্রহের প্রশাসনিক ব্যবস্থা—কর সংগ্রহের ব্যাপারে শান্তিপর্বে এক প্রশাসনিক স্তরবিন্যাসের

কথা বলা হয়েছে। রাজা প্রতিগ্রামে একজন করে অধিপতি (প্রধান) নিযুক্ত করবেন। এভাবে কাউকে দশটি গ্রামের, কাউকে কুড়িটি গ্রামের, কাউকে একশো গ্রামের এবং কাউকে একহাজার গ্রামের অধিপতি করবেন। এক গ্রামের অধিপতি দশগ্রামের অধিপতির কাছে, দশগ্রামের অধিপতি কুড়ি গ্রামের অধিপতির, কুড়ি গ্রামাধিপতি একশো গ্রামাধিপতির এবং একশো গ্রামাধিপতি এক হাজার গ্রামাধিপতির কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন এবং সকলেই অপেক্ষাকৃত উচ্চপদাধিকারী ব্যক্তির কাছে নিজ নিজ প্রজাদের দোষ প্রকাশ করবেন। গ্রামাধিপতি গ্রামের যাবতীয় উৎপাদিত দ্রব্যের উপর ন্যায্য অংশ বেতন রূপে ভোগ করবেন। এক গ্রামাধিপতি দশগ্রামাধিপতিকে, দশগ্রামাধিপতি কুড়ি গ্রামাধিপতিকে কর প্রদান করবেন এবং একাংশ নিজের বেতন হিসেবে নেবেন। শতগ্রামের অধিপতি এক বহুজনপূর্ণ গ্রামের উৎপন্ন দ্রব্যের অংশ বেতনরূপে ভোগ করবেন। হাজার গ্রামাধিপতি সেই রাজ্য মধ্যে শতগ্রামাধিপতির অধীন কোনও একটি শাখা নগরের উৎপন্ন দ্রব্যের অংশ বেতন হিসেবে পাবেন। এই সমস্ত কাজ পরিচালনা ও তদারকির ভার একজন মন্ত্রীর উপর অর্পণ করা হবে। মন্ত্রী দায়বদ্ধ থাকবেন রাজার কাছে।

৩৪.৭.৪ দণ্ড

কৌটিল্যের রাষ্ট্র সম্পর্কিত সপ্তাঙ্গ তত্ত্ব আলোচনা করতে গিয়ে আমরা সপ্তপ্রকৃতি বা উপাদানের মধ্যে দণ্ড নামে একটি উপাদান সম্পর্কে আলোচনা করেছি। প্রাচীন ভারতে দণ্ড শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হ'ত। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও দণ্ড শব্দটি দিয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতাকে যেমন বোঝানো হয়েছে, দণ্ড অর্থে বিচার ব্যবস্থা, শাস্তি ও সৈন্যকেও বোঝানো হয়েছে। দণ্ড শব্দটি যখন রাজ্যের প্রকৃতি হিসেবে (সপ্ত প্রকৃতি/উপাদানের মধ্যে একটি) উল্লেখ করা হয়েছে যেখানে দণ্ড শব্দটির অর্থ হল সৈন্য। মহাভারতের শান্তিপর্বে দণ্ড শব্দটি মূলত ব্যবহৃত হয়েছে রাজনৈতিক ক্ষমতা হিসেবে। যেমন ১২১ নং অধ্যায়ে দণ্ডের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এভাবে, 'এই জগতে যার দ্বারা সকলে বশবর্তী হয় তার নাম দণ্ড'। শান্তিপর্বে সৈন্যসম্পর্কিত আলোচনায় শূর (সৈন্য) শব্দটির ব্যবহার করা হয়েছে। শান্তিপর্বের সময় বর্ণভিত্তিক সমাজব্যবস্থা যেহেতু গড়ে উঠতে থাকে এবং সৈন্যরা মূলত ক্ষত্রিয় বর্ণেরই অন্তর্গত বা ক্ষত্রিয় নামে পরিচিত সেহেতু ক্ষত্রিয় হিসেবেও উল্লেখ করা হয়েছে। রাজ্যের প্রকৃতি হিসেবে (সপ্তপ্রকৃতির মধ্যে একটি) দণ্ড বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা সৈন্য শব্দটিই ব্যবহার করব।

শান্তিপর্বে সৈন্য সম্পর্কে বিভিন্ন অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। রাজার অত্যন্ত সহায়ক হ'ল সৈন্যবাহিনী। যে রাজার সৈন্যগণ সন্তুষ্ট, রাজার দ্বারা সান্ত্বনাপ্রাপ্ত ও শত্রুদিগকে প্রতারণা করতে সক্ষম সেই রাজার অল্প সৈন্য দিয়ে পৃথিবী জয় করা সম্ভবপর। ১০০ তম অধ্যায়ে আমরা সৈন্যদের এক স্তরবিন্যাসও লক্ষ্য করি। রাজা সৈন্যদের মধ্যে কিছু লোককে দশ সৈন্যের নায়ক, কিছু লোককে শতসৈন্যের নায়ক এবং কোনও প্রধান ও আলস্যহীন বীরকে এক হাজার সৈন্যের অধ্যক্ষ করবেন। এই অধ্যায়ে কিভাবে সৈন্যসজ্জা করতে হবে সে সম্পর্কে বলা হয়েছে। সৈন্যদের সামনে অভিজ্ঞ ও শক্তিশালী বাহিনী স্থাপন করার কথা ১৫নং শ্লোকে বলা হয়েছে। কিন্তু ৯৯ অধ্যায়ের ৯নং শ্লোকে প্রথমে গজারোহী যোদ্ধাদের, পরে রথী যোদ্ধাদের, রথী যোদ্ধাদের পিছনে অশ্বারোহী সৈন্য এবং তারপর বিভিন্ন অস্ত্রে সজ্জিত পদাতিক বাহিনী স্থাপনের কথা বলা হয়েছে। অস্ত্রের মধ্যে গরু, মোষ, অজগর এবং হাতির চামড়া দিয়ে তৈরী বর্ম, লোহা দিয়ে তৈরী শঙ্কু, কবচ,

খড়্গ, কুঠার, ফলক, ঢাল ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে।

অবশ্য, অস্ত্রের ব্যাপারে যোদ্ধাদের দেশ ও বংশের আচারের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যেমন গান্ধার, সিন্ধু ও সৌবীর দেশের যোদ্ধারা নখর ও প্রাসের দ্বারা যুদ্ধ করে থাকেন। এদেশের যোদ্ধারা অত্যন্ত বলবান এবং নির্ভীক। উশীনর দেশের যোদ্ধারা সব রকম অস্ত্রে পারদর্শী এবং বীর। পূর্ব দেশের যোদ্ধারা হাতিতে চেপে যুদ্ধ করতে এবং কপট যুদ্ধে অত্যন্ত অভিজ্ঞ। যবন, কাম্বোজ ও মথুরা দেশের লোকেরা মল্ল যুদ্ধে নিপুণ এবং দক্ষিণ দেশের লোকেরা তরবারি যুদ্ধে অভ্যস্ত।

১০১ নং অধ্যায়ে দেহের গড়ন অনুযায়ী সৈন্যদের দক্ষতা ও স্বভাবের কথা বলা হয়েছে। যেমন, যাদের দেহের গড়ন দৃঢ়, দেখতে সুন্দর, বুকের পাটা বিশাল এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও দৃঢ় সেই সব বীরগণ যুদ্ধের কথা শুনে উত্তেজিত ও আনন্দিত হন। ১৬ থেকে ২০ নং শ্লোকে যে সমস্ত যোদ্ধাদের কথা বলা হয়েছে সেই সমস্ত যোদ্ধাগণ বনজ বা বনভিত্তিক অন্ত্যজ জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলেই মনে হয়। যাদের চুল খাড়া, মুখ লম্বা ও মোটা, উঁচু কাঁধ, ঘাড় মোটা ও মাংসবহুল, দেখতে বিকট, মাথা গোলাকার এবং বিশাল যা অনেকটা বিড়ালের মুখের মত, যাদের কণ্ঠস্বরে কঠোরতা থাকে, অত্যন্ত ক্রোধী, গর্বিত, ভয়ঙ্কর ও ধর্মজ্ঞানহীন, যারা যুদ্ধে কখনও পিছু হটেনা এবং দেহের মায়া ত্যাগ করে যুদ্ধ করে সেই ধরনের যোদ্ধাদের যুদ্ধের সামনে রাখা উচিত এবং পুরস্কৃত করা উচিত; কারন এই ধরনের সৈন্যরা ধৈর্য্য সহকারে শত্রুদের আঘাত সহ্য করতে পারে এবং আঘাত দিতেও পারে। এই ধরনের সৈন্যরা ধর্ম-অধর্মের নীতি ভেঙে ফেলে। রাজার উপরেও মাঝে মাঝে ক্রুদ্ধ হয়ে পড়ে। সুতরাং, এই ধরনের সৈন্যদের সান্ত্বনাপূর্ণ বাক্যে সবসময় আয়ত্বে রাখা উচিত।

৩৪.৭.৫ মিত্র

শান্তিপর্বের বিভিন্ন অধ্যায়ে রাজাকে শত্রু ও মিত্রকে বাছাই করা এবং প্রয়োজনে অবিশ্বাস ও বিশ্বাস করার উপরে বিশেষ মনোযোগী হতে বলা হয়েছে। ভীষ্ম ও যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ও বিভিন্ন উপাখ্যানের মাধ্যমে রাজাকে এ বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। ৮০ নং অধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে ভীষ্মদের মিত্র কাকে বলে এবং মিত্র কতরকমের হয় সে সম্পর্কে উপদেশ দেন। রাজার বিপদে যিনি ভীত হন, রাজার উন্নতিতে যিনি ঈর্ষান্বিত হন না আবার অবনতিতে যিনি ব্যাকুল হয়ে পড়েন তিনিই রাজার মিত্র। ভীষ্মদেব রাজার চাররকমের মিত্রের কথা বলেন। (১) সহার্থ - অর্থাৎ, যার সঙ্গে রাজা চুক্তিতে আবদ্ধ হন; (২) ভজমান - যার সঙ্গে বংশানুক্রমিকভাবে মিত্রতার সম্পর্ক রয়েছে। (৩) সহজ - জ্ঞাতিগোত্রের ভাই। (৪) কৃত্রিম - অর্থাৎ, যার সঙ্গে ধনদান ইত্যাদির দ্বারা মিত্রতা গড়ে উঠেছে। এই চার রকমের বন্ধুর মধ্যে ভজমান ও সহজ এই দুই ধরনের মিত্রই শ্রেষ্ঠ। অপর দুই প্রকার (সহার্থ ও কৃত্রিম) মিত্র সম্পর্কে সবসময়েই আশঙ্কা করতে হয়। অবশ্য সবরকমের মিত্রের উপর আশঙ্কা করা উচিত, কারণ কার্যবশত মিত্র শত্রু হয়ে পড়ে আবার শত্রুও মিত্র হয়ে যায়। এছাড়াও ভীষ্মদেব আরোও এক ধরনের মিত্রের কথা বলেছেন। ধর্মাত্মা মানুষমাত্রই পঞ্চম সহায় বা মিত্র; কারণ ধর্মাত্মা মানুষ একজনের পক্ষপাতী হন না আবার অর্থের প্রলোভনে দু-পক্ষেরই কাছে মিত্রের ভান করেন না। যে পক্ষ ধর্ম অনুযায়ী চলেন সেই পক্ষের সহায় হন। আবার কোনও পক্ষেই ধর্ম না দেখলে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকেন।

মিত্র কাকে বলে এবং কতরকমের মিত্র হ'তে পারে সে সম্পর্কে বলা হ'লেও মিত্র সম্পর্কে কতক... সাধারণ নিয়মের কথা বলা হয়েছে ১৩৮ নং অধ্যায়ে। প্রথমত, শত্রু-মিত্র বাছাই করা সবসময় দেশ ও কালের উপর নির্ভর করে। কোনও কোনও সময় পরিস্থিতি অনুযায়ী শত্রুও মিত্র হয় আবার মিত্রও শত্রু হ'তে পারে। সুতরাং মিত্র বাছাই করতে গেলে দেশ, কাল, পরিস্থিতি বিবেচনা করা দরকার। দ্বিতীয়ত, স্বার্থই বন্ধুত্ব ও শত্রুতা সৃষ্টির প্রধান কারণ। চিরস্থায়ী বন্ধুত্ব ও চিরস্থায়ী শত্রুতা প্রায় দেখা যায় না। স্বার্থের কারণে শত্রুও বন্ধু হয় আবার বন্ধুও শত্রুতে পরিণত হয়। এ জগতে প্রতিটি ব্যক্তিই যেহেতু স্বার্থপর সেহেতু নিজের ভাই, বাবা, মা, পুত্র, স্বামী, স্ত্রী সম্পর্কও স্বার্থচালিত। কেউ দান করে, কেউ প্রিয়বাক্য প্রয়োগ করে এবং কেউ বা মন্ত্রপাঠ, হোম, জপ করে অন্যের প্রিয় হয়ে থাকে। তৃতীয়ত, এ জগতে প্রতিটি ব্যক্তিই আত্মরক্ষায় ব্যস্ত, সুতরাং, রাজার পক্ষেও আত্মরক্ষার সুযোগ সুবিধা শত্রু-মিত্র বাছাই করার মাপকাঠি হওয়া উচিত। যে রাজা মিত্রের প্রতি একান্ত বিশ্বাস ও শত্রুর প্রতি সব সময় অবিশ্বাস করে অথবা উভয়কেই শুধুমাত্র বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করে সেই রাজাকে স্থিরপ্রাজ্ঞ না বলে চঞ্চলবুদ্ধি সম্পন্ন বলাই ভাল। চতুর্থত, রাজার পক্ষে কাউকেই পুরোপুরি বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করা উচিত নয়; কিন্তু রাজা প্রত্যেকের কাছেই নিজের বিশ্বাস তৈরী করবে।

৩৪.৭.৬ দুর্গ

শান্তিপর্বের ৮৬তম অধ্যায়ে ৬ রকমের দুর্গের কথা বলা হয়েছে। যেমন, মরুদুর্গ, ভূমিদুর্গ, গিরিদুর্গ, মনুষ্যদুর্গ, মৃত্তিকাদুর্গ ও বনদুর্গ। এর মধ্যে যে দুর্গের বাইরে শক্ত প্রাচীর ও গভীর পরিখা থাকবে এবং দুর্গের ভিতরে ধান, অস্ত্র, হাতি, ঘোড়া ও রথ থাকবে, যে নগরে বিদ্বান শিল্পী, ধার্মিক ও সবরকম কাজে নিপুণ মানুষজন থাকবে সেই দুর্গে রাজা বসবাস করবেন। সেই নগরে বিভিন্ন ধরনের শস্যও মজুত থাকবে। নানারকম দ্রব্যাদির দোকান, সব রকম বিরোধ মীমাংসার জন্য আদালতও থাকবে। কোনওরকম উপদ্রব ও ভয় থাকবে না। ঘরগুলি হবে সুন্দর ও সাজানো; গান, বাজনা ও বেদধ্বনি চলতে থাকবে। বীর যোদ্ধা ও ধনীলোকের বসবাস থাকবে। মন্ত্রী প্রভৃতি রাজকর্মচারী ও সৈন্য রাজার অনুগত হয়ে বসবাস করবে।

রাজা যে দুর্গে বসবাস করবেন সেই দুর্গে কোষ, সৈন্য, মিত্র ও বাণিজ্য প্রভৃতির প্রসার ঘটাবেন। বিভিন্ন ধরনের দোষ, ব্যাধি প্রভৃতি নিবারণে যত্নবান হবেন। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র, দ্রব্যসামগ্রী, ধাতব ও খনিজ পদার্থ, খাদ্যশস্য, ভেষজ ঔষধ প্রভৃতির এক বিশাল তালিকা এই অধ্যায়ের ১২ থেকে ৩৫ নং শ্লোকে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া আচার্য, ঋত্বিক, পুরোহিত, মহাধনুর্ধর, রাজমিস্ত্রী, দৈবজ্ঞ, চিকিৎসক, যোদ্ধা, ব্যবসায়ী প্রভৃতি ব্যক্তির প্রতি রাজা বিশেষ যত্ন নিয়ে উপযুক্ত সব কাজে নিয়োগ করবেন। রাজা ধার্মিকদের সম্মান, অধার্মিকদের দমন ও সমস্ত বর্ণদের নিজ নিজ কাজে বিশেষ যত্ন নিয়ে নিযুক্ত করবেন।

যুদ্ধকালীন সময়ে বা যুদ্ধের প্রস্তুতিকালে রাজা দুর্গকে কীভাবে সাজাবেন তারও এক বিস্তৃত বিবরণ ৬৯নং অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে। যেমন, বলা হয়েছে দুর্গের পরিখাগুলি জল দিয়ে ভর্তি করবেন এবং সেই পরিখায় কুমীর, মকর, প্রভৃতি জলজন্তু ছেড়ে দেবেন এবং অসংখ্য শূল পুঁতে রাখবেন। যাতে আগুন না লাগে তার জন্য ঘরগুলি কাদা দিয়ে লেপে রাখবেন। রাত্রে, এমনকি দিনেও বাইরে আলো জ্বালানো নিষিদ্ধ ঘোষণা করবেন। তীর্থস্থান, সভাগৃহ ও প্রধান স্থানগুলিতে গুপ্তচরের ব্যবস্থা রাখবেন। অস্ত্র ও সৈন্যঘর লোকচক্ষুর আড়ালে রাখবেন। সবরকমের ঔষধপত্র, ভেষজ্ঞ চিকিৎসক, বিষ চিকিৎসক, ক্ষত চিকিৎসক ও

ভূত চিকিৎসক এই চার রকমের চিকিৎসককে দূর্গের মধ্যে বাস করাইবেন। দূর্গ সজ্জার এ বিবরণ দেখে মনে হয় প্রাচীন ভারতে নগরসভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল এবং শান্তিপর্বের রচয়িতা বাস্তব জ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয় দিয়েছেন এই দূর্গ সজ্জায়।

৩৪.৮ অন্য রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক

অন্য রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক পরিচালনার বিষয়টি শান্তিপর্বে আলাদাভাবে কোনও অধ্যায়ে আলোচিত না হ'লেও মিত্র-শত্রুর আলোচনায় সন্ধি স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা ও ধরন সম্পর্কিত আলোচনায় ও যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা, নীতিসমূহ, যুদ্ধকৌশল, দুর্বল ও বলবান রাজার পক্ষে যুদ্ধে কি করা উচিত---এই সব প্রশ্নের উত্তরে অন্য রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়টিও বিভিন্ন অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। সপ্তাঙ্গ সম্পর্কে আলোচনার সময় আমরা মিত্র-এর আলোচনায় রাজার মিত্র কে হবে এবং কতরকমের মিত্র হ'তে পারে সে সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এখন আমরা সন্ধি ও যুদ্ধ সম্পর্কে শান্তিপর্বের বক্তব্যগুলি আলোচনা করব।

৩৪.৮.১ সন্ধি

রাজা কার সঙ্গে মিত্রতার সম্পর্ক গড়ে তুলবেন সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সন্ধির বিষয়টিও আলোচিত হয়েছে। কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে এবং কার কার সঙ্গে রাজার পক্ষে সন্ধি করা উচিত সে সম্পর্কে শান্তিপর্বের [illegible], ১৩১, ১৩৮, ১৩৯ এবং ১৬৮ অধ্যায়গুলি বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমত, রাজা যখন নিজেকে অপেক্ষাকৃত দুর্বল বলে মনে করবেন তখন মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করে বলবান রাজার সঙ্গে সন্ধি স্থাপনই উচিত। অবশ্য বলবান রাজার সঙ্গে দুর্বল রাজার সন্ধি কখনও দীর্ঘস্থায়ী হয় না। সুতরাং, সুচতুর রাজা অপেক্ষাকৃত বলবান রাজার সঙ্গে সন্ধি করেও বলবান রাজাকে বিশ্বাস করবেন না। দ্বিতীয়ত, যার সঙ্গে সন্ধি করলে কিছু লাভের সম্ভাবনা থাকে তার সঙ্গেও সন্ধি করা রাজার উচিত। তৃতীয়ত, সন্ধি করতে ইচ্ছুক, গুণবান, উৎসাহসম্পন্ন ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করে ধর্ম অনুসারে রাজ্য রক্ষা করা রাজার কর্তব্য। চতুর্থত, প্রাণরক্ষার জন্য শত্রুদের সঙ্গেও সন্ধি করা উচিত। যে রাজা বিপক্ষদের সঙ্গে কখনও সন্ধি করতে রাজী হয় না সেই রাজা কখনই অর্থোপার্জন বা সুখ ভোগ করতে পারে না। আবার যে ব্যক্তি উপযুক্ত সময়ে মিত্রদের সঙ্গে বিরোধ এবং শত্রুদের সঙ্গে সন্ধি করে সেই রাজার বিপুল অর্থ ও মহৎ ফল লাভ হয়। পঞ্চমত, একবার কারও সঙ্গে শত্রুতামূলক সম্পর্ক গড়ে উঠলে পরে যদিও স্বার্থপূরনের জন্য পবস্পরের মধ্যে সন্ধি হয় তাহলেও পরস্পরকে বিশ্বাস করা উচিত নয়। কারণ পরস্পরকে প্রতারণা করাই তাদের উদ্দেশ্য। এক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান রাজা নিজের বুদ্ধিকৌশলে অন্যকে প্রতারণা করতে সমর্থ হয়। আর নির্বোধ রাজা নিজের অসাবধানতাবশত প্রতারিত হয়। এক্ষেত্রে ভীত হ'লেও নির্ভীকদের ন্যায় এবং অন্যের প্রতি অবিশ্বাস থাকলেও বিশ্বস্তের ন্যায় ব্যবহার করা উচিত। ষষ্ঠত, আক্রমণকারী শত্রু যদি পবিত্রচিত্ত হয় ও ধর্মানুসারে জয় লাভের বাসনা করে তাহলে তার সঙ্গে অবিলম্বে সন্ধি করে ধীরে ধীরে নিজের গ্রাম নগরাদি উদ্ধার করা রাজার কর্তব্য। সপ্তমত, শত্রু যদি মহাবল পরাক্রান্ত হয় ও অধর্মানুসারে জয়লাভের চেষ্টা করে তাহলে রাজা তাকে (শত্রুকে) কতকগুলি পরিত্যাগ করে বিপদ থেকে মুক্ত হবেন। কারণ, রাজা

যে কোনও প্রকারে হোক জীবিত থাকলে পুনরায় আগের ন্যায় সম্পত্তিশালী হ'তে পারবেন। যদি অন্ত:পুরিকাগণও শত্রুর হস্তাগত হয় তাহলেও তাদের প্রতি দয়া না করে আত্মরক্ষা করাই রাজার কর্তব্য। অথচ এই অধ্যায়ে'ই ১০ নং শ্লোকে বলা হয়েছে শত্রু ধার্মিক হ'লে তার সঙ্গে সন্ধিস্থাপনে কিন্তু অধার্মিক হ'লে তার প্রতি যুদ্ধ করাই রাজার কর্তব্য। রাজা যুদ্ধে নিহত হ'লে স্বর্গারোহন করে ইন্দ্রের সঙ্গে মিলিত হন, আর শত্রুকে পরাজিত করলে পৃথিবীর আধিপত্য লাভ করেন। ১৩ এবং ১৪নং শ্লোকে অবশ্য রাজাকে পরিস্থিতি অনুযায়ী কাজ করতে বলা হয়েছে। যুদ্ধ সময় উপস্থিত হ'লে যুদ্ধ পরিত্যাগের বাসনা করে বুদ্ধি কৌশলে শত্রুর বিশ্বাস উৎপাদন ও বিনয় উৎপাদন করে যুদ্ধ করাই রাজার উচিত। আর যখন স্বপক্ষের ক্রোধবশত শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ বা সন্ধি স্থাপন করতে নিতান্ত অসমর্থ হবেন তখন দুর্গ থেকে প্রথমে পলায়ন করে পরে ক্রমে ক্রমে সন্ধি দ্বারা নিজ সৈন্যদের ঐক্যবদ্ধ করে পুনরায় নিজরাজ্য অধিকার করবেন।

৩৪.৮.২ যুদ্ধ

শান্তিপর্বে যুদ্ধের তুলনায় সন্ধির উপরেই বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যুদ্ধ না করে শত্রুকে পরাজিত করাই রাজার কর্তব্য। কারণ, রাজা যুদ্ধের মাধ্যমে যে জয়লাভ করেন তা সাধুসমাজে জঘন্য বলে গণ্য হয়ে থাকে। রাজধর্ম তথা ক্ষাত্রধর্মকে একদিকে যেমন সবচেয়ে বড় ধর্ম বলা হয়েছে অপরদিকে ক্ষাত্রধর্মকে সবচেয়ে পাপজনক ধর্ম বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। কারণ, রাজার যুদ্ধের সঙ্গে বহুলোকের প্রাণ নষ্ট হয়। একারণে ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দেন— যে রাজা জয়ের আশায় যুদ্ধের সময় মানুষকে হত্যা করেন সেই রাজা জয়লাভের পরে প্রজাদের সবদিক থেকে উন্নতি করার চেষ্টা করবেন এবং দান, যজ্ঞ ও তপস্যার দ্বারা পাপ স্খালন করবেন।

যুদ্ধের সিদ্ধান্তের আগে বিবেচ্য বিষয়

যে কোনও রাজার পক্ষেই যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নেবার আগে কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করা দরকার। প্রথমত, যদি কোনও রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ় না থাকে তাহলে রাজার পক্ষে যুদ্ধে না গিয়ে নিজের যা সম্পদ আছে সেই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। কোনও রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ় কিনা তা বোঝা উপায় হ'ল সেই রাজ্যের জনপদ অত্যন্ত বিস্তীর্ণ ও সম্পদে পূর্ণ কিনা, প্রজাগণ সন্তুষ্ট, সম্পদশালী ও বশীভূত কিনা এবং মন্ত্রীগণের সংখ্যাও অসংখ্য ও অনুগত কিনা তার উপর। দ্বিতীয়ত, যুদ্ধে যাওয়ার আগে রাজা প্রথমে নিজের পঞ্চইন্দ্রিয়কে জয় করতে সক্ষম কিনা তা বিবেচনা করা উচিত। একমাত্র জিতেন্দ্রিয় রাজাই শত্রু জয় করতে পারেন। তৃতীয়ত, রাজা নিজের মন্ত্রী, পুত্র, মিত্র, সামন্ত রাজা, নগর ও জনপদবাসীদের আচার ব্যবহার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হবেন। কারণ এদের বিরোধীতা রাজাকে বিপদে ফেলতে পারে। অন্ধ, জড়, বধির প্রভৃতির মতো দেখতে যারা, ক্ষুধা, পিপাসা ও পরিশ্রমে সহনশীল এবং যাদের পরীক্ষা করে সত্যবাদিতা ইত্যাদি গুণসম্পন্ন বলে জানা গেছে এরকম বিচক্ষণ মানুষকে গুপ্তচর হিসেবে নিয়োগ করে রাজা নিজের মিত্র, পুত্র, মন্ত্রী ইত্যাদি লোকজন সম্পর্কে খোঁজখবর নেবেন। গুপ্তচররা যাতে একে অপরকে চিনতে না পারে তার ব্যবস্থাও করবেন। এমনকি, গুপ্তচররা কি করে তা দেখার জন্য বাজার-হাটে, লোকসমাজে ও ভিক্ষুকগণের কাছে অন্য লোক নিয়োগ কববেন। এভাবে রাজা দেশের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিকে জেনে নেবেন। চতুর্থত শুধুমাত্র

আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেই নয়, বৈদেশিক পরিস্থিতিও রাজা মূল্যায়ন করবেন। তিনি গুপ্তচরের মাধ্যমে উদাসীন (নিরপেক্ষ) শত্রু ও মিত্র রাজার ব্যবহার পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবেন যুদ্ধে যাওয়া সঙ্গত কিনা।

যুদ্ধ সম্পর্কিত নীতিসমূহ ঃ

যুদ্ধে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেও প্রত্যেক রাজার যুদ্ধের কয়েকটি নীতি মেনে চলা উচিত। ৯৫ এবং ৯৬ নং অধ্যায়ে যুদ্ধের কয়েকটি নিয়মনীতির উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমত, রাজার পক্ষে ধর্মযুদ্ধই একমাত্র পথ। অধর্মের দ্বারা জয়লাভে রাজা কখনও সম্মান পান না। এধরনের জয়লাভ অকিঞ্চিৎকর ও নিন্দনীয়। অবশ্য ৯৫ নং অধ্যায়ে বলা হয়েছে, বিপক্ষ যদি যুদ্ধে শঠতা অবলম্বন করে তাহলে রাজাও শঠতার আশ্রয় নেবেন। আবার এই অধ্যায়েরই কয়েকটি শ্লোকের পর বলা হয়েছে পাপাত্মারাই অধর্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে থাকে। সাধুগণ সৎপথ অবলম্বন করেই অসাধুকে জয় করেন। অধর্মযুদ্ধে জয়লাভ অপেক্ষা ধর্মযুদ্ধে প্রাণত্যাগ শ্রেয়। দ্বিতীয়ত, কোনও সৈন্য যুদ্ধে নিরস্ত্র হ'লে তাকে পরিত্যাগ করাই ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য। দুর্বল, সন্তানহীন, অস্ত্রহীন, বিপন্ন ও ক্ষতযুক্ত ক্ষত্রিয়কে বধ না করাই কর্তব্য। যদি কোনও সৈনিক যুদ্ধে আহত হয় তাহলে হয় সেই সৈনিককে তার বাড়িতে পাঠানোর ব্যবস্থা করা নতুবা নিজের বাড়িতে নিয়ে এসে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত। তৃতীয়ত, বিপন্ন, ভীত বা আত্মসমর্পণকারী সৈনিকের উপর অস্ত্র নিক্ষেপ করা উচিত নয়। চতুর্থত, বিষযুক্ত বা কুটিল (গোপনে প্রয়োগ যোগ্য) বাণ নিয়ে যুদ্ধ করা অন্যায়। পঞ্চমত, বর্ণহীন, অস্ত্রত্যাগী ও শরণাগত ব্যক্তিকে হত্যা করা রাজার অনুচিত কাজ। পঞ্চমত, নিদ্রিত, পিপাসিত, পরিশ্রান্ত অথবা দিগ্‌ভ্রান্ত সৈনিকের উপর আঘাত করা অনুচিত। ষষ্ঠত, অস্ত্র ও কবচ ত্যাগ করার পর, যুদ্ধস্থানে যাবার সময়, পান ও ভোজনের সময়, অন্য কাজে নিযুক্ত, লেখার কাজে ব্যপৃত, রোগাক্রান্ত, যারা একজনের বস্তু অপরের কাছে নিয়ে যাওয়ায় ব্যস্ত এমন ব্যক্তিকেও আঘাত করা নিষিদ্ধ। সপ্তমত, রাজদ্বারের প্রহরী অথবা মন্ত্রীদের প্রহরীদেরও বধ করা অন্যায়। অষ্টমত, যুদ্ধে বৃদ্ধ, বালক, ও নারীদের উপর অস্ত্রপ্রয়োগ অনুচিত। পলায়মান যোদ্ধার পিছনেও আঘাত কবা অন্যায়। নবমত, রাজা ছাড়া অপর কোনও ব্যক্তির পক্ষে রাজার সঙ্গে যুদ্ধে এগিয়ে যাওয়া উচিত নয়। দশমত, রাজার সৈন্য কর্তৃক পরাজিত কোনও শত্রুসৈন্যের সঙ্গে রাজা যুদ্ধ করবেন না। পরিবর্তে সেই ব্যক্তিকে নিজের ঘরে নিয়ে এসে একবছর ধরে দাসত্ব স্বীকার করার জন্য উপদেশ দেবেন। যদি এক বছরের মধ্যে সেই ব্যক্তি দাসত্ব স্বীকার না করে তাহলে সেই ব্যক্তিকে একবছর পর মুক্তি দেওয়াই রাজার উচিত। একাদশ, রাজা যদি ক্ষমতাবলে শত্রুর কন্যাকে নিজ ঘরে নিয়ে আসেন তাহলে সেই কন্যাকে স্ত্রী করার জন্য এক বছর ধরে উপদেশ দেবেন। একবছরের পর সেই নারী যদি স্ত্রী হ'তে রাজী না থাকে বা অপর কোনও ব্যক্তিকে বিবাহ করতে মনস্থ করে তাহলে রাজা সেই নারীকে মুক্তি দেবেন। দ্বাদশ, যুদ্ধে প্রাপ্ত অন্যান্য দাসদাসীদের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযুক্ত হবে। ত্রয়োদশ, যুদ্ধে যে সমস্ত গাভী লাভ হবে সেই সমস্ত গাভীর দুধ রাজা স্বয়ং ব্যবহার না করে ব্রাহ্মণগণকে দেবেন এবং বলদকে চাষের কাজে লাগাবেন। চতুর্দশ, দুই পক্ষই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'লে উভয়পক্ষের মাঝে যদি শান্তিস্থাপনের জন্য কোনও ব্রাহ্মণ হাজির হয় তাহলে সেই মুহূর্তেই দু'পক্ষ যুদ্ধ বন্ধ করবেন।

যুদ্ধযাত্রার সময়, কৌশল ইত্যাদি ঃ

যুদ্ধের নিয়মনীতিসমূহের উল্লেখ ছাড়াও যুদ্ধযাত্রার সময়, কৌশল প্রভৃতি খুঁটিনাটি বিষয়ও স্থান পেয়েছে শান্তিপর্বে। যদি অস্ত্র প্রস্তুত থাকে এবং যোদ্ধারাও শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত থাকে তাহলে

চৈত্র ও অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমায় যুদ্ধ করাই প্রকৃত সময়। কারণ এ সময়ে পৃথিবী পাকা ফসলে পূর্ণ থাকে ও মাটিতেও জল থাকে। তাছাড়া এ সময় খুব শীত ও থাকে না এবং গরম ও থাকে না। এরকম সময় ছাড়াও রাজা যদি দেখেন শত্রুপক্ষ কোনও সংকটে পড়েছে তাহলে সেই সময়ও যুদ্ধের পক্ষে অনুকূল সময়। যেদিকে বাতাস, সূর্য ও শুক্রগ্রহ থাকে সেদিকে পিছন করে যুদ্ধ করলে জয়লাভ হয়। এই তিনটি বিষয় যদি আলাদা আলাদা দিকে থাকে তাহলে এদের মধ্যে আগের আগের বিষয়ই শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ বাতাসকে পিছনে রেখে অবশিষ্ট দু'টিকে সামনে রেখেও যুদ্ধ করা যেতে পারে।

যে জমিতে কাদা, জল, বাঁধ ও মাটির টিলা নেই সেখানে অশ্বারোহী সৈন্যই উপযুক্ত, যেখানে কাদা বা গর্ত নেই সেরকম জমিতে রথারোহী সৈন্যই উপযুক্ত। আর যে জমিতে বহু ছোট গাছ, জলাশয় বা বাড়ি রয়েছে সেটি গজারোহী যোদ্ধাদের পক্ষে অনুকূল এবং যে জমি অত্যন্ত দুর্গম, বাঁশ ও বেতবনে ভর্তি, পর্বত ও উপবন সংযুক্ত সেরকম স্থানে পদাতিক বাহিনী উপযুক্ত। ঋতুবিচারে বর্ষাকালে পদাতিক এবং গজবাহিনী উপযুক্ত; অন্যান্য সময়ে পদাতিক ও অশ্ববাহিনী শ্রেষ্ঠ। রাজার সৈন্যবাহিনীতে যদি পদাতিক সৈন্যসংখ্যা বেশী থাকে তাহলে সেই বাহিনী দৃঢ়। যে বাহিনীতে রথ ও অশ্বের সংখ্যা বেশী সেই বাহিনী বর্ষা ছাড়া অন্য সময়ের জন্য উত্তম বলে বিবেচনা করা উচিত। এ সমস্ত বিষয় বিবেচনা করে দেশ ও কাল অনুযায়ী রাজা যুদ্ধে অগ্রসর হবেন।

যুদ্ধযাত্রার জন্য সেই পথই অনুসরণ করা উচিত যা সমতল ও সুগম এবং যেখানে জল ও তৃণাদি সহজে পাওয়া যায়। বনে যাতায়াতে যেহেতু পথ ভুল হবার সম্ভাবনা থাকে সেহেতু বনবাসী গুপ্তচরদের কাছ থেকে পথের বিবরণ জেনে নেওয়া উচিত। সৈন্যদের সামনের দিকে অভিজ্ঞ ও শক্তিশালী পদাতিক সৈন্য স্থাপন করা প্রয়োজন। শত্রুদের কাছ থেকে আত্মরক্ষার জন্য সৈন্যদের শিবির এমন হওয়া উচিৎ যেখানে পৌঁছানো কঠিন, যার চারদিকে জলের পরিখা রয়েছে, আকাশচুম্বী প্রাসাদ রয়েছে এবং শত্রুদের আক্রমণ প্রতিরোধ করার ব্যবস্থা রয়েছে। সৈন্য-শিবির স্থাপনের জন্য অনাবৃত স্থানের চেয়ে বহুগুণবিশিষ্ট বনের কাছাকাছি স্থানই উপযুক্ত, কারণ সেখানে ব্যূহ রচনা করার জন্য রথ ও বাহন থেকে নামা সৈন্যদের গোপন রাখা যেমন সহজ অপরদিকে শত্রুদের আঘাতের প্রত্যাঘাত করা এবং প্রয়োজনে লুকিয়ে পড়ার সুবিধা থাকে। এভাবে হাতি, ঘোড়া, রথ ও পদাতিক বাহিনী একত্রিত করার পরেও রাজা যুদ্ধের পরিবর্তে সন্ধি করার চেষ্টা করবেন। যদি সন্ধির প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় তাহলে ভেদনীতি দ্বারা শত্রুরাজ্যে বিভেদ সৃষ্টি করবেন। এতে ব্যর্থ হ'লে দাননীতি প্রয়োগ করা উচিত। এভাবে সাম (সন্ধি) ভেদ ও দাননীতি ব্যর্থ হ'লেই সব শেষে রাজা যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নেবেন এবং যুদ্ধ সেভাবেই করা উচিত যাতে শত্রুপক্ষ সবদিক থেকে সংকটে পড়ে।

যুদ্ধের ব্যাপারে দুর্বল রাজার করণীয় বিষয় ঃ

যুদ্ধের ব্যাপারে সবল রাজা ও দুর্বল রাজার করণীয় বিষয়ও ভিন্ন হওয়া উচিৎ বলে শান্তিপর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। দুর্বল রাজার উচিৎ হ'ল দম্ভ, কাম, ক্রোধ, হর্ষ ও ভয় ত্যাগ করে নতজানু হয়ে শত্রুর তথা বলবান রাজার অধীনতা স্বীকার করে বিশ্বাস উৎপাদনে রত হওয়া। এভাবে বলশালী রাজার বিশ্বস্ত হয়ে মিত্রদের সৈন্যগণকে লাভ করে উত্তম মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করে যোগ্যব্যক্তিদের দ্বারা শত্রুরাজ্যে বিভেদ সৃষ্টি করবেন এবং শত্রু-দ্বারাই শত্রুকে ধ্বংস করবেন। যে সমস্ত জিনিষ দুষ্প্রাপ্য যেমন নারী, পোষাক,

পালঙ্ক, আসন, বাহন, মূল্যবান বাড়ি, পশু, প্রভৃতি দিয়ে শত্রুকে আসক্ত করবেন যাতে সেই শত্রু ক্রমশ অলস হয়ে পড়ে। যে সমস্ত কাজ অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য ও কষ্টকর সেই সমস্ত কাজ করতে পরামর্শ দেওয়া, ভোগবিলাস, উপকরণ বাড়িয়ে যাওয়ার জন্য প্রজাকে অনুপ্রাণিত করা প্রভৃতি কাজের মাধ্যমে শত্রুরাজার রাজকোষকে শূন্য করে দেওয়া প্রভৃতি পথগুলি দুর্বল রাজার অনুসরণ করা উচিত। এভাবে বলশালী রাজাকে ক্রমশ অলস, অর্থশূন্য, আসক্ত করে ধ্বংস করাই দুর্বল রাজার কর্তব্য।

যুদ্ধের ব্যাপারে বলবান রাজার করণীয় বিষয় ঃ

বলবান রাজার পক্ষেও করণীয় কয়েকটি কাজের উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, বলবান রাজাও প্রথমে যুদ্ধে না গিয়ে সন্ধির মাধ্যমে জয়লাভে চেষ্টা করবেন। বলবান রাজা অন্য রাজ্যে প্রবেশ করে সেখানের প্রজাদিগকে কর দানের বিনিময়ে ভালোভাবে রক্ষণাবেক্ষণের প্রতিশ্রুতি দেবেন। প্রজাগণ যদি এতে সম্মত হয় তাহলে কোনও রকম বিরোধ না করেই তিনি সেই রাজ্য লাভ করবেন। যদি প্রজারা এতে সম্মত না হয় তাহলে যুদ্ধের মাধ্যমে রাজা প্রজাদের বশীভূত করবেন।

যুদ্ধ জয়ের পর বিজেতা রাজার করণীয় বিষয় ঃ

যুদ্ধ জয়ের পর বলবান রাজা শত্রুকে ক্ষমা করবেন। কারণ, এতে শত্রুরা ক্রমশ তাকে বিশ্বাস করতে থাকে। রাজা যদি ক্ষমা না করে উগ্র স্বভাবই বজায় রাখেন তাহলে তিনি সকলের বিদ্বেষের পাত্র হয়ে থাকেন; আবার তিনি যদি অত্যন্ত নরম স্বভাবের হন তাহলে সবার অবজ্ঞার পাত্র হয়ে পড়েন। সুতরাং, রাজাকে প্রয়োজনবোধে উগ্রতা ও কোমলতা—এই দুই স্বভাবকেই অবলম্বন করতে হবে। ইউরোপের রাজনীতিচর্চার ক্ষেত্রেও পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের এক তাত্ত্বিক ম্যাকিয়াভেলি রাজাকে সিংহ (বলশালী)-শৃগালের (ধূর্ত) মিশ্রণ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'প্রিন্স'-এ ম্যাকিয়াভেলি রাজাকে ক্ষমতায় টিকে থাকার ও নিজের কর্তৃত্বের বৈধতা প্রতিষ্ঠার জন্য যে সব সুপারিশ করেছেন, তার সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রেই অর্থশাস্ত্র ও শান্তিপর্বে উল্লেখিত বক্তব্যের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

যুদ্ধ যেহেতু বহু মানুষের মৃত্যুর কারণ, সেহেতু রাজা দেশবাসীদের প্রতি মধুর বাক্য প্রয়োগ করবেন। যদিও ৪১নং শ্লোকে (অধ্যায় ১০২) রাজাকে বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য ছলকপটতার আশ্রয় না নিতে বলা হয়েছে, তবুও ৩৫-৩৭ নং শ্লোকে প্রজাদের কাছে বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য মিথ্যা কথা বলাকেও অনুমোদন করা হয়েছে। প্রজাদের কাছে বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য রাজা বলবেন—"এই যুদ্ধে আমার সৈন্যরা যে এত বীরকে হত্যা করেছে তা আমার আদৌ প্রিয় নয় কিন্তু আমি কি করব? আমি বারবার নিষেধ করলেও তারা আমার কথা শোনেনি"। শত্রুপক্ষের কাছে এভাবে দুঃখ প্রকাশ করার পর রাজা অন্যস্থানে, অর্থাৎ নিজদেশে সেই বীর যোদ্ধাদের প্রশংসা করবেন যারা শত্রুপক্ষের প্রধান বীরদের হত্যা করেছে। বস্তুত, জনমতকে নিজের অনুকূলে আনার জন্য যুদ্ধে যার ক্ষতি হয়েছে (অর্থাৎ, বিজিত শত্রু) সহানুভূতি এবং নিজরাজ্যে বীরত্ব প্রকাশ করবেন। এভাবে রাজা সকলের কাছে বিশ্বাসের পাত্র হয়ে উঠবেন এবং এর ফলে গোটা রাজ্যকে ভালোভাবে ভোগ করতে সক্ষম হবেন। সামরিকবাহিনী বা ক্ষমতা প্রয়োগ করে দেশকে যে বেশীদিন শাসনে রাখা যায় না সে সম্পর্কে শান্তিপর্বের বক্তব্য অত্যন্ত পরিষ্কার এবং এ কারণেই রাজাকে জনমত অনুকূলে আনার জন্য বিশেষভাবে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

৩৪.৯ সারাংশ

এই এককটিতে মহাভারতের শান্তিপর্বের আলোচিত রাজতন্ত্রের প্রকৃতি, রাষ্ট্রের উদ্ভব, রাজাকে মান্য করার কারণ, আন্তঃরাজ্য সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়গুলি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে বর্তমান রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানে শান্তিপর্বের প্রাসঙ্গিকতার বিষয়টি।

৩৪.১০ অনুশীলনী

রচনাত্মক প্রশ্ন

(১) রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে শান্তিপর্বের বক্তব্য উল্লেখ করুন।

(২) শান্তিপর্বে বর্ণিত রাজধর্মের বিষয়টি আলোচনা করুন।

(৩) শান্তিপর্ব অনুসরণে দণ্ডনীতিশাস্ত্রের সংজ্ঞা ও বিষয়বস্তু সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

(৪) শান্তিপর্বে উল্লেখিত যুদ্ধের নিয়মাবলি কী কী?

(৫) শান্তিপর্বে বিদ্রোহকে যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে সে সম্পর্কে আপনার মতামত ব্যক্ত করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন

(১) রাজাকে মেনে চলার কারণগুলি কী কী?

(২) রাজার কর্তব্যগুলি কী কী?

(৩) গণরাজ্য সম্পর্কে শান্তিপর্বের বক্তব্য উল্লেখ করুন।

(৪) শান্তিপর্ব অনুযায়ী মিত্র কয় প্রকার?

(৫) যুদ্ধ জয়ের পর বিজেতা রাজার করণীয় বিষয় কী?

৩৪.১১ গ্রন্থপঞ্জী

কালীপ্রসন্ন সিংহ (অনূদিত) ঃ মহাভারত-শান্তিপর্ব

বুদ্ধদেব বসু (১৯৭৪) ঃ মহাভারতের কথা, কলিকাতা এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্যতীর্থ (অনূদিত) (বঙ্গাব্দ ১৩৮১) ঃ মহাভারতে শান্তিপর্ব, কলিকাতা আর্যশাস্ত্র।

সুকুমারী ভট্টাচার্য (বঙ্গাব্দ ১৩৯৪) ঃ মহাভারতের সমাজ, শান্তিনেকেতন, শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী গবেষণা প্রকাশন সমিতি।

একক ৩৫ □ ইসলামীয় রাষ্ট্রতত্ত্ব ও মুসলমান আমলের ভারতে রাজনৈতিক চিন্তা

গঠন

৩৫.০ উদ্দেশ্য
৩৫.১ প্রস্তাবনা
৩৫.২ ইসলাম-পূর্ব আরবের রাজনৈতিক ব্যবস্থা
৩৫.৩ হজরত মুহম্মদ ঃ ইসলামীয় রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন
৩৫.৪ ইসলামীয় রাষ্ট্রের বিকাশ ঃ খলিফাতন্ত্রের উদ্ভব
৩৫.৫ ইসলামীয় রাষ্ট্রের সম্প্রসারণ ঃ প্রকৃতিগত পরিবর্তন
৩৫.৬ ইসলামীয় দার্শনিকদের রচনায় রাষ্ট্র
৩৫.৭ ভারতবর্ষ ও ইসলাম
৩৫.৭.১ সুলতানী শাসনপর্বে রাষ্ট্র
৩৫.৭.২ ইসলামীয় রাষ্ট্র-দার্শনিকদের আলোচনায় রাষ্ট্র ঃ সুলতানীপর্ব
৩৫.৭.৩ মুঘল শাসনপর্বে রাষ্ট্র
৩৫.৭.৪ মুঘল শাসিত ভারতে চরমরাজতন্ত্র গড়ে ওঠার কারণসমূহ
৩৫.৭.৫ ইসলামীয় রাষ্ট্র-দার্শনিকদের আলোচনায় রাষ্ট্র ঃ মুঘলপর্ব
৩৫.৮ ইসলামীয় রাষ্ট্রতত্ত্বে শাসকের কার্যাবলী
৩৫.৯ সারাংশ
৩৫.১০ অনুশীলনী
৩৫.১১ গ্রন্থপঞ্জী

৩৫.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি আলোচনার উদ্দেশ্য হ'ল ইসলামীয় চিন্তায় রাষ্ট্রের ধারণাটি ব্যাখ্যা করা। এই এককটি আলোচনার মাধ্যমে আমরা যে বিষয়গুলি জানতে পারব তা হ'ল —

- ইসলামের উদ্ভবের আগে আরবের রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রকৃতি।
- হজরত মুহম্মদের সময়ে রাজনৈতিক ব্যবস্থার রূপান্তর। ইসলামীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থার গোড়াপত্তনের-ইতিহাস।

- হজরত মুহম্মদের মৃত্যুর পর ইসলামের বিকাশ ও সম্প্রসারণ পর্ব এবং এই পর্বে রাজনীতি সম্পর্কে ইসলামীয় দার্শনিকদের মতামত।
- ভারতে ইসলামের আগমন - সুলতানীপর্বের রাষ্ট্রব্যবস্থা ও রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্কে সে সময়কার দার্শনিকদের চিন্তাভাবনা।
- মুঘলপর্বে রাষ্ট্রকাঠামোর প্রকৃতি — এ সময়ের রাষ্ট্র দার্শনিকগণ কিভাবে রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রশাসকের ভূমিকাকে ব্যাখ্যা করেছেন।
- ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির বিষয়টিও আমাদের আলোচনায় থাকবে। এই বিষয়টির আলোচনা আজকের যুগেও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। মধ্যযুগের ভারতের রাজনৈতিক ভাবনা ও রাষ্ট্রপ্রকৃতি থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা এ বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন হতে পারব।

৩৫.১ প্রস্তাবনা

আমাদের দেশ এক বহুজাতিক দেশ হিসেবে খ্যাত। অতি প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ভারতে এসেছে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজনে। কখনও বা এই প্রয়োজনের তাগিদে বহিরাগত গোষ্ঠীগুলি রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে এদেশে স্থায়ী বাসিন্দা হয়েছে। সুদূর অতীতে আর্যরা এসেছে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পেরিয়ে - গড়ে তুলেছে এদেশের মানুষের সঙ্গে সম্পর্কের ঘাতপ্রতিঘাতে বৈদিক সংস্কৃতি। এভাবেই এসেছে আরবগণ ইসলামের উদ্ভবের আগেই দক্ষিণভারতে বাণিজ্যিক কারণে, পরে দখল করেছে রাজনৈতিক ক্ষমতা। ইতিমধ্যে সপ্তম শতকে আরবে হজরত মুহম্মদের মাধ্যমে ইসলামের উদ্ভব ঘটেছে। আরবের বিভিন্ন কৌম গোষ্ঠীগুলি হজরত মুহম্মদের নেতৃত্বে গড়ে তুলেছে 'উম্মা' বা সমভাতৃত্বের আদর্শে বিশ্বাসী এক সম্প্রদায়। কয়েক শতকের মধ্যেই ইসলাম পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তেও ছড়িয়ে পড়ে। পারস্য, তুরস্ক, ইরাণ পেরিয়ে ভারতের মাটিতে ইসলাম যখন পৌঁছায় তখন সে এক রূপান্তরিত ইসলামীয় রাষ্ট্রদর্শন। এয়োদশ শতকে দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় সুলতানীপর্বের (খ্রীঃ ১২০৬-১৫২৬) ইসলামী রাষ্ট্রদর্শন মুঘলপর্বের (খ্রীঃ ১৫২৬ - ১৭৫৭ - ১৮৫৮) রাজনৈতিক স্থায়িত্বে পুনরায় রূপান্তরিত হ'তে থাকে।

এই এককে আমরা ইসলামীয় রাষ্ট্রতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করব। ইসলামীয় রাষ্ট্রভাবনায় এই পরিবর্তনকে চিহ্নিত করতে গিয়ে আমরা প্রথমে ইসলামের উদ্ভবের পূর্বের আরবের রাজনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করব। হজরত মুহম্মদের সময়ে ইসলামীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার গোড়াপত্তন হয়। এ সময়ে আরবের প্রধানত ভ্রাম্যমান পশুপালক কৌম গোষ্ঠীগুলিকে এক সমবিশ্বাসী সম্প্রদায় এবং ক্রমশ একটি রাজনৈতিক জনগোষ্ঠীতে পরিণত করার অন্যতম কৃতিত্ব হ'ল হজরত মুহম্মদের। হজরত মুহম্মদের মৃত্যুর পর প্রথম চার খলিফার সময় (খুলাফায়ে রাশেদূন এর যুগে) ইসলামীয় রাষ্ট্রের ও রাষ্ট্র ধারণার বিকাশ ঘটে। পরবর্তী তিন-চার শতকের মধ্যে ইসলামীয় রাষ্ট্রের সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রদর্শনেরও পরিবর্তন ঘটতে থাকে। খলিফাতন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশ, রাজতন্ত্রের উদ্ভব এই পরিবর্তনেরই ফলশ্রুতি। আমাদের আলোচনায় তাই এই বিষয়গুলির উপর আলোচনা আবশ্যিক হয়ে পড়ে।

৩৫.২ ইসলাম-পূর্ব আরবের রাজনৈতিক ব্যবস্থা

আজ থেকে প্রায় সাড়ে চৌদ্দশ বছর আগে ইসলাম প্রচারক হজরত মুহম্মদ এর জন্মের (খ্রীঃ ৫৭০ ২৯শে আগষ্ট - ১২ রবিউন আউওল, মতান্তরে ৯ রবিউল আউওল) প্রাক্কালে আরবের রাজনৈতিক জীবন ছিল অত্যন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ। সে সময় দক্ষিণ আরব ছিল কৃষি, অর্থনীতি ও বর্হিবানিজ্যে সমৃদ্ধ, অনেকগুলি ছোট ছোট রাজ্যও গড়ে ওঠে দক্ষিণ আরবে। যেমন সায়েবীগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'সাবা' মিসীরগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মা আন বা মা'ঈন, কাতাবান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কাতাবান রাজ্য এবং তার পাশেই হাযরামাউত রাজ্য, হিমায়ের বংশের ইয়েমেন রাজ্য। উত্তর ও মধ্য আরবেও অনেকগুলি রাজ্য গড়ে ওঠে, যেমন, জেরুজালেমের নেগেভ অঞ্চলের নেবিয়াতান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পেট্রারাজ্য, সিরিয়ার মরু অঞ্চলে পালমিরা রাজ্য, পারস্য সীমান্তে হিরা রাজ্য, সিরিয়ার সীমান্তে গাসমান রাজ্য, মধ্য আরবে কিন্দা রাজ্য।

সে সময় আরবে এই রাজ্যগুলি গড়ে উঠলেও আধুনিক অর্থে এগুলিকে রাজ্য বলা চলে কিনা সে সম্পর্কে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। কারণ, আধুনিক অর্থে রাষ্ট্র বলতে যা বোঝায় তার অনেক কিছুই ছিল এই রাজ্যগুলিতে অনুপস্থিত। বরঞ্চ এগুলিকে বলা চলে কৌমরাজ্য, যা আধুনিক অর্থে রাজ্যগঠনের আগের অবস্থা। সে সময় আরব ছিল বিভিন্ন কৌম গোষ্ঠীতে বিভক্ত। পৃথিবীর অন্য প্রান্তের কৌমগোষ্ঠীর মতো আরবের কৌমগোষ্ঠীগুলিও ছিল গোত্রভিত্তিক যা রক্তের বন্ধন, ভাষা ও কৌম প্রতীক হিসেবে কোনও দেবদেবীর পূজার্চনার (সে সময় কাবা গৃহের মূর্তি ছিল ৩৬০) দ্বারা আবদ্ধ থাকত। এমনকি কোনও ব্যক্তির পরিচয়ও নির্ধারিত হ'ত সেই ব্যক্তি কোন্ কৌমগোষ্ঠীর অন্তর্গত তার দ্বারা। এ কারণে নিজ কৌমগোষ্ঠীর প্রাধান্য, মর্যাদা শ্রেষ্ঠত্ব প্রভৃতি সম্পর্কে সবাই ছিল খুব সজাগ। রক্তের সম্পর্ক ছাড়াও কোনও গোত্রের সদস্যপদ লাভ করা যেত কোনও সম্পর্ক পাতিয়ে। এছাড়া, কোনও পরিবারের মুক্তিপ্রাপ্ত দাস সেই পরিবারের অধীনে ঐ গোত্রেই বাস করতে পারত। যুদ্ধবন্দীদের, বিশেষ করে নারীদের, বিবাহ করে গোত্রের অন্তর্ভূক্ত করার বিষয়টিও ছিল স্বাভাবিক।

অধিকাংশ কৌমগোষ্ঠীই পরিচালিত হ'ত কোনও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদ্বারা। এই গোত্রপ্রধান সাধারণত বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি হ'তেন। অনেক সময় গোত্রান্তর্গত বংশ, বীরত্ব প্রভৃতি বিষয়গুলিও বিবেচিত হ'ত। এই গোষ্ঠীপ্রধান বা শেখ অন্যান্য গোষ্ঠীর সঙ্গে যুদ্ধ বা সংঘাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতেন। কিন্তু বিচার বা অন্যান্য ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে, গোত্রের অন্তর্গত বিভিন্ন বংশের প্রধানদের সঙ্গে পরামর্শ করতেন। সাধারণভাবে গোষ্ঠীপ্রধান অন্যান্য সদস্যদের কাছ থেকে কোনও কর বা এ জাতীয় অর্থ/দ্রব্য পেতেন না। কিন্তু যুদ্ধে প্রাপ্ত ধনসম্পদের (যা গণীমাত নামে পরিচিত) একাংশ গোষ্ঠীপ্রধানের প্রাপ্য ছিল। এছাড়া কোনও দ্রব্য লুণ্ঠন করলেও সেই লুণ্ঠিত দ্রব্যের একাংশ গোষ্ঠীপ্রধানের প্রাপ্য। বাকী অংশ লুণ্ঠনে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের ভাগ করে দেওয়া হ'ত।

সামাজিক-অর্থনৈতিক ও বসবাসের দিক থেকে আরবগণ ছিল মূলত দু'ভাগে বিভক্ত — মরুবাসী ও নগরবাসী। উত্তর আরবে বসবাসকারী অধিকাংশই ছিল মরুবাসী; জীবিকা ছিল পশুপালন। এছাড়া

লুণ্ঠন। ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন-এর মতে, বেদুইনরা ছিল প্রকৃতিগত ভাবে অ-সভ্য দস্যু; কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বের প্রতি সম্পূর্ণ আস্থাহীন এবং অপরের সম্পদ লুণ্ঠনের প্রতি অতিমাত্রায় আগ্রহী। আর. এ. নিকলসনও মনে করেন, এই ধরনের জনগোষ্ঠীর মধ্যে গোষ্ঠীপতি থাকলেও গোষ্ঠীপতির পক্ষে অন্য ব্যক্তির উপরে আদেশ জারী করা বা আনুগত্য আদায় করা ছিল অসম্ভব। এক কথায়, প্রতিটি ব্যক্তিই ছিল স্বশাসিত।

এরই পাশাপাশি বাণিজ্যিক কারণে আরবে কতকগুলি নগরের উদ্ভব ঘটতে থাকে। বাইজানটাইন ও পারস্যের মধ্যে বিরোধ, নতুন বাণিজ্যপথের প্রসার প্রভৃতি ঘটনাবলীর ফলে অন্যতম বানিজ্যনগর হিসেবে মক্কা বিবেচিত হয়। যিশু খ্রীষ্টের জন্মের আগে থেকেই ম'কোরব বানিজ্যকেন্দ্র হিসাবে গণ্য হতে থাকে। উত্তর থেকে দক্ষিণ তথা প্যালেস্টাইন থেকে ইয়েমেন এবং পূর্ব থেকে পশ্চিম তথা লোহিত সাগর থেকে ইথিওপিয়া এবং পারস্য উপকূলের সঙ্গে সংযোগকারী মক্কা ছিল মূলত বাণিজ্য নগর। পঞ্চম শতকের শেষের দিকে কুরেশবংশের কুশয় নামে এক ব্যক্তি মক্কার কর্তৃত্ব লাভ করেন। আসগর আলী ইঞ্জিনিয়ার এর মতে, এই কুশয়ই সম্ভবত সিরিয়া থেকে দেবী আল উজ্জা এবং মনাত মক্কায় নিয়ে আসেন। গল্পগাথা অনুযায়ী এই কুশয় এরই পুত্র আব্দুল মানফ-এর চার পুত্র যথাক্রমে পারস্য, ইথিওপিয়া, ইয়েমেন এবং সিরিয়া থেকে রওনা হন বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে। মক্কার বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্যও কুরেশ গোষ্ঠী মুখ্য ভূমিকা নেয়। মানফের পুত্র হাশিম বিভিন্ন গোত্র প্রধানদের সঙ্গে ইলাফ নামে এক চুক্তি করেন। এই চুক্তির শর্তে বলা হয়, বাণিজ্য উদ্দেশ্যে সিরিয়া যাওয়ার পথে যে সকল গোত্র-গোষ্ঠী পড়ত তাদের প্রধানরা কুরেশদের বাণিজ্য কাফেলাকে নিরাপদে গন্তব্যস্থলে পৌছে দেবে এবং বিনিময়ে বাণিজ্যলাভের কিছু অংশ পাবে। সিরিয়ার সম্রাটও এধরণের চুক্তি করেন যাতে বিভিন্ন লুণ্ঠনকারী গোত্রগোষ্ঠীর হাত থেকে বাণিজ্যকে নিরাপদ রাখা যায়। হজরত মুহম্মদের জীবনেও 'আমরা বিভিন্ন চুক্তির সঙ্গে পরিচিত হই। এ সময় মক্কায় বিভিন্ন গোত্র প্রধানদের নিয়ে গঠিত এক সভা 'আল-মালা' ছিল। সাধারণ বিষয়গুলি আলোচনার জন্য বিভিন্ন গোত্রের মানুষ কাবা প্রাঙ্গনে হাজির হত। এই কাবা একদিকে যেমন ছিল উপাসনাগৃহ, অপরদিকে ছিল সাধারণ আলোচনা ক্ষেত্র। এই সভায় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করলেও আধুনিক অর্থে কোনও আইন বা প্রশাসনিক সংস্থা ছিল না, কারণ প্রতিটি গোত্রই ছিল স্ব-স্বাধীন। এই ব্যবস্থাকে আসগর আলী ইঞ্জিনিয়ার commercial oligopoly বা বণিকগোষ্ঠী চালিত ব্যবস্থা বলে অভিহিত করেন। এই ব্যবস্থায় আদিম গোত্রভিত্তিক সমাজব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যই ছিল প্রধান। এই বাণিজ্যনগরের উদ্বৃত্ত ও সৃষ্টি হয়েছে সুদূর অঞ্চলের বানিজ্য থেকে - কোনও সমৃদ্ধ কৃষিব্যবস্থায় থেকে নয়। একারনে সেসময় রাজতন্ত্র যা মূলত কৃষি সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত — আরবে উদ্ভূত হয়নি। বরঞ্চ বলা চলে ভ্রাম্যমান পশুপালন সমাজ থেকে বাণিজ্য সমাজের রূপান্তরের পর্বে আরবে ইসলামের জন্ম। একারণে মক্কার তথা ইসলামের উদ্ভবের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপট অন্যান্য ধর্মের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট থেকে ভিন্ন। ওয়াট (W. Montgomary Watt) মনে করেন আরবের ধূসর মরুভূমিতে ইসলামের জন্ম নয়; বস্তুত ইসলামের জন্ম আরবের সমৃদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্রে। আরবের এই গোত্রভিত্তিক সমাজ-ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় রূপান্তরে হজরত মুহম্মদের ভূমিকা অসামান্য।

৩৫.৩ হজরত মুহম্মদ ঃ ইসলামীয় রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন

ইসলাম-পূর্ব আরবের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখেছি যে, সেসময় বিভিন্ন গোত্র গোষ্ঠীগুলির মধ্যে বিরোধ সংঘর্ষ ছিল আরবের স্বাভাবিক ঘটনা। এধরনের ঘটনা বিশেষভাবে প্রকাশ পেত বাৎসরিক কোনও সমায়ে-মেলায় উৎসব অনুষ্ঠানে। বকর গোত্রের সঙ্গে তাগলিব গোত্রের বিরোধের সূচনা হয় এক উটকে কেন্দ্র করে এবং এই বিরোধ প্রায় ৪০ বৎসর ধরে চলে। আবস গোত্রের সঙ্গে যুবীয়ান গোত্রের বিরোধ বাধে ঘোড়া ও উটের এক প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে এবং এই বিরোধ কয়েক দশক স্থায়ী হয়। পরস্পর বিবাদমান গোত্রগোষ্ঠীগুলিকে একত্র করে এক সংহত গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ে পরিণত করার অন্যতম কৃতিত্ব হ'ল হজরত মুহম্মদের। বিভিন্ন ধরনের সমস্যা ও সংঘাতকে অতিক্রম করে, একই ঈশ্বরের অধীন (সে সময় কাবা উপাসনা গৃহেই দেবদেবী মূর্তির সংখ্যা ছিল ৩৬০টি) সমভ্রাতৃত্বে ও সাম্যের আদর্শে বিশ্বাসী এই নবজাগ্রত সম্প্রদায় — মুসলিম সম্প্রদায় হজরত মুহম্মদের সৃষ্টি। কুর-আন এ ঘোষিত হ'ল 'আজ তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম (ইসলাম) পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের ধর্ম মনোনীত করলাম' (৫ ঃ ৩)।

কৌম সমাজের রক্তের বন্ধন, ভাষা ও নির্দিষ্ট-গোত্রভিত্তিক দেবদেবীর পূজার্চণার পরিবর্তে দেখা দিল নতুন ত্রিবন্ধন। (১) আল্লাহ্ তথা এক ঈশ্বরে বিশ্বাস (২) সর্বশ্রেষ্ঠ ও শেষ নবী হিসেবে হজরত মুহম্মদকে স্বীকার ও হজরত মুহম্মদের প্রতি আস্থা এবং (৩) আল্লাহ্ তালার ঈশীবাণী হিসেবে মুহম্মদ কথিত বাণীর (যা পরবর্তীকালে পবিত্র গ্রন্থ কুর-আন হিসেবে গ্রথিত) প্রতি বিশ্বাস। এই নবোদ্ভুত সম্প্রদায়কে রাষ্ট্র বলা যাবে কিনা সে সম্পর্কে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে, কারণ রাষ্ট্রগঠনের উপাদানগুলির মধ্যে বেশ কিছু উপাদানই এখানে অনুপস্থিত। যেমন, সমবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য কোনও নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকার প্রয়োজন নেই অর্থাৎ রাষ্ট্র নামক কোনও সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে তা আবদ্ধ নয়। দ্বিতীয়ত, এই নতুন সম্প্রদায়ের সদস্যভূক্তির অন্যতম শর্ত হ'ল আল্লাহ্তালার প্রতি বিশ্বাস; কুর-আন এবং আল্লাহ্তালার সর্বশেষ ও শ্রেষ্ঠ নবী হজরত মুহম্মদের প্রতি সম্পূর্ন আস্থা। তৃতীয়ত, আল্লাহ্তালাই একমাত্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। এই চূড়ান্ত ক্ষমতা রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা নামে পরিচিত। একমাত্র আল্লাহ্তালা এবং আল্লাহ্র রসুল (প্রতিনিধি) হজরত মুহম্মদ প্রতিপালক হিসেবে সেই ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী। কুর-আন এর আয়াত, অনুযায়ী 'হে নবী, আমার বান্দার উপর তোমার কোনও আধিপত্য নেই। তোমার প্রতিপালকের আধিপত্যই যথেষ্ট (১৭ ঃ ৬৫)। চতুর্থত, আল্লাহ্তালার মুখনিঃসৃত বাণী যা হজরত মুহম্মদের কাছে ঐশীভাবে প্রকাশিত, এবং পরবর্ত্তীকালে কুর-আন হিসেবে গ্রথিত, একমাত্র আইন বা শরিয়ত। এই আইনের এমনকি একটি শব্দেরও পরিবর্তনের অধিকার কোনও ব্যক্তি বা নেতা (শেখ) ইমাম, আমির বা খলিকার নেই। এই আইন সমভাবে প্রযোজ্য। আইনের এই সার্বভৌম ও সার্বজনীনতার ধারণা আধুনিক রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হ'লেও আধুনিক রাষ্ট্রে শাসক তথা রাজা/সামরিক বাহিনীর প্রধান/আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ আইনপ্রয়োগ, প্রচলিত আইনের সংশোধন বা বাতিলের অধিকারী, যা মুসলিম সমাজে অনুপস্থিত।

অ-রাষ্ট্রীয় সম্প্রদায় হিসেবে ইসলামের উদ্ভব হ'লেও ইসলামের ক্রমপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যগুলি ক্রমশ পরিস্ফুট হ'তে থাকে। এবং সম্ভবত হজরত মুহম্মদের জীবিতকালেই এই পরিবর্তনের সূচনা। বদর যুদ্ধের (মার্চ, ৬২৪ খ্রীঃ) পর হজরত মুহম্মদকে বেশ কিছু নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হ'তে হয়; যেমন, যে সমস্ত ব্যক্তি বা গোষ্ঠী নতুন ধর্ম ইসলাম-এ দীক্ষিত বা আশ্রিত হ'তে থাকে সেই সমস্ত জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্ক কেমন হবে, দীক্ষিতদের পরিচালন ব্যবস্থা, নেতৃত্বের স্বরূপ — প্রভৃতি বিষয়গুলি ক্রমশ গুরুত্ব পেতে থাকে। অধ্যাপক সেরওয়ানী (H.K. Sherwani) হজরত মুহম্মদের জীবনের কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করেন যা ইসলামীয় রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। যেমন, ৬২১ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে এপ্রিলে প্রথম প্রতিশ্রুতি এবং কয়েক মাস পরে মতান্তরে ৬২২ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় আকাবা। প্রথম প্রতিশ্রুতিটি হয় খাজরাজ গোত্রের ১০ জন এবং আউম গোত্রের ১০ জন এর সঙ্গে। দ্বিতীয় প্রতিশ্রুতিতে ৭৩ জন পুরুষ ও ২জন মহিলা অংশ নেয় এবং এদের মধ্যে ১২ জনকে হজরত মুহম্মদ বাছাই করেন। এই দুই প্রতিশ্রুতিতে সকলেই হজরত মুহম্মদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে এবং ঘোষণা করে যে, তারা এই নতুন ধর্মকে মান্য করবে এবং প্রয়োজনে রক্ষা করার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করবে। হজরত মুহম্মদের জীবনে পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা হ'ল মদিনায় বসবাসকারী ইসলাম বর্হিভূত অন্যান্য জনগোষ্ঠীর, বিশেষত ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের, সঙ্গে মদিনার চুক্তি সম্পাদন করা, এই মদিনা চুক্তি নানা দিক থেকেই তাৎপর্যপূর্ণ। হজরত মুহম্মদ জিযয়ার বিনিময়ে ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের সঙ্গে যে সকল চুক্তি সম্পাদন করেন তার বিষয়বস্তু 'ইসলাম ঃ রাষ্ট্র ও সমাজ' (১৯৭৭, ১৯৮৪) গ্রন্থে শেখ মুহম্মদ লুৎফর রহমান সংক্ষেপে তুলে ধরেন। বিষয় বস্তুগুলি নিম্নরূপ ঃ

তারা (অ-মুসলিম জনগণ), শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হ'লে মদিনা রাষ্ট্র তাদের রক্ষা করবে।

তাদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করা হবে না।

তাদের সকল প্রকার নিরাপত্তা দেওয়া হবে।

তাদের ব্যবসায়, বাণিজ্য, সম্পত্তি ও অধিকারে নিরাপত্তা থাকবে

তাদের ধর্ম, ধর্মযাজক, ধর্মস্থান, ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও গীর্জাদির কোনও ক্ষতি করা হবে না বা তাদের ধর্মপালনে বাধাদানও করা হবে না।

তাদের কোনও অধিকার ক্ষুন্ন করা হবে না।

তাদের উদ্দ্যেশ্যে সামরিক বাহিনী প্রেরণ করা হবে না।

তাদের জন্য সামরিক বাহিনীতে যোগদান বাধ্যতামূলক নয়।

ধর্মীয় ও বিচার ব্যবস্থায় তাদের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে।

তাছাড়া বাণিজ্যিক কারণে হজরত মুহম্মদকে অন্যান্য রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে যেমন খ্রীষ্টীয় রাষ্ট্র নজরান, ইহুদী রাষ্ট্র ইয়াথরিব এবং হিসার সাম্রাজ্যের সংস্পর্শে আসতে হয়। পূর্বে ইরান, পশ্চিমে পূর্বরোম সাম্রাজ্য এবং আবেসিনিয়ার সঙ্গে আরব বণিকদের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ট। ভারতের সঙ্গেও আরবের বানিজ্যিক

সম্পর্ক ছিল। খাদিজার বানিজ্যিক প্রতিনিধি হিসেবে হজরত মুহম্মদকে অন্যান্য রাষ্ট্রের সম্পর্কে ধারণা বা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়েছে। এ'সমস্ত অভিজ্ঞতা পরবর্ত্তীকালে ইসলামীয় রাষ্ট্র সৃষ্টি ও পরিচালনায় সহায়ক হয়।

ইসলামের রাষ্ট্রভাবনায় আল্লাহতালাই একমাত্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এবং হজরত মুহম্মদ হলেন তারই প্রেরিত পুরুষ বা পয়গম্বর। কুর-আন অনুযায়ী হজরত মুহম্মদের সার্বভৌম ক্ষমতা দু'ভাবে নিয়ন্ত্রিত। প্রথমত তিনি আইনের রক্ষাকর্তা - সৃষ্টিকর্তা নন। তিনিও সাধারণ মুসলিমের ন্যায় শরিয়তের অধীন। তিনি ইসলাম ও বিশ্বাসীদের রক্ষক - প্রভু নন। এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও শরীয়তের সার্বভৌমত্ব প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহতালার নবীরই সার্বভৌমত্ব। আইনের রক্ষাকর্তা ও ব্যাখ্যাকর্তা হিসেবে তিনি সার্বভৌম সমাজের তথা রাষ্ট্রেরও রক্ষাকর্তা। রাজনৈতিক সামাজিক, সামরিক ক্ষমতার তিনিই অধিকারী। যুদ্ধপরিচালনা ও শান্তিস্থাপনের বা গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা তাঁরই হাতে ন্যস্ত। বিভিন্নধরণের কর (যেমন অ-মুসলমানদের উপর জিযয়া এবং মুসলমানদের উপর খারাজ) ধার্য করার ব্যাপারে তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। ধর্মীয় ব্যাপারেও তিনিই প্রধান। নামাজ পরিচালনা করা তাঁর দায়িত্ব। এককথায়, হজরত মুহম্মদ ছিলেন সকল ক্ষমতার কেন্দ্রস্বরূপ। কুর-আন যেমন ঘোষণা করেছে "আল্লাহ-ব্যতীত কারো আদেশ বা অধিকার নাই" (১২ ঃ ৪০) একইভাবে অন্যত্র বলা হয়েছে "আল্লাহ ও তার রসুলকে মান্য-কর" (৪৭ ঃ ২০-২২)। বার বার বলা হয়েছে "আল্লাহকে ভয় কর এবং আমাকে (রসুলকে) মান্যকর"। "যারা আল্লাহ ও তার রসুলকে মান্য করে তাদের জন্য বেহেস্তের শান্তির প্রতিশ্রুতি রয়েছে (৪ ঃ ১৩-১৭)। "যারা মান্য করে না তারা নরকের আগুনে দগ্ধ হবে "(৩৩ ঃ ৩৬)। হুসেনীর (S.A.Q Husaini) মতে। 'অনেক বিতর্কিত বিষয়ে রসুলের নির্দেশ কুর-আনের ক্ষমতাকেও ছাড়াইয়া যায় কিন্তু কুর আন তদনুরূপভাবে নির্দেশকে ডিঙিয়ে যেতে পারে না।

ইসলামে দীক্ষিত বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলির পরিচালনার জন্য হজরত মুহম্মদ এক প্রশাসনিক পরিকাঠামোও গ্রহণ করেন। তিনি বিভিন্ন কাজের পরিচালনার জন্য কয়েকজন সহকারীকে নিয়োগ করেন। যেমন আল্লাহকর্ত্তৃক প্রেরিত বাণী সংকলনের জন্য তিনি কয়েকজন সহকারীকে নির্দেশ দেন। যাকাতও যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদের হিসেব ও সংরক্ষণের জন্য কয়েকজন সচিব নিয়োগ করেন। বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে সম্পর্ক রক্ষা, বিভিন্ন পত্রের মুকাবিলা করা, মহানবীর সিল সংরক্ষণ করা, প্রভৃতি বিভিন্ন কার্য সম্পাদনের ভার থাকত তাঁরই একান্ত বিশ্বস্ত অনুগত সহকারীদের উপর।

মদীনা ও পাশাপাশি এলাকাগুলির শাসনকার্য হজরত মুহম্মদ নিজেই পরিচালনা করতেন। অন্যান্য অঞ্চলগুলিকে বিশেষত যে অঞ্চলগুলি অধিগ্রহণ করা হয়েছে, পরিচালনার দায়িত্ব থাকত তাঁরই বাছাই করা ওয়ালী বা প্রশাসকের উপর। ইসলামের প্রসার, কর আদায়, শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা প্রভৃতি কাজ-পরিচালনার দায়িত্ব থাকত এই সমস্ত প্রশাসকদের উপরে। এই সমস্ত প্রশাসক নিয়োগ ছাড়াও হজরত মুহম্মদ ছোট ছোট অঞ্চল ও বড় বড় গোত্রের পরিচালনার জন্য এক একজন করে আমিন নিয়োগ করতেন।

এই নতুন উম্মা (সুমেরীয় ভাষা উম থেকে আগত যার বুৎপত্তিগত অর্থ 'মা'; প্রচলিত অর্থ, সম্প্রদায় বিশেষ) পরিচালনার জন্য অর্থেরও প্রয়োজন। এই প্রয়োজন মেটানোর জন্য হজরত মুহম্মদ রাজস্বের উৎস

হিসেবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলিকে ধার্য করেন - (১) গাণীমত বা যুদ্ধে প্রাপ্ত, (২) যাকাত-মুসলমানদের উপর ধার্য কর (৩) জিযয়া - অ-মুসলিমদের উপর ধার্য কর (৪) খারাজ বা ভূমি রাজস্ব এবং আল-ফাই বা সম্প্রদায়ের যৌথ সম্পত্তি।

উপরোক্ত উৎস থেকে সংগৃহীত রাজস্বের বন্টনব্যবস্থাও ছিল সুনির্দিষ্ট। যেমন গাণীমত বা যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদের $^{1}/_{5}$ অংশ মহানবীর জন্য রেখে বাকী $^{4}/_{5}$ অংশ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈনিকদের মধ্যে মর্যাদা অনুসারে বন্টন করে দেওয়া হ'ত। এই ব্যবস্থার মধ্যে আমরা ইসলাম-পূর্ব আরবের রীতিই লক্ষ করি। যাকাত শুধুমাত্র মুসলমানদের উপর ধার্য কর। প্রত্যেক অবস্থাসম্পন্ন মুসলমানকেই খাদ্যশস্য, গৃহপালিত জন্তু, সোনারূপার মত মূল্যবান ধাতু, বানিজ্যদ্রব্য ও খনিজসম্পদের এক নির্দিষ্ট অংশ কর হিসেবে দিতে হত। জিযয়া ছিল অ-মুসলমান প্রজাদের উপর ধার্য কর। ইসলামের উদ্ভবের আগেও পারস্যের সাসানী সম্রাটগণ আশ্রিত জনগোষ্ঠীর উপর গেজিৎ (Gezit) এবং রোমান সম্রাটগন ট্রাইবিউটাম ক্যাপিটিস (Tributum Capitis) নামে কর ধার্য করতেন। বিনিময়ে সম্রাটগণ আশ্রিত প্রজাদের নিরাপত্তার বিধান করতেন। হজরত মুহম্মদ কর্তৃক ধার্য জিযয়া করের মধ্যে ও এই প্রাচীন প্রথার প্রয়োগ দেখা যায়। খারাজ ধার্য করার ব্যাপারেও পারস্য (খারাগ- Kharag) এবং রোমান সাম্রাজ্যের (Tributam soli) প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। জিযয়া ও খারাজ থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব মূলত সামরিক খাতেই ব্যয় করা হ'ত এবং এই কর ধার্যের পর থেকেই নিয়মিত ও নির্ধারিত বেতনপ্রাপ্ত প্রাপ্ত সামরিক বাহিনী গড়ে ওঠে যা রাষ্ট্রের উদ্ভবের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। আল ফাই বা সম্প্রদায়ের যৌথ সম্পত্তি (বেশীর ভাগই যুদ্ধ থেকে প্রাপ্ত) মহানবীর পরিবারবর্গ এবং অনাথ গরীব দুঃখীদের জন্য ব্যয় করা হ'ত। এভাবে এক ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসেবে উদ্ভুত ইসলাম সম্প্রদায় বা উম্মা রাজস্ব ধার্য, প্রতিষ্ঠিত সেনা বাহিনী, প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রভৃতি গড়ে তোলার মধ্যদিয়ে ক্রমশঃ রাষ্ট্রীয় সম্প্রদায়ের দিকেই এগুতে থাকে।

৩৫.৪ ইসলামীয় রাষ্ট্রের বিকাশ ঃ খলিফাতন্ত্রের উদ্ভব

হজরত মুহম্মদের মৃত্যুর (৬৩২ খ্রীঃ ৭ই জুন) পর ক্রমান্বয়ে যে সময়ে চারজন খলিফা ইসলামীয় সম্প্রদায়ের দায়িত্বভার নেন সেই যুগকে (খ্রীঃ ৬৩২ থেকে খ্রীঃ ৬৬১) ইসলামের ইতিহাসে 'খুলাফায়ে রাশেদূণ' এর যুগ বলা হয়। এই যুগেই ইসলামীয় সম্প্রদায় ইসলামীয় রাষ্ট্রের রূপ পায়। আল্লাহতালার প্রতিনিধি হিসেবে হজরত মুহম্মদই সার্বভৌম ক্ষমতার প্রয়োগকারী ছিলেন। কিন্তু হজরত মুহম্মদের মৃত্যুর পর কে সেই ক্ষমতার অধিকারী হবেন অর্থাৎ নেতা বা ইমাম নির্ধারণ নিয়ে সংকট দেখা দেয়। ইসলাম উম্মার গোড়াপত্তন যেহেতু মদিনায় ঘটেছে সেহেতু মদিনাবাসীগণ (আনসারী বা মুহম্মদের সাহায্যকারী) নিজেদের মধ্যে থেকে নেতা নির্বাচনে পক্ষপাতী। অন্যদিকে মক্কা থেকে আগত মুসলমানগণ (মুজাহির নামে পরিচিত) হজরত মুহম্মদেরই গোত্রের অর্থাৎ কুরেশ গোত্র থেকে কাউকে নির্বাচনে ইচ্ছুক। এ নিয়ে বিরোধ যখন তুঙ্গে তখন হজরত মুহম্মদেরই সহকারী হজরত ওমর ইসলাম রাষ্ট্রের পরিচালনার পরবর্তী উত্তরাধিকারী হিসেবে আবুবকর এর নামে ঘোষণা করেন এবং এই ঘোষণা সকলে মেনে নেন। পরবর্তীকালে খলিফা আবুবকর মৃত্যুশয্যায় হজরত ওমরকে পরবর্তী খলিফার জন্য মনোনীত করেন। সুতরাং বলা যায় প্রথম দু'জন খলিফাই হলেন একক ব্যক্তি দ্বারা মনোনীত এবং কুরেশ বংশজাত। কিন্তু হজরত ওমর

মৃত্যুকালে ছয়জন সদস্য বিশিষ্ট এক নির্বাচক মন্ডলীর ওপর খলিফা নির্বাচনের ভার দিয়ে যান। এদের মধ্যে আবদুর রহমান অপর পাঁচজনের সঙ্গে আলোচনা করে হজরত ওসমানকে তৃতীয় খলিফা হিসেবে মনোনীত করেন। চতুর্থ খলিফা হিসেবে নিযুক্ত হ'ল হজরত আলী। তৃতীয় খলিফা হজরত ওসমান এর অকর্মন্যতা, পক্ষপাতিত্ব, দুষ্কৃত কর্মের প্রতিশোধ হিসেবে ওসমানকে হত্যাকরে হত্যাকারীগণ হজরত আলীকে খলিফা হিসেবে নিযুক্ত করেন। এর পর থেকেই খলিফা পদটিকে ঘিরে ইসলামের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব তথা ইসলামীয় রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব আদায়ের দ্বন্দ্বের সূচনা হয়। শেখ মুহম্মদ লুৎফর রহমান এর মতে, ওসমানের হত্যাকান্ডের পর খিলাফত নিয়ে গৃহযুদ্ধের যে সূচনা হয় তা আর বন্ধ হয়নি এবং খিলাফতকে কেন্দ্র করে যত বড় বড় যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে মুসলমান মুসলমানে ততবড় যুদ্ধ আর কোন কারণে সংঘটিত হয়নি।

দ্বিতীয়ত, ইসলামীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে ওঠার এই পর্বে খিলাফত পদটি এক প্রতিষ্ঠানিক আকার লাভ করে এবং ইসলামীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ও রাষ্ট্রচিন্তায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। আক্ষরিক অর্থে খিলাফত বলতে উত্তরাধিকারী বোঝায়। এই শব্দটি মানুষ, নেতা, শাসক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রধান প্রভৃতি অর্থেও ব্যবহৃত হয়। হজরত মুহম্মদের মৃত্যুর পরে আরবে খিলাফত শব্দটি যখন এক প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করতে থাকে তখন শব্দটি দ্বারা ঈশ্বরের নবীর অর্থাৎ হজরত মুহম্মদের উত্তরাধিকারী হিসেবেই ব্যবহৃত হয়। আবুবকর নিজেকে খলিফা হিসেবে অর্থাৎ হজরত মুহম্মদের উত্তরাধিকারী অর্থেই ব্যবহার করেন, কুর-আন এও একাধিকবার (ছয়বার) খলিফা শব্দটির ব্যবহার আছে মূলত এই অর্থেই। আবুবকর আবার নিজেকে ইমাম হিসেবেও উল্লেখ করেন এবং ইমাম হিসেবে তিনি সংঘবদ্ধ উপাসনায় খুৎবা ঘোষণাকারী প্রধান ব্যক্তি। আবুবকরের পর হজরত ওমর যখন খলিফার স্থলাভিষিক্ত হন তখন তিনি নিজেকে খলিফা বা ইমাম ছাড়াও আমীর-উল-মুমিনিন (অর্থাৎ নেতা বা সামরিক বাহিনীর প্রধান) উপাধি ব্যবহার করেন। এভাবে খলিফা (সম্প্রদায়ের পরবর্তী নেতা) ইমাম (ধর্মীয় নেতা) এবং আমীর-উল-মুমিনিন (সামরিক ও প্রশাসনিক প্রধান) — এই তিনটি পদ একই ব্যক্তিকে ঘিরে গড়ে ওঠে এবং খলিফা একই সঙ্গে সম্প্রদায় গত, ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সামরিক প্রধান হিসেবে বিবেচিত হতে থাকেন।

তৃতীয়ত, সার্বভৌম হিসেবে খলিফা প্রশাসনিক, ধর্মীয়, বিচার বিষয়ক ও সামরিক সংক্রান্ত ক্ষমতার প্রধান হলেও তত্ত্বগতভাবে আইনপ্রণয়নের ব্যাপারে তাঁর ক্ষমতা সীমিত। আল্লাহতালা কর্তৃক হজরত মুহম্মদের নিকট প্রেরিত বাণীই রাষ্ট্রকর্তৃত্ব ও আইনের একমাত্র উৎস। হজরত মুহম্মদের মৃত্যুর পর এই বাণীগুলিকে সংগ্রহ ও সংকলিত করার প্রয়োজন দেখা দেয়। প্রথম খলিফা আবুবকর এর আমলে তারই নির্দেশে এবং ওমরের প্রস্তাবক্রমে বহু বিজ্ঞজনের সহায়তায় এই বাণীগুলিকে সংকলিত করা হয় এবং যা গ্রন্থ হিসেবে কুর-আন এর রূপ পায়। বিভিন্ন পরিবেশ ও পরিস্থিতির পটভূমিতে আল্লাহতালার যে সমস্ত নির্দেশ হজরত মুহম্মদের নিকট অবতীর্ণ হয়েছিল তা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট অনুযায়ী গ্রথিত না করে কাঠামোগতভাবে সাজিয়ে নেওয়া হয়। তাছাড়া, বাছাইকরণ ও হয়। ইসলামের সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়গুলির ব্যাখ্যায় হজরত মুহম্মদের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা ও অনুসৃত পথ আইনের মর্যাদা পায়। তাছাড়া বিভিন্ন পরিস্থিতির মোকাবিলায় কুর-আন এর ভাষ্য হিসেবে বিভিন্ন হাদীশ গ্রন্থও রচিত হতে থাকে। এই সমস্ত গ্রন্থ প্রণয়নে তৎকালীন রাজনৈতিক প্রয়োজনগুলিই প্রধান

ভূমিকা নেয়। এম. এল. রায়চৌধুরীর মতে, দুঃখজনক ঘটনা হল, ধর্মীয় ব্যাখ্যাকারগণ নবীর সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সারমর্ম বা ভাবের চেয়ে কাঠামোর (form) উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করেন এবং এর ফলে এই ব্যাখ্যা ইসলামের মুক্ত ও চলমান প্রগতির এক আভ্যন্তরীণ বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

চতুর্থত, খলিফা নিয়োগের ব্যাপারে বংশ বা গোত্রের বিষয়টি এক মুখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। একমাত্র হজরত মুহম্মদের বংশ কুরেশ বংশ থেকেই খলিফা নিয়োগের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। এর ফলে খলিফার উপর আরবের বনিকগোষ্ঠীর চাপ বাড়তে থাকে। তাছাড়া খলিফা নিয়োগে বংশ বা গোত্রের বিষয়টি পরবর্ত্তীকালে বংশানুক্রমিক খলিফাতন্ত্রের জন্ম দেয়।

পঞ্চমত, নবীর সঙ্গে খলিফার গোত্রের সম্বন্ধ থাকায়, খলিফা আরব সংস্কৃতি ও ভাষার অধিকারী হওয়ায় এবং যেহেতু কুর-আন আরবী ভাষাতেই গ্রথিত সেহেতু অচিরেই আরববাসীদের কাছে ইসলাম এক জাতীয় ধর্মে রূপান্তরিত হয়। পরবর্ত্তীকালে ইসলামের সম্প্রসারণে অন্যরাজ্য অধিগ্রহণ, ইসলামীকরণ, আরবীয়করণ-এসমস্তই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে থাকে এবং ধর্ম ও রাজনীতির মেলবন্ধন ঘটতে থাকে।

৩৫.৫ ইসলামীয় রাষ্ট্রের সম্প্রসারণ ঃ প্রকৃতিগত পরিবর্তন

আমরা এর আগের আলোচনায় দেখেছি হজরত মুহম্মদের মদিনাগমন ও বদর যুদ্ধের পরের সময়ে ইসলামীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার সূচনা হলেও হজরত মুহম্মদের জীবিতকালে ইসলাম ছিল মূলত সম-ভাতৃত্বে বিশ্বাসী এক ধর্ম সম্প্রদায় মাত্র। হজরত মুহম্মদের মৃত্যুর পরবর্ত্তী চারজন খলিফার যুগে একদিকে যেমন খলিফাতন্ত্রের প্রসার ঘটে, অপরদিকে সামরিক প্রশাসনিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন ঘটতে থাকে খলিফার হাতে। এভাবে এক ধর্মীয় সম্প্রদায় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।

চতুর্থ খলিফা হজরত আলীর মৃত্যুর (৬৬১ খ্রীঃ) পর খলিফাতন্ত্র উমাইয়া গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণে আসে। উমাইয়া গোষ্ঠীপ্রধান মুরাবীয়া তার জীবদ্দশাতেই নিজ পুত্র ইয়াযীদকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করে ইসলাম রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। রাজধানীও স্থানান্তরিত হয় দামোস্কে। উমাইয়া খিলাফত ৬৬১ খ্রীঃ থেকে ৭৬০ খ্রীঃ পর্যন্ত স্থায়ী হয় এবং এই সময়পর্বে যে ১৪ জন উমায়াদ খলিফা হন তাঁরা ছিলেন মক্কার ধনী বনিকশ্রেণীর অন্তর্গত। ইসলামের ভাতৃত্বের সম্প্রদায় এর পরিবর্তে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র ক্রমশঃ প্রধান হয়ে ওঠে। বলপ্রয়োগের মাধ্যমে উমাইয়া তন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে আব্বাসীয়গণ ৭৫০ খ্রীঃ খিলাফত অধিকার করেন এবং রাজধানী বাগদাদ এ স্থানান্তরিত হয়। ১২৫৮ খ্রীঃ হালাগুখান তাতার আব্বাসীয় খলিফা মু'তাসিমকে হত্যা করে আব্বাসী বংশের খলিফাতন্ত্রের অবসান ঘটান। ইতিমধ্যে ৯০৯ খ্রীঃ মিশরে ও উত্তর আফ্রিকার ফাতেমীগণ শিয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেন এবং তা ১১৭১ খ্রীঃ পর্যন্ত স্থায়ী হয়। ৭৫০ খ্রীঃ উমাইয়া খলিফাতন্ত্রের অবসান ঘটলেও উমাইয়াদের একটি শাখা ক্ষমতা বলে স্পেন দখল করে স্বাধীন উমাইয়া খলিফাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই খলিফাতন্ত্র ১০৩১ খ্রীঃ পর্যন্ত স্থায়ী হয়। ১৫১৭ খ্রীঃ তুর্কী সুলতান সেলিম (প্রথম) মিশর অধিকার করে কায়রোয় নাম মাত্র খলিফা আব্বাসী বংশের আহম্মদকে বন্দী করে খলিফাপদ লাভ করেন।

এই ঐতিহাসিক ঘটনার প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা ও চিন্তাচেতনা ও পরিবর্তিত হতে থাকে। প্রথমত, ইসলামের ভ্রাতৃত্বের সম্প্রদায় এর পরিবর্তে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রই ক্রমশ প্রকট হতে থাকে যা ইসলামের মূল ভাবধারার বিরোধী। দ্বিতীয়ত, খলিফাপদের তথা ইসলামী রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্ব দখলের জন্য অর্ন্তকলহ ও অন্তর্ঘাত তীব্রতর হতে থাকে। একই উম্মা বা ইসলামীয় সম্প্রদায় গড়ে তোলার পরিবর্তে একাধিক খলিফার এবং খলিফাতন্ত্রের সৃষ্টি ঘটতে থাকে। তৃতীয়ত, আরব ভূখন্ড থেকে অন্যান্য অংশে ইসলামের সম্প্রসারণ ঘটায় অন্যান্য অংশের ইসলাম সংগঠন ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যে সম্পর্ক কি হবে সে নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। অন্যকোনও অঞ্চলের মুসলিম শাসক কি আরবের খলিফাকে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতা হিসাবে মেনে নিয়ে আনুগত্য দেখাবে? নাকি, রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন থাকবে? সমবিশ্বাসীদের মধ্যে একই ঈশ্বর (আল্লাহতালা) এক নবী (হজরত মুহম্মদ) এক ধর্মগ্রন্থ (কুর-আন) এবং একই কেন্দ্রীয়শক্তি (খলিফাতন্ত্র) ইসলামীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার মূল প্রতিবাদ্য বিষয়। হাদীস গ্রন্থে বলা হ'ল, ''যদি দুজন খলিফা থাকে তাহলে অবশ্যই একজন মৃত্যু বরণ করবে''। এর মধ্যে দিয়ে এক অবিভক্ত আনুগত্যকেই স্বীকার করা হয়েছে। এমনকি এ-কথাও বলা হ'ল —। ''শাসক যদি অত্যাচারী হয় তাহলে সে তার শাস্তি অবশ্যই পাবে কিন্তু জনগণ তাকে মান্য করে চলবে' (আবু ইউসুফ)। বাস্তবেও দেখা যায় আরব ভূখন্ডের বাইরে বেশ কিছু ইসলাম অনুসরণকারী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে সেই রাষ্ট্রপ্রধান এমনকি স্বাধীনভাবে রাষ্ট্র ক্ষমতা প্রয়োগ করলেও খলিকার কাছ থেকে বৈধতার স্বীকৃতি আদায় করেন। খলিফাও 'আমির উল-ইসলাম' নায়েব-উল-খলিফা প্রভৃতি উপাধি বিতরণের মাধ্যমে এই সমস্ত রাষ্ট্রগুলির শাসকের ক্ষমতা প্রয়োগের বৈধতাদানের মাধ্যমে বস্তুত সেই রাষ্ট্রের শাসকের কর্তৃত্বকে স্বীকার করে নেন। খলিফার কাছ থেকে স্বীকৃতি আদায়ের রাজনৈতিক তাৎপর্য হল — (১) ইসলামীয় রাষ্ট্রের বা বলা ভালো ইসলামীয় রাষ্ট্রপুঞ্জের এক রাষ্ট্র হিসেবে বৈধতা লাভ করা, (২) মুসলমান নাগরিকের কাছ থেকে নিঃশর্ত আনুগত আদায় করা। কারণ খলিফার প্রতি আনুগত্য শাসকের ইসলামের প্রতি হজরত মুহম্মদের প্রতি, কুর-আন এর প্রতি আনুগত্যকে প্রমাণ করে।

চতুর্থত, ইসলামীয় রাষ্ট্রের সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে নব অর্জিত রাষ্ট্রের সংস্কৃতির সঙ্গে ঘাত প্রতিঘাত ইসলামের প্রকৃতি ও ইসলামীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও চিন্তাবেদনার এক ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে আসে। সাইপ্রাস ও রোডস দ্বীপকে ঘাঁটি করে ইউরোপ ভূখন্ডে মুসলমানেরা আক্রমন চালায় ও সিসিলি দখলের মাধ্যমে বহিঃ বিশ্বের সঙ্গে পাশ্চাত্যের যোগাযোগকে ছিন্ন করে। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির যেখানে তথাকথিত অন্ধকারময় যুগের সূচনা আরব সংস্কৃতির তখন সুবর্ণ যুগের সূত্রপাত। ক্ষয়িষ্ণু রোমান সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, আইনবিধি সম্প্রসারিত ইসলামের কাছে রাজনীতির এক খনি হিসেবে দেখা দেয়। রোমান প্রতিষ্ঠানগুলির ইসলামীকরণ ঘটতে থাকে। পারস্যজয়ের পর পারস্যের রাজদরবারের প্রাতিষ্ঠানিকতা, আচার, অনুষ্ঠান, আনুগত্যের নীতি ক্রমশ ইসলামীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থান পায়। আব্বাসীয় পর্বে আরবের ভারতে রাজনৈতিক সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ও বৃদ্ধি পায়। পঞ্চমত, জাতক কথা, উপনিষদসমূহ আরবিতে অনূদিত হতে থাকে। এমনকি ভারতীয় পন্ডিতদের একাধিক দল বাগদাদে গিয়ে দ্বিতীয় আব্বাসীয় খলিফা অল মসুরের দরবারে গণিত, নক্ষত্রবিদ্যা, সামুদ্রিক বিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা আলোচনা করেন। শুধুমাত্র ভারতীয় দর্শনই নয় গ্রিক দর্শনও এসময় আরবে বিকাশলাভ করে। অন্যান্য

অনেক কারণের মধ্যে এসমস্ত ঘটনাগুলি সুফিবাদের উদ্ভব ও প্রসারে সাহায্য করে। এভাবে রোমান, পারসিক, ভারতীয়, গ্রিক দর্শন ইসলামীয় দর্শনও রাজনৈতিক চিন্তাভাবনায় এক ব্যাপক প্রভাব ফেলে। এই প্রভাব আমরা লক্ষ করি বিশেষভাবে খলিফা হারান ও মামুনের আচার ব্যবস্থায় এবং ইবনে আবীর রবি (খ্রীঃ ৮৬০ খ্রীঃ ৯৪০), অল ফারাবি (খ্রীঃ ৮৭০-৯৫০), অল মওয়ার্দি (খ্রীঃ ৯৭৪-১০৫৮), নিজামূল মুলুক অল তুসি (খ্রীঃ ১০১৭-১০৯১), ইমাম গজ্জালি (খ্রীঃ ১০৫৮-১১১১) ইবনে খালদুন (খ্রীঃ ১৩১২-১৪০৬) প্রমুখ ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দার্শনিকদের রচনায়। এছাড়াও আবু হানিফ, মালিক, সাফি, হানবল প্রমুখ ইমামের ব্যাখ্যায় ইসলামীয় আইনের ও রাষ্ট্রের বিশ্লেষণ সমৃদ্ধ হতে থাকে।

৩৫.৬ ইসলামীয় দার্শনিকদের রচনায় রাষ্ট্র

ইসলামের সম্প্রসারণের ফলে উদ্ভুত নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে গতানুগতিক ইসলামীয় ব্যবস্থাকে সাম্যঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলার ব্যাপারটি ছিল নিঃসন্দেহে খুবই দুরূহ। যেমন কুর-আন-এ রাজতন্ত্রের ব্যাপারটির উল্লেখ না থাকলেও আবির রবি (৮৬০ - ৯৪৯ খ্রীঃ) রাজতন্ত্রের সমর্থনে এই মত প্রকাশ করেন, "আল্লাহর এটাই ইচ্ছা যে জনগনকে সংগঠিত করা ও তাদের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসে ঈশ্বরের বিধানকে ঠিকমতো বলবৎ করার বিষয়টি দেখাশোনার জন্য সমাজের একজন প্রধানব্যক্তি নিযুক্ত হবেন"। আল ফারাবি (খ্রীঃ ৮৭০-৯৫০) রাজতন্ত্রকে শুধুমাত্র সমর্থনই করেননি রাজাকে ঈশ্বরের মতোই প্রধান ও দ্বাদশ গুণ সম্পন্ন সর্বশক্তিমান পুরুষ হিসেবে উল্লেখ করেন। নিজামুল মুলুক 'শিয়ামতনামা' গ্রন্থে রাজতন্ত্রকে এভাবে বৈধতাদান করেন -" সর্বশক্তিমান আল্লাহতালা বিশ্বাসীদের মধ্যে কোনও ব্যক্তিকে বাছাই করেন ও তার ওপর জগতের স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের ভার অর্পন করেন এবং মানবজাতির স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তির প্রয়োজনে শাসন ক্ষমতাও অর্পন করেন"। ইসলামীয় রাষ্ট্রদর্শনের অন্যতম তাত্ত্বিক ইমাম গজ্জালি (১০৫৮-১১১১খ্রিঃ) রাষ্ট্রের বিশ্লেষণে ঐতিহাসিক ও পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি রাষ্ট্রকে এক বিবর্তনের ফলশ্রুতি হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। রাষ্ট্রসৃষ্টির আগে সমাজ ছিল অরাজকতা, আভ্যন্তরীন কলহ ও বিরোধপূর্ণ। এই অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার জন্য ও সমাজে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য অধিকতর শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির শাসন প্রয়োজন। কিন্তু কোন শাসকদ্বারাই এরকম অবস্থায় স্থায়ীসংগঠন গড়ে তোলা সম্ভবপর নয়। একমাত্র ঈশ্বরের পথ অনুসরণ করেই সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা সম্ভব। সুতরাং সুলতান বা শাসক রাষ্ট্র পরিচালনায় ঈশ্বর নির্দেশিত পথ অনুসরণ করে চলবেন। এভাবে গজ্জালি রাজনীতিকে ধর্মীয় বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত করেন।

মধ্যযুগের ইসলাম জগতের বিস্ময়কর প্রতিভা বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন (খ্রীঃ ১৩১২-১৪০৫) রাষ্ট্রকে দুভাগে ভাগ করেন। (এক) তাবিয়ী রাষ্ট্র বা স্বাভাবিক রাষ্ট্র এবং (দুই) সিয়াসী রাষ্ট্র বা বিধিবদ্ধ রাষ্ট্র। শাসক শুধুমাত্র ক্ষমতা বলে যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাও পরিচালনা করে সে রাষ্ট্র হল তাবিয়ী রাষ্ট্র। সিয়াসী রাষ্ট্র হল বিধিবদ্ধ বা আইনের দ্বারা শাসিত রাষ্ট্র। এই সিয়াসী রাষ্ট্রকে খালাদুন আবার দুভাগে ভাগ করেন - (এক) সিয়াসী আকলীয়া বা যুক্তিগ্রাহ্য বিধিবদ্ধ এবং (দুই) সিয়াসী দীনিয়াহ বা ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত বিধিবদ্ধ রাষ্ট্র। ইসলামীয় রাষ্ট্র হল এই শেষ প্রকারের রাষ্ট্র অর্থাৎ সিয়াসী দীনিয়াহ বা ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত বিধিবদ্ধ রাষ্ট্র।

পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে ইসলামে যে খলিকাতন্ত্রের প্রসার ঘটে ইবনে খালদুন সেই খলিফাতন্ত্রকে যুক্তিগ্রাহ্য করে তোলেন। ইবনে খালদুনের মতে, খিলাফত হল এমন প্রতিষ্ঠান যা হজরত মুহম্মদের আদর্শ ও লক্ষ্যেরই প্রতিনিধিত্ব করে। খলিফার প্রধান কর্তব্য হ'ল ইসলামের রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রনীতিকে ভালোভাবে নিয়ন্ত্রন করা। খালদুন 'মুকদ্দিমা' গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, রাষ্ট্রীয় আইন দুটি গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক বিধানের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং তা হ'ল গোষ্ঠী চেতনা ও ধর্মীয় চেতনা।

অল মওয়ার্দী, অল গজ্জালি প্রমুখ দার্শনিকগণ খিলাফতের জন্য কুরেশ বংশের প্রাধান্য দিয়েছেন। কিন্তু ইবনে খালদুন খলিফার পদটিকে শুধুমাত্র কুরেশ বংশের মধ্যে আবদ্ধ না করে সময় বিশেষে এর ব্যতিক্রমকেও সমর্থন করেছেন। খারেজীগন ও খিলাফতকে কোনও বংশের একচেটিয়া বলে মনে করেননি। এমনকি যোগ্যতা থাকলে একজন মহিলাকেও তাঁরা খলিফা বা ইমাম হিসেবে গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

ইসলামীয় রাষ্ট্রদর্শনের আর এক তাত্ত্বিক অল-মওয়ার্দী খিলাফত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। শেখ মুহম্মদ লুৎফর রহমান অল-মওয়ার্দীয় মতকে খুব সংক্ষেপে তুলে ধরেন 'ইমলাম ঃ রাষ্ট্র ও সমাজ' (১৯৭৭, ১৯৮৪) গ্রন্থে। মওয়ার্দী খিলাফত পদটিকে বংশানুক্রমিক করার পরিবর্তে নির্বাচনমূলক বলে অভিহিত করেন। এমনকি তিনি খিলাফত পদপ্রার্থী হওয়া এবং নির্বাচকমন্ডলীর সদস্য হওয়ার জন্য কতকগুলি শর্তের ও উল্লেখ করেন। যেমন খলিফা পদপ্রার্থী হতে গেলে তিনি ৭টি গুণের অধিকারী হবেন— কুরেশবংশজাত, পুরুষ, পূর্ণবয়স্ক, চরিত্রবান। শারীরিক ও মানসিক ব্যাধি মুক্ত, বেসামরিক শাসনের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্তগ্রহণের যোগ্য, কুর-আন ও হাদীস সম্পর্কিত জ্ঞানের অধিকারী এবং মুসলমান ভূখন্ডের নিরাপত্তার জন্য সাহসী। খলিফার নির্বাচক মন্ডলীর যোগ্যতার বিষয়েও তিনি মন্তব্য করেন। প্রথমদিকে কেবল মহাবীদের (হজরত মুহম্মদের সহচরদের) এই ক্ষমতা ছিল কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে যাদের আইন বিষয়ে প্রকৃতজ্ঞান রয়েছে এবং যারা তাদের ধর্মপরায়ণতা ও যোগ্যতার জন্য খ্যাত তারাই খলিফার নির্বাচনের যোগ্য। যদি এই নির্বাচকমন্ডলী কোনও অযোগ্যব্যক্তিকে খলিফা হিসেবে নির্বাচিত করেন' তাহলেও তাদের এই নির্বাচন চূড়ান্ত বলে মেনে নিতে হবে। ইবনে জামায়া অবশ্য নির্বাচনের মাধ্যমে খিলাফত পদপ্রাপ্তির পাশাপাশি ক্ষমতা দখলের মাধ্যমে খিলাফত পদপ্রাপ্তির বিষয়গুলিকে আলোচনায় আনেন। জামায়ার মতে, ক্ষমতাবলে যদি কেউ খলিফাপদ দখল করে এবং তারপর অন্যকোন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি কর্তৃক সেই খলিফা পদচ্যুত হয় তাহলে দ্বিতীয়জনকেই খলিফা হিসেবে মানতে হবে। এব্যাপারে তিনি খলিফা ওমরের বক্তব্য তুলে ধরেন — 'আমরা সব সময় বিজেতার পক্ষে'।

খলিফার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অল মওয়ার্দীর বক্তব্য হল, খলিফাকে ধর্মের বিশুদ্ধতা রক্ষা করতে হবে, অর্ধমাচরণ দমন করতে হবে, আইন এর শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং বিবাদ মীমাংসা করতে হবে। রাষ্ট্রের সীমানা রক্ষা করা, ধর্মদ্রোহীদের শাস্তি দেওয়া, ইসলামের শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ, ঘোষণা করা, গাণীমত ও জিযয়া সংগ্রহ করা ও উপযুক্তভাবে বন্টন করা, যোগ্য কর্মচারী নিয়োগ করা প্রভৃতি কাজগুলিও খলিফার অন্যতম কাজ।

ইসলাম রাষ্ট্র দার্শনিকগণ ইসলাম ধর্মের উপর রাজনীতিকে প্রতিষ্ঠা করার সম্পর্কে যেমন মতপ্রকাশ

করেন, রাজনীতির প্রয়োজনে ধর্মের নতুনতর ব্যাখ্যাও দিয়ে থাকেন, ইমাম গজ্জালি রাজনৈতিক ক্ষমতাকে যুক্তিতর্কের পরিবর্তে ঈশ্বরিক আইনের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। ইবনে তাইমিয়া (খ্রীঃ ১২৬৩-১৩২৮) অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বিষয়টি ব্যাখ্যা করেন- ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ক্ষমতার ব্যবহার অত্যন্ত আদর্শ কাজ। কারণ, তা আল্লাহতালার নৈকট্যলাভে সহায়ক হয়। এই নৈকট্যলাভের অর্থই হ'ল, আল্লাহও তার রসুলকে মান্য করা। শেখ মুহম্মদ লুৎফর রহমান এব্যাপারে মন্তব্য করেন, "ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে খিলাফত প্রতিষ্ঠান পূর্ববর্ত্তী কোনও পরিকল্পনা ব্যতিরেকেই জন্মলাভ করে। পরবর্ত্তীকালে মুসলিম শাস্ত্রবিদগণ শরিয়তের সাথে রাজনৈতিক কাঠামোকে এক পর্যায়ে ফেলে খলীফার সঙ্গে ইহলৌকিক ও ধর্মীয় নেতৃত্বের সমন্বয় সাধন করেন এবং খলিফাকে আধ্যাত্মিক ও ইহলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী বলে স্বীকার করেন। সেই জন্যই বলা যায় যে, "ইসলাম রাষ্ট্রকে ধর্মীয় উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ব্যবহার করেছে — সে উদ্দেশ্য হ'ল মানব সমাজকে ইসলামে দীক্ষিত করা" (ইসলামঃ রাষ্ট্র ও সমাজ (১৯৭৭, ১৯৮৪) পৃঃ ১৯১)। ইসলামের সঙ্গে রাষ্ট্রের এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের পরিপেক্ষিতেই ইসলামীয় তাত্ত্বিকগণ রাষ্ট্রকে দুভাগে ভাগ করেন— দার-উল-ইসলাম এবং দার-উল-হারব। দার-উল-ইসলাম হল সেই রাষ্ট্র যা ইসলামীয় অনুশাসন দ্বারা পরিচালিত এবং দার-উল-হারব হ'ল যে রাষ্ট্রে ইসলামের অনুশাসনগুলি অনুসৃত হয় না বা বলা চলে বিধর্মীদের দ্বারা শাসিত রাজ্য।

৩৫.৭ ভারতবর্ষ ও ইসলাম

ভারতের সঙ্গে আরবের যোগাযোগ ইসলামের উদ্ভবের অনেক আগে থেকেই। ভারতের বিশেষ করে ভারতের দক্ষিণ উপকূলের সঙ্গে আরব বণিকদের যোগাযোগ অনেকদিনের এবং তা ইসলামের উদ্ভবের আগে থেকেই। দাক্ষিণপূর্ব এশিয়ার মশলা প্রধান দ্বীপগুলির সঙ্গে, ভারতের রেশম ও তুলা ও তুলাজাত দ্রব্য প্রভৃতি কেনা বেচার জন্য আরব বণিকগণ শুধুমাত্র বাণিজ্য কুঠি নয়, স্থায়ীভাবে বসবাস ও শুরু করেন। দক্ষিণভারতের শাসকগণ ও আরব বণিকদের নিরাপত্তা ও বাণিজ্যে উৎসাহ দিতেন। আরবে ইসলামের উদ্ভব, বিভিন্ন পৌত্তলিক গোত্রগুলির ইসলামে দীক্ষিতকরণ স্বাভাবিকভাবেই ভারতে বসবাসকারী আরববাসীদের ও ইসলাম ধর্মাবলম্বী করে তোলে। কিন্তু ভারতে রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার বিষয়টি ছিল এসময় গৌণ। তবে ভারতের ধনসম্পদের প্রতি আকর্ষণ আবর শাসকদের ভারত অভিযানের বিষয়ে উৎসাহী যে করেনি তা নয়। দ্বিতীয় খলিফা ওমরের সময়ে বা ৬৬০ খ্রীঃ চতুর্থ খলিফা আলীর সময়ে সিন্ধু এলাকায় অভিযান চালানোর প্রচেষ্টা যে হয়নি তা নয় বা ৬৬৪ খ্রীঃ প্রথম উমায়াদ খলিফার মুরাবিয়ার সময়েও এই প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। ৭১১ খ্রিঃ মুহম্মদ বিন ক্বাশিম কর্তৃকসিন্ধু বিজয় এবং তার পরেও বিভিন্ন সময়ে ভারতে বিক্ষিপ্তভাবে অভিযান চললেও স্থায়ীভাবে সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয় ১২০৬ খ্রীঃ। এসময় অর্থাৎ ১২০৬ খ্রীঃ মুহম্মদ ঘুরীর মৃত্যু হলে কুৎবউদ্দীন আইবক নিজেকে ভারতের স্বাধীন সুলতান বলে ঘোষণা করেন এবং তিনি দিল্লীতে যে সালতানাত প্রতিষ্ঠা করেন তা ১৫২৬ খ্রীঃ পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এই পর্যায়কে ভারতের ইতিহাসে সুলতানী পর্ব বলে। ১৫২৬ খ্রীঃ পানিপথের প্রথমযুদ্ধে শেষ লুদী সুলতান ইব্রাহিম লুদীকে পরাজিত করে বাবুর দিল্লীর সিংহাসন দখল করে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৫৪০ থেকে ১৫৫৫ খ্রীঃ পর্যন্ত সময়ে সুরীবংশের শাসকপর্বটিকে বাদদিলে ১৫২৬ থেকে ১৮৫৮ খ্রীঃ

পর্যন্ত এই মুঘল সাম্রাজ্য বজায় থাকে। আমরা এই পর্বদু'টি আলাদা ভাবে আলোচনা করব।

৩৫.৭.১ সুলতানীশাসন পর্বে রাষ্ট্র

ভারতে সুলতানী শাসনের যুগ হ'ল ১২০৬ খ্রীঃ থেকে ১৫২৬ খ্রীঃ পর্যন্ত এবং সুলতানগণ জাতিতে ছিলেন তুর্কী। ভারতে সুলতানীপর্বে পাঁচটি বংশ শাসনকার্য পরিচালনা করেন। এই বংশগুলি হল যথাক্রমে মামলুক বা দাস বংশ (খ্রীঃ ১২০৬-১২৯০) খলজীবংশ (খ্রীঃ ১২৯০-১৩২০) তুঘলক বংশ (খ্রীঃ ১৩২০-১৪১৪) সৈয়দ বংশ (খ্রীঃ ১৪১৪-১৪৫১) ও লোদীবংশ (খ্রীঃ ১৪১৫-১৫২৬), সুলতানী শাসনপর্বে রাষ্ট্র সম্পর্কিত যে সমস্ত ব্যবস্থা ও ধারণাগুলি প্রকট হয়ে ওঠে তা নিম্নরূপ।

প্রথমত, সুলতানী শাসকগণ ভারতে রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। এই রাজতন্ত্র অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্থায়ী হয়নি। পরিবর্তে ছিল আভ্যন্তরীণ কলহ ও বিরোধেপূর্ণ। দ্বিতীয়ত, সুলতানী শাসকগণ স্বাধীনভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করলেও অধিকাংশ সুলতানই খলিফার কাছ থেকে বৈধতা আদায়ে সচেষ্ট হন। সুলতান মামুদ, মামুদের পুত্র মামুদ আব্বাসী খলিফার কাছ থেকে স্বীকৃতি লাভ করেন। মুহম্মদ ঘুরী ও তার ভাই গিয়াসউদ্দীন খলিফার কাছ থেকে স্বীকৃতি লাভ করে নিজেকে নাসীর আমির-উল-মুমিনিন ও নসর-উদ-দুনিয়া বলে ঘোষণা করেন। এমনকি, খলিফা মুসতাসিম এর মৃত্যুর পরেও প্রায় চল্লিশ বছর ধরে দিল্লীর সুলতানগণ মুসতাসিম এর নাম মুদ্রায় উল্লেখ করেন। আলাউদ্দিন খলজী, মুহম্মদ বিন তুঘলক, ফিরোজ শাহ প্রভৃতি শাসকগণ ও খলিফার কাছ থেকে স্বীকৃতি আদায় করেন। এই প্রথার একমাত্র ব্যতিক্রমী হলেন কুতুবউদ্দীন মুবারক শাহ যিনি খিলাফতের আধিপত্যকে অস্বীকার করে দিল্লীর স্বাধীন সুলতান হিসেবে ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। এমনকি তিনি নিজেকে প্রধান ইমাম, খলিফা, আল্লাহর প্রতিনিধি বলে ঘোষণা করেন। ১৩১৭ খ্রীঃ থেকে তাঁর মুদ্রাতেও নিজের নাম উল্লেখ ও খলিফা উপাধির ব্যবহার দেখা যায়। শুধুমাত্র ভারতে কুতুবউদ্দীন মুবারকশাহই নয়, ভারতের বাইরেও অনেক শাসকই খলিফার নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে ক্ষমতা প্রয়োগের পক্ষপাতী ছিলেন। বস্তুত ১২৫৮ খ্রীঃ আব্বাসীদের পতনের পর থেকে খলিফাতন্ত্রের গুরুত্ব কমতে থাকে।

তৃতীয়ত, সুলতানী শাসকগণ রাজতন্ত্র গড়ে তুললেও বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রকে সবসময় রক্ষা করতে পারেননি। শাসক বাছাইএর ব্যাপারেও কোন সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। সামরিক ক্ষমতা , শাসনকার্যে দক্ষতা, শাসক কর্তৃক পরবর্তী শাসককে বাছাই করা, গোষ্ঠী-প্রধানদের কর্তৃক বাছাই করা প্রভৃতি পদ্ধতি অনুসরণ করতে দেখা যায়। অধ্যাপক আর. পি. ত্রিপাঠীর মতে, রাজতন্ত্রের ধারণায় খলজী শাসকদের দুটি অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। (এক) রাজতন্ত্র কোনও গোষ্ঠী বা সুবিধাভোগী শ্রেণীর সম্পত্তি নয়। ক্ষমতা ও দক্ষতাই হল রাজতন্ত্রের ভিত্তি। (দুই) ধর্মীয় অনুমোদন ছাড়াই রাজতন্ত্রের অস্তিত্ব সম্ভব।

চতুর্থত, সুলতানী শাসন ছিল একান্তভাবেই পুরুষ শাসিত। ইলতুৎমিস তাঁর কন্যা রাজিয়াকে মনোনীত করে গেলেও আমীরগণ একজন মহিলার শাসন মানতে অস্বীকার করে রুকনউদ্দীনকে সিংহাসনে বসান। পরে অবশ্য রাজিয়া গৃহযুদ্ধে জয় লাভ করে সিংহাসনে বসেন। তাঁর প্রশাসনিক দক্ষতা, সমর কৌশল, বিদ্যোৎসাহীতা প্রভৃতি গুণাবলীর কোনটারই অভাব ছিল না। তথাদি তাঁর বিরুদ্ধে রক্ষণশীলদের চক্রান্ত শুরু হয় এবং সেই চক্রান্তে ১২৪০ খ্রীঃ সুলতানা রাজিয়া প্রাণ হারান। সুতরাং বলা যায় সুলতানী

রাষ্ট্র ছিল একান্তভাবেই পুরুষতান্ত্রিক।

৩৫.৭.২ ভারতে ইসলামীয় রাষ্ট্রদার্শনিকের আলোচনায় রাষ্ট্রঃ সুলতানীপর্ব

ইসলামের উৎসস্থল আরবভূখন্ড থেকে ইসলাম আরবের বাইরের দেশগুলিতে কয়েক শতকের মধ্যেই সম্প্রসারিত হতে থাকে। আরবকেন্দ্রিক ইসলামীয় রাষ্ট্রতত্ত্ব বিদেশের মাটিতে রূপান্তরিতও হতে থাকে। এই সম্প্রসারণে ও রূপান্তরের যুগেই ইসলাম ভারতে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে। অষ্টম বা দশম শতকের কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ঘটনা বাদ দিলে এয়োদশ শতকে ভারতে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় সুলতানী শাসন (১২০৬ - ১৫৫৬ খ্রীঃ)। এই সুলতানীপর্বের অন্যতম রাষ্ট্রদার্শনিক হলেন জিয়াউদ্দিন বরণী (খ্রীঃ ১২৮৫-১৩৫৯)। আমরা রাষ্ট্র সম্পর্কে জিয়াউদ্দিন বরণীর বক্তব্য এখানে আলোচনা করব।

জিয়াউদ্দিন বরণী সুলতানীযুগের অন্যতম রাষ্ট্র দার্শনিক যিনি জীবনের প্রথমদিকে সুলতানী রাজদরবারে অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিলেন কিন্তু মুহম্মদ তুঘলকের মৃত্যুর পর ১৩৫১ খ্রীঃ থেকে এই প্রভাব প্রতিপত্তি থেকে তিনি বঞ্চিত হন। রাজদরবার থেকে বিতারিত বরণী রাজনৈতিক দর্শনের উপর বিখ্যাত গ্রন্থ তারিখ-ই-ফিরোজশাহী রচনা করেন। সম্ভবত এই রচনার লক্ষ্য ছিল যাতে সুলতান ফিরোজশা তুঘলকের কৃপাদৃষ্টি লাভ করা যায়।

বরণী মধ্যযুগের ইউরোপীয় তাত্ত্বিক সেন্ট অগাস্টিন (খ্রীঃ ৩৫৪-৪৩০) মত দুই রাজ্যের তত্ত্ব হাজির করেন — ঈশ্বরের রাজ্য এবং ইহলোকে সুলতানের রাজ্য। ঈশ্বরের রাজ্য হল প্রকৃত রাজ্য এবং ঈশ্বর হলেন প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী। ঈশ্বর বা আল্লাহ ইহলোকে কাউকে কৃপা করেন আবার কাউকে শাস্তি দেন। আবার অনেক ব্যক্তিকে ইহলোকে কৃপা বা শাস্তি না দিয়ে পরলোকের জন্য কৃপা বা শাস্তি রেখে দেন। তিনিই বিশ্বজগতের শৃঙ্খলা করেন এবং সব কিছুর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করেন। তিনিই প্রকৃত সম্রাট ও সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু ইহজগতের মানুষের সমাজে তিনি এই ক্ষমতা প্রয়োগ করেন পয়গম্বর, জ্ঞানী এবং সুলতানের মাধ্যমে। তিনি সুলতানের উপর দায়িত্ব দেন মানুষের ত্রুটিগুলি দূর করার জন্য।

আমরা হজরত মুহম্মদের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে দেখেছি ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ক্ষমতা হজরত মুহম্মদের উপরই ন্যস্ত ছিল। এই দুই ক্ষমতার কোনও বিভাজন হয়নি। কিন্তু পরবর্তীকালে এই দুই ক্ষমতার বিভাজন ঘটতে থাকে। বরণীর রচনাতেও আমরা ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ক্ষমতার বিভাজন লাভ করি। বরণীর মতে ধর্ম আর রাজনীতি অর্থাৎ ধর্মীয় প্রধান এবং রাজনৈতিক প্রধান দুই যমজ ভাই। ধর্ম ছাড়া রাজনীতি নিরর্থক ; আবার রাজনীতি ছাড়া ধর্ম অসহায়। শুধুমাত্র সুলতানের পক্ষে ন্যায়সম্মত রাজ্য গড়ে তোলা সম্ভবপর নয় ; আবার শুধুমাত্র ধর্মীয় প্রধানের পক্ষে রাজনৈতিক ক্ষমতা ছাড়া শৃঙ্খলা রক্ষা ও ধর্মীয় বিধিনিষেধগুলি বলবৎ করা সম্ভব নয়। ঈশ্বর এ কারণেই ধর্মীয় প্রধান এবং রাষ্ট্র প্রধানকে সৃষ্টি করেছেন ভিন্ন ভিন্ন গুণ দিয়ে। এ জগতে ভালো এবং মন্দের যুদ্ধক্ষেত্র যেখানে মন্দকে চিরতরে দূর কার যায় না, শুধুমাত্র সাময়িকভাবে দমন করা যায়। একারণে রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগের ও প্রয়োজন থেকে যায়।

ভারতে মুসলমানগণ (ধর্মান্তরিত জনগোষ্ঠীর 'অনেকেই আগেকার সংস্কার থেকে যেমন মুক্ত হতে

পারেনি অপরদিকে সপ্তম শতকের হজরত মুহম্মদের ভাবধারার প্রকৃত মুসলমান পরিবর্তিত কাঠামোয় মূল নীতি থেকেও সরে আসে) যে ইসলামের মূল ভাবধারা অনুসরণ করে না যে সম্পর্কে বরণী দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং প্রকৃত ইসলামের ভাবধারায় মুসলমানদের ফিরিয়ে আমার জন্য সুলতান তথা রাজনৈতিক কর্তৃত্বের প্রয়োজন উপলব্ধি করেছেন। বরণীর মতে, ইদানীং ঈশ্বরের প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস এবং ইসলামের প্রতি দৃঢ়তা ও নিশ্চয়তা খুব কম মানুষের মধ্যেই দেখা যায়। এখনকার মানুষ ইসলামকে অনুসরণ করে নিছক সংস্কার বশে। হজরতমুহম্মদের আবির্ভাবের আগে ইহজগতের প্রাপ্তি, আশা-আকাঙ্খাই যেমন মানুষের মধ্যে ছিল প্রধান, বর্তমানে মানুষের মধ্যেও সেই প্রবণতাই পুনরায় ফিরে এসেছে। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যেতে পারে যদি সুলতানের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা থাকে। এমনকি, এর জন্য প্রয়োজনে সুলতান সন্ত্রাসসৃষ্টি বা চরম ক্ষমতার প্রয়োগ করবেন। এভাবে চরম ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে সুলতান অবিশ্বাসীদের, দুর্বিনীতদের এবং সংস্কারবদ্ধ বিশ্বাসীদের প্রকৃত ইসলামে ফিরিয়ে আনবেন। বরণীর মতে, শাসন, প্রাধান্য বা যুদ্ধজয় দারিদ্রের জীবন নিয়ে সম্ভবপর হয় না। সুলতান যদি ক্ষমতা প্রধান, বিত্তবৈভবসম্পন্ন, আড়ম্বর ও জাঁকজমকপূর্ণ না হ'ল তাহলে প্রজারা রাজাকে মানবে না; বিনীতরাও দুর্বিনীত হয়ে পড়বে এবং কর্তৃত্বের প্রতি আনুগত্য উধাও হয়ে যাবে — ঈশ্বর যাকে প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছেন তাকে অর্থাৎ সুলতানকে মান্য করতে ভুলে যাবে; এর ফলে চরম এক অরাজকতা সৃষ্টি হবে। অবশ্য বরণী সুলতানকে একই সঙ্গে ক্ষমতাশালী ও দয়াপ্রবণ হতে বলেছেন। কারণ প্রজাদের মধ্যে ভালো-মন্দ দুধরণেরই মানুষ আছে। সুলতান মন্দলোকের কাছে নির্দয় হবেন; ভালোমানুষের কাছে দয়া পরবশ হবেন।

সুলতানকে এভাবে সর্বশক্তিমান, আড়ম্বরপূর্ণ করে গড়ে তোলার পরই বরণীর কাছে প্রশ্ন জেগেছে সুলতানের এই প্রকৃতি প্রকৃত ইসলামের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা ? বরণীর মতে, দারিদ্র, অবনত, অনুগত, অহংমুক্তিই ঈশ্বরের কাছে যাবার পথ প্রস্তুত করে। অথচ ক্ষমতাসম্পন্ন আড়ম্বরপূর্ণ সুলতানের তত্ত্বগতভাবে ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে থাকারই কথা। কারণ এসব প্রকৃত ইসলামের বিরোধী। এই দ্বিধাদ্বন্দ্বে বরণী জনগণকে প্রকৃত ইসলামে ফিরে যাবার নির্দেশ দিলেও সুলতান এর প্রকৃত ইসলাম থেকে সরে থাকাকেই সমর্থন করেছেন এবং সুলতানকে পারস্যের সম্রাটকে অনুসরণ করার পরামর্শ দিয়েছেণ। বরণীর বিচারে পারস্য। সম্রাট ইসলামের প্রাধান্যকে বজায় রেখেছেন এবং একই সঙ্গে সিংহাসন, রাজকীয় মর্যাদা, বিলাসবহুল জীবন যাত্রা, দরবারী ব্যবস্থাপনা, বহুরত্নঘোষিত পোষাক, বিরাট হারেম, ব্যয়বহুল জীবন সবকিছুকেই ব্যবহার করেছেন। এই বিচ্যুতিকে বরণী তুলনা করেছেন মুসলমানের পক্ষে মৃত জন্তুর মাংস খাওয়ার সঙ্গে। মৃত জন্তুর মাংস ইসলামে নিষিদ্ধ; কিন্তু চরম ক্ষুধার্তের কাছে তা গ্রহণযোগ্য। সেরকম পারস্যের সুলতাণী ব্যবস্থা ইসলামে নিষিদ্ধ হলেও প্রয়োজনের তাগিদে তা গ্রহণীয় হতে পারে। নিঃসন্দেহে সুলতানের পক্ষে এজীবন ইসলাম বিরোধী। এবং এর জন্য সুলতান রাত্রিতে (নিভৃতে) ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন; ভেঙ্গে পড়বেন। এভাবে বরণী পরোক্ষভাবে চরম ক্ষমতাসম্পন্ন রাজতন্ত্রকেই সমর্থন করেছেন।

বরণীর কাছে প্রকৃত ইসলামে মুসলমানদের প্রতিষ্ঠিত করা, অমুসলমানদের ইসলামে দীক্ষিত করা সুলতানের অন্যতম দায়িত্ব হলেও বরণী একথাও বলেন যে ইসলামে বিশ্বাসী সমস্ত পয়গম্বর ও সুলতানগন সকলে এক হলেও অবিশ্বাসীদের দমন এবং প্রকৃত ইসলামে দীক্ষিত করতে পারবেন না। কারণ জগতের

ধর্মই হচ্ছে সত্য ও মিথ্যা, একেশ্বরবাদ ও বহুঈশ্বরবাদ অ-পৌত্তলিকতা ও পৌত্তলিকতা, আলো এবং অন্ধকার, দিবা ও রাত্রের সহাবস্থান। মিথ্যা না থাকলে যেমন সত্যের উপলব্ধি করা যায় না, মন্দ না থাকলে ভালোকে বোঝা যায় না, সেরকম বহু ঈশ্বরবাদ বা পৌত্তলিকতাবাদ না থাকলে ইসলামকেও বোঝা যায় না। উভয়ের সহাবস্থানই স্বাভাবিক এবং বাস্তব। এভাবে বরণী অমুসলিমদের অস্তিত্বকেও স্বীকার করে নিয়েছেন।

রাজার কাছ থেকে বিতাড়িত বরণী সুলতানকে বিজ্ঞলোকর সঙ্গে পরামর্শ নেওয়ার ব্যাপারে সচেতন করে দেন। যে কোনও মহৎ সুলতানেরই উচিত হচ্ছে বিজ্ঞব্যক্তিদের নিয়ে এক মন্ত্রণাসভা গড়ে তোলা। পার্ষদরাও রাজাকে খোলাখুলিভাবে নির্ভিক মনে তাদের সুচিন্তিত মতামত জানাবেন। কোন বিষয়ে সকলে যখন একমত হবেন তখনই সুলতান সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন। পরামর্শের অর্থ হচ্ছে মতের ঐক্য। দ্বিতীয়ত, পরামর্শদাতাগণ যথাযথভাবে নিযুক্ত হবেন। তাদের অভিজ্ঞতা, আনুগত্য এবং পদমর্যাদাও প্রায় একইরকম হবে, কারণ পদমর্যাদা বা আনুগত্যে যদি ভিন্নতা দেখা যায় তাহলে সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষেত্রেও বৈপরীত্য ঘটবে। তৃতীয়ত, পরামর্শদাতাদের কাছে সুলতান কোনও ব্যাপার গোপন করলেন না। উপমা সহকারে বরণী বলেছেন চিকিৎসকের কাছে রোগী যদি কিছু গোপন করে তাহলে চিকিৎসকের পক্ষে ঠিকমত চিকিৎসা করা যাবে না। চতুর্থত, পরামর্শদাতাদের নিরাপত্তার যথাযথ ব্যবস্থা থাকবে। সত্যভাষণের জন্য তাঁরা সুলতানের রোষে পড়বেন না। পঞ্চমত, পরামর্শের বিষয় গোপনীয় থাকবে। ষষ্ঠত, সুলতান পরামর্শসভায় প্রথমেই নিজের মতামত প্রকাশ করবেন না। অপরের মতামত শোনার পরই তিনি নিজের মতপ্রকাশ করবেন। কারণ, প্রথমেই যদি সুলতান নিজের মত প্রকাশ করেন তাহলে পরামর্শদাতাদের কাছ থেকে প্রকৃত মতামত নাও প্রকাশিত হতে পারে। কারণ কেউই সুলতানের বিরুদ্ধে মতপ্রকাশে সাহসী হবেন না। এখানে বরণী বিজেতা এবং রাজার মধ্যে পার্থক্য করেন। বিজেতা নিজের ইচ্ছামত লোকদের বাছাই করে সমর্থকগোষ্ঠী তৈরী করেন। সমর্থকগনও সুলতানের প্রশংসাকারী ও অনুগত চাটুকারে পরিনত হয় এবং বিনিময়ে সুলতানের কাছ থেকে সম্পদ সম্মান ক্ষমতা প্রভৃতি লাভ করে। সুলতানের পাশে জমা হতে থাকে যত দুর্বৃত্তের দল। কিন্তু যে শাসকের দৃষ্টি ঈশ্বরের দিকে নিবদ্ধ সেই শাসকের পক্ষে এদের সম্পর্কে সচেতন হওয়া উচিত এবং প্রকৃত পরামর্শকের পরামর্শই নেওয়া উচিত।

৩৫.৭.৩ মুঘল শাসনপর্বে রাষ্ট্র

১৫২৬ খ্রীঃ থেকে ১৮৫৮ খ্রীঃ পর্যন্ত দীর্ঘ সময়জুড়ে ভারতে মুঘল বংশ শাসন ক্ষমতা ভোগ করে। এসময় ইসলাম জগতে এক চরম অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা যায়। বাগদাদকেন্দ্রিক আব্বাসী খলিফার পতন, খলিফাতন্ত্রকে ঘিরে ইসলামজগতে এক চরম রাজনৈতিক সংকট, শিয়া ও সুন্নী সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব প্রভৃতি ঘটনাগুলির পাশাপাশি তৈমুর এর উত্থান ইসলাম জগতের রাজনৈতিক নেতৃত্বের এক তৃতীয় শক্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। তৈমুর কর্তৃক পারস্যজয়, বাগদাদ অধিগ্রহণ এবং খলিফাতুল্লা পদবি ব্যবহার ইসলাম দুনিয়ার এক নতুন মাত্রা যোগ করে। ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবুর হলেন এই তৈমুর এরই বংশধর।

ভারতে মুঘল শাসনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে রাষ্ট্র সম্পর্কে আমরা কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করি।

প্রথমত, মুঘল শাসন পুরোপুরি বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রকেই প্রতিষ্ঠা করে। ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ সমবিশ্বাসীদের এক রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে রাষ্ট্রকে না দেখে রাষ্ট্রকে এক বংশানুক্রমিক পিতৃতান্ত্রিক সত্ত্ব হিসাবেই দেখা হয়। এমনকি অ-মুসলমান নারীর গর্ভজাত সন্তানও সিংহাসনের অধিকারী। অথচ বংশানুক্রমিক রাজনৈতিক বিষয়টি ছিল একেবারেই ইসলাম বিরোধী। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্র বংশানুক্রমিক সম্পত্তিতে পরিণত হলেও সিংহাসন নিয়ে পারিবারিক কলহ, অন্তর্ঘাত বারবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। আকবরের বিরুদ্ধে তার ভাই এর বিদ্রোহ, পুত্র সেলিম এর বিদ্রোহ, জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে পুত্র খুসরুর এবং পিতার বিরুদ্ধে শাজাহানের বিদ্রোহ, শাহজাহানের বিরুদ্ধে তার পুত্রদের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে বিরোধ আমরা লক্ষ করি। তৃতীয়ত, মুঘল শাসকগণ খলিফার নিয়ন্ত্রণ মুক্ত হয়েই চরম রাষ্ট্রক্ষমতা ব্যবহার করেছেন। বাবুর নিজেকে বাদশাহ বা সার্বভৌম হিসেবেই ঘোষণা করেন, নিজের নামে খুৎবা উচ্চারণ করেন এবং মুদ্রাতেও মাত্র প্রথম চার খলিফার নাম উল্লেখ করেন। হুমায়ুন যদিও নিজেকে খলিফা বলে প্রচার করেননি তথাপি তৈমুর বংশধর হিসেবে নিজেকে সর্বশক্তিমান বলে মনে করতেন। সম্রাট আকবর ও এই ঐতিহ্যেরই অনুসরণ করেন এবং নিজেকে 'সর্বশক্তিমান', 'মনুষ্য আকারে দেবতা' বলে মনে করতেন। আকবরের মত জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান সার্বভৌম ক্ষমতাকে সরাসরি আল্লার দান বলে মনে করতেন। একমাত্র আওরঙ্গদেব ধর্মীয় ব্যাপারে মক্কার প্রাধান্য মেনে ১৬৮৪ খ্রীঃ মক্কায় শরীফের কাছে উপঢৌকন পাঠালেও রাজনৈতিক কর্তৃত্বের ব্যাপারে ছিলেন পুরোপুরি স্বাধীন। চতুর্থত, মুঘল শাসকদের কাছে ধর্মের চেয়ে রাজনীতিই প্রধান বিষয় ছিল। রাজনৈতিক প্রয়োজনের তাগিদে তাই বাবুর সুন্নি মতাবলম্বী হয়েও শিয়া মতাবলম্বীদের মত মাথায় টুপি/তাজ ব্যবহার, শিয়াদের মত খুৎবা উচ্চারণ, আলি মুর্তাজার নামে প্রার্থনা করতেন। শিয়া-সাহায্যের প্রয়োজন যখন মিটে যায় তখন বাবুর পুনরায় তার আগের অর্থাৎ সুন্নি মতে ফিরে যান। বাবুরের মত হুমায়নুও রাজনৈতিক প্রয়োজনে পারস্যের সাহায্যের সময় শিয়া মতের প্রতি আনুগত্য দেখান যদিও তিনি বাবুরের মত ছিলেন সুন্নি মতাবলম্বী। পঞ্চমত, মুঘল শাসকগন ধর্মের তুলনায় রাজনীতিকে বেশী গুরুত্ব দিলেও রাজনীতির উৎস হিসেবে আল্লাহতালা তথা ধর্মকে মেনে নেন। পার্থক্য হল, এখানে মুঘল শাসকগণ আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে নিজেদের মনে করতেন অর্থাৎ আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে সম্রাট সরাসরি ভাবে আল্লার কাছ থেকে ক্ষমতা লাভ করেন। সুতরাং তিনি একমাত্র আল্লাহর কাছে দায়বদ্ধ; অন্যকোনও ব্যক্তি বা আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে খলিফার কাছে দায়বদ্ধ নন। শাসক হিসেবে তার ক্ষমতা অনিয়ন্ত্রিতও অবিভাজ্য। ষষ্ঠত, মুঘল শাসকগণ পূবনির্ধারিত কোনও তত্ত্ব বা ধারণার চেয়ে বাস্তব পরিস্থিতিকে বেশী গুরুত্ব দিতেন। তাঁরা জানতেন ভারতবর্ষ শুধুমাত্র শিয়া সুন্নির মতাবলম্বী মুসলমানের বাসস্থান নয়। ভারতের জনসংখ্যার বড় অংশই হিন্দুসম্প্রদায়ের যারা আবার বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত। এছাড়া রয়েছে খ্রীষ্টান, ইহুদী, বৌদ্ধ, জৈন ও অন্যান্য আদিম জনগোষ্ঠী। এরকম এক বিচিত্র ও বহুধর্মী জনগোষ্ঠীতে কোনও এক বিশেষ সম্প্রদায়ের ব্যবস্থাপনা চালু করলে তা বিদ্রোহের পথকেই প্রশস্ত করবে। মুঘল শাসকগণ এব্যাপারে যথেষ্ঠ সতর্ক ছিলেন। ভারতে রাষ্ট্রপরিচালনার ব্যাপারে বাবুর হুমায়ুনকে যে পরামর্শ দেন তার মধ্যে এ ব্যাপারটি গুরুত্বসহকারে বিবেচিত হয়েছে। জাহাঙ্গীরও ভারতীয় দর্শন ও আচার ব্যবস্থার সম্পর্কে ছিলেন যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল। আরবী ভাষায় পরিবর্তে পার্সী ভাষার ব্যবহার

খ্রীষ্টানদের ধর্মান্তরিতকরণে অনুমতি প্রদান, জিযয়া এবং অন্যান্য তীর্থকর রদ, সামরিকও প্রশাসনিক বিভাগের নিম্ন থেকে উচ্চপদে অ-মুসলমানদের নিয়োগ, অ-মুসলমান সম্প্রদায়ের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন, প্রভৃতি বিষয়গুলি ভারতের মুঘল শাসনকে এক ভিন্ন মাত্রা দান করেছে যা পৃথিবীর অন্যান্য মুসলমান শাসনে বিরল এবং সম্ভবত একারনেই গোঁড়া রক্ষণশীল মুসলমান সম্প্রদায় মুঘল শাসনকে অ-ধর্মীয় বলে চিহ্নিত করেছেন।

৩৫.৭.৪ মুঘলশাসিত ভারতে চরম রাজতন্ত্র গড়ে ওঠার কারণসমূহ

মুঘল শাসিত ভারতে চরম ক্ষমতাসম্পন্ন রাজতন্ত্র গড়ে ওঠার পিছনে কয়েকটি কারণ এর উল্লেখ করা যেতে পারে। এপ্রসঙ্গে আমরা একই সময়ে ইউরোপে রাজতন্ত্রের ক্ষমতার সঙ্গে এক তুলনামূলক আলোচনায় যাব। প্রথমত, মুঘল শাসকগণ ছিলেন বহিরাগত এবং যুদ্ধের মাধ্যমে ভারতের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার করেন। একারণে মুঘল রাজতন্ত্র ছিল সামরিক শাসনের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভারতের পরাধীন শাসকগণ বা গোষ্ঠীসমূহ এই শাসন থেকে মুক্ত হবার জন্য বারবার সচেষ্ট হয়েছেন। এর ফলে মুঘল শাসকগনকেও সামরিক শাসননির্ভর কেন্দ্রীভূত ক্ষমতাপ্রবণ হতে হয়েছে। দ্বিতীয়ত, মধ্যযুগীয় ইউরোপের ইতিহাসে দেখা যায় সামন্তপ্রভুদের প্রাধান্যও কর্তৃত্ব। কিন্তু ভারতে অনুরূপ কোনও প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি। পরিবর্তে ভারতে জাতভিত্তিক স্তরবিন্যস্ত সমাজ ব্যবস্থায় শাসকের সঙ্গে ধর্মযাজকদের (হিন্দু ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণদের) এক সমঝোতা দেখা যায়। জমি অনুদান, গ্রামদান, মন্দির প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির মাধ্যমে শাসক চেয়েছেন যাজক সম্প্রদায়কে নিয়ন্ত্রনে রাখতে। রাজা এবং যাজক সম্প্রদায় পরস্পর পরস্পরের সহায়ক হিসেবে অবস্থান করেছেন এবং অস্ত্রের শাসনও শাস্ত্রের শাসন পরস্পর বিরোধী হয়ে ওঠেনি। মুঘল শাসকগণ এই ব্যবস্থাকেই মুলত অনুসরণ করেছেন। মুখল শাসকদের ক্ষমতার প্রতিযোগী কোন নির্দিষ্ট অভিজাততন্ত্র না থাকায় সম্রাট অপ্রতিহত ভাবেই ক্ষমতা প্রয়োগ করে গেছেন; রাজ্যের কোনও অংশে বিদ্রোহ দেখা দিলে তা কঠোরভাবে দমনে সক্রিয় হয়েছেন। বিপরীতভাবে, স্বৈরাচারী রাজার হাত থেকে নিজগোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের ক্ষমতা রক্ষার উদ্দেশ্যে ইউরোপে অভিজাতগোষ্ঠী সব সময়েই সজাগ এবং জনসমর্থন আদায়ের তাগিদে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতেও তৎপর। এর ফলে ইউরোপে রাজতন্ত্র কমবেশী নিয়ন্ত্রিত। তৃতীয়ত, ইউরোপে রাজার পক্ষে স্বাধীনভাবে জমি বা অন্যান্য বিষয়ে কর আরোপের ক্ষমতা ছিল সীমিত। যুদ্ধের মত ব্যাপক খরচ মেটানোর জন্য রাজাকে সামন্ত প্রভুদের উপর নির্ভর করতে হত এবং এর বিনিময়ে সামন্ত প্রভুরাও বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা আদায় করে নিত; কিন্তু ভারতে মুঘল শাসকদের কর আদায়ের ক্ষমতা ছিল প্রত্যাক্ষ এবং চূড়ান্ত। তাছাড়া লুন্ঠন, যুদ্ধজয়ে প্রাপ্ত সম্পদ রাজকোষকে সমৃদ্ধ করত। এর ফলে মুঘল শাসকগণকে আর্থিক ব্যাপারে সামন্তপ্রভুর মতো কোন গোষ্ঠীর উপর নির্ভর করতে হয়নি। চতুর্থত, মুঘল রাষ্ট্রে বেতনভুক সামরিক বাহিনীর উপস্থিতি শাসককে সৈন্যের জন্য রাজ্যের মধ্যে অপরের উপর নির্ভরশীল করে তোলেনি। সামরিক বাহিণীর কর্মীগণ বেতনও যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ভাগ পেত। এর ফলে সামরিক বাহিনীর কাছে রাজ্যজয়ের বিষয়টি ছিল লাভজনক ও কাম্য। অপরদিকে ইউরোপের শাসকগনের সামরিক সাহায্যের জন্য সামন্তপ্রভুদের উপর নির্ভর করতে হত। পঞ্চমত, ইউরোপে গোষ্ঠী অধিকার সংরক্ষিত করার ব্যাপারে পরিষদের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ, এই পরিষদই আইনের প্রকৃতি, কর

ধার্য বা বাতিলের সম্মতি জানাত। এই পরিষদের সদস্যগণ পুরোমাত্রায় রাজা কর্তৃক মনোনীত নয়। বরঞ্চ বিভিন্নগোষ্ঠীর স্বার্থবহ। মুঘল শাসিত ভারতে অনুরূপ কোন পরিষদের অস্তিত্ব ছিল না। মুঘল শাসকের দরবারে সদস্যগণ শাসক কর্তৃক মনোনীত এবং সম্রাটও এই সদস্যদের মতামত গ্রহণে বাধ্য ছিলেন না। ষষ্ঠত, চার্চ ও রাষ্ট্রের মধ্যেকার বিরোধ ইউরোপের ইতিহাসে যে গতি সঞ্চার করেছিল ভারতে তা ছিল অনুপস্থিত। সুলতানী আমলের শেষ দিক থেকেই মুঘল শাসকগণ ছিলেন সুন্নি মতাবলম্বী। সম্রাট ও উলেমা উভয়েই ইসলামের রক্ষা ও সম্প্রসারণের ব্যাপারে একমত। কিন্তু সম্রাটগণ বহুক্ষেত্রেই উলেমাদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করে নিজ মতকে কার্যকর করেছেন। উলেমাগণ ও আর্থিক ব্যাপারে রাজকোষের উপর ছিলেন একান্তভাবে নির্ভরশীল। সপ্তমত, ভারতে হিন্দু ও মুসলমান (বড় অংশই ধর্মান্তরিত) উভয় সম্প্রদায়ই বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রকে স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান বলে মনে করত। একারণে আইনের রক্ষাবর্তা ও প্রয়োগ কর্তা হিসেবে রাজতন্ত্রের বিকল্প কোন রাষ্ট্রব্যবস্থা বা তত্ত্ব সেসময় ভারতে গড়ে ওঠেনি। সর্বোপরি, মুঘলশাসিত ভারতের আয়তন ছিল বিশাল। যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব, ভাষা ও সংস্কৃতির ভিন্নতা, সর্বজনগ্রাহ্য শিক্ষা ব্যবস্থার অনুপস্থিতি সংবদ্ধ দৃঢ় কোনও জনমত গড়ে তোলার বা আন্দোলন পরিচালনা করার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। এ সমস্ত কারণে মুঘল ভারতে রাজতন্ত্র নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র হিসেবে গড়ে ওঠার পরিবর্তে গড়ে উঠেছে এক চরম কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা সম্পন্ন রাজতন্ত্র।

৩৫.৭.৫ ইসলামীয় রাষ্ট্র দার্শনিকের আলোচনায় রাষ্ট্র ঃ মুঘলপর্ব

এর আগের আলোচনায় আমরা দেখেছি কিভাবে আরবকেন্দ্রিক ইসলামীয় রাষ্ট্র বাবস্থা ও রাষ্ট্রদর্শন দামাস্কাস, বাগদাদ, সমরখন্ড এবং ইস্পাহানের ঐতিহ্যে ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হতে থাকে। এই পরিবর্তিত রাষ্ট্রদর্শন ভারতের মাটিতে এসে নতুনকরে আর এক পরিবর্তনের মুখোমুখী হয়। দামাস্কাস, বাগদাদ ও সমর-খন্ডের ঐতিহ্য যেখানে সুন্নিভাবাপন্ন, ইরানের ঐতিহ্য সেখানে শিয়াভাবাপন্ন। এই উভয় ঐতিহ্যই বিদেশের মাটিতে আবার পরিবর্তিত হতে থাকে। ভারতে যেহেতু বিভিন্ন ধর্মীয় ও সংস্কৃতি সম্পন্ন জনগোষ্ঠী বাস করে এবং মুসলমান জনগোষ্ঠী তুলনায় অনেক কম সেহেতু বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে না নিলে রাষ্ট্রপরিচালনায় যে এক ব্যাপক সংকট দেবে সে সম্পর্কে ভারতের মুঘল শাসকগণ ছিলেন যথেষ্ট সতর্ক। এবং একারণে তাঁরা এমন অনেক পথই অনুসরণ করেছেন যা ইসলামের উদ্ভবের প্রথমদিকের মুসলমান শাসকদের অনুসৃত নীতির বিরোধী। এই পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রের তথা রাষ্ট্রশাসকের কী করা উচিত সে সম্পর্কে এসময়ের মুসলমান রাষ্ট্রদার্শনিকদের রচনায় বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হয়েছে। এসময়ের অন্যতম তাত্ত্বিক হিসেবে আমরা আবুল ফজল এর রাষ্ট্র সম্পর্কিত দর্শন নিয়ে আলোচনা করব।

মধ্যযুগে ভারতের অন্যতম তাত্ত্বিক আবুল ফজল (খ্রীঃ ১৫৫১-১৬০২) আকবরের শুধুমাত্র পার্ষদই ছিলেন না, অত্যন্ত ঘনিষ্ঠও ছিলেন। তিনি শাসক আকবরকে ইসলামের রক্ষক হিসেবে না দেখে সকল মানুষের কাছেই গ্রহণীয় শাসক হিসেবে ভূমিকা পালন করতে পরামর্শ দেন। আবুল ফজল এর মতে, সম্রাট যদি সব শ্রেণীর মানুষকে ও সব ধর্মীয় গোষ্ঠীকে সমানভাবে না দেখেন তাহলে তিনি ঐপদের যোগ্যই নন। 'আইন-ই-আকবরী'গ্রন্থে আবুল ফজল-রাষ্ট্র ও রাজনীতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তাঁর

চিন্তাভাবনায় গ্রিক এবং ভারতীয় দর্শনের ছাপ অত্যন্ত স্পষ্ট।

আবুল ফজল রাজতন্ত্রকেই সমর্থন করেন। রাষ্ট্র তথা রাজতন্ত্রের উদ্ভবের কারণ অন্বেষণে তিনি মানুষের প্রকৃতি বিশ্লেষণে অগ্রসর হন। এব্যাপারে তিনি ঐতিহাসিক পদ্ধতিকেই অনুসরণ করেন। তাঁর মতে, জগতের অধিকাংশ মানুষই হ'ল স্বার্থপর হাল্কামনের মানুষ এবং একারণে সামান্য কিছু পাবার জন্য আদর্শ বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত নয়। এর ফলে সমাজে মানুষের মধ্যে কলহ অবশ্যম্ভাবী। এই কলহে দুনিয়া সবসময়েই অবদমিত ও বঞ্চিত হতে বাধ্য। মানুষের এই চরিত্র বিশ্লেষণে ফজলের সঙ্গে ভারতীয় দার্শনিক কৌটিল্যের মাৎসন্যায়ের ধারণা এবং পাশ্চাত্য দার্শনিক টমাস হবসএর প্রকৃতিরাজ্যের ধারণা ও ম্যাকিয়াভেলীর মানুষের চরিত্র চিত্রণের সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। আবুল ফজলের মতে মানুষের এই বিশৃঙ্খল অবস্থা থেকে একমাত্র মুক্তি ঘটতে পারে যদি সমাজ কোনও সর্বশক্তিমান শাসকের দ্বারা শাসিত হয়। রাষ্ট্র তথা সর্বশক্তিমান শাসকের কাছে আনুগত্যের মাধ্যমে মানুষ তার নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা ফিরে পাবে। সমাজের মধ্যেও শৃঙ্খলা ও স্থায়িত্ব বজায় থাকবে। ফজলের মতো আল ফারাবিও মনে করেন, অরাজক অবস্থা থেকে পরিত্রানের জন্যই রাষ্ট্র তথা রাজতন্ত্রের সৃষ্টি। ফারাবি ও টমাস হবস এর মতো এক চুক্তির কথা বলেন যেখানে মানুষ নিজেদের মধ্যে এক চুক্তি করে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের সৃষ্টি করেছে এবং তার হাতে সমাজ তথা নিজেদের শাসনকরার ক্ষমতা অর্পন করেছে।

আবুল ফজল অবশ্য রাষ্ট্রসৃষ্টির পিছনে চুক্তির পরিবর্তে ঈশ্বরের ইচ্ছার কথা বলেন। ফজলের মতে, রাজতন্ত্র হল ঈশ্বর তথা আল্লারই দান এবং তখনই তা সৃষ্টি হয় যখন কয়েক হাজার ভালোগুণ কোন ব্যক্তির মধ্যে সঞ্চিত হয়। আবুল ফজলের মতে, ঈশ্বরের কাছে সবচেয়ে মর্যাদার বিষয় হ'ল রাজপদ। এব্যাপারে তিনি সুলতান বা রাজার উপাধি পাদশাহ শব্দটির অর্থ ব্যাখ্যা করেন। পাদ শব্দটির অর্থ হ'ল স্থায়িত্ব এবং ভোগদখল। রাজার যদি কোনও অস্তিত্ব না থাকত তাহলে সমাজ থেকে বিরোধ স্বার্থপরতা প্রভৃতিকে কখনই দূর করা যেত না। মানুষ বিশৃঙ্খলা এবং লালসায় ধ্বংশের পথেই এগিয়ে যেত। এই বিশ্ব, বড় বড় বাজার তার সমৃদ্ধি হারিয়ে মরুভূমিতে পরিণত হত। সম্রাটের ন্যায়ের আলোকে কিছু মানুষ আনন্দের সঙ্গেই আনুগত্যের পথ বেছে নেয়; অন্যেরা শাস্তির ভয়ে হিংসা থেকে বিরত থাকে। শাহ শব্দটির দ্বারা বোঝানো হয় সেই ব্যক্তিকে যে অপরকে অতিক্রম করে গেছে। আবার এই শব্দটি স্বামী বা প্রভু অর্থেও প্রয়োগ করা হয়। সম্রাট হলেন স্বামী বা বিশ্বপতি যেখানে স্ত্রী এই পৃথিবী যা রাজার কাছে অনুগত থাকবে এবং স্তুতি করবে। এই উপমাটির মধ্যে আবুল ফজলের নারী সম্পর্কে ভাবনাও ধরা পড়েছে। রাজনীতি শুধুমাত্র পুরুষের জন্য; নারী সেখানে আনুগতা মাত্র।

আবুলফজল রাজপদকে ঈশ্বরের কাছ থেকে বিচ্যুরিত আলো, সূর্যের রশ্মির সঙ্গে তুলনা করেছেন, যা বিশ্বকে আলোকিত করে। আবুল ফজল ঈশ্বরের এবং সম্রাটের মধ্যে কোনও মধ্যস্থতাকারীর (যেমন পয়গম্বর বা খলিফা) উপস্থিতিকে স্বীকার করেননি। তাঁর মতে, ঈশ্বরের এই দ্যুতি কোনও মধ্যস্থতাকারী ব্যক্তি ছাড়াই সরাসরি সম্রাটের কাছে পৌঁছায়। এই দ্যুতির মাধ্যমে যে সমস্ত মহৎ গুণগুলি সম্রাটের মধ্যে সঞ্চারিত হয় তা হ'ল (এক) প্রজাদের প্রতি এক পিতৃসুলভ ভালবাসা। রাজাকে ভালবাসার মধ্যে দিয়ে হাজার হাজার মানুষ বিশ্রামের জায়গা খুঁজে পায়; সম্প্রদায়গত পার্থক্য বিরোধেরও ঝড় তোলে না।

জ্ঞানদিয়ে সম্রাট সে যুগের মূলভাবকে বুঝতে পারেন এবং সেই অনুযায়ী কাজের পরিকল্পনা তৈরী করেন। (দুই) এক বড় মাপের হৃদয় ঃ সম্রাটের বড় মাপের হৃদয় সম্রাটকে পরমতসহিষ্ণু করে তোলে। ছোট বড় সকলের দাবীই তিনি মেটাতে দেরী করেন না। (তিন) ঈশ্বরের প্রতি ক্রমবর্ধমান বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের ফলে যখনই রাজা কোন কাজ করেন ঈশ্বরকেই সেই কাজের প্রকৃত কর্তা হিসেবে মনে করেন। (চার) প্রার্থনা এবং ভক্তি। সাফল্যের সময়েও সম্রাট ঈশ্বরের কথা ভুলে যান না। ইচ্ছার দ্বারা চালিত না হয়ে তিনি যুক্তির দ্বারাই চালিত হন এবং যা গৌণ তার পিছনে সময় নষ্টও করেন না। অন্ধ ক্রোধ যাতে পেয়ে না বসতে পারে তার জন্য সম্রাট ন্যায়ের প্রতি অনুগত থাকেন। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা এবং অবিচল ভক্তিই রাজাকে ন্যায়ের প্রতি অনুরক্ত করে তোলে।

ইসলাম ধর্মবিশ্বাসীদের সঙ্গে এক সাম্যের কথা বললে ও আবুল ফজলের রচনায় আমরা এক শ্রেণীবিন্যস্ত সমাজের চেহারা দেখি এবং এ ব্যাপারে ভারতীয় জাত ব্যবস্থার প্রভাব থাকতে পারে। আবুল ফজলের রচনাতে সমাজে চারটি শ্রেণীর উল্লেখ রয়েছে। এই চারটি শ্রেণীকে আবুল ফজল আগুন, বাতাস, জল ও মাটির সঙ্গে তুলনা করেছেন। প্রথম শ্রেণীটি হল যোদ্ধা, যারা রাজনৈতিক কাঠামোয় আগুনের ধর্মবিশিষ্ট। এদের শিখা বুদ্ধি দ্বারা চালিত হয়ে বিরোধ ও বিদ্রোহকে দগ্ধ / ধ্বংস করে কিন্তু প্রদীপ হয়ে এই বিক্ষুব্ধ পৃথিবীকে আলো দেখায়। দ্বিতীয় শ্রেণী হল বণিক ও কারীগর শ্রেণী যাকে বাতাসের সঙ্গে তুলনা করা যায়। বাতাস যেমন সর্বত্রগামী এরাও সেরকম সর্বত্রগামী। এদের শ্রম এবং বিচরণে ঈশ্বরের দান (দ্রব্য সামগ্রী) সার্বজনীন হয়ে ওঠে অর্থাৎ সবার হাতে পৌছায় এবং পরিতৃপ্তির বাতাস জীবনের গোলাপকুঞ্জকে স্নিগ্ধ করে। তৃতীয় শ্রেণী হল জ্ঞানী যেমন দার্শনিক, চিকিৎসক, গণিতজ্ঞ, জ্যামিতি বিশারদ এবং জ্যোর্তিবিদ যাঁদেরকে জলের তুলনা করা যায়। এদের কলম এবং বিজ্ঞতা থেকে তৃষিত পৃথিবীতে ঝর্ণা নামে এবং সৃষ্টির উদ্যান জলসিঞ্চনে সতেজ হয়ে ওঠে। চতুর্থ শ্রেণী হ'ল কৃষক এবং শ্রমিক যাঁদেরকে মাটির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। এদের প্রচেষ্টায় জীবন শষ্য-পূর্ণতা পায় এবং এদের শ্রম থেকে শক্তি ও শান্তি প্রবাহিত হয়। সম্রাটের অবশ্য করণীয় কর্তব্য হল প্রত্যেকে তার নিজের কাজটুকু করেছে কিনা দেখা। এভাবে সকলে যদি ব্যক্তিগত দক্ষতার সঙ্গে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা মিশিয়ে কাজ করে তাহলে রাষ্ট্র সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। আবুল ফজলের এই ব্যক্তব্যে ভারতীয় জাত ব্যবস্থার প্রতিফলনই লক্ষ করা যায়। যদিও এই শ্রেণীগুলিতে অংশগ্রহণ জাত ব্যবস্থার মতো বংশানুক্রমিক কিনা সম্পর্কে আবুল ফজল কোন বক্তব্য রাখেননি। হয়ত এখানে আবুল ফজলের উপর গ্রিক দার্শনিক প্লেটোর প্রভাবই প্রধান।

৩৫.৮ ইসলামীয় রাষ্ট্রতত্ত্বে শাসকের কার্যাবলী

আমরা রাষ্ট্রসম্পর্কে ইসলামীয় তত্ত্ব আলোচনা করতে গিয়ে দেখেছি হজরত মুহম্মদ একদিকে ছিলেন নতুন গড়ে ওঠা সম্প্রদায়ের প্রধান পরিচালক, সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক, প্রধান আইনপ্রনয়নকারী, ন্যায় বিচারের উৎস, প্রধান বিচারপতি ও যাবতীয় ক্ষমতার ও প্রভুত্বের অধিকারী। পরবর্তীকালে ইসলামের সম্প্রসারণের যুগে রাষ্ট্রের তথা শাসকের কোন কোন কাজগুলি করা উচিত সে সম্পর্কে মুসলমান তাত্ত্বিকগণ মতামত প্রকাশ করেন। একাদশ শতকের বাগদাদের অন্যতম তাত্ত্বিক অল-মওয়ার্দী (খ্রীঃ ৯৭৪-

১০৫৮) সম্রাটের ক্ষমতা ও কার্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে নিম্নোক্ত কাজগুলির উল্লেখ করেন। মওয়ার্দীর মতে, রাষ্ট্রশাসকের অন্যতম কাজ হল ঃ

১) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও ধর্মের রক্ষা,

২) আইনগত বিরোধের নিষ্পত্তিকরা,

৩) ইসলাম ভূখন্ডকে রক্ষা করা,

৪) দুষ্কৃতকারীদের শাস্তি দেওয়া,

৫) সীমান্তরক্ষায় সৈন্য মোতায়েন করা,

৬) ইসলাম গ্রহণে বা ইসলামের প্রতি বশ্যতাস্বীকারে অন্যর প্রতি যুদ্ধ বা জেহাদ ঘোষণা করা,

৭) কর সংগ্রহ ও কর ব্যবস্থা পরিচালনা করা,

৮) কর্মচারীদের বেতনব্যবস্থা ও রাজকোষ পরিচালন,

৯) সুযোগ্য কর্মচারী নিয়োগ,

১০) সরকারী কাজগুলির তদারকী করা।

ভারতে মুঘল শাসকগণ ছিলেন অবিভাজ্য ও অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী। আবুল ফজল বা বদাউনীর রচনায় মুঘল শাসকদের কাজগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়। এই কাজগুলিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। (১) ধর্মসংক্রান্ত এবং (২) রাজনৈতিক ।

ধর্মের অন্যতমরক্ষক হিসেবে সম্রাটের কাজ হল-

১) শরিয়ত তথা ধর্মীয় আইনকে রক্ষা করা,

২) ধর্মের অভিভাবক হিসেবে কাজ করা,

৩) ইসলামের মতাদর্শ প্রচার করা,

৪) মসজিদ প্রতিষ্ঠাও রক্ষণাবেক্ষণ করা, মসজিদ সংলগ্ন মাদ্রাসাগুলি রক্ষণাবেক্ষণ করাও উলেমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করা

৫) মন্দির, মসজিদ, মহাপুরষ প্রভৃতির ক্ষেত্রে আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা করা। মুঘল শাসকগণ ও হিন্দুদের মন্দির নির্মানে বা পরিচালনায় আর্থিক অনুদান বা জমি বন্দোবস্ত করতেন এমন নজীর ও পাওয়া যায়।

৬) ভিখারীদের সাহায্যদান। আবুল ফজলের রচনা থেকে জানা যায় বাদশাহের নজরে পড়া প্রত্যেক ভিখারী সাহায্য পেতেন। বদাউণী উল্লেখ করেন যে এই সাহায্য হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই পেতেন। খয়রাতপুর নামে বিভিন্ন সাহায্যস্থান ও গড়ে তোলা হয়।

সম্রাটের রাজনৈতিক কাজগুলি হল ঃ—

১) ইসলাম ভূখন্ডের সম্প্রসারণ,

২) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষা,

৩) সুশাসন প্রতিষ্ঠা,

৪) আশ্রিতদের এমনকি অন্যধর্মের হলেও, নিরাপত্তার বিধান করা,

৫) জিযয়া কর সংগ্রহ,

উপরের কাজগুলি ছাড়াও মুঘল সম্রাটগণ কতকগুলি বিশেষ সুযোগ সুবিধা ভোগ করতেন এবং সে ব্যাপারে ক্ষমতা প্রয়োগ করতেন। যেমন (এক) মুঘল রাষ্ট্র ব্যবস্থা একান্তভাবে রাজতান্ত্রিক হওয়ায় সম্রাট মাঝে মাঝে জনসমাজে দর্শন দিতেন যা ঝড়োকা-ই-দর্শন নামে পরিচিত। এই প্রথাটি আকবর চালু করেন। পরবর্ত্তীকালে জাহাঙ্গীর, শাহজাহান এবং আওরঙ্গজেব এই প্রথাটিকে প্রশাসনিক ও বিচার বিষয়ক কাজেও ব্যবহার করেন। আবুল ফজলের বিবরণে জানা যায়, প্রতিদিন সকালে সূর্যোদয়ের পর সম্রাট ঝাড়োকায় উপস্থিত হলে সৈনিক, ব্যবসায়ী, শিল্পী, মজদুর, দীন দুঃখী জনসাধারণ সম্রাটের দর্শন লাভের জন্য তাড়াহুড়ো ও দৌড়ঝাঁপ শুরু করত। আবুল হামিদখান লাহোরীর মতে, শাহজাহান ঝাড়োকা দর্শনের পর জনসাধারণের অভাব অভিযোগ শুনতেন,ঝাড়োকা-ই-দিওয়ানে প্রবেশ করে সরকারীকাজের তদারকি করতেন। বদাউনীর মতে, আকবর প্রবর্তিত এই ঝাড়োকাদর্শনে হিন্দু প্রভাব রয়েছে। যদুনাথ সরকারের মতে, ঝাড়োকাদর্শন হিন্দু প্রথা বলে আওরঙ্গজেব এই প্রথা পরবর্ত্তীকালে বাতিল করেন।

দ্বিতীয়ত, সম্রাটের প্রতি আনুগত্যের নিদর্শনস্বরূপ কুর্নিশ ও তশলীম ব্যবস্থা চালু করা হয়। সম্রাটের সামনে প্রজাদের নতজানু হয়ে আনুগত্য দেখাতে হ'ত। তৃতীয়ত, একমাত্র নবাবই উপাধি বিতরণের অধিকারী ছিলেন। চতুর্থত, মুদ্রা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রন পরিচালন ও নতুন মুদ্রার চালু করার ক্ষেত্রে সম্রাটের ক্ষমতা ছিল চূড়ান্ত। আবুল ফজলের রচনায় ২৬ রকমের সোনার মুদ্রা, ৯ রকমের রূপার মুদ্রার উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়া তামার মুদ্রাও চালু ছিল। মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ ছিল সার্বভৌম ক্ষমতার প্রতীকস্বরূপ। পঞ্চমত, রাষ্ট্রে কোনও নির্দেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে সম্রাট শীলমোহর ব্যবহার করতেন। সম্রাটের শীলমোহর অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে রক্ষা করা হ'ত। ষষ্ঠত, মৃত্যুদন্ড বা অনুরূপ কঠোর শাস্তিদান একমাত্র সম্রাট দিতে পারতেন। আবার কোনও বন্দীর প্রতি ক্ষমা বা মুক্তিদান সম্রাটের বিশেষাধিরার বলে গণ্য হত। ব্যক্তিগতভাবেও সম্রাটগণ বিচার করতে পারতেন এবং এব্যাপারে সপ্তাহে একদিন নির্ধারিত ছিল। যেমন আকবর বৃহস্পতিবারে, জাহাঙ্গীর মঙ্গলবারে এবং শাহজাহান বুধবারে ব্যক্তিগতভাবে বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। সপ্তমত, সম্রাটের প্রকাশ্য দরবার অনুষ্ঠিত হওয়ায় কতকগুলি বিশেষ সুবিধা দেখা যায়। যেমন এতে সম্রাটও প্রজাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগ ঘটে। সম্রাটের পক্ষে ও গোটা দেশের অবস্থা জানার যেমন সুযোগ ঘটে অপরদিকে উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের প্রভাব ও এতে কমে। অষ্টমত, এ. কে. এম. আবদুল আলীম এর মতে খুৎবা, তিরাজ ও সিক্কাহ এই তিনটি ছিল রাজকীয় বিশিষ্ঠ সম্মান চিহ্ন। মুঘল শাসকগণ এই তিনটিকেই স্বাধীনভাবে ব্যবহার

করতেন। সিক্কাহ বা মুদ্রা সম্পর্কে আমরা এর আগেই আলোচনা করেছি। খুৎবা হ'ল সমবেত উপাসনায় ধর্মোপদেশ। দিল্লীর সুলতানগণ আব্বাসী খলিফাদের কাছ থেকে স্বীকৃতি নেওয়ায় খুৎবার প্রথমে খলিফার নাম উচ্চারণ করে পরে নিজেদের নাম উল্লেখ করতেন। কিন্তু মুঘল শাসকগণ খুৎবাতে খলিফাদের নাম উল্লেখ না করে নিজেদের নামই উচ্চারণ করতেন। তিরাজ এর অর্থ হল সুন্দর সূচের কাজ। সম্রাট সোনা রূপার কারুকার্যে সুন্দর পোষাকে সুসজ্জিত থাকতেন। নবমত, ইসলাম সমভ্রাতৃত্বের সাম্যতে বিশ্বাসী হলেও ধর্মীয় উপাসনাগৃহে যাওয়ার সময় একমাত্র সম্রাটই পাল্কী ব্যবহার করতে পারতেন।

৩৫.৯ সারাংশ

এই এককটিতে প্রাক্-ইসলামীয় পর্বে আরবদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় প্রকৃতি, হজরত মুহম্মদ ও মুহম্মদ পরবর্তী সময়ে ইসলামীয় চিন্তার উদ্ভব ও বিকাশ, ভারতে ইসলামের আগমন, সুলতানী ও মুঘল পর্বে ভারতে ইসলামীয় চিন্তার গঠন ও প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে প্রাধান্য পেয়েছে মুসলমান আমলে ভারতে রাষ্ট্রব্যবস্থা, আদর্শ, রাষ্ট্রশাসকের ভূমিকা, ধর্ম ও রাজনীতির সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়গুলি।

৩৫.১০ অনুশীলনী

(১) রাষ্ট্র সম্পর্কে আবুল ফজল এর মতামত ব্যক্ত করুন।

(২) খলিফাতন্ত্র সম্পর্কে ইসলামীয় রাষ্ট্রদার্শনিকদের বক্তব্যগুলি উল্লেখ করুন।

(৩) রাষ্ট্রও রাজনীতি সম্পর্কে জিয়াউদ্দিন বরণীর মতামত ব্যক্ত করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন ঃ

(১) খলিফাতন্ত্র কাকে বলে ?

(২) কুর-আন কোন সময় গ্রথিত হয় ?

(৩) ইসলামীয় দর্শন অনুযায়ী সুলতানকে মান্য করার কারণ কী ?

(৪) ইসলামীয় দর্শন অনুযায়ী রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক কী ?

৩৫.১১ গ্রন্থপঞ্জী

এ. কে. এম. আবুল আলীম (১৯৭৬/১৯৯২) - ভারতে মুসলিম শাসনব্যবস্থার ইতিহাস, ঢাকা, বাংলা একাডেমী।

শেখ মুহম্মদ লুৎফর রহমান (১৯৭৭/১৯৮৪)- ইসলামঃ রাষ্ট্রও সমাজ, ঢাকা, বাংলা একাডেমী

Ainslie T. Embree (ed) (1958/1992) - Sources of Indian Tradition. Vol. I. New Delhi, Penguin Books.

M. L. Roychowdhury (1951) - The State and Religion in Mughal India, Calcutta Indian Publicity Society.

R.P. Tripathi - (1936/1992) - Some Aspects of Muslim Administration, Allahabad Central Book Deport.

একক ৩৬ □ সুফিবাদ ও ভক্তিআন্দোলন

গঠন

৩৬.০ উদ্দেশ্য

৩৬.১ প্রস্তাবনা

৩৬.২ সুফিবাদ

- ৩৬.২.১ সুফিশব্দটির অর্থ
- ৩৬.২.২ সুফিবাদের বৈশিষ্ট্য
- ৩৬.২.৩ সুফিবাদের উদ্ভবের কারণ
- ৩৬.২.৪ ভারতবর্ষে সুফিবাদ
- ৩৬.২.৫ সুফিসাধকদের অবদান
- ৩৬.২.৬ জনকল্যানকর কার্যসম্পাদন
- ৩৬.২.৭ সাংস্কৃতিক সমন্বয়
- ৩৬.২.৮ ইসলামের প্রসার
- ৩৬.২.৯ রাজনীতি ও সুফি সাধক

৩৬.৩ মধ্যযুগে ভক্তিআন্দোলন

- ৩৬.৩.১ ভক্তি সাধনা কাকে বলে
- ৩৬.৩.২ ভক্তি সাধনার মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ
- ৩৬.৩.৩ ভক্তি আন্দোলনের উদ্ভবের কারণ
- ৩৬.৩.৪ ভক্তি আন্দোলনের উদ্ভবের কারণ ঃ ইসলামের প্রভাব
- ৩৬.৩.৫ ভক্তি আন্দোলনের উদ্ভবের কারণ ঃ ভারতীয় ধর্মীয় ঐতিহ্য ও পরিস্থিতি
- ৩৬.৩.৬ ভক্তি আন্দোলনের উদ্ভব ঃ মার্কসবাদী তাত্ত্বিকগণের বক্তব্য

৩৬.৪ দক্ষিণ ভারতে ভক্তি আন্দোলন

- ৩৬.৪.১ দক্ষিণ ভারতে ভক্তি আন্দোলন ঃ প্রথম পর্ব
- ৩৬.৪.২ দক্ষিণ ভারতে ভক্তি আন্দেলন ঃ দ্বিতীয় পর্ব

৩৬.৫ ভক্তি আন্দোলন ঃ মহারাষ্ট্র

৩৬.৬ ভক্তি আন্দোলন ঃ উত্তর ভারত

৩৬.৭ ভক্তি আন্দোলন ঃ পূর্ব ভারত

৩৬.৮ ভক্তি আন্দোলন ও নারী

৩৬.৮.১ ভক্তি সাধকগণের দৃষ্টিতে নারী

৩৬.৮.২ নারীর গতানুগতিক ভূমিকা অনুসারী ভক্তি সাধিকা

৩৬.৮.৩ নারীর গতানুগতিক ভূমিকা পালনে বিরোধী ভক্তি সাধিকা

৩৬.৯ ভক্তি আন্দোলনের ফলাফল

৩৬.১০ সারাংশ

৩৬.১১ অনুশীলনী

৩৬.১২ গ্রন্থপঞ্জী

৩৬.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠের মাধ্যমে আমরা যে বিষয়গুলি সম্পর্কে জানতে পারব তা হল—

(১) সুফিবাদ বলতে কী বোঝায় ও সুফিবাদের বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী;

(২) ভারতে সুফিবাদের প্রসার ও ভারতীয় সমাজে সুফিদরবেশদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান;

(৩) সুফিবাদের সঙ্গে ভক্তি আন্দোলনের সম্পর্ক ; ভারতে ভক্তিআন্দোলনের উদ্ভবে সুফিবাদের কোনও ভূমিকা আছে কিনা;

(৪) ভারতে ভক্তি আন্দোলনের উদ্ভবের কারণ;

(৫) ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে যেমন দক্ষিণভারতে, মহারাষ্ট্রে, উত্তর ভারতে ও পূর্বভারতে ভক্তি আন্দোলনের প্রকৃতি;

(৬) ভক্তি আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণ;

(৭) ভক্তি আন্দোলনের ফলাফল;

(৮) ভক্তি আন্দোলন যেহেতু কোন দেশ, কাল বা সীমানার মধ্যে আবদ্ধ নয় সেহেতু আমাদের যুগেও এই ভক্তি ভজনার কোন ধারা রয়েছে কিনা সে সম্পর্কে আমরা সচেতন হতে পারব। ভক্তি আন্দোলনের ইতিবাচক দিকগুলি, যেমন, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয়সাধন, জাতভেদের অবসান, সামাজিক সমতা প্রভৃতি বিষয়গুলি থেকে শিক্ষা নিতে পারব।

৩৬.১ প্রস্তাবনা

মধ্যযুগে ভারতে একদিকে সুফিবাদ বা ইসলামীয় মরমিয়া সাধনা, অপরদিকে ভক্তি সাধনা বা হিন্দু মরমিয়া সাধনার বিকাশ দেখা যায়। কমবেশী প্রায় একই সময়ে এই দুই মরমিয়া সাধনার বিকাশ ঘটায়

পন্ডিতগণ এই দুই ঘটনার, অর্থাৎ, সুফিবাদ ও ভক্তিআন্দোলনের মধ্যে কোনও সম্পর্ক আছে কিনা সে নিয়ে আলোচনা শুরু করেন। একদল পন্ডিত একটি ঘটনার কারণ হিসেবে অন্য ঘটনাটির উল্লেখ করেন। অর্থাৎ সুফিবাদে প্রেমের মধ্যদিয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে ব্যক্তির তথা ভক্তের ব্যক্তিগত সম্পর্কস্থাপন, মুক্তির জন্য ঈশ্বরের করুণা বা প্রসাদ ভিক্ষা প্রভৃতি বিষয়গুলি হিন্দুদর্শনের বিশেষভাবে বেদান্ত দর্শনের প্রভাব। ঠিক এর বিপরীত কথাটি শোনা যায় অপর একদল তাত্ত্বিকের থেকে যাঁরা মনে করেন, হিন্দু ভক্তি আন্দোলনের উদ্ভব ইসলামের একত্ববাদ, সামাজিক সাম্য প্রভৃতি ধারণাগুলি থেকে।

আবার বেশকিছু তাত্ত্বিক রয়েছেন যাঁরা সুফিবাদ ও ভক্তি আন্দোলনকে যথাক্রমে মুসলমান ও হিন্দু জনগোষ্ঠীর পারস্পরিক বিরোধীতা থেকে উদ্ভুত বলে মনে করেন। সুফিবাদের প্রসার ঘটেছে অস্ত্রের পরিবর্তে প্রেম ভালবাসা দিয়ে হিন্দুদের ধর্মান্তরিতকরণের জন্য। অপরদিকে ভক্তি আন্দোলনের উদ্ভব ঘটেছে ইসলামের হাত থেকে হিন্দু ধর্মকে বিশেষ করে ধর্মান্তরিতকরণকে বন্ধ করার জন্য।

তৃতীয় দলভুক্ত তাত্ত্বিকগণ মনে করেন মুসলমান এবং হিন্দু মরমীয়া সাধকগণ উভয় ধর্মেরই আনুষ্ঠানিকতা, গোঁড়ামি ও পরস্পর বিরোধীতাকে বর্জন করে দুই জনগোষ্ঠীর মধ্যে সমঝোতা ও মিলনের চেষ্টা করেছেন যদিও এই চেষ্টা ফলপ্রসু হয়নি উভয় ধর্মীয় গোষ্ঠীর রক্ষণশীল অংশের বিরোধীতায়।

আমরা এই এককে সুফিবাদ ও ভক্তি আন্দোলনের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করব। প্রথমে সুফিবাদ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। সুফিবাদ কাকে বলে, সুফি শব্দটি কোথা থেকে এসেছে, সুফিবাদের উদ্ভবের কারণ ও বিকাশ—প্রভৃতি বিষয়গুলি আলোচনায় থাকবে। ভক্তিসাধনা কাকে বলে, হিন্দু ভক্তি সাধনার উদ্ভবের কারণ, ভক্তি আন্দোলনের প্রকৃতি ও প্রসার সম্পর্কে আলোচনা করা হবে পরবর্তী পর্যায়ে । ভক্তি আন্দোলনের ফলাফল এর বিষয়টিও আমরা আলোচনা করব পরিশেষে।

৩৬.২ সুফিবাদ

সুফি শব্দটি সাধারণত ইসলামে মরমিয়া সাধনা ও সাধুসন্তদের নামের সঙ্গে জড়িত। এই সাধুসন্তদের প্রচলিত মতকেই সুফিবাদ বলা হয়। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতক নাগাদ এই শব্দটির ব্যবহার ব্যাপক ভাবে শুরু হতে থাকে; যদিও কারো মতে এই শব্দটি প্রাক্-ইসলামীয় যুগেতে আরবে প্রচলিত ছিল। ভারতে ইসলামের সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে সুফিবাদের ও বিকাশ লক্ষ করা যায়। আমরা এই অংশে সুফিবাদ নিয়ে আলোচনা করব। সুফি শব্দটির অর্থ, সুফিবাদ বলতে কী বোঝায়, সুফিবাদের উদ্ভবের কারণ, ভারতে সুফিবাদের প্রসার , ভারতের সামাজিক সাংস্কৃতিক কাঠামোয় সুফিবাদের অবদান প্রভৃতি বিষয়গুলি আমরা এখন আলোচনা করব।

৩৬.২.১ সুফি শব্দটির অর্থ

সাধারণ মত হ'ল সুফি শব্দটি এসেছে সুফ বা রুক্ষ পশম থেকে। মরমিয়া সাধকগণ রুক্ষ পশমের জোব্বা পরতেন বলে এই সাধুসন্তদের সুফি নামে অভিহিত করা হয়। গিব ইবনে সিরিন (মৃত্যু খ্রিঃ ৭২৯) এর মতে খ্রীষ্টান কৃচ্ছ সাধকগণ প্রথমে এই ধরনের পোষাক পরতেন। যিশু ভক্তদের অনুসরণ করে

মুসলমান সম্প্রদায়ের কঠোর সংযমীগণ ও এই ধরনের পোষাক ব্যবহার শুরু করেন। দ্বিতীয় মতে, সুফ শব্দটি উদ্ভব আরবি শব্দ সাফা অর্থাৎ পবিত্রতা থেকে। চারিত্রিক পবিত্রতা বা বিশুদ্ধি যেহেতু সুফি জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য সেহেতু এই ধরনের সাধকগন সুফিনামে পরিচিত হ'ন। তৃতীয় মত অনুসারে, সুফ শব্দটি শ্রেণী বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ সুফি হ'ল আল্লাহর নিকটবর্তী শ্রেণী। চতুর্থ মতে, সুফি শব্দটি এসেছে সুফফা (সমতল ছাদ) থেকে। হজরত মুহম্মদের বেশ কিছু সঙ্গী সংযমী জীবনযাপনের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। এঁদের কোন পরিবার বা গৃহ ছিল না। তাঁরা রসুলের নির্মিত মসজিদে বাস করতেন এবং সুফফা বা সমতল ছাদের উপর শয়ন করতেন। পঞ্চম মতটি অনুযায়ী, সুফি কথাটি এসেছে সাফাহ্ অর্থাৎ ছোট টিপি বা টিলা থেকে। এই ধরনের টিলায় একদল মুসলমান গূঢ়তত্ত্ব নিয়ে আলোচনায় সমবেত হতেন বলে এই ধরনের গোষ্ঠীকে সুফি বলা হত।

৩৬.২.২ সুফিবাদের বৈশিষ্ট্য

সুফি সাধকগণ প্রেম ও ভক্তির উপর তাদের মতকে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হবার আকাঙ্খায় প্রাতিষ্ঠানিকতা, আচার অনুষ্ঠান ইত্যাদির পরিবর্তে প্রেমের পথকেই বেশী পছন্দ করতেন। একদিকে স্রষ্টা বা আল্লাহ্র মধ্যে তীব্র ভালবাসা অপরদিকে এই ভালবাসার মাধ্যমে আত্মার উন্নতি - এই দু'ই ই সুফি সাধকদের লক্ষ্য। আধ্যাত্মিক জীবনের দিকে এগিয়ে যাওয়াকে বলা হয় 'যাত্রা' আর ঈশ্বরের অন্বেষণকারী হলেন যাত্রী/সালিক/ ভ্রমণকারী। এভাবেই যাত্রী/সালিক বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন স্তর ভেদ করে স্রষ্টার সঙ্গে মিলনের কাঙ্খিত লক্ষ্যে চালিত হ'ন। এবং অবশেষে পরমসত্তার সঙ্গে মিলনে স্বকীয়সত্তার বিনাশ ঘটান যাকে বলা হয় ফানা-ফিল-হকিকত। এই শেষস্তরে সুফি সাধক যখন আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতার পৌঁছে সবসময় স্রষ্টার বা আল্লার সঙ্গে মিলিত অবস্থায় থাকেন তখন তিনি 'বাকিবিল্লাহ' লাভ করেন। আল্লার মধ্যে সুস্থিতিই সুফির চরম লক্ষ্য।

সুফিবাদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমত, সুফিগণ কয়েকটি প্রশিক্ষণ স্তরের মধ্য দিয়ে স্রষ্টা বা আল্লার সঙ্গে মিলিত হতে চান। এর জন্য প্রয়োজন মিলনের চরম আকাঙ্খা বা আকুতি এবং শরীর ও মনের নিয়ন্ত্রণ। একারণে সুফিগণ সাধারণত রাজনীতি বা ঐশ্বর্যের থেকে দূরে থাকতে চান। দ্বিতীয়ত, সাধনার পথে চলতে গিয়ে দরকার এক পথ প্রদর্শকের। এই পথ প্রদর্শকই হলেন সেখ বা পীর যিনি সাধকের ব্যক্তিসত্তাকে চরমসত্তার সঙ্গে মিলিত হবার পথ বদলান। তৃতীয়ত, মালিক বা সাধক সাধনার জন্য পীরের/শুরুর আস্তানায় বাস করে পীরের সেবা ও আধ্যাত্মিক কাজকর্মে পীর বা গুরুকে অনুসরণ করেন। চতুর্থত, পীর বা গুরু তাঁর মৃত্যুর আগে শিষ্যদের মধ্যে একজনকে প্রচারের দায়িত্ব দিয়ে যান। পরবর্তীকালে এই ব্যবস্থা বংশানুক্রমিক হতে থাকে। পঞ্চমত, সুফিগন আত্মোন্নতি বা আত্মার সঙ্গে মিলিত হওয়ার প্রচেষ্টা ছাড়াও ইসলামের জন্য এবং মানুষের মঙ্গলের জন্য নিজেদের উৎসর্গ করেন। সুফি জালাল উদ্দিন রুমীর বক্তব্য এক্ষেত্রে তুলে ধরা যেতে পারে। রুমীর মতে, মানুষের হৃদয় জয়করাই সবচেয়ে বড় তীর্থযাত্রা এবং একটি হৃদয় হাজার কাবার চেয়েও শ্রেয়। কারণ কা'বা তো কেবল ইব্রাহিমের গৃহ কিন্তু হৃদয় হচ্ছে আল্লাহ একমাত্র আবাস (ডঃ এম. এ. রহিম - ১৯৮২)। ষষ্ঠত, সুফিগন জীবের বিকাশকে এক চক্রের সঙ্গে তুলনা করেন। রুমীর মতে, জীবন মানেই আল্লাহর কাছে ফিরে যাবার পথ

পরিক্রমা। জীবন প্রক্রিয়া ক্রমানুসারে এগিয়ে যায়, যেমন খনিজপদার্থ উদ্ভিদে, উদ্ভিদ প্রাণীজীবনে, প্রাণী মানবজীবনে, এবং মানুষ অতিমানুষের পর্যায়ে উন্নীত হয়। পরিনামে তার আদি উৎপত্তিস্থলে প্রত্যাবর্তন ঘটে। আর এক সুফি রাবেয়া (খ্রীঃ ৭১৩-৮০১) প্রেমের মাধ্যমে প্রেমময় আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হওয়াকেই প্রধান লক্ষ্য বলে মনে করেন। রাবেয়া বলতেন, আল্লাহর প্রেম আমাকে এত বেশী নিমগ্ন করেছে যে আর কারো প্রেম বা ঘৃণাই আমার অন্তরে নেই।

৩৬.২.৩ সুফিবাদের উদ্ভবের কারণ

সুফি শব্দটির অর্থ নিয়ে যেমন বিতর্ক রয়েছে সুফিবাদের উদ্ভবের কারণ সম্পর্কেও সেইরূপ মতপার্থক্য রয়েছে। জোনস বা ক্রেমার বা হর্টেনের মত একদল তাত্ত্বিক রয়েছেন যাঁরা সুফিবাদের উদ্ভবের পিছনে হিন্দু ও বৌদ্ধ দর্শনকে দায়ী করেন। হিন্দু বেদান্তদর্শন এবং বৌদ্ধদর্শন বিশেষ করে মহাযানদর্শন সুফিবাদের উদ্ভবের অন্যতম কারণ বলে এ ধরনের তাত্ত্বিকগণ মনে করেন। দ্বিতীয় দলে রয়েছেন সেই সমস্ত তাত্ত্বিকগণ যাঁরা সুফিবাদের উদ্ভবের কারণ হিসেবে খ্রীষ্ট মরমীয়া সাধকদের অবদানকে উল্লেখ করেন। এই মত অনুসারে নবম শতকেই অর্থাৎ ইসলামের উদ্ভবের কিছু পরেই গ্রিক দর্শন বিশেষ করে প্লেটোর দর্শন এবং খ্রীষ্টীয় দর্শনের সঙ্গে আরবজগতের পরিচয় ঘটে। খ্রীষ্টধর্মের কৃচ্ছ্রসাধকগণের সাধনা ও জীবনচর্চা সুফিবাদের জন্ম দেয়। আর একদল তাত্ত্বিক রয়েছেন যেমন অধ্যাপক ম্যাসিগনোঁ যাঁরা মনে করেন, সুফিগণ প্রেরণা লাভ করেছেন হজরত মুহম্মদের জীবন ও কুর-আন থেকেই। দারিদ্র (ফকর), ধ্যান (জিকর), ধৈর্য (সবর) ও ত্যাগ (জেহাদ) প্রভৃতি সুফিবাদের অনুসৃত যাবতীয় অনুশীলন কুর-আনের এর মধ্যেই পাওয়া যায়।

আজিজ আহমেদও মনে করেন সুফিবাদের উদ্ভব হয়েছে ইসলামের মধ্য থেকেই এবং এর প্রথম প্রকাশ দেখা যায় হজরত মুহম্মদের সহকর্মীদের মধ্যে। সে সময় কুফা, বসরা ও মদীনার ধর্মীয় জীবনে ভক্তিবাদই ছিল প্রধান। ইসলামের উদ্ভবের প্রথম দুই শতকের মধ্যে যখন এই সুফি ভাবধারার বিকাশ ঘটে তখন ইসলাম ছিল বাইরের প্রভাব মুক্ত। পরবর্তীকালে ইসলামের সঙ্গে গ্রিক সভ্যতা, খ্রীষ্টীয় সভ্যতা ও ভারতীয় সভ্যতার সংযোগ ঘটে এবং ইসলামের ম রমীয় ধারার তথা সুফিবাদের ধারা স্ফীত হয়। কিন্তু এই ধারার উৎস ছিল ইসলামের মধ্যেই নিহিত।

চতুর্থ আর এক দল তাত্ত্বিক রয়েছেন যারা মনে করেন, হজরত মুহম্মদের মৃত্যুর পর খলিফাতন্ত্রের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে খলিফাদের জাগতিক ঐশ্বর্য ও সম্পদের প্রতি যে নির্লজ্জ প্রকাশ ও নৈতিক অধঃপতন ঘটে তারই প্রতিক্রিয়ায় বেশ কিছু নিষ্ঠাবান মুসলমান প্রাতিষ্ঠানিকতার পরিবর্তে প্রেম, ভালবাসা, ও ভক্তির মাধ্যমে আল্লার সঙ্গে মিলিত হবার প্রয়াসী হন। বলা বাহুল্য, প্রাতিষ্ঠানিক ইসলামের পৃষ্ঠপোষক মুসলমান উলেমাগণ সুফিদের বিরোধী ছিলেন। উলেমাগণ ছিলেন কুর'আন ও শরিয়ত এর আক্ষরিক প্রয়োগের পক্ষপাতী। শরিয়তের ব্যাখ্যার জন্য মুফতি বা কাজী হিসেবে রাজদরবারে নিযুক্তি ও জীবিকা নির্বাহের জন্য অর্থসাহায্যও ঘটতে থাকে। জাগতিক বিষয়গুলির উপর এবং প্রত্যেকে শরিয়তি নিয়ম ঠিক মত মেনে চলছে কিনা সম্পর্কে উলেমাগণ ছিলেন অত্যন্ত সজাগ। কিন্তু সুফিগণ বাহ্য আচার অনুষ্ঠান, অনুশাসন ইত্যাদির

পরিবর্তে অন্তরের প্রেম ভালবাসা অভিজ্ঞতা ইত্যাদির মাধ্যমে ঈশ্বর তথা আল্লাহতালাকে পেতে চান কামালউদ্দিন হোসেন ইসলামধর্মে শরিয়তবাদ ও সুফিবাদের মধ্যে পার্থক্যের বিষয়টি অত্যন্ত সংক্ষেপে তুলে ধরেন 'রবীন্দ্রনাথ ও মুঘল সংস্কৃতি' গ্রন্থে (১৯৯৮) — ''তত্ত্বের দিক থেকে শরিয়তবাদ দ্বৈতবাদী। সুফিবাদীরা মোটের উপর অদ্বৈতবাদী। সাধনার দিক থেকে শরিয়তবাদ নামাজ রোজা পালনে পাবন্দ। সুফীবাদীরা জিকর-আযকর বা ধ্যান আরাধণায় বেশী জোর দেন'' (পৃঃ-২৫৮)। বলাবাহুল্য, রক্ষণশীল সম্প্রদায় এই মরমীয়া সাধকদের আদৌ পছন্দ করতেন না। দশম শতকে সুফি হল্লাজ যখন দাবী করলেন, 'আমিই সত্য' তখন রক্ষণশীলগণ হল্লাজকে শুধু ক্রুশে বিদ্ধ করে হত্যাই করেনি, হত্যার আগে বেত্রাঘাত করা হয় এবং একে একে হাত পা কেটে ফেলা হয় এবং তারপর ক্রুশে বিদ্ধ করা হয়। ঘটনাটি থেকে বোঝা যায় সে সময় রক্ষণশীল মুসলমানগণ এই সুফি দরবেশদের সম্পর্কে কতটা বিরূপ ছিল।

৩৬.২.৪ ভারতবর্ষে সুফিবাদ

হজরত মুহম্মদের মত্যুর কয়েক দশকের মধ্যেই আরবে ইসলামীয় মরমীয়া সাধনার ধারা লক্ষ্য করা যায়। প্রথমদিকে সুফি সাধকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন হাসান-আল বসরী (খ্রীঃ ৬৪২-৭২৮)। ইনি তৃতীয় খলিফা হজরত ওসমানের সমসাময়িক ছিলেন। অষ্টমশতকের মহিলা সুফি রাবেয়া (খ্রীঃ ৭১৩-৮০১) স্রষ্টা আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হবার ব্যকুলতা ও ঈশ্বরের সঙ্গে ভক্তের ঐশী প্রেমের বিষয়টি তুলে ধরেন। রাবেয়ার সময়ে আর একজন সুফি বিশেষ সুনাম অর্জন করেন। ইনি হলেন ইব্রাহিম বিন-আদম এভাবে সুফি সাধনা ক্রমশ বসরা থেকে বাগদাদে প্রসারিত হতে থাকে এবং আল মুসাবিবি (খ্রীঃ ৮৪৭) আনজুনায়েদ (খ্রীঃ ৯১০) জুন্নুন-আল মিস্রি (খ্রীঃ ৮৫৬) বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। এভাবে সুফি ভাবধারা একদিকে যেমন বিভিন্ন দেশে সম্প্রসারিত হতে থাকে অপরদিকে মত ও পথকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও সৃষ্টি হয়। ড: এস.এ.রহিম (১৯৬৩) এর মতে সুফি সম্প্রদায়ের মোট সংখ্যা প্রায় ১৭৫।

খ্রীষ্টীয় দশম-একাদশ শতক থেকেই বিভিন্ন সুফি সাধক ভারতে আসতে থাকেন। এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন খাজা মইনুদ্দিন চিশতি (খ্রীঃ ১১৪২ - ১২৩৬) যিনি ১১৯২ খ্রীঃ ভারতে আসেন এবং কিছুদিন লাহোরে ও দিল্লিতে কাটিয়ে শেষ জীবন অতিবাহিত করেন আজমীরে। ইনি হলেন ভারতে চিশতিয়া তরীকা'র (পথ/সম্প্রদায়) প্রতিষ্ঠাতা। চিশতি সিলসিলায় (আশ্রমে/আখড়ায়) হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই ছিল খুব প্রিয়। এই সম্প্রদায়ের সুফিগণ সম্পদ ও রাজনীতি থেকে দূরে থাকতে পছন্দ করতেন। পরে অবশ্য এই সম্প্রদায়ের অনেক সুফি রাজনীতির কাছাকাছি আসেন। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে সেখ হাসিউদ্দিন নাগোরী রাজপুতানায়, বাবা মরিদ পাঞ্জাবে, খাজা কুতুবউদ্দিন বখতীয়ার কাকী দিল্লিতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেন।

খাজামইমুদ্দিন চিশতির পরেই ভারতে যে সুফি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেন তিনি হলেন সোহরাবর্দী (খ্রীঃ ১১৪৪-১২৩৪)। ইনি মুসলমান জগতের এক সংকটময় মুহূর্তের (১২১৪ খ্রীঃ যখন চেঙ্গিস খানের নেতৃত্বে শুরু হয় মঙ্গোলীয়দের আক্রমন। এবং একারণেই সম্ভবত সোহারাবর্দীর দর্শনে ফুটে উঠেছে এক নৈরাজ্যবাদী মরমী সুর। বাহাউদ্দিন জাকরিয়া বাগদাদে গিয়ে সোহরাবর্দীর কাছে দীক্ষা নিয়ে

মুলতানে ফিরে আসেন এবং গড়ে তোলেন সোহরাউর্দী তরীকা। এই সম্প্রদায়ের দরবেশগণ রাজনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যোগাযোগ রাখতেন।

১৪৮২ খ্রীঃ গউথ জিলানী ভারতে গড়ে তোলেন শেখ আবদুল কাদির জিলানীর নামানুসারে কাদিরিয়া তরীকা। দারাশিকো ছিলেন এই সম্প্রদায়ের মতাবলম্বী। সপ্তদশ শতকে বাংলাদেশে এই মত প্রচার করেন শাহ জানাল। এ ছাড়া যে সমস্ত তরীকা ভারতে প্রাধান্য বিস্তার করে সেগুলি হল শরমউদ্দিন আলী কলন্দর প্রতিষ্ঠিত কলন্দরিয়া তরীকা শেখ জালালউদ্দিন টবরীজীর 'কাকা' তরীকা যা বাংলাদেশে বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

৩৬.২.৫ সুফি সাধদের অবদান

আল্লাহ্ তথা স্রষ্টার সঙ্গে মিলিত হওয়াই সুফি সাধকদের প্রধান লক্ষ্য হলেও অধিকাংশ সুফি সাধকই সমাজ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নির্জন সাধনার মাধ্যমে আত্মমুক্তির কথা ভাবেননি। অন্যতম সুফি সাধক খাজা মইনুদ্দিন চিশতির বক্তব্য এখানে তুলে ধরা যেতে পারে — যে দোজখের অনল থেকে ও রোজ কেয়ামতের ভীতি থেকে মুক্ত থাকতে চায় তাকে আল্লাহর বন্দেগী করতে হবে। তাঁকে (আল্লাহকে) সে (সাধক) সুক্ষাতিসুক্ষ ভাবে বন্দেগী করবে যা সকল বন্দনার শ্রেষ্ঠ - যেমন বিক্ষুব্ধকে বিচারদান, অসহায়কে সাহায্য, ক্ষুধার্তকে অনুদান। আমরা এই বিষয়টি সুফি সাধকদের অবদান প্রসঙ্গে আলোচনা করব।

৩৬.২.৬ জনকল্যানকর কার্যসম্পাদন

দশম শতকের পর থেকেই মরমীয়া সুফি সাধকগণ ভারতের বিভিন্নপ্রান্তে ছড়িয়ে পড়েন; গড়ে তোলেন প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে দরগা এবং খানকাহ (আস্তানা)। এই খানকাহগুলি বস্তুত ছিল একাধারে সাধনক্ষেত্র, অন্যদিকে আশ্রয়স্থল ও চিকিৎসাকেন্দ্র। এখানে ধর্মনির্বিশেষে দুঃস্থ, উন্মাদ ও অসুস্থ ব্যক্তিরা আশ্রয় পেত। এই সমস্ত খানকাহগুলির সঙ্গে লঙ্গরখানা বা বিনাখরচে খাবার ব্যবস্থাও থাকত। এই সমস্ত খানবাহগুলির খরচ মেটানোর জন্য বিষয়সম্পত্তিও দান করা হত কখনও সমৃদ্ধ ব্যক্তিদের কাছ থেকে কখনও রাষ্ট্রের কাছ থেকে। এভাবে সুফি সাধকগণ বিভিন্ন জনকল্যানমূলক কাজ সম্পাদন করে সাধারণ মানুষের কাছে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন।

৩৬.২.৭ সাংস্কৃতিক সমন্বয়

সুফি সাধকদের দরগায় হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই যোগ দিত। ধর্মান্তরিত মুসলমানগণও তাদের পূর্বেকার সংস্কার ও আচারাদি অনুষ্ঠান করতে পারত। সুফিগণ এব্যাপারে কঠোর ভাবে শরিয়ত অনুশাসনের প্রয়োগের পক্ষপাতী ছিলেন না। এইসমস্ত সুফিসন্তগন ভারতের বৌদ্ধ ও হিন্দুতন্ত্রসাধক, নাথযোগীদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়ে নিজেদের অলৌকিক শক্তির অধিকারী বলে প্রচার করতেন। হলায়ুধ মিশ্র রচিত 'শেখ শুভোদয়া' গ্রন্থ থেকে জানা যায় হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই মানুষ রোগমুক্তি, সন্তানকামনা ও সৌভাগ্য লাভের আশায় এই সুফিসন্তের কাছেই অনুগ্রহ কামনা করে প্রার্থনা জানায় এবং অনেকেই তাঁর নামে বিষয়সম্পত্তিও উৎসর্গ করে। সে সময়কার হিন্দধর্মের ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের

জাতভিত্তিক কঠোরতা, অন্ত্যজ জাতগোষ্ঠীগুলির প্রতি উচ্চ জাতভুক্ত ব্যক্তিদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক নির্যাতন, অবক্ষয়িত ও তন্ত্রজর্জরিত বৌদ্ধদের বিকৃত জীবনবোধ, নাথপন্থীদের তন্ত্রসর্বস্বতা, সমাজে সহজিয়াপন্থীদের প্রতি নিষ্করুণ ব্যবহার — এসবই ছিল মধ্যযুগের শেষ দিকের ভারতীয় সমাজজীবনের বাস্তব চিত্র। এই অবস্থায় সুফিদের সহজ ও সরল জীবনযাত্রা, মানুষের কাছাকাছি থাকা ও দুঃখ দুর্দশায় অংশনেওয়া স্বাভাবিকভাবেই হিন্দুসমাজকে, বিশেষভাবে অন্ত্যজ গোষ্ঠীগুলিকে, সহজিয়াদের আকৃষ্ট করে। সমাজের এই সাধারণ মানুষের স্তরে গড়ে ওঠে এক সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক লেনদেন-এর পরিবেশ। এই পরিবেশেই সত্যপীর পূজার উদ্ভব। অন্যান্যক্ষেত্রেও এই সমন্বয়ী ভাবধারা লক্ষ করা যায়।

হিন্দু-মুসলমানের সমন্বয় সাধনা একদিকে যেমন সমাজের নিচে তলায় দেখা যায়, অপরদিকে সুফিসাধক ও সুফিপ্রভাবিত তাত্ত্বিকগণ ভারতীয় দর্শন ও শাস্ত্রীয় গ্রন্থগুলির অনুবাদে অগ্রসর হন। সুফিপ্রভাবিত দারা সিকোহ্ ফারসীতে উপনিষদের অনুবাদ করনে। আঞ্চলিক ভাষার বিকাশও ঘটতে থাকে সাধারণ মানুষের সংঙ্গে সংযোগ গড়ার তাগিদে।

৩৬.২.৮ ইসলামের প্রসার

আধ্যাত্মিক উন্নতি বা জনকল্যানমূলক কাজকর্মছাড়াও ইসলামের বিস্তারে সুফিগণ এক প্রধানভূমিকা নেন। দশমশতকে ইসলামের মধ্যেকার ক্ষমতার লড়াই উমাইয়া গোষ্ঠীর (খ্রীঃ ৬৬১-৭৫০) হাত থেকে আব্বাসীদের খলিফাতন্ত্র (খ্রীঃ ৭৫০-১২৫৮) দখল, আরবকেন্দ্রিক ইসলামের বিকেন্দ্রিকরণ প্রভৃতি ঘটনাগুলি যেমন ঘটতে থাকে, আরব দেশ থেকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সুফিদরবেশগণ এশিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে, বিশেষ করে যেক্ষেত্রে ইসলাম রাজশক্তির অধিকারী, ছড়িয়ে পড়তে থাকেন। এভাবেই ভারতের বিভিন্নপ্রান্তে, বিশেষ করে প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে, সুফিগণ দরগা বা আস্তানা গড়ে তোলেন। বিভিন্ন সুফিসম্প্রদায়ের মধ্যেও শুরু হয় প্রাধান্য বিস্তারের প্রতিযোগিতা এবং এর জন্য প্রয়োজন নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি জনসমর্থন আদায়। এই সমস্ত সুফিদরবেশগণের অসাধারণ নৈতিকগুণ, দুঃখ কষ্ট সহ্যকরার অসীম ক্ষমতা, অনাড়ম্বর জীবন যাপন, দুঃস্থ মানুষদের জন্য গভীর সহানুভূতি ও সেবামূলক মনোভাব, ইসলামের ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ববোধ ভারতে অ-মুসলমান জনগোষ্ঠীগুলিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের চাপে অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে নির্যাতিত অন্ত্যজ জাতগুলি, বৌদ্ধজনগোষ্ঠী, নাথপন্থী ও সহজিয়া গোষ্ঠী, উপজাতি গোষ্ঠীগুলি (বিশেষভাবে সিন্ধুপ্রদেশের) ইসলামের মধ্যে খুঁজে পায় এক মানবিক মর্যাদাবোধ, স্তরহীন সমাজের স্বাদ ও সরাসরিভাবে ঈশ্বর ভজনার অধিকার। ডঃ এস. এ. রহিম এর রচনা থেকে জানা যায়, উত্তরবঙ্গে শেখ জামালউদ্দিন তাবরিজী, পূর্ববঙ্গের সিলেটে শাহজ্বালান, খুলনা-যশোহরে মুজাহিদ দরবেশ খান জাহান আলি ইসলামে দীক্ষিতকরণে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা নেন। ভারতে মুসলমান জনগোষ্ঠীর ভৌগোলিক অবস্থান থেকে অনুমান করা যায় সুলতান ও মুঘলশাসনাধীন ভারতে রাষ্ট্রীয় বলপ্রয়োগ এর মাধ্যমে ধর্মান্তরিত হওয়ার ঘটনা তুলনামূলকভাবে অনেক কম। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধর্মান্তরিতকরণ প্রক্রিয়া চলেছে সুফিসন্তদের দ্বারা এবং বহুবছর ধরে ক্রমান্বয়ে।

৩৬.২.৯ রাজনীতি ও সুফিসাধক

সাধারণভাবে ধারণা করা হয়, সুফি দরবেশগণ রাজনীতি থেকে যথাসম্ভব দূরে থেকে নির্জনে

সাধনার মাধ্যমে আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হবার আকাঙ্খায় মগ্ন থাকতেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, প্রথমদিকের কিছু কিছু সুফিসন্তদের বাদ দিলে পরবর্ত্তীকালের অধিকাংশ সুফি দরবেশদের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্কে ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। ডঃ এম. এ. রহিম এর মতে, "ইসলামের প্রসার ছাড়াও বাঙলা দেশে মুসলমানদের রাজ্য বিস্তৃতি ও মুসলিম রাষ্ট্রের সংহতি বিধানে মুসলমান সুফী-দরবেশদের তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা ছিল। কখন নিজেরা, কখন মুসলমান সেনাপতিদের সঙ্গে সহযোগিতায় তারা প্রদেশের শেষ সীমা পর্যন্ত মুসলিন অধিকার কায়েম করেন"। উদাহরণ হিসেবে ডঃ রহিম সাতগাঁয়ের হিন্দুরাজার বিরুদ্ধে মুজাহিদ দরবেশ জাফরখান গাজী ও শাহ সফিউদ্দিন এর ভূমিকা এবং সিলেটের হিন্দুরাজার বিরুদ্ধে সুফি শাহজাহান এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার উল্লেখ করেন। এ সমস্ত ঘটনা থেকে ডঃ রহিম সিদ্ধান্ত করেন, "সাধারণত তাঁরা (সুফিদরবেশগণ) রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করতেন না কিন্তু মুসলিম রাষ্ট্র ও সমাজের বিপদের দিনে তাঁরা কখন ও নির্বিকার থাকেন নি"। এমনকি কখনও সুফিসন্তগণ সুলতানকে রাজ্য শাসনব্যাপারে পরামর্শও দিতেন। সোহরাবর্দী সম্প্রদায়ের সঙ্গে রাজশক্তির সম্পর্কে ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। এছাড়াও, ডঃ রহিমের মতে "মুসলমান সেনাপতিদের সামরিক ও ভৌগোলিক বিজয়ের সঙ্গে সুফীদরবেশগণ ইসলামে দীক্ষাদান করে ও শিষ্য সংগ্রহ করে নৈতিক বিজয় যুক্ত করেন এবং এভাবে একটি অ-মুসলিমদেশে মুসলিমরাষ্ট্রের স্থায়িত্ব ও শক্তির উৎস প্রদান করেন"।

সুলতানী এবং বিশেষ করে মুঘল শাসকগণ ভালোভাবেই জানতেন মুষ্টিমেয় কয়েকজন স্বধর্মাবলম্বীদের নিয়ে ভারত শাসন করা অসম্ভব। একারণে তাঁরা হিন্দু-বৌদ্ধ নির্বিশেষে স্থানীয় মানুষদের মধ্য থেকেই সহায়ক শ্রেণী গড়ে তোলেন। অন্যধর্মের মানুষ হলেও এই সহায়ক শ্রেণীর সঙ্গে বহিরাগত শাসকশ্রেণীর সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ। দরবারে শরিয়তি আইনবিষারদ হিসেবে কাজী, মৌলভী যেমন গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেতেন হিন্দু বা অন্য ধর্মভূক্ত ব্যক্তিগণও রাষ্ট্রশাসনের প্রয়োজনে শাসকের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হতেন। বাংলার সুলতানগণ রাজ্যপরিচালনায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের গুরুত্বপূর্ণ পদে শুধু নিয়োগই করেন নি, এমনকি বাংলার অধিবাসীদের স্বদেশপ্রেমের উপর তাঁদের শক্তির ভিত গড়ে তুলে দিল্লীশাসকের নিয়ন্ত্রনমুক্ত ও হতে চেয়েছিলেন। মেবারেও শাসক আকবর পিতা আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিলেন রাজপুতদের সহায়তায়। এখানে দুর্গাদাস রাঠোরে সঙ্গে আকবরের বন্ধুত্বে ধর্ম বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। রাষ্ট্রশক্তির সহায়কশ্রেণী হিসেবে হিন্দু মুসলমান উভয়েই ছিলেন গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণ হিসেবে কবীরের জীবনের একটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়। কবীর ছিলেন হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মেরই রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের বিরোধী। কবীরের জনপ্রিয়তা ও সার্বজনীন দৃষ্টিতে অসন্তুষ্ট ও ঈর্ষান্বিত ক্রুদ্ধ মৌলবী ও হিন্দু পন্ডিতরা কবীরের বিরুদ্ধে বাদশাহ সিকন্দর লোদীর কাছে অভিযোগ করে। বাদশাহের হুকুমে দরবারে হাজির হয়ে কবীর দেখলেন যে তাঁর বিরুদ্ধে মৌলবী ও হিন্দু পন্ডিত অভিযোগকারীরা হাজির হয়েছেন। প্রীত হয়ে তখন কবীর বললেন যে, দুনিয়ার যিনি বাদশাহ তাঁর দরবারেই যদি মৌলবী পন্ডিতের ঐক্য হয়ে থাকে তাহলে সব বাদশাহের যিনি বাদশাহ তাঁর দরবারে হিন্দু মুসলমানের ঐক্য না হওয়ার কোন কারণ নেই। অনুরূপ ঘটনা ঘটে বাংলাদেশেও। গৌরাঙ্গের নাম সংকীর্ত্তনের বিরুদ্ধে পন্ডিতগণ সমবেত হন সুলতান হোসেন শাহের কাছে নালিশ জানাতে।

রাষ্ট্রশক্তির সহায়কশ্রেণী হিসেবে মৌলবী-কাজী-ব্রাহ্মণ পন্ডিত যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন, প্রয়োজনে সুফি দরবেশগণও রাষ্ট্রশক্তির সহায়ক ভূমিকা পালনে দ্বিধা করেন নি। এবং এব্যাপারে তাঁরা সবসময় মানবকল্যানমূলক প্রেমময় দৃষ্টিভঙ্গি বজায়ও রাখতে পারেন নি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বাংলার ইলিয়াসশাহী সুলতানগণ রাষ্ট্র পরিচালনায় বেশী সংখ্যক হিন্দুদের নিয়োগ করায় এবং গুরুত্বপূর্ণ পদে স্থান দেওয়ায় সুফি দরবেশ শেখ আলাউল হক সুলতানদের কঠোর সমালোচনা করেন। অনুরূপভাবে, সুফি হজরত মাওলানা মুজাফফর শামস বলখী ও সুলতান সিকন্দর শাহের পুত্র ও উত্তরাধিকারী গিয়াসউদ্দিন আজম শাহকে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে হিন্দুদের নিয়োগ করার ব্যাপারে সতর্ক করেন।

সিন্ধুপ্রদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সঙ্গে সুফি দরবেশদের সম্পর্কের বিষয়টি তুলে ধরেন আনসারী (Sarah F.D. Ansari)। তিনি সুফি দরবেশগণকে শাসক ও শাসিতের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। আনসারীর মতে ৭১১- ১২ খ্রীঃ মুহম্মদ বিন কাশিম এর সিন্ধু আক্রমনের পিছনে ছিল অর্থনৈতিক সম্পদ লুণ্ঠনের তীব্র আকাঙ্খা। সিন্ধু অঞ্চল সেসময় একদিকে ছিল সম্পদে পূর্ণ অপরদিকে ছিল গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্র। এর আগের দিনগুলিতে আরবের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য পরিচালিত হলেও আরব বণিকগণ মূলত বন্দর এলাকাতেই কাজকারবার করতেন। কিন্তু ভারতে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের সঙ্গে সঙ্গে ভারতভূখন্ডের অন্যান্য অঞ্চলেও এই বনিকগন প্রবেশ করতে থাকে এবং ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। এদেরই অনুসরণ করে সুফি দরবেশগণ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে আস্তানা/দরগা/খানকাহ গড়ে তোলেন। ভারতের প্রত্যন্ত প্রদেশগুলিতে ইসলামকে জনপ্রিয় করে তোলেন এই সুফিদরবেশগন এবং এভাবে ইসলামের প্রসার ঘটিয়ে রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তিকেই সুদৃঢ় করেন। সুফি দরবেশগণ স্থানীয় ধর্মান্তরিত মুসলমানের সঙ্গে বৃহত্তর ইসলামীয় জগতের সংযোগ স্থাপন করেন; তাঁদের দরগাগুলি ইসলামীয় সংস্কৃতির প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে যা পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রশক্তিকেই মজবুত করে।

আনসারী মনে করেন, সুলতানগণ ভালো ভাবেই জানতেন যে ভারতে বিভিন্ন অঞ্চলে শাসনক্ষমতা কায়েম করতে গেলে স্থানীয় হিন্দুও বৌদ্ধদের সহায়তা অত্যন্ত প্রয়োজন। একারণে তাঁরা ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে ধর্মান্তরিতকরণের পরিবর্তে স্থানীয় জনগণের বিশ্বাসের সঙ্গে সমঝোতার ব্যাপারে সচেষ্ট হন। প্রথমে ইসমাইলীয়গণ মুলতানে সূর্যমন্দির ধ্বংস করার পরিকল্পনা নিলেও পরে সূর্যমন্দির ধ্বংস করার পরিবর্তে স্থানীয় বিশ্বাস ও ধর্মীয় আচরণের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে থাকেন এবং জনগণের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টির পরিবর্তে সহানুভূতি, সহযোগিতার মাধ্যমে ধর্মান্তরিতকরণে সচেষ্ট হন। গল্পগাথায় মুহম্মদ পরিণত হল ব্রহ্মে, আলি বিষ্ণুতে, আদম শিবে এবং সুফি সাদরুদ্দিন স্বয়ং বলরামে।

রাষ্ট্রকাঠামোয় সুফিদরবেশদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার বিষয়টি তুলে ধরেন সুফি মকদুন। তিনি শাসকের সহায়ক তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দূর্গের কথা বলেন। প্রথমদূর্গ হল জনসাধারণ। এই দুর্গটি মাটি দিয়ে তৈরী, যাকে ন্যায় এর চুন সুরকি দিয়ে মজবুত করতে হবে যাতে শাসনে ভেঙ্গে না যায়। দ্বিতীয় দূর্গটি লোহা দিয়ে তৈরী যা সামরিক বাহিনীর দ্যোতক। পুরস্কারও সাহায্য দিয়ে গড়া এই দুর্গ দেশকে বিদ্রোহ ও আক্রমণএর হাত থেকে রক্ষা করবে। তৃতীয় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দূর্গটি কঠিন ইস্পাতদিয়ে তৈরী, এরা হল দরবেশ বা জ্ঞানী যারা আল্লাহ'র মানুষ। অতএব রাজার কর্তব্য হল এদেরকে যথাযথভাবে সম্মান এবং কোষাগার

থেকে ন্যায়সম্মত সম্পদ দিয়ে সন্তুষ্ট করা; কারণ বাস্তবে এদের হাতেই শাসনপরিচালনার ভার থাকে। শাসকগণ ও সুফিদের সাহায্য ও সহযোগিতাকে যথাসম্ভব গুরুত্ব দিতেন এবং পুরস্কার হিসেবে জমিদান করতেন।

আনসারীর মতে, ভারতে সুফিগণের অনুপ্রবেশ ও বসবাসের কিছুকাল পরে সুফি দরবেশগণ ক্রমশ প্রাতিষ্ঠানিক হয়ে উঠতে থাকেন। শিষ্যগণ দরবেশগণের কবরস্থানগুলিকে পবিত্র ও ঐশীক্ষমতার আধার হিসেবে পূজা করতে থাকে। সুফিদরবেশের মৃত্যুর দিনটি আল্লাহর সঙ্গে দরবেশের মিলনের দিন হিসেবে বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হয়। সুফিদরবেশের বংশধরগণ (যা প্রথমের দিকে ছিল একমাত্র যোগ্যশিষ্য) সুফির ন্যায় ঐশী শক্তির অধিকারী না হয়েও ধর্মীয় নেতৃত্বের অধিকারী হন। এভাবেই সুফি দরবেশকে কেন্দ্র করে এক একটি ঘরানা বা সম্প্রদায় গড়ে উঠতে থাকে। রাষ্ট্র এবং শিষ্যদের কাছ থেকে জমি ও অন্যান্য সম্পদ ও অর্জিত হতে থাকে। জমি ও সম্পদের এই মালিকানা ও ধর্মীয় কর্তৃত্ব একদিকে যেমন সুফি পরিবারগুলিকে ব্যাপক ক্ষমতাসম্পন্ন করে তোলে, অপরদিকে রাষ্ট্রশক্তির স্থানীয় প্রতিনিধি হিসেবে ভূমিকা পালনের আগ্রহ দেখা দেয়। সুফিগণও সুলতানের মতো মাথায় পাগপরা, সিংহাসনের মতো গদিতে বসা মুরিদ বা শিষ্যদের কাছ থেকে নৈবেদ্য গ্রহণ করা, এমনকি শিষ্যদের মধ্যেকার বিরোধ মীমাংসা করা প্রভৃতি ঘটনাগুলির মাধ্যমে ক্রমশ সুফিপদের রাজনীতিকরণ ঘটাতে থাকেন।

সিন্ধু এলাকার সুফিগণ আর একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দায়িত্বও পালন করেন। বিভিন্ন উপজাতিদের ইসলামে দীক্ষিতকরণ, উপজাতিগোষ্ঠীগুলির মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যস্থতাকরা, ভ্রাম্যমান পশুপালক উপজাতিগুলিকে কৃষিজীবিতে রূপান্তরিত করা, উপজাতিদের সঙ্গে বাইরের জগতের সম্পর্কস্থাপন, ইসলামে দীক্ষিতকরণের মাধ্যমে সীমান্তএলাকাকে সুরক্ষিত করা প্রভৃতি কাজগুলি নিঃসন্দেহে শুধুমাত্র ধর্মীয় কাজ নয় — সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাজ যা সিন্ধু অঞ্চলের সুফি দরবেশগণ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গেই করে গেছেন। দরগাগুলি ও শুধুমাত্র ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠানাদি সম্পাদনের ক্ষেত্র হিসেবে সীমাবদ্ধ থাকেনি; উপজাতিগোষ্ঠীগুলির মধ্যে বাণিজ্যিক লেনদেন এরও কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠতে থাকে। জিনিষের কেনাবেচা, পরস্পরের ভাব/মত বিনিময়, ধর্মীয় আলোচনা, বিরোধী নিষ্পত্তিকরা— সব কিছুরই কেন্দ্রস্থল ছিল এই দরগা। এভাবে ধর্মীয় ক্ষেত্রের সঙ্গে স্থানীয় রাজনীতিতেও সুফি দরবেশগণ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে থাকেন।

৩৬.৩ মধ্যযুগে ভক্তি আন্দোলন

মধ্যযুগের ভারতে হিন্দুজনগোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে এক জোয়ার দেখা যায় — ভক্তি সাধনার জোয়ার, যদিও জোয়ারের ধরন ও জোয়ার-ভাঁটার খেলা বা গভীরতা সব জায়গায় একই রকম ছিল না। মধ্যযুগে দক্ষিণ ভারতে এর শুরু; ব্যাপ্তিকরণ খ্রীষ্টীয় একাদশ থেকে পঞ্চদশ শতক; যদি ও এর আগেই খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকেই এর সূচনা লক্ষ করা যায়। একাদশ থেকে পঞ্চদশ শতকের প্রধান সাধক রামানুজ নিম্বার্ক, মাধব ও বল্লভাচার্য। প্রায় চারশো বছর পর এর ঢেউ এসে লাগে উত্তরভারতে খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে। উত্তর ভারতে যারা এই আন্দোলনের প্রাণপুরুষ তারা হলেন রামানন্দ, নানক,

কবীর, দাদু তুলসীদাস; আর পূর্বভারতে চৈতন্যদেব (খ্রীঃ ১৪৮৬-১৫৩৩) ছিলেন এই আন্দোলনের পুরোধা। মহারাষ্ট্রে এই আন্দোলনের প্রাণপুরুষ হলেন জ্ঞানদেব, তুকারাম, নামদেব, এবং রামদাস।

মধ্যযুগের ভারতে এই ভক্তি আন্দোলনের কারণ হিসেবে সাধারণত ইসলামের, বিশেষ করে সুফিবাদের (যা আমরা আগের অংশে আলোচনা করেছি) প্রভাব এর উল্লেখ করা হয়। এই ধরনের সিদ্ধান্ত কতদূর যুক্তিযুক্ত যে সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব। ভক্তিসাধনা বলতে কি বোঝায়, বৈশিষ্ট্য, ভক্তি আন্দোলনের উদ্ভবের কারণ, দক্ষিণভারতে, মহারাষ্ট্রে, উত্তর ভারতে, পূর্বভারতে ভক্তি আন্দোলনের প্রকৃতি আমাদের বর্তমান আলোচনার মূল বিষয়। ভক্তি আন্দোলনের ফলাফলের উপর আলোচনা করা হবে।

অবশ্য মধ্যযুগের এই ভক্তি আন্দোলনকে আদৌ আন্দোলন বলা যায় কিনা সে সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতে পারে। প্রশ্ন ওঠে এই ভক্তি আন্দোলন প্রকৃত অর্থে গণ আন্দোলন ছিল কি না। কারণ এই আন্দোলনের ব্যাপ্তি ছিল সীমিত। তাছাড়া যে কোনও আন্দোলন সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের কথা বলে। কিন্তু ভক্তি আন্দোলনে এধরনের কোনও সমাজপরিবর্ত্তনের কথা বলা হয় নি। ব্যক্তিগতভাবে আত্মার মুক্তি বা ঈশ্বর/স্রষ্টার সঙ্গে মিলনই এখানে প্রধান বিবেচ্য বিষয়। সর্বোপরি, ভক্তি আন্দোলনের প্রধান ব্যক্তিদের বক্তব্যের মধ্যেও ছিল যথেষ্ট ভিন্নতা। ঈশ্বরের স্বরূপ, ভক্তের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক, ঈশ্বর সগুণ না নির্গুণ, এই সব প্রশ্নে ভক্তিসাধকগণ একমত পোষণ করেননি। একারণে এই আন্দোলন ছিল বহুমুখী ও বহুমাত্রিক। পরবর্ত্তীকালে এই আন্দোলন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হিন্দু সমাজব্যবস্থায় পৃথক জাত বা সম্প্রদায় হিসেবে বিলীন হয়। একমাত্র ব্যতিক্রম হলেন নানকপন্থীগণ, যাঁরা পরবর্ত্তীকালে সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যদিয়ে সমাজ পরিবর্তনের কথা বলেছেন এবং এক পৃথক ধর্ম-শিখ ধর্মের উত্থান ঘটিয়েছেন।

৩৬.৩.১ ভক্তিসাধনা কাকে বলে

মধ্যযুগে ভারতে ধর্ম সাধনার যে নতুন ধারাটি লক্ষ করা যায় তা তাত্ত্বিকগণ ভক্তিবাদ, ভক্তিপথ, ভক্তিমার্গ, ভক্তিসাধনা প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত করেন। ভক্তি শব্দটি এসেছে ভজ্ ধাতুর সঙ্গে ক্তিন/তি প্রত্যয় যোগ করে। সুতরাং ব্যুৎপত্তিগতভাবে এই শব্দটির অর্থ হল অংশগ্রহণ, অভিজ্ঞতা, আচরণ, কর্ষণ, অনুরাগ ইত্যাদি। পানিনির 'অষ্টাধ্যায়ী'তে এর অর্থ করা হয়েছে ভাব বা অবস্থা, অনুরাগ বা আকুতি, যা কোনও ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি প্রযুক্ত হতে পারে। এদিক থেকে ধর্মীয় বা পার্থিব যে কোনও বিষয়ের সঙ্গে ভক্তি শব্দটি যুক্ত হতে পারে। যেমন গুরুভক্তি, পিতৃ-মাতৃভক্তি, দেশভক্তি, ঈশ্বরভক্তি ইত্যাদি। ধর্মীয় ব্যাপারে দেবতার ধরন অনুযায়ী শিবভক্তি, বিষ্ণুভক্তি, কালীভক্তি, কৃষ্ণভক্তি ইত্যাদি শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়। এদিক থেকে শব্দটির মাধ্যমে শুধুমাত্র ধর্মীয় অর্থে প্রয়োগ বা শব্দটি দ্বারা কোনও বিশেষ ধর্ম বা পূজাপদ্ধতি বা মতবাদকে বোঝায় না। অথচ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই শব্দটি ব্যবহার করা হয় এক বিশেষ ধর্ম বা পূজাপদ্ধতি হিসেবে, যা একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী এবং যেখানে ব্যক্তি মানুষ ঈশ্বরের সঙ্গে ভাব ও ভালবাসা দিয়ে ব্যক্তিগত সম্পর্কস্থাপনে প্রয়াসী। এই প্রচলিত মত অনুসারে ভক্তি এক বিশেষ ধরনের পথ যা জ্ঞানপথের বা কর্মপথের বিরোধী, ভক্তের ব্যক্তিগত আবেগ, আকাঙ্খা, সরলতা, ঐকান্তিকতাই প্রধান। একারণে ভক্তিকে এক বিশেষ মতবাদ হিসেবেই সাধারণত ব্যাখ্যা করা হয়।

কৃষ্ণা শর্মার মতে, মধ্যযুগের ইতিহাস বিশ্লেষণে অধিকাংশ তাত্ত্বিকই ভক্তি শব্দটি এভাবে একটি বিশিষ্ট ধর্ম, মতবাদ বা পূজাপদ্ধতি (cult) অর্থে প্রয়োগ করায় কতকগুলি ভুল সিদ্ধান্তের কবলে পড়েছেন। যেমন (১) ভক্তিকে জ্ঞান বা কর্মের বিরোধী বলে ব্যাখ্যাকরা হয়েছে; (২) নির্গুণ উপাসনার পরিবর্তে সগুণ উপাসনার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে; (৩) ভক্তি বলতে বিষ্ণুভক্তি বা কৃষ্ণভক্তির উপর গুরুত্বদিয়ে কৃষ্ণকে যিশু খ্রীষ্টের মতো করে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। কৃষ্ণা শর্মা দেখিয়েছেন, কিভাবে পাশ্চাত্য পন্ডিতগণ বিশেষকরে উইলসন (Wilson) ওয়েবার (Weber) উইলিয়মস (Williams) এবং গিয়ারসন (Grierson) অত্যন্ত সচেতন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ভক্তিকে এভাবে এক বিশেষধর্ম বা ভাব হিসেবে ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে কৃষ্ণ পূজার জন্ম দিয়েছেন এবং ভারতের ঐতিহ্যকে ভ্রান্তভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

আমাদের আলোচনায় ভক্তি শব্দটিকে এক বিশেষ ধর্ম বা মত বা পূজাপদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার না করে সাধারণভাবেই ব্যবহার করা হয়েছে এবং একারণে ভক্তি, ধর্ম প্রভৃতি শব্দগুলির পরিবর্তে ভক্তি সাধনা শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। সামগ্রিক বিচারে মধ্যযুগ ধর্মীয় বিদ্রোহের যুগ এবং এই বিদ্রোহ শুধুমাত্র হিন্দুধর্মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। মুসলমান ধর্মে সুফিবাদের মধ্যদিয়ে এই বিদ্রোহের প্রকাশ ঘটেছে। হিন্দুধর্মের বহু শাখা প্রশাখার মধ্যে এই বিদ্রোহ প্রকাশিত হয়েছে সগুণ ভক্তি সাধনায় অথবা নির্গুণ ভক্তি সাধনায়। মতাদর্শ বা পূজার্চনার ব্যাপারে ভিন্নতা থাকলেও হিন্দু-মুসলমান ভক্তি সাধনার মধ্যে সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ভক্তির অস্তিত্ব।

৩৬.৩.২ ভক্তিসাধনার মূল বৈশিষ্ট্য সমূহ :

ভক্তি সাধনার মূল বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ ঃ

প্রথমত, ভক্তি সাধনায় ভক্তের সঙ্গে স্রষ্টার বা ঈশ্বরের সম্পর্ক একান্ত ব্যক্তিগত। পুরোহিত বা যাজক এর ন্যায় কোনও মধ্যস্থতাকারী ব্যক্তির দরকার হয় না।

দ্বিতীয়ত, স্রষ্টা বা ঈশ্বরের সঙ্গে ভক্তের সম্পর্কের ভিত্তি হল ভক্তি; এই ভক্তি প্রধানত ভক্তের চৈতন্যের সঙ্গে যুক্ত থাকে। আর এই ভক্তি-মিশ্রিত চৈতন্য রহস্যময়। একারণে এই সম্পর্কের কোনও যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যাও দেওয়া যায় না।

তৃতীয়ত, এই স্রষ্টা বা ঈশ্বর নির্গুণ (নিরাকার) হতে পারেন আবার সগুণ (আকার) হতে পারেন। শঙ্করাচার্য বা নানকের ঈশ্বর নির্গুণ-সম্পন্ন কিন্তু চৈতন্য বা মীরাবাঈ এর ঈশ্বর সগুণসম্পন্ন।

চতুর্থত, ভক্তিসাধনা শাস্ত্রীয় আচার অনুষ্ঠান বিরোধী এবং একারণে কর্মকান্ডের ও বিরোধী। অবশ্য কোনও কোনও ভক্তিসাধক পুরোপুরি কর্মকান্ডের বিরোধী ছিলেন না।

পঞ্চমত, সাধারণত জ্ঞানমার্গ বা সাধনাকে ভক্তিসাধনার পরিপন্থী বলে মনে করা হয়। কিন্তু এই সরলী করণও সব সময় সঠিক নয়। অনেক ভক্তি সাধক একই সঙ্গে ছিলেন জ্ঞানমার্গী। এব্যাপারে শঙ্করাচার্যের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

ষষ্ঠত, ভক্তি সাধনায় জাতভেদ স্বীকার করা হয় না। একারণে ভক্তিআন্দোলন বর্ণাশ্রম-ভিত্তিক সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন। এই বৈশিষ্ট্যও সবসময় সবার ক্ষেত্রে দেখা যায় না। যেমন তুলসীদাস জাতব্যবস্থাকে পুরোপুরি অস্বীকার করেন নি।

সপ্তমত, ভক্তিসাধনায় গুরুর এক বিশেষস্থান স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। এই গুরু মধ্যস্থতাকারী পুরোহিত নন—তিনি পথপ্রদর্শক।

অষ্টমত, ভক্তি সাধনায় নারী-পুরুষের সমানাধিকার স্বীকৃত; এব্যাপারেও বেশ কিছু অসংগতি দেখা যায়। যেমন কোনও কোনও ভক্তিসাধক কামিনী ও কাঞ্চনকে সাধনার প্রতিবন্ধক হিসেবে দেখেছেন বা গৃহবিমুখ হয়েছেন। চৈতন্যদেবও এই সীমাবদ্ধতাকে কাটিয়ে উঠতে পারেন নি।

নবমত, সমাজজীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও ভক্তদের দৃষ্টিভঙ্গি রক্ষণশীলতার পরিবর্তে উদার বলে মনে করা হয়। এই বৈশিষ্ট্যও সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

দশমত, ভক্তিসাধকগণ সাধারণত অনাড়ম্বর সহজ ও সরল জীবনবোধে বিশ্বাসী ছিলেন,

একাদশ, অধিকাংশ ভক্তি সাধকগণ বিশেষভাবে মহারাষ্ট্র, উত্তর ও পূর্বভারতের ভক্তি সাধকগণ সংস্কৃতের পরিবর্তে আঞ্চলিক ভাষাকেই মত প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছেন।

৩৬.৩.৩ ভক্তিআন্দোলনের উদ্ভবের কারণ

ভারতে মধ্যযুগে ভক্তি আন্দোলনের উদ্ভবের কারণ সম্পর্কে পন্ডিতদের মধ্যে বেশ মতপার্থক্য দেখা যায়। একদল পন্ডিত মনে করেন, এই আন্দোলনের উদ্ভবের পিছনে রয়েছে বাইরে থেকে আসা কোনও উপাদান এবং এই উপাদানটি হ'ল ইসলাম। অর্থাৎ ইসলামের একেশ্বরবাদ ও সামাজিক সাম্যের ধারণা ভারতে ভক্তিআন্দোলন এর প্রসার ঘটিয়েছে। আর একদল তাত্ত্বিক রয়েছেন যাঁরা এই মতের বিরোধীতা করেন এবং মনে করেন ভক্তিআন্দোলনের উৎস ভারতীয় ঐতিহ্যের মধ্যেই নিহিত। মার্কসীয় তাত্ত্বিকগন ভক্তিআন্দোলনের উদ্ভবের কারণ হিসেবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার বিশ্লেষণে অগ্রসর হন। আমরা এই অংশে ভক্তি আন্দোলনের উদ্ভবের কারণগুলি সম্পর্কে আলোচনা করব।

৩৬.৩.৪ ভক্তিআন্দোলনের উদ্ভবের কারণ ঃ ইসলামের প্রভাব

তারাচাঁদ বা ইউসুফ এর মত ঐতিহাসিকগণ মধ্যযুগের ভারতে ভক্তিআন্দোলনের প্রসারে ইসলামের অবদানের উল্লেখ করেন। পন্ডিতগণ ইসলামের এই অবস্থানকে ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক থেকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করেন। ভক্তিআন্দোলনের উদ্ভবে ইসলামের ইতিবাচক প্রভাবকে আহম্মদ শরীফ (১৯৯২) দুটি পর্বে ভাগ করেন। প্রথমপর্বটি অষ্টমশতকে দক্ষিণভারতে আরববিজয়কে কেন্দ্র করে এবং দ্বিতীয় পর্বটি একাদশ ত্রয়োদশ শতকে উত্তরভারতে তুর্কী বিজয়কে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে। আহমদ শরীফ এর মতে ৭১১ খ্রীঃ সেনানায়ক মুহম্মদ ইসলামের শাস্ত্রীয় সংস্কৃতি নিয়ে আসেন এবং এরই প্রভাবে শঙ্করাচার্য 'ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রে আবিষ্কার করেন বিমূর্ত একক ব্রহ্মকে। ইসলামের একেশ্বরবাদের প্রভাবেই

শঙ্করাচার্য, রামানুজ, মাধ্ব বা বল্লভাচার্য প্রমুখের চেতনায় এ আলোড়ন, চিন্তার এ উৎকর্ষ এবং মননের এ বিকাশ। আহমদ সরীফ অনিরুদ্ধ রায়ও রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায় এবং সুরজিৎ দাশগুপ্ত তাঁদের বিভিন্ন রচনায় শঙ্করাচার্যের একত্ববাদের উদ্ভবে ইসলামের অবদানের উল্লেখ করেন।

ইসলাম প্রভাবের দ্বিতীয় পর্বটি শুরু হয়েছে একাদশ-ত্রয়োদশ শতকে মামুদ (১০০১ খ্রীঃ থেকে ১০০৬ খ্রীঃ) মুহম্মদ ঘুরী (খ্রীঃ ১১৯০) কুতুবউদ্দিন আইবক (খ্রীঃ ১২০৬) কর্তৃক ভারত অভিযানকে কেন্দ্র করে। এসময়ে ইসলামের শাস্ত্রীয় ঐতিহ্যের পরিবর্তে মরমিয়া সুফি ঐতিহ্যই ছিল প্রধান। এই সুফি ভাবধারাই উত্তর ভারতে ভক্তি আন্দোলনের অন্যতম কারণ। আহমদ শরীকের মতে, এই সুফি ভাবধারার প্রভাবেই উত্তরভারতে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঘটে যা ভক্তিআন্দোলন নামে পরিচিত।

ভক্তি আন্দোলন ইসলামের প্রভাবে গড়ে উঠেছে এই মতের সমর্থনে যে সমস্ত যুক্তিগুলি দেখানো হয় তা নিম্নরূপ:

প্রথমত, হিন্দুধর্ম বহুত্ববাদে (বহু দেব-দেবীর অস্তিত্বে) এবং পৌত্তলিকতাবাদে বিশ্বাসী, পরিবর্তে ইসলামের একত্ববাদ এবং অপৌত্তলিকতা ভক্তিআন্দোলনের প্রধান বৈশিষ্ট্য যা ভক্তি সাধকগণ ইসলাম থেকেই গ্রহণ করেছেন।

দ্বিতীয়ত, বিশ্বাসী বা ভক্তের আবেগ, সরলতা ও ঈশ্বরের প্রতি নিজেকে উৎসর্গকরা ইসলামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ভক্তি সাধনার ক্ষেত্রেও ভক্তের এই আবেগ, সরলতা, ত্যাগ প্রধান।

তৃতীয়ত, হিন্দুর ধর্মীয় জীবন পুরোহিততন্ত্র বা মধ্যস্থতাকারী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ইসলামে, বিশেষত সুফি সাধনায়, ঈশ্বরের সঙ্গে ভক্তের প্রত্যক্ষ সম্পর্কের উপর জোর দেওয়া হয়। ভক্তি সাধনার ক্ষেত্রেও ঈশ্বরের সঙ্গে ভক্তের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ।

চতুর্থত, ইসলামের সমাজ জীবন সাম্যের আদর্শে গঠিত। বিপরীতদিকে, হিন্দুসমাজ ব্যবস্থা জাত ব্যবস্থা নির্ভর, যেখানে প্রতিটি হিন্দুই জন্মসূত্রে কোন সুনির্দিষ্ট জাতের অন্তর্ভূক্ত। এই জাতগত অবস্থান ব্যক্তির কাজ ও সামাজিক মর্যাদাকে ঠিক করে দেয়। অর্থাৎ, জন্মসূত্রেই ব্রাহ্মণও ক্ষত্রিয়গণ সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী এবং শূদ্র উপরোক্ত উচ্চজাত ভুক্ত ব্যক্তিদের সেবায় নিযুক্ত। প্রত্যেকেই এই জাতগত অবস্থান মেনে নেবে। কারণ, স্বধর্মে মৃত্যুও ভালো কিন্তু পরের ধর্ম (জাতকাজও আচরণ) ভয়াবহ। এভাবেই হিন্দুসমাজ নিম্নজাতের উপর উচ্চজাতভুক্ত ব্যক্তিদের প্রাধান্যকে বৈধতা দিয়েছে। ইসলামের সামাজিক সাম্যের ধারণাটি বিশেষ ছাপ ফেলে।

পঞ্চমত, ইসলামের দরবেশগণ বিশেষকরে মরমিয়া সাধক বা সুফি সন্তগণ যে অনাড়ম্বর জীবনযাপনের আদর্শ জনসমক্ষে তুলে ধরেন তার অবদান কম নয়। সুফিদরবেশদের জীবনের এই অনাড়ম্বর ঔদার্য সাধুতা, নিষ্ঠা ও মানবমুখী জীবন সাধারণ মানুষের জীবনই শুধু জয় করেনি ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার ক্ষেত্রেও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। মধ্যযুগের ভক্তদের মধ্যে ও এই অনাড়ম্বর জীবনের ছবি পাওয়া যায়।

বেশ কিছু তাত্ত্বিক রয়েছেন যাঁরা ভক্তি আন্দোলনে ইসলামের ইতিবাচক প্রভাব এর পরিবর্তে নেতিবাচক প্রভাবের উপর অনেকে বেশী গুরুত্ব আরোপ করেন। এই মত অনুযায়ী, হিন্দু সমাজকে ইসলামের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য অর্থাৎ ইসলামে দীক্ষিতকরণ রদ করার জন্য ভক্তি আন্দোলন, বিশেষ করে উত্তর ও পূর্বভারতে ভক্তি আন্দোলন গড়ে উঠেছে।

ভক্তি আন্দোলনের উদ্ভবের কারণ হিসেবে ইসলামএর প্রভাবকে অনেক তাত্ত্বিকই অস্বীকার করেন। প্রথমেই যে প্রশ্নটি দেখা দেয় তা হল ইসলামের কোন্ ধারার এবং কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্য বা উপাদানগুলির প্রভাব ভক্তিআন্দোলনের কারণ হিসেবে বিবেচিত হবে? ইসলামের উদ্ভবের কয়েক শতকের মধ্যেই ইসলামের বিভিন্ন ধারা লক্ষ করা যায়। ভারতে যখন ইসলামের অনুপ্রবেশ ঘটে তখন ইসলাম প্রধানত দুভাগে যথা সুন্নি ও শিয়া মতবাদে বিভক্ত। শরিয়তি বা ঐতিহ্য অনুযায়ী ইসলামের বাইরে সুফি মতবাদ ভারতের মাটিতে অত্যন্ত সক্রিয়। যদি ধরে নেওয়া হয় সুফি মতবাদই ভক্তিআন্দোলনের প্রধান উৎস তাহলে সুফি মতবাদ কতদূর ইসলামের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ প্রশ্ন দেখা দেয়। কারণ রক্ষণশীলগণ সুফি মতবাদকে ইসলাম বিরোধী বলে মন্তব্য করেন। দ্বিতীয়ত, ঈশ্বরের সঙ্গে ভক্তের ব্যক্তিগত সম্পর্কের ধারণা, ভক্তিসাধনা, প্রভৃতি ধারণাগুলি যা একান্তভাবে সুফি মতবাদ থেকে এসেছে বলে দাবী করা হয়, তা কতদূর গ্রহণযোগ্য সে সম্পর্কেও পন্ডিতগণ প্রশ্ন তুলেছেন। কারণ এই সমস্ত বৈশিষ্ঠ্যগুলি ভারতীয় ঐতিহ্যের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায়। দক্ষিণভারতে আলভার ও নায়ানার ভক্তি আন্দোলন ইসলামের উদ্ভবের আগেই সূচিত হয়েছে। বৌদ্ধদের মধ্যে, বিশেষকরে মহাযান বৌদ্ধগণ বুদ্ধকে অবতার বানিয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে ভক্তের ব্যক্তিগত সম্পর্কের বিষয়টি ইসলামের উদ্ভবের অনেক আগেই তুলে ধরেন। ভাগবত ঐতিহ্যে, দক্ষিণভারতে বীরশৈব আন্দোলনে ভক্তিসাধনাই প্রধান।

তৃতীয়ত, একেশ্বরবাদ এবং অ-পৌত্তলিকতা — ভক্তিআন্দোলনের এই দুই বৈশিষ্ঠ্যকে ইসলামের অবদান হিসেবে দেখা হয়। কিন্তু শঙ্করাচার্যের দর্শনে একেশ্বরবাদ ও অ-পৌত্তলিকতা প্রধান যা পরবর্তীকালের ভক্তিসাধকদের প্রভাবিত করে। শঙ্করাচার্যের একেশ্বরবাদ এবং ইসলামের একেশ্বরবাদ এর মধ্যে পার্থক্যও যথেষ্ট। ইসলামের একেশ্বরবাদ অন্য ঈশ্বর / দেবতাদের অস্তিত্বের বিরোধী কিন্তু শঙ্করাচার্যের একেশ্বরবাদ বহুঈশ্বরের মধ্যে সমন্বয়কারী অর্থাৎ একই ঈশ্বর বহুতে বিরাজমান বা বলা যায় বহু ঈশ্বর আসলে একই ঈশ্বরের প্রকাশ। শঙ্করাচার্যের এই ধারণা ভারতীয় বেদান্ত দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত। অ-পৌত্তলিকতা শঙ্করার্যের ও আগে বৌদ্ধদের বক্তব্যে লক্ষ করা যায়। বৌদ্ধগণ ঈশ্বর এবং পৌত্তলিকতা বিরোধী; শঙ্করাচার্য পৌত্তলিকতাবিরোধী কিন্তু ঈশ্বর বিরোধী নয়। শঙ্করাচার্যের এই অ-পৌত্তলিকতা বা নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা শঙ্করাচার্যকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলে সাকারবদীগণ বা পৌত্তলিকগণ সমালোচনা করেছেন। ভক্তি আন্দোলনের সকলেই পৌত্তলিক বিরোধী ছিলেন না। নানক, কবীর প্রমুখ ভক্তি সাধকগণ নির্গুণ ঈশ্বরের সমর্থক ছিলেন কিছু মীরাবাঈ বা চৈতন্যদেব ছিলেন সগুণ ঈশ্বরের সমর্থক।

চতুর্থত, মধ্যযুগের ভক্তদের সকলেই যে জাতব্যবস্থার বিরুদ্ধে ছিলেন তাও বলা যাবে না। তুলসীদাসের মতো অনেক ভক্তই জাতব্যবস্থা ও সামাজিক অনুষ্ঠানাদি টিকিয়ে রাখারই পক্ষপাতী ছিলেন। বিপরীতদিকে, পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে ইসলামসম্প্রদায়ের মধ্যেও সামাজিক স্তরবিন্যাস ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট। আরব রক্তের

প্রবাহ যার মধ্যে রয়েছে এরকম মুসলমান, অন্যান্য দেশ থেকে আগত মুসলমান, ভারতের ধর্মান্তরিত মুসলমান এবং ধর্মান্তরিতদের মধ্যে পূর্বতন জাত ব্যবস্থার অবস্থান প্রভৃতি বিষয়গুলি মুসলমান সম্প্রদায়কে সামাজিক সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করেনি। এই সমস্ত কারণে অনেক তাত্ত্বিকই ভক্তি আন্দোলনকে ইসলামের প্রভাব থেকে উদ্ভূত এরকম মত স্বীকার না করে ভক্তি আন্দোলনের উদ্ভবে অন্য কারণ সন্ধানে অগ্রসর হয়েছেন। অবশ্য এই সমস্ত তাত্ত্বিকদের মধ্যে অনেকেই রয়েছেন যাঁরা মনে করেন ভারতের ভক্তি আন্দোলন ইসলামের দ্বারা বিশেষ করে সুফিবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে — অবশ্য ভারতের মাটিতে ইসলামও প্রভাবিত হয়েছে ভক্তি আন্দোলনের দ্বারা। প্রায় একই সময়ে ঘটে যাওয়া দুইটি মরমীয়া সাধনার ধারা প্রবাহিত হতে যেয়ে পরস্পর পরস্পরকে যেমন প্রভাবিত করেছে একইভাবে প্রভাবিত ও হয়েছে। কিন্তু একটির উদ্ভবে অপরটি একমাত্র বা প্রধান ভূমিকা নিয়েছে এধরণের সিদ্ধান্ত টানা কষ্টকর। ভক্তি আন্দোলনের উদ্ভব ভারতের সে সময়ের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবলীর মধ্য থেকেই ঘটেছে।

৩৬.৩.৫ ভক্তিআন্দোলনের উদ্ভবের কারণ ঃ ভারতীয় ধর্মীয় ঐতিহ্য ও পরিস্থিতি

মধ্যযুগে ভারতে যে ভক্তি আন্দোলন দেখা যায় তার শিকড় ভারতের মাটিতেই প্রবিষ্ট ছিল বলে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার মন্তব্য করেন। প্রতীক পূজার পরিবর্তে একেশ্বর বাদে বিশ্বাস ঋক বেদের মধ্যেই নিহিত ছিল এবং এই বিশ্বাস পরবর্তীযুগগুলিতেও বহুদেবদেবী পূজার পাশাপাশি বজায় ছিল। ভক্তি সাধকদের বক্তব্যের মধ্যে উপনিষদের বক্তব্যের ও সুর শোনা যায়। ইসলামের উদ্ভবের আগেই বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মেও অ-পৌত্তলিকতা, জাত ব্যবস্থার বিরোধীতা লক্ষ করা যায়। খ্রীষ্টীয় প্রথম থেকে দশম শতকের মধ্যে দক্ষিণভারতে যে বৈষ্ণব (আলবার) এবং শৈব (নায়নার) ভক্তি আন্দোলন গড়ে ওঠে তা একান্তই ভারতের মাটি থেকেই উঠে আসা আন্দোলন। মধ্যযুগের ভক্তি সাধকদের কৃতিত্ব হ'ল এই সাধকগণ ভক্তির বিশুদ্ধ ধারনা শাস্ত্রীয় আচার অনুষ্ঠান ও গোষ্ঠীসংকীর্ণতায় উদ্ধে স্থাপন করেছিলেন এবং মুক্তির উপায় হিসেবে ঈশ্বরের প্রতি গভীর আকুতি ও অহৈতুকী প্রেমের ভূমিকাকে তুলে ধরেছেন। মধ্যযুগে যখন শাস্ত্রীয় ধর্ম ভাবনা শুষ্ক, জীবনহীন, স্থবির, আচার-অনুষ্ঠান সর্বস্ব হয়ে উঠেছিল তখন ভক্তি সাধকদের আদর্শও জীবনবোধ মাটির কাছাকাছি মানুষদের প্রবল ভাবে নাড়া দেয়। এরই পাশাপাশি সুফিবাদের প্রসার ঘটতে থাকে। এব্যাপারে কোনসন্দেহ নেই যে সুফি ভাবধারার প্রভাব ভক্তি আন্দোলনেও পড়ে কিন্তু একটাও ঠিক যে সুফিসাধকগণও সেসময়ের ভারতীয় যোগসাধনায় নাথপন্থীদের ক্রিয়াকলাপ দ্বারা প্রভাবিত হন। এই পারস্পরিক প্রভাবের প্রকৃতি ও ব্যাপকতা নির্ণয় করা খুব একটা সহজ কাজ নয়। এবং যতক্ষণ না তা হচ্ছে ততক্ষণ কোন এক পক্ষের প্রভাবকে বড় করে দেখানো সমীচীন নয়। তাছাড়া অন্যান্য উপাদানগুলিও আলোচনায় আনা দরকার।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক সতীশচন্দ্র ও বলেন, এটা মেনে নিতে খুব একটা অসুবিধা হবার কথা নয় যে দক্ষিণ ও উত্তর ভারতে ভক্তিআন্দোলনের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে সেখানকার নিজস্ব ও নির্দিষ্ট পরিস্থিতি থেকেই। এই দুই আন্দোলনই ভারতীয় সংস্কৃতির বৃহত্তর প্রেক্ষাপটেই থেকেছে এবং দার্শনিক, নৈতিক ও সৌন্দর্যসংক্রান্ত ধারণাগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকেছে। এমনকি, সতীশচন্দ্রের মতে, ষষ্ঠ থেকে দশম শতক পর্যন্ত দক্ষিণভারতে উদ্ভূত ও প্রসারিত ভক্তিআন্দোলন এবং চতুর্দশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নামদেব এর শুরু থেকে পঞ্চদশ শতকে কবীর, ষোড়শ শতকে চৈতন্যদেব এর মধ্যে ভক্তিআন্দোলনের যে প্রকাশ ঘটেছে

তারও পিছনে রয়েছে যথাক্রমে দক্ষিণ, উত্তর ও পূর্বভারতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের ভিন্ন ধারা। যেমন, দক্ষিণভারতে ভক্তিআন্দোলনের পিছনে ছিল বৌদ্ধ ও জৈন এবং স্মার্ত ব্রাহ্মণ বিরোধীতা এবং এর ফলে যাজক ব্রাহ্মণ্যবাদ এখানে প্রসারিত হবার সুযোগ পেয়েছে। বিপরীত চিত্রটি দেখা যায় উত্তর ভারতে, যেখানে ভক্তি আন্দোলন মূলত ব্রাহ্মণ্য ভাবধারার বিরুদ্ধে আন্দোলন এবং এর পিছনে ছিল নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উদ্ভূত আত্মপরিচয়ের সংকটে সম্মুখীন কারিগর, বিভিন্ন বৃত্তিভোগী শ্রেণী যারা ব্রাহ্মণ্য জাতভিত্তিক কাঠামোয় শূদ্রের মর্যাদা পেয়েছে এবং যারা এই আন্দোলনে মূখ্য ভূমিকা নিয়েছে। অবশ্য এই আন্দোলনগুলি থেকে সতীশচন্দ্র এক সাধারণ সূত্রের সন্ধান করেন এবং তা আমরা এখানে উল্লেখ করতে পারি। যখন কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রশক্তি খুবই প্রবল এবং আঞ্চলিক/স্থানীয় ভূস্বামী ও ব্রাহ্মণের প্রতাপ কম তখনই ভক্তি আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে; অপরদিকে যখন রাষ্ট্রশক্তি দুর্বল, স্থানীয়/আঞ্চলিক ভূস্বামীগণ অত্যন্ত সক্রিয় এবং রাষ্ট্রশক্তির বিকেন্দ্রীকরণে প্রশাসনিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী, ভূমিদানের মাধ্যমে ব্রাহ্মণের হাতে জমির এক বড় অংশের মালিকানা হস্তান্তরিত এবং বাণিজ্য, বিশেষ করে দূরপাল্লার বাণিজ্য এক সংকটের মুখে এবং নগর সভ্যতার ও সংকট দেখা দিয়েছে তখন ভক্তিআন্দোলন বিকশিত হবার অনুকূল পরিবেশ থেকে বঞ্চিত থেকেছে।

৩৬.৩.৬ ভক্তিআন্দোলনের উদ্ভব ঃ মার্কর্সবাদী তাত্ত্বিকগণের বক্তব্য

মার্কর্সবাদী তাত্ত্বিকগণ ভক্তি আন্দোলনের উদ্ভবও বিকাশের সঙ্গে সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশের সম্পর্কটি উল্লেখ করেন। এই তত্ত্বে ঈশ্বরের সঙ্গে ভক্তের সম্পর্ককে তুলনা করা হয়েছে সামন্তপ্রভুর সঙ্গে ভূমিদাসের সম্পর্কের। এব্যাপারে ডি. ডি. কোশাম্বীর (D.D.Kosambi) নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। কোশাম্বীর মতে, সামন্ত সমাজে সামন্তপ্রভূর প্রতি ভূমিদাসের আনুগত্য শর্তহীন; ভক্তিসাধনাতেও ঈশ্বরের প্রতি ভক্তের আনুগত্য শর্তহীন। রামশরণ শর্মাও কোশাম্বীর এই বিশ্লেষণকেই অনুসরণ করেছেন। এই ধরণের তত্ত্বের সীমাবদ্ধতাকে তুলে ধরেন কৃষ্ণা শর্মা (১৯৮৭) যাঁর মতে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তের আনুগত্যের বিষয়টি ভারতের ধর্মীয় ইতিহাসের প্রতিটি পর্বেই লক্ষ করা যায়। ভারতে সামন্ত সমাজ গড়ে ওঠার (ভারতে সামন্ততন্ত্র আদৌ ছিল কিনা বা থাকলে ও তা ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্র থেকে কতটা ভিন্ন এব্যাপারে পন্ডিতগণ একমত নন) আগে প্রাচীন ভারত সম্পর্কে একথা যেমন সত্য, সামন্ত পরবর্তী পুঁজিবাদী ভারতীয় সমাজেও (একদল পন্ডিত রয়েছেন যারা ভারতীয় সমাজ বিশ্লেষণে সামন্ততন্ত্র, পুঁজিতন্ত্র প্রভৃতি ধারণাগুলিকে ইউরোপীয় 'নির্মাণ' বলে মনে করেন) তা একইভাবে সত্য। সুতরাং ভক্তি সাধনাকে শুধুমাত্র সামন্তসমাজের সঙ্গে একাত্ম করে দেখাটা যুক্তিযুক্ত নয়। তাছাড়া শঙ্করাচার্যের মতো নির্গুণ ভক্তগণ ঈশ্বরের সঙ্গে ভক্তের সম্পর্ককে একান্ত ব্যক্তিগত বলে মনে করেন এবং ঈশ্বরের সঙ্গে ভক্তের একাত্মতার কথা বলেন।

ভক্তি আন্দোলনের বিশ্লেষণে মার্কসবাদী তাত্ত্বিকদের মধ্যে আর এক ধরণের প্রবণতা লক্ষ করা যায় এবং তা হ'ল ভক্তিআন্দোলনকে সেইসময়কার প্রতিষ্ঠিত সমাজের বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণের মানুষের বিদ্রোহ হিসেবে ব্যাখ্যা করা। এক্ষেত্রে বর্ণের (সাম্প্রতিক আলোচনায় বর্গের) সঙ্গে শ্রেণীর বিষয়টিকে সমার্থক মনে করা হয়েছে। একথা সত্য, এই আন্দোলনে যারা ব্যাপকভাবে সাড়া দেন তাঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নতুন সমাজ বিন্যাসে আত্মপরিচয়ে সংকটে সম্মুখীন বৃত্তি ভোগী গোষ্ঠীগুলি ও সাধারণ কৃষক, কৃষিশ্রমিক যাঁরা

অধিকাংশই ছিলেন শূদ্রজাতভুক্ত। এটাও ঘটনা যে, কবীর, দাদু, রুইদাস, নামদেব প্রমুখ ভক্তগণ ছিলেন নিম্নবর্ণের মানুষ। কিন্তু এটাও ঘটনা যে বেশ কিছু ভক্ত যেমন চৈতন্য, তুলসীদাস, সুরদাস ছিলেন উচ্চবর্ণের মানুষ। রামানুজ, নিম্বার্ক, মাধ্ব ও বল্লভাচার্য ছিলেন উচ্চবর্ণে জাত। নির্গুণ ভক্তিসাধক নানক ও ছিলেন উচ্চজাত ভুক্ত (ক্ষত্রিয়)। সুতরাং ভক্তি আন্দোলনকে নিম্নবর্ণের মানুষের আন্দোলন হিসেবে ব্যাখ্যা করা একধরণের ব্যাখ্যার সরলীকরণমাত্র।

অপর এক মাকর্সবাদীতাত্ত্বিক ইরফান হাবিব ভক্তিআন্দোলনের উদ্ভব ও বিকাশকে আলোচনা করেছেন ইসলামের আগমনে উদ্ভূত নতুন শ্রেণীবিকাশের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে। ইরফান হাবিব এর মতে, ভারতে মুসলমানদের রাজনৈতিক ক্ষমতাদখলের ফলে শাসকগোষ্ঠীর বিভিন্ন প্রয়োজন মেটানোর জন্য শহরাঞ্চলে শিল্পী ও কারিগর শ্রেণীর প্রসার ঘটতে থাকে। এই নতুন শাসকগণ কর্তৃক নতুন নতুন চাহিদার ফলে নতুন ধরণের কারিগর ও দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন দেখা দেয়। নিম্নবর্ণের মানুষেরাই মূলত এই নতুন প্রয়োজনগুলি যোগানের জন্য এগিয়ে আসে এবং এর ফলে পুরানো জাতভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে নতুন জীবিকার সংঘাত দেখা দেয়। পুরানো জাত ব্যবস্থার নিয়মবিধিও ভঙ্গ হতে থাকে। এরকম অবস্থায় কবীর ও নানকের জাতব্যবস্থা বিরোধী আন্দোলন এই নতুন জীবিকা গোষ্ঠীগুলির কাছে মুক্তির উপায় হিসেবে বিবেচিত হয় এবং এদের মধ্য থেকে বড় অংশ কবীর ও নানকের মতের অনুগামী হতে থাকে। শুধুমাত্র শহরাঞ্চলের নতুন শ্রেণীগুলিই কবীর ও নানকের জাতব্যবস্থাবিরোধী আন্দোলনের সমর্থক হয়ে ওঠেনি। গ্রামাঞ্চলে বিশেষকরে পাঞ্জাবের কৃষকদের মধ্যে 'জাঠ' সম্প্রদায়ের বড় অংশও এই আন্দোলনকে সমর্থন করেন। ইরফান হাবির এর মতে, এই জাঠগণ ছিলেন মূলত পশুপালক গোষ্ঠী যাঁরা পরে কৃষি গোষ্ঠীতে রূপান্তরিত হন। কিন্তু এই নতুন শ্রেণীতে রূপান্তরিত হবার পরেও অন্যান্য কৃষিজীবি জাতগোষ্ঠীগুলির সঙ্গে সমমর্যাদার প্রতিষ্ঠিত হতে পারেননি। স্বাভাবিক ভাবেই, একজন 'জাঠ' সম্প্রদায় ভুক্ত কৃষকের পক্ষে পুরাতন জাতব্যবস্থার নিম্নস্তরে অবস্থানের পরিবর্তে জাতভেদ মুক্ত এক সমাজের বাসিন্দা হওয়াই অধিকতর কাম্য। তাই এইজাঠদের মধ্যে কবীর ও নানকের মতের প্রসার ব্যাপক হয়ে ওঠে।

ইরফান হাবির এর এই ব্যাখ্যাকে সমালোচনা করে কৃষ্ণা শর্মা বলেন, ইরফান হাবিব ভক্তি আন্দোলনকে প্রতিবাদ ও শ্রেণীসংগ্রামের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন কিন্তু ভক্তি আন্দোলনের মূল বক্তব্যগুলির বিশদ মূল্যায়ন করেননি। তাছাড়া, কৃষ্ণা শর্মার মতে, ভক্তি সম্পর্কে ধারণার অস্পষ্টতা ও বিশ্লেষণ ইউরোপীয় বিশ্লেষণ অনুসারী হওয়ায় এক বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে। যেমন সগুণ ও নির্গুন ভক্তি আন্দোলন সম্পর্কে, দক্ষিণভারতের ও উত্তর ভারতের ভক্তি আন্দোলনের পার্থক্য সম্পর্কে এই ঐতিহাসিকগণ খুব একটা স্পষ্ট ধারণা দেননি।

অবশ্য ভক্তি আন্দোলনের বিশ্লেষণে মাকর্সবাদী তাত্ত্বিকগণের অবদান যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। ভক্তি আন্দোলনের বিশ্লেষণকে শুধুমাত্র সাংস্কৃতিক / ধর্মীয় আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে এই আন্দোলনের পিছনে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণগুলির অন্বেষণ নিঃসন্দেহে মার্কসবাদী তাত্ত্বিকগণের এক বড় অবদান। যে কোনও আন্দোলনের বিশ্লেষণে একরৈখিকতার পরিবর্তে বিশ্লেষণ বহুরৈখিক হওয়াই বাঞ্চনীয়। নতুবা আন্দোলনের প্রকৃত স্বরূপ বিশ্লেষণ সংকীর্ণ হতে বাধ্য।

৩৬.৪ দক্ষিণভারতে ভক্তি আন্দোলন

মধ্যযুগে ভারতে ভক্তি আন্দোলনের প্রথম বিকাশ ঘটে দক্ষিণ ভারতে এবং পরে তা সঞ্চারিত হয় মহারাষ্ট্র, উত্তর ভারতে এবং পূর্বভারতে। এব্যাপারে একটি গাথার উল্লেখ করা যেতে পারে —

উৎপন্ন দ্রাবিড়ে ভক্তিবৃদ্ধিং কর্ণাটকে গতা

ক্বচিৎ ক্বচিন্ মহারাষ্ট্রে গুর্জরে প্রলয়ং গতা।

("ভক্তি উৎপন্ন হয়েছিল দ্রাবিড়ে, বৃদ্ধি পেয়েছিল কর্ণাটকে কিছু কিছু মহারাষ্ট্রে, গুজরাটে লুপ্ত হয়েছে" — অনুবাদ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (রচনা সংগ্রহ ৩য় খণ্ড পৃঃ ৬৪৪।

দক্ষিণ ভারতে ভক্তি আন্দোলনের দুটি পর্ব লক্ষ করা যায়। প্রথমপর্বটি জড়িত খ্রীঃ ষষ্ঠ শতক থেকে নবম শতক পর্যন্ত 'আলবার' নামে বৈষ্ণব সম্প্রদায় ও 'নায়নার' নামে শৈব সম্প্রদায়ের সঙ্গে। দ্বিতীয়পর্বটি জড়িত একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতকে - শঙ্করাচার্যের (খ্রীঃ ৭৮৮-৮২০) অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে রামানুজ নিম্বার্ক মাধ্ব এর বক্তব্যের সঙ্গে। বল্লভাচার্য এই ধারারই প্রতিনিধি যিনি পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে ভক্তি আন্দোলনের বিকাশে দক্ষিণভারতের সঙ্গে উত্তরভারতের সেতুবন্ধন ঘটান। দ্বিতীয় পর্বটি শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদী দর্শনের বিরুদ্ধ প্রতিবাদী ভক্তিবাদী আন্দোলন হিসেবে বর্ণনা করা হলেও, কৃষ্ণা শর্মার মতে, শঙ্করাচার্যও ভক্তিবাদী তাত্ত্বিক। কৃষ্ণা শর্মার মতে, শঙ্করাচার্যকে জ্ঞানমার্গী হিসেবে এবং জ্ঞানমার্গকে ভক্তিমার্গের বিরোধী হিসেবে গণ্য করে যে বক্তব্য সাধারণত হাজির করা হয় তা সঠিক নয়। শঙ্করাচার্যও ভক্তিবাদী এবং শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদে ভক্তি ও জ্ঞানের মধ্যে কোনও বিরোধ নেই। শঙ্করাচার্য সম্পর্কে এই পরস্পরবিরোধী ব্যাখ্যার জন্য আমরা দ্বিতীয়পর্বের ভক্তি আন্দোলনের আলোচনায় শঙ্করাচার্যের মত সম্পর্কেও আলোচনা করব।

৩৬.৪.১ দক্ষিণভারতে ভক্তিআন্দোলন - প্রথমপর্ব

দক্ষিণভারতে ভক্তি আন্দোলনের প্রথম বিকাশ দেখা যায় ষষ্ঠ শতক থেকে নবম শতকে আলবার ও নায়নার গীতিকারদের রচনায়। আলবার গীতিকারদের ভক্তিমূলক গানগুলি তামিলসাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। এই গানগুলি রচিত হয়েছে খ্রীঃ সপ্তম থেকে খ্রীঃ নবম শতক পর্যন্ত এবং যা 'নালাঈর প্রবন্ধম' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হয়। এই গ্রন্থটি সে সময়কার ভক্তি আন্দোলনের প্রকৃতিকে তুলে ধরে। গানগুলির রচয়িতা 'আলবার' ভক্তি সাধকগণ যাঁরা ছিলেন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত। আলবার কবিদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন পেরিআলবার, পেরিআলবারের কন্যা আন্দল, তিরুমঙ্গ আলবার, কুলশেখর আলবার এবং নামআলবার। এই ভক্তিগীতিগুলি সেসময় এতই জনপ্রিয়তা অর্জন করে যে 'নালাঈর প্রবন্ধম'কে এক পবিত্র গ্রন্থ হিসেবে দেখা হতে থাকে।

দক্ষিণভারতের প্রেমভক্তিমূলক এই গীতিকবিতাগুলির সৃষ্টির পিছনে বিভিন্ন কারণ হাজির করেছেন পণ্ডিতগণ। ভি সুব্রামনিয়ম এর মতে, প্রাচীন তামিল সাহিত্যে বরাবরই এক যৌন প্রেমমূলক আবেগপ্রবণ ঐতিহ্য ছিল। এই প্রেম ভাবনার দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। (এক) এধরনের প্রেম ছিল সাধারণ মানুষেরই উপজীব্য বিষয় এবং (দুই) এই প্রেমের সঙ্গে এক ধরণের বিশেষ রহস্যময়তা ছিল। কিন্তু খ্রীঃ দ্বিতীয়

শতকের পর থেকে এই ঐতিহ্যটি ক্রমশঃ আর্যসভ্যতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে চাপা পড়তে থাকে এবং এরই বহিঃপ্রকাশ হিসেবে এই ধরণের প্রেমমূলক ভক্তিগীতিগুলি রচিত হয়।

আর একদল পন্ডিত রয়েছেন যাঁরা মনে করেন, সে সময় দক্ষিণভারতে বৌদ্ধ ও জৈন প্রভাব খর্ব করার জন্য বিষ্ণু উপাসনা চালু হয় এবং এর ফলে দক্ষিণভারতে ক্রমশঃ ভক্তিআন্দোলনের মধ্যদিয়ে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটে।

তৃতীয় মতে, খ্রীঃ ষষ্ঠ শতকে দক্ষিণভারতে যে ভক্তিআন্দোলন দেখা যায় তা অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ফলে গড়ে উঠেছে। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতক থেকে দক্ষিণ ভারতের অর্থনীতিতে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটতে থাকে। বাণিজ্যব্যবস্থার সংকোচন ও নগর সভ্যতার সংকট অর্থব্যবস্থাকে মূলত কৃষিভিত্তিক করে তোলে। এসময় আবার মন্দির প্রতিষ্ঠা, ব্রাহ্মণ যাজক ও মন্দির বিগ্রহকে জমিদান, দক্ষিণভারতে ব্যাপকভাবে ঘটতে থাকে। এভাবেই দক্ষিণভারতে সামন্ত অর্থব্যবস্থার গোড়াপত্তন শুরু হয়। কৃষিউদ্বৃত্তের উপর নির্ভরশীল শাসক ও যাজক সম্প্রদায় এর সঙ্গে উৎপাদক কৃষকের সম্পর্ক কী ধরণের হবে তারই তত্ত্বরূপ এবং সংস্কাররূপ পাই ভক্তিআন্দোলনে। ভক্তি আন্দোলনে ঈশ্বর এর সঙ্গে ভক্তের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং ভক্ত ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণকারী। অনুরূপভাবে, শাসকও যাজকের সঙ্গে উৎপাদক কৃষকের সম্পর্কও অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং উৎপাদক কৃষক শাসক ও যাজকের কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করবে। পরিবর্তিত এই সামন্ত অর্থব্যবস্থার অনুকূল সমাজসম্পর্ককে তুলে ধরা হয়েছে ভক্তি আন্দোলনে।

'আলবার' গীতিকবিতাগুলি থেকে ভক্তি আন্দোলনের যে বৈশিষ্ট্যগুলি ফুটে ওঠে তা নিম্নরূপ ঃ

প্রথমত, প্রথমদিকের 'আলবার' কবিগণ বিষ্ণুকৃপা লাভ করার উপায় হিসেবে ঈশ্বরের বিষয়ে প্রকৃতজ্ঞান লাভের উপর জোর দেন। ঈশ্বর সম্পর্কে প্রকৃতজ্ঞানলাভ এবং সেই জ্ঞান সাধারণমানুষের কাছে প্রচার ছিল প্রথমদিকের আলবার সাধকদের বৈশিষ্ট্য। আলবার শব্দটির অর্থই হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যিনি ঈশ্বর সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করেছেন। পরবর্ত্তীকালের আলবারগন অবশ্য জ্ঞানের পরিবর্তে ঈশ্বরের প্রতি অন্ধভক্তি এবং পুরো আত্মসমর্পণ এর উপর জোর দেন। ঈশ্বরের করুণা লাভ মানুষের চরম লক্ষ্য, কারণ এই করুণালাভই মানুষকে মুক্তি দিতে পারে।

দ্বিতীয়ত, ঈশ্বর সাধনায় গুরুর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গুরুই ভক্তকে ঈশ্বরের করুণালাভের পথ দেখান।

তৃতীয়ত, সহজ ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন ভক্ত সাধকের কাম্য। কুলশেখর আলবার রাজপরিবারের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও রাজপরিবারের সঙ্গে সমস্ত সংস্রব ত্যাগ করেন। কুলশেখর আলবার এর মতে, বিষ্ণু থেকে দূরে থাকা মানুষের চেয়ে তিরুপতি পাহাড়ের পাখি হয়ে ঈশ্বরের কাছে থাকা অনেক কাম্য।

চতুর্থত, বংশকৌলিন্য বা জাত ব্যবধান এর পরিবর্তে সামাজিক সাম্যের উপর আলবারগণ গুরুত্ব দেন। ঈশ্বরের কাছে সব মানুষই সমান। সেই ঈশ্বর এক এবং সবার প্রভুস্বরূপ। এভাবে আলবারগণ একেশ্বরবাদেরও প্রচার করেন। বেশকিছু আলবারগানে জাতব্যবস্থাকে পুরোপুরি অস্বীকার করা হয়নি। অধিকাংশ আলবার কবিই ছিলেন ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় ভুক্ত। শূদ্র হয়েও যিনি আলবার কবিদের মধ্যে বিশেষ স্থান দখল করেন তিনি হলেন নামআলবার। অত্যন্ত প্রভাবশালী কবি হয়েও নামআলবার জাতভেদকে মেনে নেন।

পঞ্চমত, আলবার কবিদের সঙ্গে সে সময়ে মন্দিরের যোগাযোগ ছিল অত্যন্তবেশী। দক্ষিণভারতে সে সময় বিভিন্নস্থানে মন্দির গড়ে উঠতে থাকে এবং মন্দিরকে কেন্দ্র করে এক ভূস্বামী যাজকশ্রেণী ও গড়ে ওঠে। আলবার কবিদের সঙ্গে এই বিষ্ণুমন্দিরগুলির সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ। শ্রীরঙ্গম মন্দিরেই 'নালাঙ্গীর প্রবন্ধম' গ্রন্থটি সংকলিত হয়। এই মন্দিরগুলিতে শূদ্রজাতভুক্ত আলবারদের প্রবেশাধিকার ও ছিল নিষিদ্ধ।

ষষ্ঠত, আলবার গীতিকবিতাগুলি যেমন কৃষ্ণের জীবনী, বিশেষকরে কৃষ্ণের বাল্যকাল, রামচন্দ্রের জীবণীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে, আবার বিরহ-যাতনা নিয়ে প্রেমের কবিতাও এর মধ্যে স্থান পেয়েছে। প্রেমমূলক সম্পর্কই এই গানগুলির প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়।

সপ্তমত, এসময়ের ভক্তি আন্দোলনে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের ও স্মার্ত ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের বিরোধীতা যেমন লক্ষ করা গেছে, অপরদিকে বিষ্ণু উপাসনার মধ্য দিয়ে যাজক ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রসারও ঘটেছে। এই যাজক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রসারে মন্দিরগুলির অবদান ছিল উল্লেখযোগ্য।

অষ্টমত, ভক্তি আন্দোলনের মধ্যদিয়ে তামিল ও সংস্কৃতভাষার পারস্পরিক লেনদেন ঘটেছে। এই ভক্তি আন্দোলনের সূত্র ধরেই দ্বাদশশতকে কবি কম্বন তামিল রামায়ণের রচনা করেছেন। এসময় মহাভারত ও ভাগবত পুরাণের অনুবাদ ও হয়েছে তামিল ভাষায়। বৈষ্ণবধর্ম প্রসারে সংস্কৃতগ্রন্থগুলি যেমন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে, অপরদিকে দক্ষিণভারতীয় ভাবনা সংস্কৃতভাষা ও বৈষ্ণবধর্মকে কেন্দ্র করে গোটা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে।

আলবার ভক্তি আন্দোলনের পাশাপাশি একই সময়ে দক্ষিণ ভারতে ভক্তি আন্দোলনের আর একটি ধারা লক্ষ করা যায়। এই ধারাটি পরিচালিত হয় নায়নারদের দ্বারা। নায়নার ভক্তি আন্দোলন খ্রীঃসপ্তম ও অষ্টমশতকে দক্ষিণভারতে ব্যাপকতা ল্যাভ করে। আলবার ভক্তি আন্দোলন যেমন বিষ্ণু সাধকদের আন্দোলন, সেরূপ নায়নার ভক্তি আন্দোলন শিব-ভক্তদের আন্দোলন। নায়নারদের ভক্তিগীতিগুলি 'তেভারম্' এবং 'পেরিয় পুরানম্' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। পেরিয়পুরানম গ্রন্থটি সংকলিত হয়েছে একাদশ শতকে এবং এই গ্রন্থে ৬৩ জন নায়নার এর জীবনবৃত্তান্ত, গীতিকবিতা সংগৃহীত হয়েছে।

আলবার আন্দোলনের মতো নায়নার ভক্তি আন্দোলনেরও মূল বিষয় হোল ভক্তি এবং একেশ্বরবাদ, শিবের প্রতি অচলা ভক্তি এবং আত্মসমর্পণই মুক্তির একমাত্র উপায়। এই আন্দোলন ও মঠ-মন্দিরকেন্দ্রিক। যাজক ব্রাহ্মণ এই আন্দোলনের প্রাণপুরুষ। আলবার আন্দোলনের মতো নায়নার আন্দোলন ও পরিচালিত হয়েছে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের বিরোধীতা থেকে। স্মার্ত বা শাস্ত্রীয় ব্রাহ্মণগণ ছিলেন এই আন্দোলনের লক্ষ্য। এসময় বিভিন্ন স্মৃতি গ্রন্থগুলিতে যেমন মনুস্মৃতি, বিষ্ণুস্মৃতি, উসানস সংহিতায় যাজক ব্রাহ্মণদের শুধুমাত্র হেয়ই করা হয়নি, বিভিন্ন ধর্মীয় কাজে অনুপ্রবেশ ও বন্ধ করা হয়। আলবার ও নায়নার আন্দোলনকারীগণ ব্রাহ্মণ্য এই স্মার্তধারার বিরোধীতা করেন এর মঠ-মন্দিরকেন্দ্রিক যাজক ব্রাহ্মণ ধারার সমর্থক হয়ে ওঠেন। অবশ্য পরবর্ত্তীকালে নায়নারদের মধ্যে দুটি স্বতন্ত্র ধারা লক্ষ করা যায়। নায়নারদের একটি গোষ্ঠী বহুত্ববাদ, পৌত্তলিকতাবাদে ও জাতব্যবস্থার বিরোধী ছিল। অপর গোষ্ঠীটি বহুত্ববাদের বিরোধী হলেও পৌত্তলিকতাবাদও জাতভেদকে মেনে নিয়েছিল। এই গোষ্ঠীটির সঙ্গে রাজনীতির সংযোগও ছিল খুব

বেশী। যাজক ও মঠ-মন্দিরগুলি জনগণের যে আনুগত্য লাভ করে তা পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রকর্তৃত্বের প্রতি আনুগত্য হয়ে দাঁড়ায়।

আলবার আন্দোলনের মতো নায়নার আন্দোলনের ভাষাও আঞ্চলিক। 'তেভারম' ও 'পেরিয় পুরানম' গ্রন্থদুটিই তার প্রত্যক্ষপ্রমাণ। নায়নার ভক্তগণ ছোট ছোট ছন্দোবদ্ধ কবিতার আকারে তাদের ভক্তিদর্শনকে প্রকাশ করতেন। এগুলি কন্নড় সাহিত্যে 'বচন' নামে পরিচিত। প্রায় তিনশো বছর ধরে এরকম বহু 'বচন' রচিত হয়। এর মাধ্যমে শিবের প্রতি ভক্তির বিষয়টি নায়নারগণ তুলে ধরেণ। দ্বাদশাতকে বাসব নামে এক শিবভক্ত এব্যাপারে বিশেষ সুনাম অর্জন করেন এবং বীরশৈব বা লিঙ্গায়ত নামে এক সম্প্রদায় গড়ে তোলেন। এই সম্প্রদায়ও বিভিন্ন মঠপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সামাজিক সাম্যের বিষয়টি তুলে ধরেন।

৩৬.৪.২ দক্ষিণভারতে ভক্তি আন্দোলন - দ্বিতীয় পর্ব

মধ্যযুগে দক্ষিণভারতে দ্বিতীয় পর্বের অর্থাৎ একাদশ-ত্রয়োদশ শতকের ভক্তিআন্দোলনের তাত্ত্বিক উৎস হিসেবে শঙ্করাচার্যের (খ্রীঃ ৭৮৮-৮২০ মতান্তরে খ্রীঃ ৫০৯-৫৪১) অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে রামানুজ (খ্রীঃ ১০১৭-১০৯৯) নিম্বার্ক (ত্রয়োদশ শতক) মাধ্ব (খ্রীঃ ১১৯৭-১২৭৬ মতান্তরে (খ্রীঃ ১১৯৮-১২৭৮) এবং বল্লভাচার্যের (খ্রীঃ ১৪৭৩-১৫৩১) যথাক্রমে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ ও শুদ্ধাদ্বৈতবাদ আশ্রিত ভক্তি সাধনাকে উল্লেখ করা যায়। এই ধরনের সিদ্ধান্তে ধরে নেওয়া হয় যে শঙ্করাচার্যের দর্শন অদ্বৈতবাদীদর্শন এবং শঙ্করাচার্য নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসক, সেহেতু শঙ্করদর্শনে ভক্তিসাধনা অনুপস্থিত। কিন্তু রামানুজ, নিম্বার্ক, মাধ্ব ও বল্লভাচার্য - প্রত্যেকেই দেবতার অস্তিত্বে এবং দেবতার সঙ্গে ব্যক্তির তথা ভক্তের সম্পর্কে বিশ্বাসী। তাছাড়া, ধরে নেওয়া হয়, জ্ঞানও ভক্তিপথ সম্পূর্ণভাবে পরস্পর বিরোধী পথ। শঙ্করাচার্য জ্ঞানের মাধ্যমে মায়ামুক্ত হয়ে আত্মমুক্তি চান, অপরদিকে রামানুজ, নিম্বার্ক, মাধ্ব ও বল্লভাচার্য জগতকে মায়া হিসেবে না দেখে ঈশ্বরেরই প্রকাশ হিসেবে দেখেন এবং ভক্তির মাধ্যমে ঈশ্বরের সান্নিধ্য পেতে চান।

কৃষ্ণা শর্মার মতে, শঙ্করাচার্যের সঙ্গে উপরোক্ত তাত্ত্বিকদের পরস্পর বিরোধী অবস্থানের ধারণা অত্যন্ত ভ্রান্ত এবং এই ভ্রান্তি আসলে গড়ে উঠেছে ভক্তি সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার উপর। শঙ্করাচার্যের ভূমিকা মূলত বহুধা বিভক্ত ও বৈচিত্র্যপূর্ণ হিন্দুদর্শন ও সম্প্রদায়গুলির মধ্যে এক সমন্বয় সাধনের এবং এই সমন্বয়সাধনের জন্য তিনি অদ্বৈতবেদান্ত দর্শনের আশ্রয় নিয়েছেন—যেখানে বহুদর্শন ও দেবতার অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিয়েও এই বহুমাত্রিকতাকে এক পরমসত্ত্বার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন এবং পরমসত্ত্বাকে প্রকৃত সত্ত্বা/সত্য হিসেবে মেনে নিয়ে বহুমাত্রিকতাকে ভ্রান্তিজনিত জ্ঞান বা মায়া হিসেবে দেখেছেন। রামানুজ প্রমুখ তাত্ত্বিকগণের মূল লক্ষ্য হল, বিষ্ণু উপাসনাকে সুদৃঢ় করা এবং বিষ্ণুকেই পরম ব্রহ্ম হিসেবে জ্ঞান করা। সুতরাং শঙ্করাচার্য যেখানে সমন্বয়কারীর ভূমিকা নিয়েছেন, রামানুজ প্রমুখ তাত্ত্বিকগণ এক বিশিষ্ট দেবতার (বিষ্ণুর) উপাসনার প্রসারে সচেষ্ট হয়েছেন। কিন্তু উভয়েই ঈশ্বরে বিশ্বাসী এবং সকলেই ভক্তির উপরে গুরুত্ব দিয়েছেন। তফাৎ শুধু এই যে শঙ্করাচার্য যেখানে নির্গুণ ভক্তিতে

বিশ্বাসী, রামানুজ সেখানে সগুণভক্তিতে বা বিষ্ণুভক্তিতে বিশ্বাসী। উভয় ক্ষেত্রেরই উৎস হল বেদান্তদর্শন— শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদ প্রসারের ফলে কোনও বিশেষ দেবতার পূজার গুরুত্ব হ্রাস পেতে থাকে। বৈষ্ণবগণ সচেষ্ট হন শঙ্করাচার্যের এই দর্শনের বিরুদ্ধে সগুণভক্তিকে সুরক্ষিত ও যুক্তগ্রাহ্য করে তুলতে। এমনকি এর জন্য শঙ্করাচার্যকে 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ' বলে অভিযুক্তও হতে হয়েছে।

বস্তুত, শঙ্করাচার্য সে সময়কার বৌদ্ধ ও জৈন প্রভৃতি নাস্তিক গোষ্ঠীগুলির বিরুদ্ধে আস্তিক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানে তৎপর হন। আস্তিকগোষ্ঠীগুলির মধ্যে ভিন্নতা থাকলেও সকলেই বেদ ও ঈশ্বরের চরম সত্তায় বিশ্বাসী। শঙ্করাচার্য তাই আস্তিক গোষ্ঠীগুলির ভিন্ন ভিন্ন দর্শন ও ভাবকে একই চরমসত্ত্বার ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। এই বক্তব্য উপস্থাপন করতে গিয়ে তিনি বেদান্তদর্শনের উপর নির্ভর করেন, যদিও বৌদ্ধদের মায়াবাদ, অ-পৌত্তলিকতা, সংঘের ধারণা দ্বারা তিনি বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। তাছাড়া, সেসময়কার আলবার ও নায়নার ভক্তি আন্দোলনের একেশ্বরবাদ ও শঙ্করাচার্যকে প্রভাবিত করে।

শঙ্করাচার্য উত্তর-মীমাংসার জ্ঞানকান্ডকেই বেদান্ত হিসেবে বা বেদের লক্ষ্য ও পরিণতি ব্যাখ্যা করেন এবং এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, ব্রহ্মকে একমাত্র বেদান্তদ্বারাই জানা যাবে। অথচ বিভিন্ন আস্তিকবাদী সম্প্রদায়গুলি এই ব্রহ্মকে ভিন্ন ভিন্নভাবে দেখে থাকেন। এর থেকে অনেকেই সিদ্ধান্ত করেন যে শঙ্করাচার্য জ্ঞানমার্গী। কারণ, জ্ঞানের মাধ্যমে তিনি ব্রহ্মকে জানতে চেয়েছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শঙ্করাচার্যের জ্ঞান ভক্তিবিরোধী নয়; আবার রামানুজ, মাধ্ব ও বল্লভাচার্য জ্ঞানকে উপেক্ষা করেননি। এখানে সকলেই জ্ঞান বলতে বুঝিয়েছেন আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রাপ্ত উপলব্ধি বা ধারণাকে। 'বিবেক চূড়ামণি' গ্রন্থে শঙ্করাচার্য ভক্তিকে কোনও ব্যক্তির স্ব স্বরূপের প্রতি অন্বেষণ বলে সংজ্ঞায়িত করেন। এই ধারণা ও শঙ্করাচার্য পেয়েছেন তাঁর আগের দার্শনিকদের কাছ থেকে। শঙ্করাচার্যের আগে আলবার ভক্তি আন্দোলনকারীগণও জ্ঞানের মাধমে ঈশ্বর অন্বেষণে বা স্বরূপ সন্ধানে এগিয়েছিলেন। শঙ্করাচার্যও মনে করেন, আত্মার এই অন্বেষণই আত্মজ্ঞানের বা মুক্তির/মোক্ষের কারণ। সাধনা হোল সেই বিশ্বাস যার মাধ্যমে অন্বেষণের সূচনা হয়। যোগ হ'ল কার্যকরী ইচ্ছা আর ভক্তি হল আত্মাকে অন্বেষণের আকুতি বা আবেগ। সুতরাং, আত্মার অন্বেষণে ভক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভক্তি যা প্রথমদিকে আত্ম অন্বেষণের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে সেই ভক্তিই আত্ম সম্পর্কে অভিজ্ঞতা বা জ্ঞানলাভের পরম লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। একারণে জ্ঞাননিষ্ঠাই ভক্তির চরম আকার। সুতরাং জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে কোন বিরোধ নেই। শঙ্করাচার্যের ভক্তি যেখানে নির্গুণ ব্রহ্মের প্রতি, রামানুজের ভক্তি সগুণ ব্রহ্মরূপী বিষ্ণুর প্রতি ভক্তি।

শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদে জ্ঞান ও ভক্তির পরস্পর নির্ভরশীলতার বিষয়টি আরো স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে যদি আমরা ভক্তি ও উপাসনা সম্পর্কে শঙ্করাচার্যের বক্তব্যকে ব্যাখ্যা করি। ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যে শঙ্করাচার্য ভক্তি বলতে নির্গুণ ব্রহ্ম এবং উপাসনা বলতে সগুণ ব্রহ্মের প্রতি আবেগ বা আকুতিকে বুঝিয়েছেন। উপাসনা হল সগুণভক্তি বা পূজার্চনা যা মানুষকে চরম সত্ত্বার কাছে (সমীপতা ও সালোকতা) নিয়ে যায়। ভক্তি সেখানে মানুষকে চরমসত্ত্বাকে উপলব্ধি করতে এবং সেই চরমসত্ত্বায় বিলীন হতে (সাযুযতা ও স্বরূপতা) সাহায্য করে এবং এই আত্মজ্ঞানই মুক্তি বা মোক্ষলাভে সহায়ক হয়। জ্ঞান শব্দটিকে শঙ্করাচার্য

দুটি অর্থে ব্যবহার করেন। (এক) জাগতিক বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান যার অধিকারীকে তিনি বিদ্বান বলেছেন। (দুই) ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মধ্যদিয়ে আত্ম বা ব্রহ্মজ্ঞান (ব্রহ্মানুভব) যার অধিকারীকে মহাত্মন বলেছেন। শঙ্করাচার্যের কাছে শেষোক্ত জ্ঞানই হ'ল প্রকৃত ও শ্রেষ্ঠজ্ঞান যা কোন মধ্যস্থতাকারী ব্যক্তি বা গ্রন্থের সাহায্যে লাভ করা যায় না। শাস্ত্রগ্রন্থ ধর্মের কার্যকরী দিক সম্পর্কে জ্ঞানলাভে সহায়তা করতে বা পথ দেখাতে পারে কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান একমাত্র লাভ করা যায় ব্যক্তিগতভাবে আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। এভাবে তিনি শ্রেষ্ঠজ্ঞানকে বলেছেন ব্রহ্মানুভব এবং এই জ্ঞাননিষ্ঠাকে বলেছেন শ্রেষ্ঠভক্তি।

রামানুজ (খ্রীঃ ১০১৭-১০৯৯) এর ভক্তিভাবনায় বেদান্ত এবং বৈষ্ণব ভাবধারা — উভয়েরই অবস্থান দেখা যায়। বেদান্তের দ্বারা প্রভাবিত রামানুজ জ্ঞান, ধ্যান ও যোগের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। অপরদিকে বৈষ্ণব ভাবধারা প্রভাবিত রামানুজ বৈষ্ণবদের পূজাপদ্ধতি ও পৌত্তলিকতাকে স্বীকার করেছেন। তাঁর দর্শনে একদিকে যেমন দেখা যায় ধ্যান ও যোগের মাধ্যমে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় আত্ম অনুসন্ধ্যান তথা জ্ঞানলাভ বা ব্রহ্মকে জানা; অপরদিকে দেবতা তথা বিষ্ণুর প্রতি পুরোপুরি আত্মসমর্পণের মাধ্যমে মুক্তিলাভ। কৃষ্ণা শর্মার মতে, রামানুজের বক্তব্যের এই পরস্পর বিরোধীতা থাকলেও সামগ্রিক বিচারে তিনি আত্মানুসন্ধান তথা জ্ঞানের উপর জোর দিয়েছেন বেশী এবং আত্মানুষ্ঠান প্রচেষ্ঠাকে তিনি ভক্তি বলে উল্লেখ করেছেন এবং দেবতার প্রতি আত্মসমর্পণকে শুধুমাত্র বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীলতা বলেছেন। অপরদিকে, চিন্ময়ী চ্যাটার্জীর বক্তব্য হ'ল, রামানুজ শঙ্করাচার্যের ব্রহ্মজ্ঞানের মাধ্যমে মুক্তির পরিবর্তে বিশ্বাস এবং ভক্তির উপরই বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। ভাস্কর এবং যমুনাচার্যের দ্বারা প্রভাবিত রামানুজ ভক্তিকেই সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন এবং মুক্তির একমাত্র পথ বলেছেন।

বস্তুত, রামানুজ দু'ধরণের সাধনার কথা বলেছেন ভক্তিসাধনা এবং প্রপত্তি বা সমর্পণ। ধ্যান, জ্ঞান এবং আধ্যাত্মিকতা ভক্তিসাধনার বৈশিষ্ট্য। অপরদিকে কোন দেবতার প্রতি সমর্পণ হ'ল প্রপত্তি। এই উভয়ধরনের সাধনার জন্য তিনি ব্যক্তি প্রকৃতির উপর নির্ভর করেছেন এবং যে সময়কার সমাজ যেহেতু জাতভিত্তিক সমাজ সেহেতু ভক্তিকে সমাজের উপরতলার তিন জাতের জন্য (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য) এবং প্রপত্তিকে নিচে অবস্থানকারী শূদ্রদের জন্য উপযুক্ত বলেছেন। এখানে তিনি জাতিভেদকেই সমর্থন করেছেন এবং বিভিন্ন জাতের মুক্তির জন্য ভিন্ন পথের নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু রামানুজের বক্তব্যে ভক্তিকে জ্ঞানের বিরোধী বলে উল্লেখ করা হয়নি; বরঞ্চ জ্ঞানকে ভক্তির জন্য অপরিহার্য বলেই বিবেচনা করা হয়েছে। তিনি শঙ্করাচার্যের অদ্বৈততত্ত্বে বিশ্বাসী। কিন্তু শঙ্করাচার্যের অদ্বৈত যেখানে নির্গুণ, রামানুজের অদ্বৈত সেখানে সগুণ—বিষ্ণু। একারণে রামানুজের কাছে এ জগত মায়া বা ভ্রান্তি নয় — সেই অদ্বৈতেরই অংশস্বরূপ।

শঙ্করাচার্য এমনকি রামানুজ এর বক্তব্যের ভিন্ন বক্তব্য লক্ষ করা যায়, মাধব (খ্রীঃ ১১৯৮-১২৭৮ মতান্তরে ১১৯৭ থেকে ১২৭৬) এর বক্তব্যে। দ্বৈতবাদী মাধব শঙ্করাচার্যের আত্মা (জীব) এবং ব্রহ্ম (পরমাত্মার) এর সমন্বয়ের পরিবর্তে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় এবং পৃথক অস্তিত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। রামানুজ ব্রহ্ম, আত্মা এবং বস্তু (অচিৎ) এর মধ্যে যে অচ্ছেদ্য বন্ধনের যথা বলেছেন মাধব তার ও বিরোধীতা করেন। মাধবের কাছে ব্রহ্ম বা চরমসত্তা এবং আত্মা — উভয়ই পৃথক এবং স্বগুণসম্পন্ন। এক কথায়, ব্রহ্ম এবং আত্মা শঙ্করাচার্যের কাছে একাত্ম, রামানুজের কাছে অবিচ্ছিন্ন কিন্তু মাধবের কাছে

পৃথক ও স্বগুণ সম্পন্ন। এমনকি, মাধ্বের জীব (আত্মা) ব্রহ্ম এর ন্যায় সৎ, চিৎ এবং আনন্দস্বরূপ। ভক্তির উদ্দেশ্যই হ'ল ব্রহ্মের সঙ্গে জীবের প্রকৃত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করা এবং এই সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হলেই ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের প্রসাদলাভ করা যায়। ভক্তির মাধ্যমে ঈশ্বর বা ব্রহ্মের প্রসাদলাভই মাধ্বের কাছে প্রধান বিষয় যদিও তিনি ব্রহ্মের স্বরূপ বা প্রকৃত জ্ঞানের প্রতি ব্যক্তি প্রচেষ্টাকে অস্বীকার করেন নি।

নিম্বার্ক (ত্রয়োদশ শতক) দৈত্বাদ্বৈত (দ্বৈত + অদ্বৈত) বাদী হিসেবে পরিচিত। তিনি একদিকে যেমন শঙ্করাচার্য ও রামানুজের মতো অদ্বৈততত্ত্বে বিশ্বাসী, অপরদিকে মাধ্বের মতো দ্বৈতসত্ত্বায়ও বিশ্বাসী। এককথায় বলা যায়, তিনি দ্বৈত একাত্মবাদী অর্থাৎ ব্রহ্ম এবং আত্মার (জীব) এর মধ্যে ঐক্য ও অনৈক্যে বিশ্বাসী। রামানুজ বা মাধ্বের মতো নিম্বার্ক ব্রহ্ম, আত্মা এবং বস্তুর উল্লেখ করেন এবং জীব ও বস্তুকে ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব হিসেবে না দেখে সবার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের স্বীকার করেন। কিন্তু একই সঙ্গে জীব বা বস্তুজগতকে ঈশ্বরের অংশ হিসেবে ব্যাখ্যা করে ঈশ্বরের অবিচ্ছন্ন সত্ত্বাকে তুলে ধরেন। ভক্তির চরম লক্ষ্য হোল সেই চরমসত্ত্বা বা ব্রহ্মকে জানা বা বলা যায় ব্রহ্মের সঙ্গে সাক্ষাৎকার। ব্রহ্মার সঙ্গে একাত্মহওয়াই জীবের চরম লক্ষ্য এবং এব্যাপরে প্রয়োজন হল চিন্তনও গভীর অনুরক্তি বা ঈশ্বর ভক্তি। এই ভক্তিই ঈশ্বরের অনুগ্রহ পেতে সাহায্য করে এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহ বা প্রসাদ পেলে মানুষ মুক্তি লাভ করে।

বল্লভাচার্য (খ্রীঃ ১৪৭৩-১৫৩১) এর বেদান্তদর্শন শুদ্ধাদ্বৈত (শুদ্ধ + অদ্বৈত) দর্শন নামে পরিচিত। শঙ্করাচার্য গোটা বিশ্বজগৎকে এক (অদ্বৈত) ব্রহ্ম হিসেবে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দৃশ্যত বা বাহ্য জগৎকে মায়া হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। শঙ্করাচার্যের মতো বল্লভাচার্যও অদ্বৈতভাবে বিশ্বজগৎকে ব্যাখ্যা করেছেন শঙ্করাচার্যের মায়া বাদকে প্রত্যাখ্যান করে। বল্লভাচার্যের মতে, সবকিছুই যদি ব্রহ্ম হয় তাহলে তারই অংশ প্রতিবিম্বকে মায়া বলার কোনও কারণ নেই। সুতরাং, এ জগৎ মায়া বা অলীক নয়; বরঞ্চ বলা চলে ব্রহ্মেরই স্বাভাবিক প্রবাহ বা সৃষ্টি। ঈশ্বর যদি সমগ্র হন তাহলে মানুষ হোল ঈশ্বরেই অংশ। ঈশ্বর হলেন অন্তর্যামী যিনি প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই অবস্থান করেন।

বল্লভাচার্যের মতে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই প্রকৃতি অনুযায়ী ঈশ্বরভাব ও দানবভাব কাজ করে। যার মধ্যে দানবভাব কাজ করে তার পক্ষে সাধনার পথে যাওয়া অসম্ভব; কিন্তু ঈশ্বরভাবাপন্ন মানুষ ভক্তি সাধনায় সক্ষম। এই ঈশ্বরভাবাপন্ন মানুষ ও দু'ধরনের। একদল আছেন যারা মর্যাদাভক্তির পথ অনুসরণ করেন এবং অপর দল পুষ্টিভক্তির পথ অনুসরণ করেন। মর্যাদাভক্তি ও পুষ্টিভক্তি হ'ল ভক্তিরই দুই ধরন। মর্যাদাভক্তি অক্ষর ব্রহ্ম তথা বা নির্গুণ ভক্তি এবং পুষ্টিভক্তি হল সগুণ বা পুরুষোত্তম এর প্রতি ভক্তি। বল্লভাচার্যের কাছে মর্যাদাভক্তি জ্ঞান বা আত্মঅন্বেষণ নির্ভর অপরদিকে পুষ্টিভক্তি সগুণ তথা বিষ্ণুর প্রতি প্রেম নির্ভর। যাঁরা মর্যাদাভক্তির পথ অনুসরণ করেণ তাঁরা জ্ঞান এবং কর্মের উপর নির্ভরশীল এবং ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় অর্থাৎ আত্ম অনুসন্ধানের মাধ্যমে মুক্তি লাভ করেন। যাঁরা পুষ্টিভক্তির পথ অনুসরণ করেন তাঁরা অবশ্যই ঈশ্বরের করুণা ভিক্ষা করবেন; কারণ ঈশ্বরের করুনালাভ হলেই মানুষের মুক্তি ঘটে। বলাবাহুল্য, এই দুই ভক্তির মধ্যে বল্লভাচার্য শেষোক্ত পুষ্টিভক্তিকেই সমর্থন করেছেন; কারণ তাঁর কাছে বিষ্ণুই হলেন সর্বোত্তম ঈশ্বর।

৩৬.৫ ভক্তিআন্দোলন — মহারাষ্ট্র

মধ্যযুগে দক্ষিণভারতের পরেই যেখানে ভক্তি আন্দোলনের প্রাবল্য দেখা যায় তা হ'ল মহারাষ্ট্র। বস্তুত, ভক্তি আন্দোলন বলতে যা বোঝায় তার বিকাশ মহারাষ্ট্রেই। দক্ষিণভারতে ভক্তি আন্দোলনে ব্রাহ্মণ্য প্রাধাণ্য, জাতব্যবস্থাকে মেনে নেওয়া এবং মন্দির কেন্দ্রিকতা ছিল প্রধান বৈশিষ্ট্য। অপরদিকে, মহারাষ্ট্রের ভক্তি আন্দোলনকারীদের অধিকাংশই ছিলেন নিম্নজাতভুক্ত এবং আন্দোলনে জাতভেদ এর বিরোধী বক্তব্যই প্রকাশিত হয়েছে। এই আন্দোলনের সূচনা ত্রয়োদশ শতকে এবং পথিকৃৎ হলেন ভক্তকবি জ্ঞানেশ্বর (খ্রীঃ ১২৭১-৯৬) যিনি জ্ঞানদেব নামেও পরিচিত। জ্ঞানদেব সংস্কৃতের পরিবর্তে আঞ্চলিক মারাঠী ভাষাকেই বক্তব্যপ্রকাশের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেন এবং লোকশ্রুতি অনুযায়ী, মাত্র ১৫ বছর বয়সেই 'ভাবার্থ দীপিকা' নামে ভগবতগীতার একটি টীকা রচনা করেন। গ্রন্থটি জ্ঞানেশ্বরী নামে ও পরিচিত। পারিবারিক সূত্রে জ্ঞানদেব নাথপন্থী এবং রামানন্দসম্প্রদায়ের দর্শন সম্পর্কে পরিচিত হন। তাঁর পিতামহ ছিলেন নাথপন্থী এবং পিতা ছিলেন রামানন্দের শিষ্য। জ্ঞানেশ্বরের রচনায় একারণে নাথপন্থী এবং রামানন্দের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। এছাড়া, তিনি সে সময়কার জনপ্রিয় 'ভারকরি' সম্প্রদায় দ্বারাও প্রভাবিত হন। নাথপন্থীদের একেশ্বরবাদের ধারণা অপরদিকে ভারকরি সম্প্রদায়ের দেবতা 'বিথোবা'র পূজাপদ্ধতি, রামানন্দের ভক্তিদর্শন জ্ঞানদেবকে গভীরভাবে স্পর্শ করে।

জ্ঞানদেব যদিও কৃষ্ণের উপাসক তথাপি তিনি শিব অথবা যে কোন সাকার অথবা নিরাকার উপাসনার কথাও বলেছেন। জ্ঞানেশ্বরের মতে, বিভিন্নমানুষ একই ঈশ্বরের পূজা করে বিভিন্ন দেবতার নামে। যে কোনও দেবতার পূজাই আসলে সেই চরম সত্ত্বাসম্পন্ন ঈশ্বরেরই পূজা তাই জ্ঞানেশ্বরের কাছে ভক্তের মন ও ভক্তি-অনুভূতিই প্রধান। প্রার্থনার মাধ্যমে ভক্ত সংসারজীবনের দুঃখ যন্ত্রণার লাঘব করে। ধনী-দরিদ্র, উঁচু-নিচু জাতের মধ্যে কোন পার্থক্য করে না। সকলের স্বর্গসুখের দ্বার উন্মুক্ত করে। এমনকি, একজন ভক্ত সূর্যের চেয়েও বড় কারণ সূর্য শুধুমাত্র দিনে আলো বিতরণ করে। কিন্তু একজন ভক্ত সব সময়কেই আলোকিত করে। একজন ভক্তের হৃদয় সিংহের মতো শক্ত আবার বিহঙ্গের মতো মুক্ত। নদী যেমন সমুদ্রের দিকে ছুটে যায় উচ্ছ্বলগতিতে এবং অবশেষে সমুদ্রতরঙ্গের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলে, ভক্তসেরকম ঈশ্বরের দিকে আনন্দে ধাবিত হয় এবং ঈশ্বরে বিলীন হয়। জ্ঞানদেব ভক্তের জীবনে গুরুর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথাও বলেন। তাঁর মতে,গুরুর দায়িত্ব ও ভক্তের কর্তব্য ঈশ্বর সাধনার অন্যতম অঙ্গ। আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার, বারবার ঈশ্বরের নামকীর্তন, গ্রামীন সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা থেকে উদাহরণ-উপমার সাহায্যে ধর্মকে ব্যাখ্যা করা সাধারণ মানুষকে সহজেই আকৃষ্ট করে।

জ্ঞানদেব এর সমসাময়িক আর এক ভক্তি সাধক হলেন নামদেব (খ্রীঃ ১২৭০-১৩৫০) যিনি জীবিকায় ছিলেন সাধারণ একজন দর্জ্জি। নামদেবকে ঘিরে অন্যান্য যেসব ভক্তিসাধকগণ সে সময় সমাজে বিশেষ প্রভাব ফেলেন তাঁরা সকলেই ছিলেন শূদ্রজাত ভুক্ত। যেমন গোরা ছিলেন কুমোর, সম্বতা ছিলেন মালী, চোখা জাতে অস্পৃশ্য, সেনা জাতে নাপিত। জ্ঞানেশ্বরের মতো নামদেব এর ও উপাস্যদেবতা হলেন

বিথোবা এবং তিনিও ছিলেন ভারকরি সম্প্রদায়ভুক্ত। অত্যন্ত সহজ সরল জীবনযাত্রা, সংসারের মধ্য থেকে ভক্তিভরে ঈশ্বরের তথা বিথোবার সাধনা, বছরে দুবার পন্ধরপুরে বিথোবার মন্দির দর্শন—এসবই ছিল নামদেব ও তাঁর সম্প্রদায়ের ভক্তিসাধনার অঙ্গ। জ্ঞানেশ্বরের মতো নামদেবও ছিলেন জাতব্যবস্থার বিরোধী এবং একারণে সাধারণ মানুষের, যাদের অধিকাংশই শূদ্রজাতভুক্ত, কাছে নামদেব ও ছিলেন খুব প্রিয়।

নামদেব এর মৃত্যুর পর প্রায় দুশো বছর ধরে মহারাষ্ট্রে কোন ভক্তসাধকের নাম সেরকম শোনা যায়নি। জর্ডেন্স (Jordens) এর মতে, ভারতে তুর্কী আক্রমন ও ইসলামের আগমনের ফলে এই ভক্তিআন্দোলন গুপ্তভাবে প্রবাহিত হতে থাকে। পন্ধরপুরের ধ্বংস হলেও মানুষের ভক্তি বিশ্বাসকে ধ্বংস করা যায়নি। প্রায় দুশো বছর পর সাধক একনাথ (খ্রীঃ ১৫৩৩-১৫৯৯) ভক্তি আন্দোলনের এই ঐতিহ্যকে পুনরায় স্থাপন করেণ। একনাথ এক ভক্ত ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান। তিনি জ্ঞানেশ্বরের 'ভাবার্থদীপিকা' গ্রন্থটির সংস্করন প্রকাশ করেন এবং রামায়নের উপর টীকা লেখেন। ভাগবত পুরানের উপর টীকা ও তাঁর বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে। কোন প্রতিষ্ঠান বা সংঘসংগঠনের মধ্যে না গিয়েও যে মানুষ ঈশ্বর ভজনার মাধ্যমে মুক্তিপেতে পারে সে কথাই একনাথ তুলে ধরেন এই সমস্ত রচনার মাধ্যমে। মহারাষ্ট্রে রাম ভাবনাকে জনপ্রিয় করে তোলেন একনাথ।

অবশ্য মহারাষ্ট্রে ভক্তি সাধকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয় হলেন সাধক তুকারাম (খ্রীঃ ১৫৯৮-১৬৫০)। তিনি ছিলেন গ্রামের এক সাধারণ কৃষি (মতান্তরে শস্য ব্যবসায়ী) পরিবারের সন্তান। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ছিল দুঃসহ। খুব একটা আর্থিক সচ্ছলতা ছিল না। তাছাড়া, দুর্ভিক্ষে তাঁর পুত্র এবং দুই স্ত্রীর মধ্যে এক স্ত্রী মারা যান। দ্বিতীয় স্ত্রীর সম্পর্কে তাঁর উচ্চ ধারনা ছিল না। ঈশ্বরের সাধনার মধ্যে দিয়েই তিনি আনন্দের পথ খুঁজতে প্রয়াসী হন। কারণ, তুকারামের মতে, ঈশ্বর ও তার মাঝে বিরোধের প্রাচীর তোলার কেউ নেই। জ্ঞানেশ্বর বা নামদেব এর মতো সাধক তুকারাম ও ভারকরি সম্প্রদায়ভুক্ত এবং দেবতা বিথোবার উপাসক। তাঁর ভক্তিগীতিগুলি এক চরম প্রেমময় সত্তার কাছে ভক্তের আকুতিই প্রকাশ। জনশ্রুতি অনুযায়ী, তুকারামের আর্থিক দুরবস্থার কথা ভেবে শিবাজী বেশ কিছু উপঢৌকন পাঠান। কিন্তু তুকারাম তা নিতে অস্বীকার করেন। কারণ, তাঁর কাছে সোনা এবং মাটি দুইই সমান; যেহেতু তাঁর মোহ এবং আকাঙ্খা দু র হয়েছে। একথা শুনে শিবাজী তুকারামকে আমন্ত্রণ জানান কিন্তু তুকারাম সেই আমন্ত্রণকে প্রত্যাখ্যান করেন এই বলে যে তুকারামের কাছে পিঁপড়ে এবং সম্রাট দুই সমান। এতে শিবাজী ক্ষুব্দ হবার পরিবর্তে নিজে তুকারামের বাড়িতেই মাঝে মাঝে এসে নাম কীর্তনে যোগ দিতেন।

তুকারামের এই ভক্তিসাধনা, বলা বাহুল্য, রক্ষণশীল হিন্দুদের অপমানের বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। রক্ষণশীলদের প্রতিনিধি রামেশ্বর ভট্ট তুকারামের গানগুলিকে ইন্দ্রয়নী নদীতে নিক্ষেপ করতে হুকুম দেন। লোকশ্রুতি অনুযায়ী, তুকারাম এগারদিন উপবাসে কাটান এবং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন (পরবর্তীকালে গান্ধীজীকেও অনুরূপ কাজ করতে দেখা যায়) গানগুলিকে রক্ষা করতে। ঈশ্বর অবশেষে এক যুবকের বেশে গানের পান্ডুলিপি তুখারামের হাতে অক্ষতঅবস্থায় দিয়ে যান। এই রামেশ্বর ভট্ট পরে তুকারামের ঘনিষ্ট শিষ্যে পরিণত হন। রামেশ্বর ভট্ট তুকারামের সম্পর্কে বলেন, যতো বড় জ্ঞানী, বেদজ্ঞ মানুষ হোক না

কেন সেই তুমি কোনভাবেই তুকারামের সমান নয়। তুকারাম ঈশ্বরকে এতই ভালবাসেন যে তার শব্দ থেকে শুধুই অমৃত ঝরে পড়ে। তুকারাম অহংকার, ঐশ্বর্য, ধর্মের প্রাতিষ্ঠানিকতা প্রভৃতি থেকে যথা সম্ভব দূরে থেকে ঈশ্বর ভজনাকেই মানুষের চরম লক্ষ বলে মনে করতেন।

সাধক রামদাস (খ্রীঃ ১৬০৮-১৬৮১) এর জীবন ছিল মহারাষ্ট্রের অন্যান্য ভক্ত সাধকদের জীবন থেকে ভিন্ন। অতি অল্প বয়সেই নারায়ণ (রামদাসের পূর্বাশ্রম নাম) গৃহত্যাগী হন এবং সহায়সম্বলহীন ভবঘুরে জীবনের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন সাধুসন্তদের সঙ্গে কাটিয়ে শেষে কৃষ্ণা নদী তীরে নিজের আশ্রম গড়ে তোলেন। রামদাসের উপাস্য দেবতা হলেন রামচন্দ্র। তিনি ভক্তি সাধনায় কয়েকটি স্তরের কথা বলেন। যেমন, ভক্তি সাধনার প্রথম স্তরটি হ'ল সাধন অর্থাৎ ভক্ত তার মনকে সংযত রাখবে ও শান্তভাবসম্পন্ন হবে। দ্বিতীয় স্তর হ'ল অনুতাপ ও উপরতি। ঈশ্বরকে ভুলে জাগতিক ব্যাপারে যুক্ত থাকার জন্য হৃদয়ে অনুতাপ এবং ক্রমশ জাগতিক ব্যাপার, আকাঙ্খা, লোভ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়া অর্থাৎ উপরতি ভক্তের অবশ্য কার্য। তৃতীয় স্তর হ'ল একান্ত বা নির্জনতা বা একাগ্রতা। চতুর্থ স্তর হ'ল বিমল জ্ঞান বা আত্মজ্ঞান। পঞ্চম স্তর হ'ল ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ। এই আত্মসমর্পণের মধ্যে সেই মানুষ জীবনের মুক্তি পেতে পারে। অবশ্য রামদাস ঈশ্বর লাভে ভক্তি, জ্ঞান ও কর্মের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। রামদাসের মতে, যে কোন উপায়েই ঈশ্বরের সান্নিধ্য পাওয়া যেতে পারে। একারণে তিনি অন্যতম শিষ্য শিবাজীর কর্মযোগের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন। তাঁর ভক্তিগীতিগুলির মধ্যে শুধুমাত্র ঈশ্বরের সান্নিধ্যের কথাই বলা হয়নি; সমাজসংস্কারের কথাও বলা হয়েছে। সাধক রামদাস একদিক থেকে অন্য ভক্তদের থেকে কছুটা ভিন্ন; কারণ, তাঁর ভক্তি বন্দনার একমাত্র বিষয় আত্মার মুক্তিই নয়, সমাজের ও সংস্কার। রামদাসের এই সমাজসংস্কার ভাবধারা তাঁর অন্যতম শিষ্য শিবাজীকে সমাজসংস্কারে উদ্বুদ্ধ করে। জর্ডেন্স (Jordens) এর মতে, মহারাষ্ট্রের এই ভক্তিসাধকগণ হিন্দুত্বকে পুর্ণজাগরিত করেছিলেন। মারাঠী ভাষা ও সংস্কৃতিকে স্বতন্ত্রে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং সামাজিক শক্তিগুলির একীকরণে জোর দিয়েছিলেন। মারাঠায় হিন্দু রাষ্ট্র গড়ে তোলায় এই বিষয়গুলি এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক উপাদান হিসাবে কাজ করেছে এবং পরের দিকে মহারাষ্ট্রীয় জাতীয়তাবাদী সংস্কার আন্দোলনের পথ প্রস্তুত করেছে।

৩৬.৬ ভক্তি আন্দোলন — উত্তর ভারত

দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে উত্তর ভারতের ভক্তি আন্দোলনের যোগসূত্র স্থাপন করেন রামানন্দ (খ্রীঃ ১২৯৯ মতান্তরে ১৩০০ - ১৪১১(?))। তিনি বারানসীতে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং পরে রামানুজের বৈষ্ণবধারায় দীক্ষিত হন। কিন্তু রামানন্দ দক্ষিণ ভারতের বৈষ্ণবসাধকদের থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র। তিনি ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের আনুষ্ঠানিকতা ও জাত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। এ ব্যাপারে তিনি হিন্দুশাস্ত্র গ্রন্থসমূহ বিশেষত বেদান্ত থেকে অথবা ইসলামের সেসময়কার সুফি সাধকদের কাছ থেকে প্রেরণা পেয়েছিলেন— সে সম্পর্কে তথ্য প্রমানের অভাবে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা মুস্কিল। তবে, সুরজিৎ দাশগুপ্তের মতে, ধর্মপিপাসু রামানন্দ যখন সত্যের সন্ধানে ভারতবর্ষ পরিক্রমণ করেন তখন মুসলিম সাধকদের উদার বক্তব্য ও ব্যাপক প্রভাবের পরিচয় তিনি নিঃসন্দেহে যথেষ্ট পরিমানেই পেয়েছিলেন। সে

সময়কার জাত বৈষম্যে জর্জরিত হিন্দু সমাজে রামানন্দের এই সমাজসমতার ধারণা নিঃসন্দেহে অভিনব ও বৈপ্লবিক। এর ফলে রামানন্দের শিষ্য বাছাইকরণের ক্ষেত্রে জাত বা ধর্মের বিষয়টি প্রধান হয়ে ওঠেনি। জাত, বৃত্তি, সংসার, নারী কোন কিছুকেই রামানন্দ সাধনার পথে অন্তরায় বলে মনে করেননি। একারণে তিনি সংসার ত্যাগের মাধ্যমে সাধনারও ছিলেন বিরোধী, তাঁর শিষ্যদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন নারী। অনেক মুসলমান ও রামানন্দের ভাবধারায় আকৃষ্ট হন। তিনি কোনরূপ প্রতিষ্ঠানিকতা বা সম্প্রদায় গঠনেরও ছিলেন বিরোধী। তাঁর ভজন গীতিগুলি একদিকে যেমন উত্তর ভারতে ভক্তিধারার প্লাবন এনেছিল, অপরদিকে সঙ্গীতও সাহিত্য ভাবনাকেও সমৃদ্ধ করেছিল।

রামানন্দের ভাবশিষ্যদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হলেন কবীর (খ্রীঃ ১৪২৪-১৫১৮)। কবীর হিন্দু না মুসলমান — এই প্রশ্ন তাঁর জন্ম কে ঘিরে যেমন রয়েছে, মৃত্যুর পর তাঁর দেহকে ঘিরেও একই প্রশ্ন। কিংবদন্তী অনুযায়ী তিনি এক ব্রাহ্মণ বিধবার সন্তান; কিন্তু পালিত হন নীরু নামে এক মুসলমান তাঁতির ঘরে। কবীর ও রামানন্দের মতো সংসার ত্যাগের মাধ্যমে নির্জন সাধনার বিরোধী। তিনি এই সংসার জীবনকে ঈশ্বরেরই লীলাস্বরূপ এবং একারণে সংসার থেকে পালিয়ে ঈশ্বর ভজনাকে ঈশ্বরের লীলা বিরোধী বলে মনে করতেন। তাছাড়া তিনি প্রতিটি মানুষের মধ্যেই ঈশ্বর এর বাস করেন বলে বিশ্বাস করতেন। আচার অনুষ্ঠান সম্পাদন বা শাস্ত্রমতে ঈশ্বর অন্বেষণের পরিবর্তে তিনি সহজ সাধনার মাধ্যমে নিজের মধ্যে যে দেবতার বাস তাকে বুঝে নিতে বলেন। যেহেতু ঈশ্বর প্রতিটি মানুষের হৃদয়েই বাস করেন সেহেতু প্রতিটি মানুষই সমান এবং একারণে তিনি জাত ব্যবস্থার ও বিরোধী। তাঁর চিন্তাভাবনার একদিকে যেমন রামানন্দ আশ্রিত ভক্তিসাধনা অপরদিকে সুফি সাধকদের মরমিয়া সাধনার এক অদ্ভুত যোগ লক্ষ করা যায়। তিনি ইসলামের গূঢ় জ্ঞান লাভ করার জন্য মক্কা, বাগদাদ, সমরখন্ড, বোখরা পর্যন্ত গিয়েছিলেন বলে শোনা যায়। সুরজিৎ দাশগুপ্তের মতে, কবীরই প্রথম খুব সচেতনভাবে হিন্দু ও মুসলিম সমন্বয়ের বিষয়ে চিন্তা করেছিলেন এবং আজীবন এই সমন্বয়ের জন্য সাধনা করেছিলেন। তিনি বলতেন।

হিন্দুকী হিন্দ্বাই দেখি তুর্কনকী তুর্কাঈ
আর ইন দুহূ রাহ না পাঈ।
দাস কবীর কাঢ়ী ভোলী দোউরাহ্ বিচ রাহ।।

(হিন্দুর হিন্দুয়ানী আর মুসলমানের মুসলমানী তো দেখেছি — এরা কেউ রাস্তার নিশানা পেল না; দাস কবীর এই দুই রাস্তাকে যুক্ত করে মধ্যের রাস্তা মুক্ত করতে চায়। সুরজিৎ দাশগুপ্ত (বঙ্গাব্দ ১৩৮৩, পৃঃ ৬৪)

কবীরের সুযোগ্য শিষ্য হলেন নানক (খ্রীঃ ১৪৬৯-১৫৩৮) যিনি কবীরের মতোই হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের ধর্মীয় আনুষ্ঠিকতার হিন্দুধর্মের আচার-সর্বস্বতা, মূর্তিপূজা ও জাতব্যবস্থার ছিলেন বিরোধী। তাঁর মতে, অন্তরকে শুদ্ধ রাখা ভগবানের প্রতি গভীর ভালবাসা ও সকল মানুষের প্রতি সমদৃষ্টিই

ধর্মপালনের তথা ঈশ্বর লাভের প্রকৃত উপায়। নানকও ইসলাম দ্বারা কতটা প্রভাবিত হয়েছিলেন যে সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে বলা মুশকিল। কিন্তু তিনি তার পূর্ববর্তী হিন্দু সাধুসন্তানদের দ্বারা যে বিশেষ প্রভাবিত হয়েছিলেন তা অত্যন্ত স্পষ্ট। তিনি সম্ভবত ইসলামের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন তার পূর্ববর্তী সাধুসন্তানদের মাধ্যমে। অপর মত অনুযায়ী, নানক ইসলামে সাধনা করেন সৈয়দ হুসেনের কাছে। তিনি গায়ক সঙ্গী মর্দানাকে নিয়ে দক্ষিণে সিংহল থেকে উত্তর পশ্চিমে মক্কা ও মদীনা এবং পূর্বে আসাম পর্যন্ত ভ্রমণ করেন। নানকের কাছে ঈশ্বর এক ও অভিন্ন; বস্তুজগৎ ঈশ্বরেরই লীলাস্বরূপ। ঈশ্বর আরাধনার জন্য নানক যে সমস্ত উপদেশ দিয়েছিলেন তা 'আদিগ্রন্থসাহেব' নামক গ্রন্থে গ্রহিত হয়েছে। তাঁর ধর্মদর্শনই পরবর্তীকালে শিখ ধর্মের জন্ম দিয়েছে।

সুরদাস (খ্রীঃ ১৪৮৩ মতান্তরে ১৪৭৩-১৫৬৩) হলেন উত্তর ভারতের আর এক জনপ্রিয় ভক্তি সাধক যিনি আগ্রা মথুরায় অন্ধচারণকবি নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন বল্লভাচার্যের প্রধান আটজন ভক্তের মধ্যে একজন। শোনা যায়, বল্লভাচার্য সুরদাসের গানশুনে এতই মুগ্ধ হয়ে যান যে তিনি সুরদাসকে শিষ্যত্বে বরণ করেন এবং ভক্তিগীতি রচনায় উৎসাহিত করেন। লোকশ্রুতি অনুযায়ী তিনি প্রায় ১ লক্ষ ১০ হাজার গান রচনা করেন এবং এর মধ্যে মাত্র ১০ হাজার গান নিয়ে প্রকাশিত হয় 'সুরসাগর' নামে এক সংকলন গ্রন্থ। সুরদাসের ভক্তিগীতিকে কৃষ্ণের শৈশব ও কৈশোরের দিকগুলিই মূলত প্রধান বিষয়। কবি হিসেবে তাঁর খ্যাতি তুলসীদাসের পরেই। শোনাযায়, আকবরের সভাগায়ক তানসেনও সুরদাসের গান গাইতেন এবং সুরদাসের গানে বিমুগ্ধ আকবর সুরদাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সুরদাসের জীবন ছিল খুব সহজ সরল। তাঁর মতে, জীবনে কোন ব্যাপারে অনুতাপের আগুনে মানুষ যখন দগ্ধ হতে থাকে তখনই তার মন ঈশ্বরমুখী হয়। যে মানুষ যৌবনের দিনগুলি বৃথা কাজে ব্যয় করে জীবনের শেষদিনগুলিতে ঈশ্বরের কথা ভাবে, সে মানুষ সারা বছর ফাঁকি দিয়ে পরীক্ষার আগে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত পড়ুয়ার মতোই মুর্খ, তাছাড়া মানুষের জীবনে কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি রিপুগুলি অত্যন্ত সক্রিয়। একমাত্র ঈশ্বরের চরণে ভক্তি নিবেদনের মাধ্যমেই মানুষ এই দুষ্ট প্রবনতা থেকে মুক্তি পেতে পারে। তিনি উপমা দিয়ে বলেন, গভীর সমুদ্রে ভাসমান জাহাজের মাস্তুলে বসা পাখি বার বার চেষ্টা করে তীরে আসতে; কিন্তু প্রতিবারেই ক্লান্ত হয়ে ফিরে যায় মাস্তুলে। সে রকম মানুষ ও এই জগৎ সমুদ্রে বস্তুগত চাহিদা পূরণের মাধ্যমে সুখ পেতে চায়। কিন্তু প্রকৃত সুখ তখনই পায় যখন মাস্তুলে আশ্রয় নেওয়া ক্লান্ত পাখির মতো ঈশ্বরের কাছে আশ্রয় নেয়।

উত্তর ভারতে রামানন্দের আর এক সুযোগ্য উত্তরাধিকারী হলেন তুলসীদাস (খ্রীঃ ১৫৩২-১৬২৩)। তাঁর রামচরিতমানস এতই জনপ্রিয় ছিল যে তাঁকে বাল্মীকির অবতার বলে মনে করা হ'ত। তুলসীদাসের জীবনী সম্পর্কে তথ্যের অভাব রয়েছে যথেষ্ট। জর্ডেন্স (Jordens) এর মতে, তুলসীদাস সম্ভবত সংস্কৃত নিয়ে পড়াশুনা করেন এবং পরে বারানসীতেই বসবাস করেন। তুলসীদাসের সঙ্গে অন্যান্য ভক্তি সাধকদের

পার্থক্য হ'ল রামানন্দ কবীর বা নানকের মতো তুলসীদাস শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধ ও জাতব্যবস্থার বিরোধী ছিলেন না। বরঞ্চ, তিনি হিন্দু শাস্ত্রীয় ঐতিহ্য ও জাতব্যবস্থার মধ্যে থেকেই সংস্কার করতে চেয়েছেন। যেকোনও জাতভুক্ত ব্যক্তিই ভক্তিসাধনার যোগ্য। অর্থাৎ প্রতিটি ব্যক্তিই তার নিজস্ব জাতগত অবস্থান থেকে ভক্তি সাধনা করতে পারে। এর জন্য জাতব্যবস্থাকে ভেঙ্গেফেলার বা এর বিরুদ্ধে যাবার কোন প্রয়োজন নেই। তুলসীদাসের ভক্তি সাধনার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হ'ল তুলসীদাস ঈশ্বরের সঙ্গে ভক্তের সম্পর্ককে প্রভুর সঙ্গে ভৃত্যের সম্পর্কের অনুরূপ বলে মনে করেন। অন্যান্য বৈষ্ণবীয় ভাবনায় সখা বা বন্ধুভাবে বা রাধাভাবে কৃষ্ণকে লাভ করার পরিবর্তে তুলসীদাস কৃষ্ণকে প্রভু হিসেবে দেখতে ইচ্ছুক। তাই তাঁর রামায়ণে সকলেই রামের প্রতি অনুরক্ত — রামের সেবক। এমনকি, কৈকেয়ী বা রাবণ ও রামের ভক্ত; কারণ, রামছাড়া মুক্তির কোন উপায় নেই। এই ভক্তি প্রত্যক্ষ সহজভক্তি যা সকলের জন্যই উন্মুক্ত। জর্ডেন্স (Jordens) উত্তরভারতে হিন্দুধর্মে তুলসীদাসের এই অপরিমিত প্রভাবের তিনটি ধরনের উল্লেখ করেন। প্রথমত, তুলসীদাস রামভজনাকে জনপ্রিয় করে তোলেন (প্রসঙ্গত, আততায়ীর গুলিতে বিদ্ধ গান্ধীজীও শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন 'হে রাম' উচ্চারণ করে)। দ্বিতীয়ত, তুলসীদাস ভক্তি সম্পর্কের ক্ষেত্রে নৈতিকতা, দয়া, প্রভৃতি মানবিক গুণগুলির উপর সবিশেষ গুরুত্ব দেন। তৃতীয়ত, যখন উত্তরভারতে ইসলাম ও হিন্দুধর্মের অন্তর্ভূক্ত বহু সম্প্রদায় হিন্দু সনাতন ধর্মকে আঘাত করতে উদ্যত, তখন তুলসীদাস সনাতন হিন্দুধর্মের কাঠামোকে শক্তিশালী করতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

উত্তর ভারতে ভক্তি আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যগুলিকে সংক্ষেপে উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমত, উত্তরভারতে ভক্তি সাধকদের মধ্যে নির্গুণ ও সগুণ উপাসনা — উভয়ই লক্ষ করা যায়। দ্বিতীয়ত, দক্ষিণভারত বা মহারাষ্ট্রের তুলনায় উত্তর ভারতে ভক্তিসাধনায় সুফিবাদের প্রভাব স্পষ্ট। তৃতীয়ত, অধিকাংশ ভক্তিসাধকই (তুলসীদাস বাদে) জাত ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার বিধি নিষেধকে মানেননি। শাস্ত্রীয় আচার অনুষ্ঠান, পৌত্তলিকতা প্রভৃতি বিষয়গুলি সম্পর্কে অধিকাংশ ভক্তিসাধকই ছিলেন প্রতিবাদী। শুধু তত্ত্বের আকারে নয়, ব্যক্তিগত জীবনেও সাধকগণ তা অনুসরণ করেছেন। চতুর্থত, সাধারণ মানুষের কাছে এই ভক্তিসাধকগণ ছিলেন অত্যন্ত জনপ্রিয়। পঞ্চমত, এই সমস্ত সাধকগণ যদিও ছিলেন প্রাতিষ্ঠানিকতার বিরোধী কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গুরু-শিষ্য পরম্পরায় সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে। ষষ্ঠত, হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সাধারণ মানুষ এই সমস্ত মরমীয় সাধকদের কাছে আশ্রয় নিয়েছেন। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয় সাধনে এই সাধকগণের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সপ্তমত, হিন্দু ও মুসলমান উভয়, সম্প্রদায়েরই শাস্ত্রীয় ব্যক্তিদের কাছে ভক্তি সাধকগণ ছিলেন ঈর্ষার ও ক্রোধের পাত্র। এই সমস্ত সাধকগণও ছিলেন জাত বিন্যাস্ত ব্রাহ্মন্যকেন্দ্রিক হিন্দু ধর্মের কাছে অপাঙক্তেয়। যার ফলে অধিকাংশ সম্প্রদায়ই পরবর্তীকালে জাত বিশ্যস্ত সমাজেরই অন্য এক জাতে পরিণত হয়েছেন। একমাত্র ব্যতিক্রম নানক যাঁর আদর্শ এক ভিন্ন ধর্মের তথা শিখ ধর্মের জন্ম দেয়। অষ্টমত, অধিকাংশ ভক্তি সাধকগণ ভক্তিগীতির মাধ্যমে তাঁদের দর্শনকে তুলে ধরেন এবং প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে সংস্কৃতের পরিবর্তে স্থানীয় ভাষাকে গ্রহণ করেন।

নানক তো সংস্কৃতকে বদ্ধ জল এর সঙ্গে তুলনা করেন। এই ভক্তি আন্দোলনের ফলে স্থানীয় ভাষাচর্চাও এক নতুন রূপ নেয়।

৩৬.৭ ভক্তিআন্দোলন — পূর্বভারত

পূর্বভারতে ভক্তি আন্দোলনের নায়ক হলেন শঙ্করদেব (আসাম) এবং শ্রীচৈতন্যদেব (বাংলা)। উত্তর ভারতের মতো আসামে ব্রাহ্মণ্য ভাবধারার প্রসার তেমন ঘটেনি। এখানে আর্যপূর্ব মঙ্গোল বা কিরাত জাতীয় মানুষই ছিল প্রধান। এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে পূজার্চনায় যাদুবিদ্যা, তন্ত্র সাধনা, ডাকিনীতন্ত্র বিভিন্ন ধরনের আদিম সংস্কার ইত্যাদিই ছিল প্রধান। এরকম এক সমাজব্যবস্থার বৌদ্ধিক ভাবনায় এক আমূল পরিবর্তন নিয়ে এলেন শঙ্করদেব (? — ১৫৭৯)। তিনি যাদুবিদ্যা, তন্ত্রসাধনা প্রভৃতির পরিবর্তে বিষ্ণু/কৃষ্ণ আরাধনা প্রবর্তন করেন। জীববলি বা বিভিন্ন ধরনের আধিভৌতিক ক্রিয়াকলাপের পরিবর্তে ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা বা প্রেমকেই তিনি প্রধান বলে গণ্য করেন। সুরজিৎ দাশগুপ্তের (বঙ্গাব্দ ১৩৮৩) ভাষায় শঙ্করদেবের বক্তব্য হোল, "প্রার্থনা, প্রশস্তি ও যৎসামান্ন পুষ্পার্ঘতেই ভগবান তুষ্ট হন—অবশ্য যদি তা প্রাণ থেকে স্বতোৎসারিত হয়"। শঙ্করদেবের এই বক্তব্য সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক প্রভাব ফেলে এবং অনেক গ্রামেই নামগান করার জন্য নামঘর ও তৈরী হয়। এই নামঘর প্রাঙ্গনে বিভিন্নজাতের মানুষ সমবেত হতেন এবং ধর্মালোচনা ও নামকীর্তন করতেন।

বাংলা দেশে ভক্তি আন্দোলনে যিনি মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন তিনি হলেন চৈতন্যদেব (খ্রীঃ ১৪৮৬-১৫৩৩, গৃহনাম-বিশ্বম্ভর, ডাকনাম নিমাই, আশ্রমনাম—শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেব)। ডঃ এম. এ. রহিম (১৯৯৬) সুরজিৎ দাশগুপ্ত প্রমুখ পন্ডিতগণ মনে করেন, চৈতন্যদেবের ভক্তি আন্দোলন ছিল প্রধানত একটি প্রতিরক্ষা মূলক আন্দোলন। মুসলমানদের ধর্ম ও জীবনের আদর্শে হিন্দুসমাজের সংস্কার করে হিন্দু সমাজে ইসলাম প্রসারের পথ বন্ধ করতে চৈতন্যদেব ভক্তি আন্দোলনের ডাক দেন। এই সমস্ত পন্ডিতগণের দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত হ'ল চৈতন্যদেবের ভক্তি আন্দোলনে সুফিবাদের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। চৈতন্যদেবের ধর্মসভায় নামসংকীর্তন করা, মোহাবিষ্ঠ অবস্থায় নৃত্য করা, সুফিদের যথাক্রমে জিকর, দশা, হাল প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলির দ্যোতক।

এর ঠিক বিপরীত বক্তব্য প্রকাশ করেন ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার রমাকান্ত চক্রবর্তী প্রমুখ পন্ডিতগণ। রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, চৈতন্যদেবের ভক্তি আন্দোলনের উৎস হিন্দু ঐতিহ্য থেকেই। বাইশ বছর বয়সে বিশ্বম্ভর যখন গয়ায় যান সেসময় ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে এবং ঈশ্বরপুরীর কাছে তিনি কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হ'ল। এই ঘটনাই তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। তিনি অবিরাম কৃষ্ণনাম জপ করেন, কখনও কাঁদেন, কখনও হাসেন। তাছাড়া, চৈতন্যদেবের জীবনে জয়দেব ও চন্ডীদাসের প্রভাবের কথাও রমেশচন্দ্র মজুমদার উল্লেখ করেন। রমাকান্ত চক্রবর্তীর মতে, শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁর সহচরগণ ভক্তির সঙ্গে ভাগবতপুরানে বর্ণিত কৃষ্ণ লীলা কাহিনীর মিশ্রণ ঘটান। তিনি অবশ্য একথাও স্বীকার করেন যে বিভিন্ন উপসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবধর্ম, বৌদ্ধ সহজ ভাবধারা হিন্দুতন্ত্র, এবং কখনও কখনও সুফিবাদ প্রভাবিত।

হিতেশরঞ্জন সান্যালের মতে, ভক্তি ধারণাটি উপনিষদের মধ্যে নিহিত থাকলেও ত্রয়োদশ থেকে ষোড়শ শতক পর্যন্ত সময়জুড়ে গোটা ভারতে মুক্তি ও সহকারিতার ধারণা নিয়ে ভক্তি আন্দোলন এক ব্যাপক আকার নেয়। বৈষ্ণবসম্পর্কিত ভক্তি ভাবনা পৌরানিক ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রে রক্ষণশীলতার এক সহনীয় বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে গড়ে ওঠে এবং ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার বাইরে যে এক গূঢ় রহস্যবাদী সাধনার ঐতিহ্য এতদিন ধরে বজায় ছিল তা এই ভক্তি আন্দোলন আত্মস্থ করে নেয়। ভারতের প্রায় সব জায়গাতেই ভক্তি আন্দোলন হিন্দু সমাজের শাস্ত্রীয় ধারার এক সমান্তরাল ধারা হিসেবে প্রচলিত হতে থাকে। এই ভক্তি আন্দোলনের এক সর্বভারতীয় সাধারণ বৈশিষ্ট্য থাকলেও ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে সংঘটিত ভক্তি আন্দোলনগুলিতে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যগুলিও ছিল প্রকট। বাংলায় এই আন্দোলন গড়ে ওঠে বাংলার স্বকীয় ঐতিহ্যকে কেন্দ্র করেই। হিতেশরঞ্জন সান্যালের মতে, বাংলায় একদিকে সর্বভারতীয় শাস্ত্রীয় ঐতিহ্য বজায় ছিল। অপরদিকে ত্রয়োদশ শতকের প্রথম থেকেই মুসলমানদের আগমনে পশ্চিম এশিয়ার সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলিও বাংলার সম্প্রসারিত হতে থাকে। কিন্তু এই সমস্ত প্রভাবসত্ত্বেও বাংলার নিজস্ব উপাদানগুলি বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয় এবং নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে বহিরাগত প্রভাবের পারস্পরিক ঘাতপ্রতিঘাতে বাংলার এই নিজস্ব উপাদানগুলিই নির্ধারকের ভূমিকা নেয়।

বাংলায় এই ক্রমবর্ধমান আঞ্চলিক স্বতন্ত্রের প্রেক্ষাপটে চৈতন্যের ভক্তি আন্দোলন ষোড়শ শতকের প্রথম দশকগুলিতে বাংলার সংস্কৃতির উপর এক গভীর ছাপ ফেলে। চৈতন্যদেব অত্যন্ত সহজ ও সরাসরিভাবে ভক্তি বিশ্বাসের কথা বলেন। কৃষ্ণের প্রতি গভীর আকুতিই কৃষ্ণের প্রতি এক প্রেমভক্তির জন্ম দেয়। ভক্ত হিসেবে তিনি রাধাভাবে কৃষ্ণকে পেতে ইচ্ছুক। জাত, বর্ণ, ধর্ম নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই কৃষ্ণের ভজনা করতে পারে। এর জন্য কোন আনুষ্ঠানিকতা বা শাস্ত্রীয় নির্দেশের প্রয়োজন নেই। সহজ, অপ্রাতিষ্ঠানিক ও অনুষ্ঠানবিহীন ভাবে শুধুমাত্র কৃষ্ণনামসংকীর্তনের মধ্যদিয়েই কৃষ্ণকে পাওয়া যায়। এই নামসংকীর্তনে অংশগ্রহণের ফলে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে এক ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে এবং যা পরবর্তীপর্যায়ে সম্প্রদায় সৃষ্টির সহায়ক হয়। এভাবে বাংলায় ভক্তি আন্দোলনে যে মুক্তি ও সহকারিতার ধারণা প্রকাশ পায় তা আসলে আঞ্চলিক সংস্কৃতি গড়ে ওঠার ফলে আত্মপ্রকাশের উন্মুখ সে সময়কার সাধারণ মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চাহিদাকেই প্রকাশ করে।

হিতেশরঞ্জন সান্যাল চৈতন্যদেবের অধ্যাত্ম জীবনকে দু'টি পর্যায়ে ভাগ করেন। প্রথমপর্যায়ে তিনি নবদ্বীপের এক গৃহী, সুপন্ডিত; একটি টোলও পরিচালনা করেন। একসময়ে নবদ্বীপের মানুষের কাছেও তিনি খুবই পরিচিত। কারণ, বৈষ্ণব ভাবধারাকে তিনি সকলের জন্যই প্রচার করেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণের পর তিনি পুরীতে বসবাস করেন। এই পর্বে তিনি রাধাভাবে শ্রীকৃষ্ণের মিলনাকাঙ্খী। তিনি প্রথমদিকে দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারত এবং পরে উত্তর ভারতে পরিভ্রমণ করেন। যদিও তিনি কোন সম্প্রদায় গড়ে তোলেননি তথাপি তিনি নিত্যানন্দের উপর ভার দেন বাংলায় ভক্তিপ্রচারে। রূপ ও সনাতনের উপর ভার দেন বৃন্দাবনে বসবাসের মাধ্যমে বৈষ্ণব ঐতিহ্যকে সংহতিকরণে। বৃন্দাবনের ছয় ভক্তের কণিষ্ঠতম শ্রীজীব গোস্বামী তিনজন বাঙালী ভক্তকে বাংলাদেশে পাঠান বৃন্দাবনের ভজনধারার (ব্রজ মন্ডল) এর সঙ্গে

বাংলার ভজনধারার (গৌর মন্ডল) সমন্বয় ঘটানোর জন্য। এই তিনজনের মধ্যে নরোত্তম দাস রাজশাহীজেলার খেজুরীতে আশ্রম গড়ে তোলেন।

বাংলার এই ভক্তি আন্দোলনে সমাজের নিচুতলার মানুষের মধ্যে যে ব্যাপক সাড়া জাগে তার কারণ হ'ল সামাজিক ও অর্থনৈতিক। সে সময়ে নবদ্বীপ শহরে কারিগর ও কারবারীদের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গে এই সমস্ত আত্মপ্রত্যয়ে বলিষ্ঠ শ্রেণীগুলির সঙ্গে যোগাযোগ ছিল এবং এদের বড অংশই পরবর্তিকালে শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তি আন্দোলনে যোগ দেন। তাছাড়া, শ্রীচৈতন্যদেব যে সময়ে ভক্তি আন্দোলন গড়ে তোলেন সে সময়েবাংলার বিভিন্ন ধরনের গূঢ় ও রহস্যবাদী সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল। তন্ত্রসাধক, বৌদ্ধ, শক্তিসাধক, কাপালিক, অবধূত, নাথযোগী তন্ত্রভাবনায় প্রভাবিত বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব সম্প্রদায় যা সহজিয়া সম্প্রদায় নামে পরিচিত — প্রভৃতি সম্প্রদায় ভুক্ত লোকের সংখ্যা ছিল প্রচুর। এই সব সম্প্রদায়ের উপাসনার পদ্ধতির মধ্যে যথেষ্ট ভিন্নতা থাকলেও উপাসনার মধ্যে দেহজ ব্যাপার গুরুত্ব পেত অনেক বেশী। এমনকি পুরুষ ও নারীর মিলনের মধ্যে দিয়ে চরমসত্বাকে উপলব্ধি করার ধারণাও ছিল প্রবল। এই সমস্ত সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ ব্রাহ্মণ্য কেন্দ্রিক শাস্ত্রীয় রীতিনীতির অনুষ্ঠান প্রভৃতি থেকে যথাসম্ভব দূরে থাকতেন। বলা বাহুল্য, সমাজের উপর তলার তথা উচ্চবর্ণের মানুষ এই সমস্ত সম্প্রদায়ের কার্যকলাপ স্বাভাবিক ভাবে মেনে নেয়নি। ফলে সমাজে এই সমস্ত সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের স্থান ছিল নিচুস্তরে এবং এদের সাধনাও ছিল অনেকক্ষেত্রে গোপন। শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তিআন্দোলন এই সম্প্রদায়গুলির কাছে এক মুক্তির স্বাদ এনে দেয়। নারী-পুরুষ, জাত-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের প্রতি উদাত্ত সংকীর্তনের মধ্যে দিয়ে সামাজিক সমতা, ভ্রাতৃত্ব ও সহকারিতা, রাধাকৃষ্ণ প্রেমের ধারণায় রাধাভাবে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলন (যা উপরোক্ত সম্প্রায়গুলির কাছে নারী-পুরুষের মিলনের মধ্যে দিয়ে চরমসত্তার মিলন) প্রভৃতি বিষয়গুলি উপরোক্ত গূঢ় রহস্যবাদী সম্প্রদায়গুলির কাছে নিজেদের প্রকাশ্যে প্রতিষ্ঠিত হবার এক সুযোগ এনে দেয়। তারা দলে দলে শ্রীচৈতন্যের ভক্তি আন্দোলনে যোগ দিয়ে আন্দোলনের ধারাকে স্ফীত করে তোলে। ডোম, চন্ডাল, মুসলমান, নারী যারা এতদিন ছিল সমাজের প্রান্তিক মানুষ তারাও এই আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে এক আত্মপ্রত্যয়ের সুযোগ খুঁজে পায়। যদিও মুসলমান যবন হরিদাসের এক পংক্তিতে ভোজনের ব্যাপারে দ্বিধাকে তিনি মেনে নেন। শ্রীচৈতন্যর পার্ষদ নরহরি সরকার এবং বংশীবাদন পুরীর শ্রীচৈতন্য সঙ্গী স্বরূপদামোদর রায় রামানন্দ ছিলেন সহজিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত।

এভাবে বাংলার ভক্তি আন্দোলন এক উদারনৈতিক ভাবধারায় ব্যক্তির মুক্তি ও সহকারিতাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলিকে ক্রমশ আত্মস্থ করে নেয় এবং শাস্ত্রীয় ধর্মীয় জীবনের সমান্তরাল ভাবে এই ভক্তিআন্দোলনের ধারা প্রবাহিত হতে থাকে। বাংলায় শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তি আন্দোলন আঞ্চলিক বাংলার সংস্কৃতির বিকাশের আত্মপ্রত্যয়কে প্রকাশ করে। হিতেশরঞ্জন সান্যালের মতে, চৈতন্য হয়ে ওঠেন বাঙালীর আত্মপ্রত্যয়ের প্রতীক। অবশ্য কিছুদিনের মধ্যে চৈতন্য অনুগামীরা চৈতন্যদেবকেই কৃষ্ণ / বিষ্ণুর অংশ জ্ঞান করে চৈতন্যদেবকে দেবতার আসনে বসান। বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলির মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব তীব্র হয়ে ওঠে, এবং জাত ভিত্তিক ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের চাপের কাছে বৈষ্ণবগণ এক ভিন্ন জাতে পরিণত হন।

৩৬.৮ ভক্তিআন্দোলন ও নারী

ভক্তি আন্দোলন নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখেছি, মধ্যযুগে ভারতে প্রায় সর্বত্রই ভক্তি আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। জাত, ধর্ম, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই বিশেষ করে সমাজের প্রান্তিক মানুষেরা এই আন্দোলনের মাধ্যমে এক আত্মপ্রকাশের সুযোগ পায়। এক উদারনৈতিক আবহাওয়ায় মক্তি, সহকারিতা, সমতা প্রভৃতি বিষয়গুলি প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এই আন্দোলনে নারীমুক্তির বিষয়টি বা এই আন্দোলনে নারীর অংশ গ্রহণের বিষয়টি খুব একটা আলোচিত হয়নি। আমরা এই অংশে দেখব ভক্তি সাধকগণ নারীমুক্তির বিষয়টি কিভাবে দেখেছেন। পরে আলোচিত হবে ভক্তি আন্দোলনে নারীদের অংশ গ্রহণের বিষয়টি।

৩৬.৮.১ ভক্তিসাধকগণের দৃষ্টিতে নারী

ভক্তিসাধকগণের অধিকাংশই নারীকে দেখেছেন কামিনী হিসেবে-কাম চরিতার্থ করার এক সামগ্রী হিসেবে। এবং একারণে নারীদের কাছ থেকে (অনেক ক্ষেত্রে সংসার বর্জনের মধ্য দিয়ে) যথা সম্ভব দূরে থাকতে চেয়েছেন। ব্যতিক্রম যে ছিল না তা নয়। যেমন অস্পৃশ্য রূইদাস ছিলেন মীরাবাঈ এর গুরু। তুলসীদাসের সঙ্গে ও মীরাবাঈ এর ঘনিষ্ট যোগাযোগ ছিল। নিম্নজাতের তুকারাম ছিলেন সাধিকা বহিনবাঈ এর গুরু। আবার অনেক ভক্তি সাধকই সংসার জীবন যাপনের মধ্যদিয়েই ভক্তি সাধনা করেছেন। কিন্তু নারীদের সাধনার পথে অন্তরায় হিসেবেই দেখা হত। যেমন কবীর মনে করতেন কামিনী এবং কাঞ্চন উভয়েই মানুষকে সাধনার পথ থেকে ভ্রষ্ট করে।

এমনকি নারীকে কাল নাগিনীর সঙ্গেও তুলনা করা হয়েছে। ভক্ত সাধক দাদুও পরামর্শ দিয়েছেন কনক ও কামিনী থেকে দূরে থাকতে। কারণ আগুনে যেমন পোকামাকড় পুড়ে ছাই হয় নারীও সেরকম জগৎকে দগ্ধ করে। তামিল সংগীতেই কামিনী ও কাঞ্চনকে মানুষের পতনের কারণ বলা হয়েছে। সপ্তম শতকের শৈব সাধক সুন্দরী নারীর চোখকে মায়াবী হরিণের চোখের সঙ্গে তুলনা করেছেন। দশমশতকে সাধক মনিক্কবছকর নারীর সম্মোহনী শক্তির তথা কালো চোখ, লাল ঠোঁট এবং মুক্তো ঝড়ানো হাসিতে ভরা নারীর আকর্ষণ থেকে দূরে থাকতেই চেয়েছেন। শ্রীজীব গোস্বামীর সঙ্গে মীরাবাঈ যখন বৃন্দাবনে সাক্ষাৎ করতে আসেন তখন শ্রীজীব গোস্বামী সাক্ষাতে অসম্মত হ'ন; কারণ মীরাবাঈ সাধিকা হলেও নারী। শ্রী চৈতন্যদেব সাধনার জন্য সংসার ত্যাগ করেন। এক বৃদ্ধা বৈষ্ণবীর কাছ থেকে চাল সংগ্রহের জন্য নারী সংসর্গের অপরাধে শিষ্য ছোট হরিদাসকে তিনি তাড়িয়ে দেন।

অবশ্য কোনও কোনও ভক্তি সাধক নারীকে কামিনী হিসেবে না দেখে নারীর প্রশংসা করেছেন। কিন্তু এক্ষেত্রেও নারীর অন্যতম গুণ হিসেবে দৈহিক ও মানসিক বিশুদ্ধতার উপর জোর দিয়েছেন। যেমন দক্ষিণ ভারতের ভক্তিসাধক তিরুবল্লুভর বা উত্তরভারতের কবীর নারীর দৈহিক ও চারিত্রিক বিশুদ্ধতা বজায় রাখার উপর জোর দিয়েছেন। নানক নারীকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। কারণ, নারী মাতা হিসেবে সন্তানের জন্ম দেয়, স্ত্রী হিসেবে স্বামীকে সঙ্গ দেয় এবং এভাবে মানুষের অস্তিত্বকেই টিকিয়ে রাখে। অর্থাৎ সমাজে নারীর

মূল্য শুধুমাত্র মা, স্ত্রী, কন্যা হিসেবে ভূমিকাটুকু পালন করে যাওয়ার জন্য। কিন্তু কোনও নারী যদি সেই ভূমিকাটুকু পালনে অসমর্থ বা অনিচ্ছুক হয়, অর্থাৎ কুমারী জীবন কাটাতে চায় এককথায় বিবাহ বা মাতৃত্বের বন্ধন না নিয়ে যদি কোন নারী ব্যক্তিত্ববিকাশে/মুক্তিসাধনায় অগ্রসর হয় তাহলে সেই নারীর প্রতি সমাজের এমনকি ভক্তি আন্দোলনের অধিকাংশ পুরোধাদের দৃষ্টিভঙ্গি খুব একটা ইতিবাচক ছিল না।

৩৬.৮.২ নারীর গতানুগতিক ভূমিকা অনুযায়ী ভক্তি সাধিকা

বিজয়া রামস্বামী (১৯৯৭) মধ্যযুগের ভারতের ভক্তি সাধিকাদের কয়েকটি বর্গে ভাগ করেন। এক প্রান্তে রয়েছেন সেই সমস্ত ভক্তি সাধিকা যাঁরা নারীর গতানুগতিক ভূমিকাকে স্বীকার করে নিয়ে ভক্তি সাধনায় অংশ নিয়েছেন। অপরপ্রান্তে আর একদল সাধিকা ছিলেন যাঁরা নারীর গতানুগতিক ভূমিকার শৃঙ্খল ভেঙ্গে মুক্ত স্বাধীন জীবনচর্চার দিকে এগিয়ে যান। যে সমস্তসাধিকা নারীর গতানুগতিক ভূমিকাকে স্বীকার করে নিয়ে এবং যথাযথ ভাবে পালন করে ভক্তিসাধনার দিকে এগিয়ে যান তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন বাসুকি (সাধক তিরুবল্লুভর এর স্ত্রী) নিলম্ব (বীরশৈব ভক্ত বাসব এর স্ত্রী) বিষ্ণুপ্রিয়া (শ্রীচৈতন্যের স্ত্রী) সীতাদেবী (অদ্বৈত আচার্যের স্ত্রী) জাহ্নবীদেবী (নিত্যানন্দের দ্বিতীয় স্ত্রী) হেমলতা ঠাকুরাণী (শ্রী নিবাস আচার্যের কন্যা)। বাসুকি বা বিষ্ণুপ্রিয়া স্বামীর সমস্ত আদেশকেই দেবতার আদেশ বলে মেনে নিতেন এবং এটাকেই চরম ধর্মাচরণ বলে মনে করতেন্। স্বামীর নির্দেশ মানতে গিয়ে যদি নিজের পবিত্রতাকেও জলাঞ্জলি দিতে হয় তাহলেও স্বাধ্বী স্ত্রীর পক্ষে তা করা উচিত। যেমন করেছিলেন কবীরের স্ত্রী যখন কবীর তাঁকে এক বনিকের কাছে অর্পণ করেন (অন্যমতে কবীর বিয়েই করেন নি), বা নায়নার সাধক আয়ারপপ্পয়ার এর স্ত্রী, যিনি স্বামীর নির্দেশে এক অতিথির মনোরঞ্জন করেছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব যখন দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন তখন তাঁর গৃহীজীবনের সমাপ্তি ঘটেছে। দ্বিতীয় স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়ার কাছে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রত্যাশা ছিল যাতে তিনি শ্রীচৈতন্যের মাকে দেখাশুনা করেন, অর্থাৎ সাংসারিক দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়েই এই সমস্ত নারীগণ সাধনার পথে এগিয়ে যাবেন।

৩৬.৮.৩ নারীর গতানুগতিক ভূমিকা পালনের বিরোধী ভক্তি সাধিকা

বিপরীত দিকে লাল্লা, মীরাবাঈ, অক্কামহাদেবী ছিলেন বিদ্রোহী যাঁরা বিবাহিত জীবনের (অক্কামহাদেবী রাজা কৌশিক এর অন্তঃপুর বাসিনী ছিলেন কিন্তু উভয়ের মধ্যে বিয়ে হয়েছিল কিনা সে সম্পর্কে কোনও সুস্পষ্ট তথ্য নেই) অত্যাচার ও প্রবঞ্চনায় গতানুগতির নারী জীবনের বাঁধাধরা গন্ডি থেকে বেড়িয়ে এসেছিলেন। লাল্লার বিয়ে হয়েছিল বারো বছর বয়সে এবং মীরাবাঈ বিয়ের (মেবারের রানা ভোজরাজ এর সঙ্গে) কিছু দিন পরেই বিধবা হন। রূপা ভবাণীর বিয়ে হয় যখন তাঁর বয়স দশবছরও হয়নি এবং যাঁকে বিয়ের পর যৌতুক ও অন্যান্য কারণে প্রচুর নির্যাতন সহ্য করতে হয়। এই নির্যাতনের হাত থেকে অব্যাহতি পেতে তিনি গৃহত্যাগী হন এবং এক সুফি সাধক শাহি কালন্দর এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। মীরাবাঈ এর একটি ভজনে দেখা যায় —

পগ ঘুংঘরু মীরা নাচী রে। পগ ঘুংঘরু।।

লোগ কহে মীরা হোগয়ে বাওরী। সাস কহে কুল নাসী রে।।

জহর কা পেয়ালা রানাজী নে ভেজা। পীবত মীরা হাঁসী রে।।

(মীরা ঘুঁঘুর পড়ে নৃত্য করে, লোকে ভাবে মীরা পাগল হয়েছে। শাশুড়ী বলে পরিবারের নাম ডুবিয়েছে। রাণাজী বিষপাত্র পাঠায়-মীরা হাসিমুখে তা পান করে)।

শুধুমাত্র মীরাবাঈই নয়, লাল্লা বা অক্কা মহাদেবীকেও সবাই উন্মাদ হিসেবেই গণ্য করতেন। চক্কুবাঈকে তো উন্মাদ ভেবে বাড়িতে বন্দী করে রাখা হত যাতে করে চক্কুবাঈ সাধক কবীর বা নামদেব এর সঙ্গে যুক্ত হতে না পারেন'

অনেক সময় ভক্তিসাধনা নারীর সাংসারিক জীবনে বিড়ম্বনাও সৃষ্টি করত। সাধিকা পুনিতবতীর আধ্যাত্মিক ক্ষমতায় ভীত স্বামী শেষ পর্যন্ত স্ত্রীকে ত্যাগ করেন এবং দ্বিতীয়বার বিয়ে করে প্রথমাস্ত্রীকে ঐশী ক্ষমতার অধিকারিণী বলে প্রণাম করে আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন; অথচ হিন্দু পারিবারিক জীবনে বিপরীত আচরণই লক্ষ করা যায়।

লাল্লা, মীরাবাঈ, অক্কা মহাদেবী প্রমুখ ভক্তি সাধিকাগণ সংসার জীবন থেকে বেড়িয়ে এসে নারীর গতানুগতিক ভূমিকা পালন থেকেই শুধুমাত্র সরে আসেননি; এই সমস্ত সাধিকাগন সামাজিক বিধিনিষেধগুলিকেও নিরর্থক বলে মনে করতেন। অক্কা মহাদেবী যেদিন রাজা কৌশিকের প্রাসাদ থেকে বেড়িয়ে এলেন সেদিন তাঁর আজানুলম্বিত চুলই ছিল একমাত্র আচ্ছাদন। ভক্তিসাধিকা লাল্লাও অঙ্গ আবরণের কোন প্রয়োজন বোধ করেন নি। এই সমস্ত সাধিকাগণের অনেকেই জাতভেদ, পৌত্তলিকতা প্রভৃতির ও ছিলেন বিরোধী। কবীরের মত লাল্লাও ছিলেন হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কাছেই প্রিয়। অক্কাদেবী তো প্রতিমাকে পাথর বলে মনে করতেন। মীরাবাঈ, বহিলবাঈ শূদ্র-অশূদ্রের মধ্যে কোন পার্থক্য করতেন না।

তাছাড়া, উপরোক্ত সাধিকাগণের অধিকাংশই উপাস্য দেবতাকে স্বামী বা একমাত্র পুরুষ বলে মনে করতেন। সাধিকা মুক্তবাঈ, মীরাবাঈ, অক্কামহাদেবী যথাক্রমে বিষ্ণু, কৃষ্ণ ও মল্লিকার্জনকে স্বামী হিসেবে বরণ করেন। মীরাবাঈতো কৃষ্ণছাড়া সবাইকেই নারী হিসেবে ভাবতেন। এভাবে ঈশ্বর ও ভক্তের সম্পর্ককে স্বামী এবং স্ত্রী হিসেবে গণ্য করা শুধুমাত্র সাধিকাদের ক্ষেত্রেই নয়, মধ্যযুগের অনেক ভক্ত সাধকও নিজেদের নারী ভেবে ঈশ্বরের সাধনা করতেন। কবীর ও শ্রীচৈতন্য নিজেদের নারী/রাধা ভেবে কৃষ্ণ উপাসনা করেন।

বিজয়া রামস্বামীর (যার বিশ্লেষণ এই অংশটির আলোচনার মূল উৎস) মতে, মধ্যযুগের ভক্তি সাধিকাগণ বিশেষত নারীর গতানুগতিক ভূমিকা পালনে অনিচ্ছুক সাধিকাগণ শুধু মাত্র বিষয়গত দ্রব্য থেকেই মুক্ত ছিলেন না, সমাজ জীবন থেকেও ছিলেন বিচ্ছিন্ন। এভাবে সাধিকাগণ দ্বৈত বিচ্ছিন্নতার শিকার হন। একদিকে তাঁরা জগৎ ও জীবনের বস্তুগত চাহিদা থেকে যথাসম্ভব বিচ্ছিন্ন ছিলেন। অপরদিকে নারীর গতানুগতিক

জীবনযাত্রা থেকে দূরে থাকায় সমাজজীবন থেকেও বিচ্ছিন্ন ছিলেন। এই দ্বৈত একাকীত্ব সাধিকাদের ভক্তিগীতির মধ্যে অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই উচ্চারিত হয়েছে।

৩৬.৯ ভক্তি আন্দোলনের ফলাফল

মধ্যযুগে ভারতে বিভিন্নপ্রান্তে যে ভক্তি আন্দোলন প্রবলভাবে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে তার ফলে সমাজে শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ, সংস্কারাদি ধারার এক বিকল্প ধারার সৃষ্টি করে। শাস্ত্রীয় নিয়মকানুন, বিধিনিষেধ এর পরিবর্তে প্রেম, ভালবাসা প্রভৃতি সহজাত প্রবণতার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন, ঈশ্বরের মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়ার ধারণা সাময়িকভাবে হলেও ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক ধারাটিকে দুর্বল করে তোলে। দক্ষিণভারতের ভক্তি আন্দোলন অবশ্য জৈন, বৌদ্ধ ও স্মার্ত ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের বিরুদ্ধে যাজক ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করে। দ্বিতীয়ত, এই আন্দোলনের চরিত্র ছিল উদার এবং পরমতসহিষ্ণুতা ছিল প্রধান বৈশিষ্ট্য। জাত, ধর্ম ভাষা নারী পুরুষ নির্বিশেষে মানুষ এই আন্দোলনে সামিল হন। স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে এমনকি বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যেও এক সমন্বয়বাদী ভাবধারা গড়ে ওঠে। বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলির মধ্যে পারস্পরিক সংঘাত বা প্রাধান্য স্থাপনের পরিবর্তে সহাবস্থান, সহকারিতা, ভ্রাতৃত্ব বোধ প্রধান বলে বিবেচিত হয়। অবশ্য, দক্ষিণ ভারতের ভক্তি আন্দোলন পুরোপুরি জাতভেদ মুক্ত ছিল বলে দাবী করা যায় না। বাংলার ভক্তি আন্দোলন ও চৈতন্য পরবর্তী পর্যায়ে জাত ভেদকে গুরুত্ব দিতে থাকে।

তৃতীয়ত, সমাজের নিচু তলার মানুষ বৌদ্ধ, তান্ত্রিক, অবধূত, নাথ যোগী, সহজিয়া সম্প্রদায়, নারী যারা এতদিন শাস্ত্রীয় ধর্মীয় ব্যবস্থায় প্রান্তিক বলে বিবেচিত ছিল তারা এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এক মুক্তির স্বাদ পায়। আত্মপ্রত্যয়ের এক বলিষ্ঠ চেতনা লক্ষ করা যায়।

চতুর্থত, সাধারণ মানুষের কাছে বক্তব্য পৌঁছে দেবার তাগিদে ভক্তি সাধকগণ সংস্কৃতের পরিবর্তে আঞ্চলিক ভাষার উপর গুরুত্ব দেয়। এর ফলে ভাবের বাহন হিসেবে আঞ্চলিক ভাষাগুলি বিকশিত হবার সুযোগ পায়। কবীরের দোহাবলী হিন্দিভাষাকে, নামদেব মারাঠী ভাষাকে, নানক গুরুমুখী লিপি ও পাঞ্জাবী ভাষাকে এবং চৈতন্যদেব বাংলাভাষাকে সমৃদ্ধ করে তোলেন।

পঞ্চমত, বিভিন্ন সম্প্রদায় ও ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলির মধ্যে পারস্পরিক লেনদেন এর মাধ্যমে শিল্প, স্থাপত্য, চিত্রাঙ্কন এক সমৃদ্ধ রূপ লাভ করে।

ষষ্ঠত, ভক্তি আন্দোলনের আর একটি অবদান হল সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ। দক্ষিণভারতে আন্দন, উত্তরভারতে মীরাবাঈ, বাংলায় শ্রী চৈতন্যের দ্বিতীয়া পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী, অদ্বৈত আচার্যের পত্নী মীরাদেবী, নিত্যানন্দের দ্বিতীয়া স্ত্রী জাহ্নবী দেবী, শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা হেমলতা ঠাকুরাণী প্রমুখ মহিলাগণ ভক্তি আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন এবং অনেককেই ভক্তি ভজনায় দীক্ষিত করেন।

ষষ্ঠত, শাস্ত্রীয় ব্রাহ্মণ্যধারাটি ছিল শাসকগোষ্ঠীর সহায়ক ধারা। ভক্তসাধক কবীর, চৈতন্যের বিরুদ্ধে হিন্দু, মুসলমান উভয় ধর্মের শাস্ত্রীয় রক্ষণশীলগোষ্ঠী ছিলেন প্রতিবাদে সরব। সুফি সাধকগণের মধ্যে অনেকেই

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্ক বজায় রাখতেন। তাঁদের প্রতিবাদ ছিল ইসলামের বিরুদ্ধে নয়—ইসলামের প্রাতিষ্ঠানিকতা ও খলিফাদের ব্যভিচারের বিরুদ্ধে। ইসলামের সমভ্রাতৃত্ববোধ সামাজিক সাম্য প্রভৃতি ধারণাগুলি সুফি সাধকদের ইসলাম বিরোধী করে তোলেনি; বরঞ্চ ইসলামের মধ্যেই থেকেছেন এবং ইসলামের সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণে রাষ্ট্রীয় শক্তির সুদৃঢ়করণের সম্ভাবনাকে স্বাগত জানিয়েছেন। রাষ্ট্র শক্তিও উভয় ধর্মেরই শাস্ত্রীয় ধারাটির সঙ্গে বোঝাপড়া করেছেন, ক্ষমতার সহায়ক শ্রেণী হিসেবে শাস্ত্রীয় গোষ্ঠীকে বেছে নিয়েছেন। বিনিময়ে উভয় ধর্মেরই শাস্ত্রীয় ধারার পোষকগণ রাষ্ট্রশক্তির কাছ থেকে পুরষ্কার পেয়েছেন, রাজ দরবারে স্থান পেয়েছেন, ভূমিদান বা গ্রামদানে তুষ্ট হয়েছেন। সুফি সাধক গণও এই অনুদান থেকে বঞ্চিত হননি। কিন্তু ভক্তি সাধকগণ হিন্দু ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের আনুষ্ঠানিকতার বিরোধিতা যখন করেছেন, এই ব্যবস্থার আধার হিসেবে জাত ব্যবস্থাকে ও আক্রমণ করেছেন। এর ফলে ভক্তি সাধকগণ জাতভিত্তিক ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক হিন্দুধর্মের মধ্যে আশ্রয় নেবার পরিবর্তে তার বিকল্প পথ খুঁজেছেন। রামানন্দ মীরাবাঈ, কবীর, নানক, শ্রীচৈতন্য প্রমুখ ভক্তি সাধকদের সঙ্গে রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে মিত্রতার সম্পর্কের কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই। মীরাবাঈ রাজপরিবারের সদস্য হয়েও পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছেন তাঁর কৃষ্ণভক্তির জন্য। চৈতন্যদেবের নাম সংকীর্তন যজ্ঞের ব্যয় মেটানোর জন্য স্থানীয় বিত্তবান জমিদারদের অংশগ্রহণের দু'একটি নজীর যে নেই তা নয়; কিন্তু তা শাসকগোষ্ঠীর সহায়ক শ্রেণী হিসেবে প্রতিষ্ঠিতকরণের পক্ষে যথেষ্ট নয়। বরঞ্চ চৈতন্যদেবের নামসংকীর্তনে রাষ্ট্রশক্তির বিরোধীতার চিত্রই ধরা পরে।

অবশ্য চৈতন্যদেবের সময়ে এবং বিশেষ করে চৈতন্যদেবের পরবর্তী পর্যায়ে বেশ কিছু জমিদারও স্থানীয় রাজা বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হন। বৈষ্ণব ধর্মও ইতি মধ্যে ব্রাহ্মণ্য ধর্মীয় ঐতিহ্যের অঙ্গ হয়ে পড়ে। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রও আভিজাত্যের প্রতি দুর্বার আকর্ষণের ফলে বৈষ্ণব প্রধানগণ বৃহত্তর জনজীবন থেকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হতে থাকেন এবং এর ফলে বৈষ্ণবদের মধ্যেও স্তর বিন্যাস দেখা যায়। দক্ষিণভারতে ভক্তি সাধকগণ ও রাজশক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন। সাধক রামদাসের সঙ্গে শিবাজীর সম্পর্কও ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ট। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই সাধকগণ ছিলেন এক বৃহত্তর রাজশক্তির বিরুদ্ধ শক্তি।

অবশ্য বেশ কিছু তাত্ত্বিক রয়েছেন যাঁরা মনে করেন, ভক্তিসাধনা পরোক্ষভাবে রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করেছে। কারণ, রাষ্ট্রীয় শক্তির বিরোধীতার পরিবর্তে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক নির্যাতনের প্রকৃত প্রতিবাদের পরিবর্তে বিদ্যমান সমাজকে সহনীয় করে তুলতে সাহায্য করেছে। সাধক/ সাধিকাগণ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক বঞ্চনা থেকে মুক্তির পরিবর্তে আত্মিকমুক্তির মধ্যেই ব্যক্তি প্রচেষ্টাকে আবদ্ধ রেখেছেন। এতে শাসকগোষ্ঠীরই সুবিধা হয়েছে বেশী। যদুনাথ সরকার ও রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় বাঙালী ও উড়িষ্যাবাসীদের দুর্বলতার কারণ হিসেবে এই ভক্তি সাধনাকেই দায়ী করেন। অবশ্য এ ধরনের সিদ্ধান্তের সমর্থনে কোন গ্রহণযোগ্য ও সুনির্দিষ্ট প্রমান তাঁরা হাজির করেননি।

বিজ্ঞানের সঙ্গে সামাজিক আন্দোলনের সম্পর্ক দেখাতে গিয়ে এ রহমান মন্তব্য করেন, ভক্তির প্রাধান্যের কথা বলা হলেও এবং ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ভক্তি সাধকদের উপস্থিতি থাকলেও সামগ্রিক বিচারে ভক্তি একটি আন্দোলন হিসেবে গড়ে উঠতে পারেনি। পরিবর্তে, বিভিন্ন ভক্তিসাধককে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সম্প্রদায়

গড়ে ওঠে এবং সম্প্রদায়গুলি নিজ নিজ গুরুর আদর্শ প্রচার করতে থাকে। একমাত্র গুরু নানকই এক বৃহত্তর আন্দোলনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং যা অচিরেই সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনে পরিনত হয় এবং পরিশেষে এক ভিন্ন ধর্ম, শিখ ধর্মের জন্ম দেয়।

৩৬.১০ সারাংশ

এই এককটিতে আলোচিত হল সুফিবাদ ও ভক্তি আন্দোলন। সুফিবাদের উদ্ভব, প্রসার ও বৈশিষ্ট্য, সুফিবাদ ও ভক্তি আন্দোলনের সম্পর্ক, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ভক্তি আন্দোলনের বিস্তার, ভক্তি আন্দোলনে নারীদের ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়গুলি এখানে প্রাধান্য পেয়েছে। সর্বোপরি, বর্তমান কালে বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় রাখার প্রশ্নে ভক্তি আন্দোলনের ফলাফল ও প্রাসঙ্গিকতার বিষয়টিও আলোচিত হয়েছে।

৩৬.১১ অনুশীলনী

১। সুফিবাদের বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী?

২। ভক্তি আন্দোলনের উদ্ভবের কারণগুলি উল্লেখ করুন।

৩। বাংলার ভক্তি আন্দোলনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করুন।

৪। ভক্তি আন্দোলনের ফলাফলগুলি আলোচনা করুন।

৫। ভারতে সুফিদরবেশদের অবদানগুলি কী কী?

সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন

১। সুফি শব্দটির অর্থ কী?

২। সুফি ও ভক্তি আন্দোলনে সমন্বয়বাদী ধারাটি উল্লেখ করুন।

৩। ভক্তি আন্দোলনের কারণ হিসেবে আপনি কোনটিকে বেশী গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করবেন?

৪। ভক্তি আন্দোলনে মীরাবাঈ-এর ভূমিকা কী?

৫। ভক্তি আন্দোলনের ইতিবাচক দিকগুলি কী কী?

৩৬.১২ গ্রন্থপঞ্জী

আমিনুল ইসলাম (১৯৮৫/১৯৯৫) — মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন, ঢাকা, বাংলা একাডেমী।

সুরজিৎ দাশগুপ্ত (বঙ্গাব্দ ১৩৮৩) — ভারতবর্ষ ও ইসলাম, কলিকাতা।

Ahmed Aziz (1964/1999) — Studied in Islamic Culture in the Indian Environment, New Delhi, oxford India.

A.L. Bashan (ed) (1975/1999) — A Cultural History of India, New Delhi,Oxford India.

Chinmoyee Chatterjee (Vol. I 1976/Vol.II 1981) — Evolution of Bhakti Cult. Vol. I & II, Calcutta J.U.

Krishna Sharma (1987) — Bhakti and the Bhakri movement. A new Perspective, Delhi, Munsiram Monoharlal.

D.N. Jha (ed) (1996) — Society and Ideology in India : Essays in honour of Professor R. S. Sharma, Delhi Munsiram Monohar Lal. এই গ্রন্থটি থেকে যে প্রবন্ধটি পড়া প্রয়োজন —Hitesh Ranjan Sanyal - Trends of change in Bhakti Movement in Bengal (Sixteenth & Seventeenth Centuries)

D. P. Chattapadhyay & Rabindra Kumar (997)– Science, Philosopy and culture Vol-II, Delhi, PHISP. এই গ্রন্থটি থেকে যে প্রবন্ধটি পড়া দরকার— Vijaya Ramaswami - Women Saints in Medieval Indian society এবং A. Rahman - Science and social movements.

R. C. Majumdar (ed) (1960)—The Delhi sultanate—Bharatiya Vidya Bhaban's History and Culture of Indian People, Vol. VI, Bombay.

Sarah F. D. Ansari (1992)—Sufi Saints and State Power : The Pirs of Sind 1843-1947, Cambridge, Cambridge University Press.

Satish Chandra (1996/1997)—Historiography Religin and State in Medieval India Delhi, Har Anand Pub.

Tara Chand (1976)—Influence of Islam on Indian Culture, Allahabad, The Indian Press.

একক ৩৭ □ রাজা রামমোহন রায়

গঠন

৩৭.০ উদ্দেশ্য
৩৭.১ প্রস্তাবনা
৩৭.২ আধুনিকতার পথিকৃৎ রামমোহন
৩৭.৩ রামমোহনের উদারপন্থী ভাবনা
৩৭.৩.১ স্বাধীনতা সম্পর্কিত ধারণা
৩৭.৩.২ মুদ্রণ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম
৩৭.৩.৩ ক্ষমতা স্বতন্ত্রী করণের সমর্থন
৩৭.৩.৪ আইনের অনুশাসন নীতির সমর্থন
৩৭.৪ বিচার ব্যবস্থার সংস্কার সাধনের প্রয়াস
৩৭.৫. রামমোহনের সমাজ চেতনা ও সংস্কার আন্দোলন
৩৭.৫.১ শিক্ষাগত দৃষ্টি ভঙ্গী
৩৭.৫.২ নারীর নিরাপত্তা বিধান
৩৭.৫.৩ ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী
৩৭.৫.৪ আর্থনীতিক ধ্যানধারণা
৩৭.৫.৫ আন্তর্জাতিক মনস্কতা
৩৭.৬ রামমোহনের চিন্তাধারার মূল্যায়ন
৩৭.৭ সারাংশ
৩৭.৮ অনুশীলণী
৩৭.৯ গ্রন্থপঞ্জী

৩৭.০ উদ্দেশ্য

আধুনিক ভারতের অন্যতম অগ্রদূত রামোহন রায়ের রাজনীতি ও সমাজচিত্তনের বিশিষ্ট দিকগুলি বিধৃত হয়েছে এই এককে। এটি অনুধাবন করলে আপনি জানতে পারবেন :

- এদেশে আধুনিক রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রথম সুসংবদ্ধ বিস্তার উদ্ভব হ'ল কিভাবে;
- আধুনিকতার কোন্ কোন্ উপাদান ঠাঁই পেল সেকালের প্রায়নিশ্চল, রক্ষণশীল ভারতীয় সমাজে;
- ঔপনিবেশিক শাসনের একেবারে প্রথম যুগেই স্বাধীন চেতনার উন্মেষ ঘটাতে রামোহনের ভূমিকা কী ছিল;
- গতিহীন, সংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের পরিবর্তন সাধনে রামমোহন কী কী উদ্যোগ নিয়েছিলেন; এবং
- সেকাল ও একালের প্রেক্ষিতে রামমোহনের প্রকৃত মূল্যায়ণ কী হওয়া উচিত।

৩৭.১ প্রস্তাবনা

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ভারতের রাজনীতিক ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। সেটি হল ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতিষ্ঠা। পাশ্চাত্যে তখন পশ্চিম ইউরোপের ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানী প্রভৃতি দেশগুলি এক ক্ষয়িষ্ণু সমাজ ব্যবস্থাকে পিছনে ফেলে এক নতুন যুগকে স্বাগত জানিয়েছে। মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার কুসংস্কার ও স্বৈরাচারের অচলায়তনকে ভেদ করে সভ্যতার এক নতুন অধ্যায় উন্মোচিত হতে চলেছে। শিল্পে-বাণিজ্যে-বিজ্ঞাপন সাধনায় যেমন, তেমনই আবার সমাজ-সংগঠন, রাষ্ট্রীয় বিধান এবং সমাজচর্চা সর্বক্ষেত্রেই পরিবর্তনের জোয়ার।

পৃথিবার এক মহাদেশ যখন এভাবে নবযুগ তথা আধুনিক সভ্যতাকে স্বাগত জানাচ্ছে, এশিয়া মহাদেশে ভারত তখন সামন্ততান্ত্রিক স্থবিরতার বেড়াজালে বন্দী। ভারতের সেই মধ্যযুগীয় জড়ত্বের মধ্যে আধুনিকতার ভগীরথ রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন রাজা রামমোহন রায়। সমাজের সমস্ত অন্ধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি আজীবন নির্ভীকভাবে সংগ্রাম করে গেছেন।

৩৭.২ আধুনিকতার পথিকৃৎ রামমোহন

রামমোহনের বলিষ্ঠ মানসিকতার মূলে ছিল তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসারতা এবং অনন্যসাধারণ জ্ঞানানুশীলন। একদিকে প্রাচ্যের বিভিন্ন শাস্ত্রে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য সমাজের অন্ধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রামের প্রধান অস্ত্র ছিল। অপরদিকে পাশ্চাত্যের নতুন যুগের যুক্তিবাদী, প্রগতিশীল, উদারপন্থী চিন্তাধারার উপলব্ধি ছিল তাঁর আধুনিক মননশীলতার উৎস। এই আধুনিকতার সম্পর্কে তিনি বাংলা তথা ভারতের বুকে আনতে চেয়েছিলেন নতুন প্রাণের স্পন্দন।

রাজা রামমোহন রায়ের সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তার অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর উদারপন্থী মনোভাব। এক সত্যানুসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তিনি উদারনীতিবাদের জন্মভূমি ইউরোপের ইতিহাসে অনুশীলন করেছিলেন এবং রেনেশাঁস থেকে ফরাসী বিপ্লব পর্যন্ত দীর্ঘ কালপর্বের ঐতিহাসিক গুরুত্বটিকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। ইউরোপীয় ইতিহাসের এই কালপর্বই ছিল বুর্জোয়া জাগরণের যুগ। এই বুর্জোয়া জাগরণের ফলেই মধ্যযুগীয় সংকীর্ণতার পরিবর্তে দেখা দিয়েছিল এক যুক্তিনির্ভর, মানবতাবাদী, মুক্ত চেতনার দৃষ্টিভঙ্গী রাজনীতিক চিন্তার ইতিহাসে সেটি উদারনীতিবাদ নামে পরিচিত। উদারনীতিবাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল স্বাধীনতা। ধর্মীয় কুসংস্কার ও সামন্ততান্ত্রিক কর্তৃত্ববাদের শৃংখল থেকে মানুষকে মুক্ত করে মানবসত্ত্বার স্বাধীন বিকাশই ছিল উদারনীতিক রাজনীতিক দর্শনের লক্ষ্য। ব্যক্তির বিশ্বাস, চিন্তা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং আর্থ-সামাজিক ও রাজনীতিক ক্ষেত্রে স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠাই ছিল উদারনীতিবাদের দাবী। এক কথায় উদারনীতিবাদ ছিল নতুন যুগের নতুন দর্শন।

ইউরোপের এই বিরাট ঐতিহাসিক পরিবর্তন নতুন যুগের নতুন দর্শনের মর্মবস্তুকে যথার্থভাবে

উপলব্ধি করেছিলেন রাজা রামমোহন রায়। ভারতের আর্থ-সামাজিক ও রাজনীতিক প্রগতিকে ত্বরান্বিত করার জন্য ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই এই নতুন যুগদর্শনকে ভারতের মাটিতে তিনি বপন করতে চেয়েছিলেন।

৩৭.৩ রামমোহনের উদারপন্থী ভাবনা

রাজা রামমোহন রায়ের উদারনীতিক চিন্তাধারার ব্যাপ্তি সমকালীন ভারতবর্ষের সমাজজীবনের বিভিন্ন দিককে স্পর্শ করেছিল, ধর্ম, শিল্প, সমাজজীবনে নারীর স্থান, মানুষের স্বাধীনতা ও অধিকার, জাতিভেদ প্রথা, ভারতের আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি প্রভৃতি আর্থ-সামাজিক ও রাজনীতিক সমস্যার বিভিন্ন দিকে রামমোহন রায়ের উদারনীতিক চিন্তাধারা প্রবাহিত হয়েছে।

৩৭.৩.১ স্বাধীনতা সম্পর্কিত ধারণা

রাজা রামমোহন রায়ের উদারনীতিক চিন্তাধারার বলিষ্ঠ প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর স্বাধীনতা সম্পর্কিত ধারণার মধ্যে। স্বাধীনতাকে তিনি ব্যক্তি মানুষের জীবনের অমূল্য সম্পদ বলে মনে করেছেন। মানুষের ব্যক্তিত্বের স্বাধীন বিকাশই ছিল তাঁর বিভিন্ন সমাজ সংস্কার মূলক কর্মসূচীর মূল লক্ষ্য, কেবল ব্যক্তির জীবনে নয়, জাতির জীবনেও স্বাধীন আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকারকে তিনি অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামকে তিনি আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি গ্রীক ও নিয়পলিটানদের মুক্তির সংগ্রামকে যেমন অভিনন্দন জানিয়েছেন, তেমনি সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানিয়েছেন ফরাসী বিপ্লবের স্বাধীনতার মহান আদর্শকে। স্পেনে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় তিনি এতই আনন্দিত হয়েছিলেন যে এই উপলক্ষ্যে তিনি কোলকাতায় একটি ভোজসভার আয়োজন করেছিলেন আবার বোঁর্বোরাজের বিরুদ্ধে নেপলস্ বাসীদের বিদ্রোহ যখন ব্যর্থ হয় তখন তিনি গভীরভাবে বেদনাহত হয়েছিলেন। স্বাধীনতার জয় এবং স্বৈরাচারের বিনাশই ছিল তাঁর কাম্য। ১৮২১ সালে বাকিংহামকে লেখা একটি চিঠিতে তাঁর এই চিন্তা স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এই চিঠিতে তিনি লেখেন যে স্বাধীনতার শত্রুরা এবং স্বৈরাচারের মিত্ররা শেষ পর্যন্ত কখনই সফল হতে পারে নি এবং কখনই তা পারবে না।

এহেন স্বাধীনতা-প্রেমী রামমোহন রায় ভারতের ক্ষেত্রে কিন্তু ব্রিটিশ শাসনকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। 'Political Thought in India পুস্তকে Thomas Pantham মন্তব্য করেন যে ব্রিটিশ শাসকের প্রতি রামমোহন রায়ের সমর্থনের অন্যতম কারণ ছিল এই যে এই শাসক ব্যবস্থায় জনসাধারণ পৌর স্বাধীণতা ভোগ করে। তিনি এই শাসনব্যবস্থার সুফলগুলিকে ভারতীয় জনজীবনে সম্প্রসারণে আগ্রহী ছিলেন। বিমানবিহারী মজুমদার বলেন যে রামমোহন ছিলেন প্রথম ভারতীয় যিনি ব্রিটিশ সাংবিধানিক ব্যবস্থার মর্মবস্তু উপলব্ধি করেন এবং পৌর স্বাধীনতার দাবী জানান। তাঁর সমকালীন যুগের ভারতবাসীদের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। দেশ তখন অজ্ঞতা ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল। জনচেতনা ও একাত্মবোধের বিশেস অভাব ছিল। সেই কারণে রামমোহন তৎকালীন ভারতবাসীদের স্বশাসনের পক্ষে অনুপযুক্ত বলে মনে করেন এবং তাদের জন্যে রাজনীতিক স্বাধীনতা দাবী করেন নি।

৩৭.৩.২ মুদ্রণ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম

রামমোহনের স্বাধীনতা চেতনার এক বলিষ্ঠ প্রকাশ ঘটেছে তাঁর সংবাদপত্র তথা মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে। জনমত গঠন ও প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে সংবাদ পত্রের জনকল্যাণমুখী ভূমিকা সম্পর্কে রামমোহন সম্পূর্ণভাবে সচেতন ছিলেন। তিনি নিজে বিভিন্ন পত্র পত্রিকার কেবল পাঠক মাত্র ছিলেন না। তিনি বিভিন্ন পত্র পত্রিকার প্রকাশকও ছিলেন। ১৮২১ সালে তাঁর প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য দুটি পত্রিকা হল 'The Brahmanical Magazine' এবং বাংলা সাপ্তাহিকী 'সংবাদ কৌমুদী'। ১৮২২ সালে প্রকাশিত 'মিরাৎ-উল-আকবর' ছিল একটি উল্লেখযোগ্য ফার্সি সাপ্তাহিকী। ১৮২৩ সালে ভারতের অস্থায়ী গভর্ণর জন অ্যাডামস একটি জরুরী আইন জারী করে সংবাদপত্রের প্রকাশকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন। এইভাবে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ রামমোহন 'মিরাৎ-উল-আকবর' পত্রিকাটি প্রকাশ করা বন্ধ করে দেন। সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ আইনের বিরুদ্ধে রামমোহন সহ তৎকালীন কয়েকজন বিশিষ্ট মণীষি সুপ্রীম কোর্টের কাছে একটি লিখিত আবেদন পেশ করেন। তবে সুপ্রীমকোর্টে এই আবেদনটি প্রত্যাখ্যাত হয়। কিন্তু রামমোহনের অদম্য প্রচেষ্টা এখানেই থেমে যায় নি। তিনি মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ রাজের কাছে পর্যন্ত স্মারকলিপি পেশ করেছিলেন। 'On the Bengal Renaissance পুস্তকে অধ্যাপক সুশোভন সরকার মন্তব্য করেন যে ১৮২৩ সালে সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ আইনের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্ট এবং ইংল্যান্ডের রাজার কাছে প্রেরিত আবেদন পত্রে রামমোহন যেভাবে মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে সমর্থন করেছিলেন সেটি আমাদের মিলটনের 'Areopagitica'র কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ইংরেজ কবি জন মিলটনের 'Areopagitica' ছিল মানুষের স্বাধীন মতপ্রকাশের অধিকার সম্পর্কে এক কালজয়ী রচনা।

দুঃখের বিষয় হ'ল এই যে ইংল্যান্ডের রাজার নিকট প্রেরিত আবেদন পত্রটিও প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। রামমোহনের সঙ্গে কোর্ট অফ্ ডিরেক্টরস্ এর দীর্ঘকাল ধরে বাদানুবাদ চলে। স্বাধীন মুদ্রাযন্ত্রের স্বপক্ষে রামমোহণের যুক্তি ছিল এই যে ভারতে শক্তিশালী জনমত গঠনের জন্যে এটি বিশেষভাবে প্রয়োজন ছিল। তিনি আরোও বলেন যে প্রচলিত শাসন ব্যবস্থা প্রসঙ্গে দেশবাসীর মধ্যে অভাব-অভিযোগের অভিব্যক্তির জন্যে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সুনিশ্চিত হওয়া দরকার। তা হলে জনসাধারণের মধ্যে কোন ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়ে বিদ্রোহের আশংকা থাকবে না। কেবল শাসিতের দিক থেকে নয়, শাসক বা সরকারের দিক থেকেও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সংবাদপত্রের মাধ্যমেই সরকার জনমত সম্পর্কে অবহিত হতে পারে এবং জনস্বার্থ সম্পর্কে সঠিক নীতি গ্রহণ করতে পারে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্যে রামমোহণের সংগ্রাম তাঁর জীবদ্দশায় সফল হয় নি। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরে ১৮৩৫ সালে চার্লস মেটকাফ্ -এর দ্বারা Press Regulation Act বা মুদ্রণ নিয়ন্ত্রণ আইনের প্রত্যাহার ছিল রামমোহণের দীর্ঘকালীন সংগ্রামের জয়যুক্ত ফলশ্রুতি। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্যে রামমোহণের এই অক্লান্ত-সংগ্রাম তাঁকে ভারতে সাংবিধানিক আন্দোলনের পথিকৃৎ করে রেখেছে।

৩৭.৩.৩ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির সমর্থণ

রামমোহনের স্বাধীনতা প্রীতি অবাধ ক্ষমতাকে সমর্থন করে নি। তিনি মনে করতেন যে আইন প্রণয়ণ এবং আইন প্রয়োগের ক্ষমতা একই কর্তৃপক্ষের হাতে ন্যস্ত থাকা উচিত নয়। এইরূপ দ্বৈত ক্ষমতার বলে বলীয়ান হলে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের স্বৈরাচারিতার পথ প্রশস্ত হবার আশংকা থাকে। তিনি ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির সমর্থক ছিলেন। ভারতে স্থানীয় শাসন কর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচারিতার ফলে জনসাধারণের স্বাধীণতা যাতে বিপন্ন না হয় সেই উদ্দেশ্যে তিনি ভারতীয়দের জন্যে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ভারতে নিযুক্ত ইংরেজ আমলাদের হাতে ন্যস্ত রাখার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি ভারতীয়দের জন্যে আইন প্রণয়ণের দায়িত্ব ইংল্যান্ডের প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা পার্লামেন্টের উপর ন্যস্ত থাকাটা যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করতেন। এইভাবে আইন প্রণয়ন ও আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের মধ্যে ক্ষমতা বিভাজনের ফলে স্থাণীয় শাসন কর্তৃপক্ষের স্বৈরাচারিতা রোধ করে জনসাধারণের স্বাধীনতা রক্ষা করা সম্ভব হবে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন।

৩৭.৩.৪ আইনের অনুশাসন নীতির সমর্থন

রামমোহন আইনের অনুশাসন তত্ত্বের সমর্থক ছিলেন। আইনের দৃষ্টিতে সমতাই হ'ল আইনের তত্ত্বের মূল কথা। ব্রিটেনে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার ভিত্তি হ'ল আইনের দৃষ্টিতে সমতা। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসক নিজেদের এই নীতি প্রয়োগ করলেও ভারতীয় ঔপনিবেশের ক্ষেত্রে এই নীতি কার্যকর করার ব্যাপারে পশ্চাৎপদ ছিল। ভারতে সরকারী ক্ষেত্রে ভারতীয়দের সমান অধিকারের নীতি স্বীকৃত হয় নি। রামমোহন ব্রিটিশ শাসনের এই বৈষম্যমূলক নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তিনি সরকারী চাকুরীতে নিয়োগের ব্যাপারে যোগ্যতার ভিত্তিতে ইংরেজ এবং ভারতীয়দের সমান অধিকারের দাবী জানিয়েছিলেন।

রামমোহন ব্রিটিশ সরকারের বৈষম্যমূলক জুরি আইনের বিরোধিতা করেছিলেন। এই আইন অনুযায়ী কোন হিন্দু এবং মুসলমান জুরি কোন খ্রীস্টানের বিচার করতে পারতেন না। এই বৈষম্যমূলক ও অবমাননাকর জুরি আইনের বিরুদ্ধে রামমোহনের উদ্যোগে একটি স্মারকপত্র ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিকট প্রেরিত হয়। এই স্মারকপত্রে মোট দু'শ একুশ জনের স্বাক্ষর ছিল। তাঁদের মধ্যে হিন্দু স্বাক্ষরকারীদের সংখ্যা ছিল একশ ছাব্বিশ। মুসলমান স্বাক্ষরকারীদের সংখ্যা ছিল পঁচানব্বই জন। রামমোহনের প্রবল বিরোধিতার ফলে ১৮৩২ সালে ব্রিটিশ সরকার নতুন জুরি আইন প্রবর্তন করে। সেই আইনে বৈষম্যমূলক শর্তগুলির বিলোপ করা হয়।

রামমোহন অবিবেচনা প্রসূত স্বেচ্ছাচারী আইনকে কখনই সমর্থন করেন নি। জনকল্যান সাধনকেই তিনি আইনের উদ্দেশ্য বলে মনে করেছেন। তিনি ভারতীয়দের জন্যে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ব্রিটিশ পার্লামেন্টের হাতে ন্যস্ত রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু ব্রিটিশ পার্লামেন্টের মত একটি দূরবর্তী কর্তৃপক্ষের পক্ষে ভারতের জনজীবনের স্থানীয় সমস্যাগুলি যে পূর্ণমাত্রায় উপলব্ধি করা সম্ভব নয় সে সম্পর্কে তিনি বিশেষভাবে সচেতন ছিলেন। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট যাতে ভারতীয়দের জন্যে জনকল্যাণমূলক আইন প্রণয়ন

করে সেটিই ছিল তাঁর কাছে সর্বতোভাবে কাম্য। এই উদ্দেশ্যে তাঁর প্রস্তাবিত তিনটি ব্যবস্থার কথা উল্লেখযোগ্য। প্রথমত, দেশের প্রকৃত জনমত অনুধাবনের জন্যে তিনি সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। দ্বিতীয়ত, তিনি মনে করেছিলেন যে ব্রিটিশ শাসন কর্তৃপক্ষ ভারতের জনসাধারণের মতামত সম্পর্কে সঠিকভাবে অবহিত হবার জন্যে বিভিন্ন কমিটি ও কমিশন নিয়োগ করতে পারেন। তৃতীয়ত, তিনি মনে করতেন যে ভারতের জন্যে কোন আইন প্রণয়নের আগে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের পক্ষে ভারতের বিদ্বান ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মতামত গ্রহণ করা উচিত।

৩৭.৪ বিচার ব্যবস্থার সংস্কার সাধনের প্রয়াস

বিচার ব্যবস্থার সংস্কার সাধন প্রসঙ্গে রামমোহনের মতামত উল্লেখযোগ্য। রামমোহন দেওয়াণী ও ফৌজদারী আইন বিধিবদ্ধ করে পুস্তকাকারে প্রকাশ করার কথা বলেন। তিনি বিচার বিভাগের স্বাধীনতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তাঁর মতে, বিচারকের হাতে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ন্যস্ত থাকা উচিত নয়। অনুরূপভাবে বিচার বিভাগ থেকে শাসন বিভাগ স্বতন্ত্র থাকা উচিত। তিনি মনে করতেন যে ইউরোপীয় এবং ভারতীয় বিচারকগণ একত্রে বিচারকার্য সম্পাদন করলে সুবিচার পাওয়া সম্ভব হবে। কারণ ইউরোপীয় বিচারকগণ ভারতীয় ভাষায় পারদর্শী হন না। এই কারণে বিচারকার্য সম্পাদনের ব্যাপারে ভারতীয় বিচারকদের সাহায্য নেওয়া দরকার। তিনি ভারতীয় আদালতগুলিতে জুরির বিচার প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি পঞ্চায়েতের সাহায্যে বিচারকার্য জুরিদের দ্বারা পরিচালনার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

৩৭.৫ রামমোহনের সমাজচেতনা ও সংস্কার আন্দোলন

রামমোহনের ব্যক্তিত্বের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর সমাজচেতনা। একজন প্রকৃত সমাজতাত্ত্বিকের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে তিনি ভারতীয় সমাজকে দেখেছিলেন এবং একথা উপলব্ধি করেছিলেন যে ভারতের মধ্যযুগীয় সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছিল অশিক্ষার অভিশাপ এবং বহুবিধ অন্ধ কুসংস্কার ও কুপ্রথার বেড়াজাল। তিনি বুঝেছিলেন যে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণের জন্যে ভারতীয় সমাজে প্রয়োজন ছিল এই প্রতিবন্ধকতাগুলির দূর করে সমাজকে প্রগতির পক্ষে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। সমাজ সংস্কারের পথে রামমোহনের প্রগতিশীল ভূমিকা তাঁকে বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে অমর করে রেখেছে।

৩৭.৫,১ শিক্ষাগত দৃষ্টিভঙ্গী

রামমোহনের সত্যসন্ধানী দৃষ্টিতে একথা স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়েছিল যে ব্রিটিশ শাসনের পশ্চাতে রয়েছে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান সমৃদ্ধ এক উন্নততর সভ্যতা। তিনি ভারতবাসীকে নবযুগের ধ্যানধারণায় উদ্বুদ্ধ করে তোলার জন্যে পশ্চিমী শিক্ষা ও বিজ্ঞান চর্চার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। প্রাচ্যের বিভিন্ন শাস্ত্রে তাঁর বিশেষ জ্ঞান এবং সংস্কৃতে তাঁর অসামান্য পারদর্শিতা ছিল। কিন্তু ১৮২৩ সালে লর্ড

আমহার্স্টকে লেখা একটি চিঠিতে দেখা যায় যে তিনি সংস্কৃত শিক্ষার পরিবর্তে গণিত শাস্ত্র, দর্শণ, রসায়ন বিদ্যা, ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা প্রভৃতি জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিদ্যা চর্চাকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে রামমোহন ইংরেজী শিক্ষার প্রসারের জন্যে ব্যক্তিগত ভাবেও যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন। তিনি ছিলেন প্রথম ভারতীয় যাঁর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল।

৩৭.৫.২ নারীর নিরাপত্তা বিধান

বাস্তব সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে রামমোহন রায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি ছিল সতীদাহ প্রথা নিবারণ। সতীদাহ নিবারণের ক্ষেত্রে রামমোহনের আগেও অনেকের চিন্তা ও প্রচেষ্টার কথা জানা যায়। কিন্তু রামমোহনের মৌলিকত্ব ছিল এই যে তিনিই সর্বপ্রথম এই বর্বর প্রথার বিরুদ্ধে একটি আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্রিয় হয়েছিলেন। তিনি সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে বাংলা ও ইংরেজীতে কয়েকটি বই লিখে নিজের খরচে সেইগুলি ছাপিয়ে বিনামূল্যে সর্বত্র বিতরণ করেন। ১৮১৮ এবং১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে সতীদাহ প্রথা অশাস্ত্রীয় এই মর্মে রামমোহন রায় কর্তৃক লিখিত তিনখানি বাংলা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এ সম্পর্কে ইংরেজীতে লেখা আরোও চারখানি বই প্রকাশিত হয়েছিল ১৮১৮, ১৮২০, ১৮৩০ এবং ১৮৩২ সালে। রামমোহন একথাও বুঝেছিলেন যে সতীদাহ প্রথা সম্পর্কে ধর্মীয় সংস্কার হিন্দুমনের গভীরে এমনভাবে প্রোথিত যে সে সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা কার্যকর করতে হলে একমাত্র উপযুক্ত লোকশিক্ষা ও জনমত গঠনের মাধ্যমেই সেটি সম্ভব। তাই সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলা ছিল তাঁর অন্যতম লক্ষ্য। সংবাদপত্রের মাধ্যমে এই প্রথার বিরুদ্ধে তিনি আন্দোলন চালিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য দুটি সংবাদপত্রের নাম হল 'বঙ্গাল গেজেটি' ও'সংবাদ কৌমুদী।' সতীদাহ নিবারণের উদ্দেশ্যে কার্যক্ষেত্রে রামমোহনের সক্রিয় ভূমিকাও বিশেষভাবে স্মরণীয়। তিনি একটি ভিজিলান্স কমিটি গঠন করেন। এই কমিটির উদ্দেশ্য ছিল সতীদাহ সম্পর্কিত সরকারী নিয়ন্ত্রণ বিধিগুলি যথারীতি পালিত হচ্ছে কিনা তার ওপর নজর রাখা। তিনি নিজে শ্মশানঘাটে উপস্থিত হয়ে সহমরণে উদ্যত বিধবাদের চিতায় আরোহণ করা থেকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করতেন।

১৮২৯ সালে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক সতীদাহ প্রথা রদ করে আইন প্রণয়ন করলে ১৮৩০ সালের ১৬ই জানুয়ারী রামমোহন রায় টাউন হলে একটি সভা করে বেন্টিঙ্ককে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। কিন্তু তৎকালীন হিন্দু সমাজের রক্ষণশীল নেতৃবৃন্দ বেন্টিঙ্কের আইনকে স্বাগত জানাতে পারেন নি। বেন্টিঙ্কের আইন যাতে কার্যকর না হয় সেই উদ্দেশ্যে সতীদাহ প্রথার সমর্থকরা ইংল্যান্ডে প্রিভি কাউন্সিলে একটি আবেদনপত্র পেশ করেন। এই আবেদনের বিরোধিতা করার উদ্দেশ্যে ১৮৩০ সালে রামমোহন ইংল্যান্ডে যাত্রা করেন। প্রিভি কাউন্সিলে রক্ষণশীল গোষ্ঠীর আবেদন পত্রের বিরুদ্ধে রামমোহন আর একটি আবেদন পত্র পেশ করেন এবং রক্ষণশীল গোষ্ঠীর আবেদন পত্রের শুনানীকালে ভারতীয় নারীর পক্ষ হয়ে তিনি সর্বদা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ১৮৩২ সালে প্রিভি কাউন্সিলে রক্ষণশীল হিন্দুগোষ্ঠীর আবেদন নাকচ হয়ে যায়। এইভাবে রামমোহন সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদের জন্যে আমরণ সংগ্রাম করে গেছেন।

সমাজে নারীর মর্যাদার পক্ষে অবমাননাকর যে প্রথাটির বিরুদ্ধে রামমোহন প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন

সেটি ছিল পুরুষের বহুবিবাহ প্রথা। তিনি প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র বিশ্লেষণ করে দেখান যে শাস্ত্রকাররা পুরুষের একাধিক বিবাহকে স্বাভাবিক নিয়ম বলে নির্দেশ করেন নি। শাস্ত্রে এটি ব্যতিক্রম হিসাবেই স্বীকৃত। এই সামাজিক কুপ্রথা দূর করার জন্যে তিনি সরকারী হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। বস্তুতঃ রামমোহন যথার্থভাবে একথা হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যে ভারতে দীর্ঘপ্রচলিত কুপ্রথার ভারে জরাগ্রস্ত সমাজের পুনরুজ্জীবনের জন্যে প্রয়োজন ছিল সামাজিক বিষয়ে রাষ্ট্রশক্তির হস্তক্ষেপ।

রামমোহনের চোখে মধ্যযুগীয় সমাজে নারীর অবহেলিত সামাজিক অবস্থানের মূল কারণটি ধরা পরেছিল। সেই কারণটি ছিল আর্থনীতিক কারণ। স্ত্রীলোকের দায়াধিকার সম্বন্ধে তৎকালীন হিন্দুসমাজে প্রচলিত ব্যবস্থাকে তিনি অন্যায় এবং শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলে সমালোচনা করেন। তিনি প্রাচীন শাস্ত্রকারদের বিধান ব্যাখ্যা করে দেখান যে প্রাচীন শাস্ত্রানুসারে মৃত পতির সম্পত্তিতে তাঁর বিধবা পত্নীর পরিবারের অন্যান্য পুরুষ সদস্যদের মতই সমান অধিকার ছিল। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় রামমোহন রায় রচিত 'The Modern Encroachments on the Ancient Rights of Females' পুস্তিকা। নারীকে আর্থিক ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতা প্রদান করাই ছিল তাঁর এই রচনার উদ্দেশ্য।

অর্থের বিনিময়ে কন্যাবিক্রয়ের কদর্থ প্রলোভনকে রামমোহন তীক্ষ্ণভাবে সমালোচনা করেন। তিনি একথা বুঝেছিলেন যে সমাজে নারীর বঞ্চনা ও শোষণের অন্যতম কারণ ছিল নারীর শিক্ষা ও সুযোগের অভাব। উদারনীতিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন রামমোহন নারীশিক্ষাকে বিশেষভাবে সমর্থন করেছিলেন।

৩৭.৫.৩ ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী

রামমোহনের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে তাঁর উদারনীতিক চিন্তাচেতনা বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর ধর্মচিন্তার মূলে ছিল এক সুমহান ঐক্যবোধের উপলব্ধি। 'ভারতপথিক রামমোহন' রচনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন যে মানুষে মানুষে ঐক্যই হ'ল মানুষের সমাজের সবচেয়ে বড় তত্ত্ব। এই ঐক্যবোধ যখন দুর্বল হয়ে পড়ে তখন সেই দুর্বলতা দেশের সমাজের জীবনে এক দুষ্ট ব্যধির মত ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। এই ঐক্যবোধই হ'ল ভারতের উপনিষদের সনাতন শাশ্বত সত্য। কিন্তু ভারতের অন্তরের এই শাস্বত সত্যটি চাপা পড়ে গিয়েছিল বাহ্যভেদের অন্তরালে। বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানের বিভেদের অন্তরালে হারিয়ে গিয়েছিল ধর্মের সুমহান ঐক্যবোধের আধ্যাত্মিক উপলব্ধি। রামমোহন সকল প্রকার ধর্মীয় সংকীর্ণতা, ধর্মীয় বিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িকতার উর্দ্ধে ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, তিনি "উপনিষদের ঐক্যতত্ত্বের আলোকে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টানকে সত্যদৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছিলেন, তিনি কাউকেই বর্জন করেন নি। বুদ্ধির মহিমায় ও হৃদয়ের বিপুলতায় তিনি এই বাহ্যভেদের ভারতে আধ্যাত্মিক অভেদকে উজ্জ্বল করে উপলব্ধি করেছিলেন"।

৩৭.৫.৪ আর্থনীতিক ধ্যানধারণা

রামমোহনের উদারনীতিক চিন্তাচেতনা তাঁর আর্থনীতিক ধ্যানধারণার মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে। কৃষিপ্রধান

ভারতবর্ষে অর্থনীতির মেরুদন্ড কৃষকদের দারিদ্রের দুঃখকে তিনি অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি মনে করতেন যে চিরস্থায়ী এবং রায়তওয়ারি এই দুটি ব্যবস্থার কোনটিই দরিদ্র কৃষকদের পক্ষে মঙ্গলজনক হয় নি। কৃষকেরা জমিদার ও রাজকর্মচারীদের শোষণের শিকারে পরিণত হয়েছে। তিনি কৃষকের উপর কর বৃদ্ধির ব্যবস্থাকে সমর্থন করেন নি। তার পরিবর্তে তিনি কৃষকদের করের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেবার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি এদেশে ইস্ট ইন্ডিয়াকোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকারের পরিবর্তে অবাধ বাণিজ্যের নীতিকে সমর্থন করেছিলেন। তিনি মনে করতেন যে শিক্ষিত ও ধণী ইংরেজরা এদেশে বসবাস করলে তাদের উন্নত জ্ঞান এবং মুলধনের সংস্পর্শে ভারতে শিল্পায়নের পথ সুগম হবে।

৩৭.৫.৫ আন্তর্জাতিক মনস্কতা

রামমোহনের উদারপন্থী চিন্তাধারা কেবলমাত্র জাতীয়তাবাদী ধ্যানধারণার মধ্যেই সীমিত থাকে নি। তাঁর অন্তর ছিল বিশ্বমানবিক চেতনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ। তাই জাতীয়তাবাদের গন্ডী অতিক্রম করে তাঁর উদাও চিন্তাধারা প্রসারিত হয়েছিল আন্তর্জাতিকতার জগতে। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ফ্রান্সের তৎকালীন পররাষ্ট্র মন্ত্রীকে একটি পত্র লেখেন। এই পত্রটিতে তিনি একটি জাতি-সংঘ স্থাপনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও জাতিকে সৌহার্দ্যের বন্ধনে আবদ্ধ করাই ছিল এই জাতি-সংঘ গঠনের উদ্দেশ্য।

৩৭.৫.৬ রামমোহনের চিন্তাধারার মূল্যায়ন

সমকালে ও উত্তরকালে রামমোহনের চিন্তাধারা বিভিন্ন দিক থেকে সমালোচিত হয়েছে। সমালোচকগণের মন্তব্য, রামমোহন অন্যান্য দেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও নিজের দেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনকে ঈশ্বরের আশীর্বাদ হিসেবে স্বাগত জানান। রামমোহন এবং নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্যান্য অনেকে ভারতকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের ছত্রছায়ায় একটি উপনিবেশে পরিণত করায় উদ্যোগী হন। সমালোচকগণ আরোও বলেন যে রামমোহন রায় যে আধুনিকতার ধারার পথিকৃৎ ছিলেন সেটি প্রাক্‌পুঁজিবাদী সমাজ থেকে পূর্ণ পুঁজিবাদী আধুনিকতায় উত্তরণ ছিল না। সেটি ছিল বুর্জোয়া আধুনিকতার এক দুর্বল এবং বিকৃত ব্যঙ্গচিত্র মাত্র। রামমোহন রায় এবং তাঁর সহযোগীদের মতাদর্শ এবং ভূমিকা তাঁদের ভারতে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিতন্ত্রের দেশীয় দালাল হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

সমালোচকগণ আরোও বলেন যে, ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা এবং এর নিয়ন্ত্রণাধীন ভারতবর্ষ সম্পর্কে রামমোহনের বোধ ও উপলব্ধি তাঁর ব্যক্তিক এবং শ্রেনীগত স্বার্থদ্বারা সীমাবদ্ধ ছিল। ব্যক্তিগত জীবনে ও শ্রেণী-অবস্থানের দিক দিয়ে রামমোহন ছিলেন সামন্তযুগীয় ভোগবিলাসী ও সুবিধাভোগী জমিদার। কর্নওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে নতুন ভূমি-সম্পর্কের দ্বারা জমির ওপর জমিদারশ্রেণীর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই জমিদার শ্রেণীর কাছে ব্রিটিশরা ছিল সৌভাগ্যের অগ্রদূত। তিনি ইউরোপীয় বণিকদের বিভিন্ন ব্যবসায়ে অর্থলগ্নী করতেন এবং সুদের বিনিময়ে অর্থ ঋণ দিতেন। তিনি এদেশে ইংরেজদের অবাধ বাণিজ্যকে সমর্থন করেছিলেন। ইংরেজ বণিকগোষ্ঠীর সঙ্গে জনস্বার্থের বন্ধনে আবদ্ধ থাকায় রামমোহনের রাজনীতিক দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতি সমর্থনের মনোভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

রামমোহনের চিন্তাধারার মূল্যায়নে Thomas Pantham মন্তব্য করেন যে একথা সত্য যে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী অনুপ্রবেশের অশুভ ফলাফল কি হতে পারে রামমোহন সেটি উপলব্ধি করতে পারেন নি। তাঁর রচনাগুলিতে দেশপ্রেম বা জাতীয়তাবাদী অনুভূতির কোন প্রকাশ ছিল না। তাঁর সমসাময়িক ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে এই ধরণের অনুভূতি ছিল অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত। রামমোহনের উদ্দেশ্যে ছিল স্বতন্ত্র প্রকৃতির। মূলতঃ দুটি কারণে তিনি ব্রিটিশ শাসনকে সমর্থন করেছিলেন। প্রথমত, তিনি দেশীয় জনগণের কল্যাণার্থে ব্রিটিশ শাসনকে স্বাগত জানান এবং এই শাসনের সংস্কার কামনা করেন।। ঔপনিবেশিক শাসন কর্তৃপক্ষ এবং তাদের জনগণ নিজেদের দেশে যে পৌরস্বাধীনতা ভোগ করে ভারতে জনগণ সেই পৌরস্বাধীনতা ভোগ করবে এই ছিল তাঁর ইচ্ছা। এ দিক থেকে তাঁর চিন্তাধারা ছিল বলিষ্ঠ এবং প্রগতিশীল। দ্বিতীয়ত, তিনি ব্রিটিশ শাসনের পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে ভারতের আর্থনীতিক বিকাশের পথে সহায়ক বলে মনে করেছিলেন। প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির তুলনায় পুঁজিবাদ এবং তার উদারনীতিবাদের আদর্শকে তিনি প্রগতিশীল বলে মনে করেছিলেন। Thomas Pantham এর মতে ব্রিটিশ শাসন রামমোহন এবং নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নিকট যে আর্থিক সফল বহন করে এনেছিল কেবলমাত্র সেই কারণেই তিনি এই শাসনকে সমর্থন করেন নি। একথা সত্য যে তিনি এই সকল সুযোগ সুবিধার অংশীদার ছিলেন। কিন্তু ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে তাঁর অন্যতম আশা ছিল এই যে এই শাসনের মাধ্যমে ভারতে উদারনীতিক ধ্যানধারণার উন্মেষ ঘটবে। তিনি সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার সঙ্গে ভারতের রাজনীতিক ও আর্থনীতিক একাত্মতার বিরোধিতা করেন নি। কিন্তু তিনি সাম্রাজ্যবাদী শাসনব্যবস্থার সংস্কার সাধনে প্রয়াসী হন। তিনি চেয়েছিলেন যে ভারতের জন্য শাসননীতি রচনায় ভারতীয়দের মতামত গ্রহণ করা হোক। তখনও পর্যন্ত ভারতে জাতীয় স্বাধীনতার জন্য উপযুক্ত পরিবেশের সৃষ্টি হয় নি। রামমোহন সেই কারণে দেশবাসীকে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে রত হবার আহ্বান জানান নি। বরং তিনি চেয়েছিলেন নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভারতের পুনরুজ্জীবন। এইদিক থেকে তিনি ছিলেন ভারতের প্রথম রাজনীতিক মডারেট। একথা সত্য যে তিনি ব্রিটিশ শাসনকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি নিঃশর্তভাবে ব্রিটিশ শাসনকে স্বাগত জানান নি। ভারত থেকে মুনাফা সংগ্রহ করে বিদেশে চালান দেওয়াকে তিনি সমর্থন করেন নি। তিনি চেয়েছিলেন যে এদেশে সদয়, শিক্ষিত ও ধনী ইংরেজরা বসবাস করুক। সেক্ষেত্রে ভারতে বিদেশী মূলধনের বিনিয়োগ হবে এবং ভবিষ্যতে শিল্প বিপ্লবের পথ প্রশস্ত হবে এই ছিল তাঁর ইচ্ছা। ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে সমর্থন করা সত্ত্বেও রামমোহনের উদারনীতিক চিন্তার মধ্যে সাম্রাজ্যবাদোত্তর বিশ্বসংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণার ইংগিত পাওয়া যায়। তিনি মনে করতেন যে উপনিবেশ এবং ঔপনিবেসিক কর্তৃপক্ষ উভয়ের সমাজব্যবস্থারই ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, রাজনীতিক এবং আর্থনীতিক সংস্কার সাধনের প্রয়োজন। তখন উদীয়মান বিশ্বসভ্যতার জন্য যেটি প্রয়োজন ছিল সেটি হ'ল একটি নব মানবিক সংস্কৃতি। রামমোহন ছিলেন বিশ্বমানবতার পূজারী। বিশ্বজনীন মানবতার আদর্শ অনুযায়ী বিশ্বের বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিরোধের পরিবর্তে পারস্পরিক সহনশীলতা ও সহযোগিতাই ছিল তাঁর কাম্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন যে রামমোহন ছিলেন সমকালীন বিশ্বে একমাত্র ব্যক্তি যিনি বর্তমান যুগের তাৎপর্য উপলব্ধি

করতে পেরেছিলেন। তিনি জানতেন যে বিচ্ছিন্ন স্বাধীনতা মানবসভ্যতার আদর্শ নয়। বরং চিন্তা ও কর্মের সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তি ও জাতির পরস্পরের উপর নির্ভরশীলতার ভিত্তিতে সৃষ্ট ভ্রাতৃত্বের মধ্যেই নিহিত রয়েছে সেই আদর্শ।

৩৭.৭ সারাংশ

ভারতের মধ্যযুগীয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজজীবনে আধুনিকতার ভগীরথরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন রাজা রামমোহন রায়। রামমোহনের চিন্তাধারা ছিল যুক্তিবাদী, প্রগতিশীল এবং উদারপন্থী। তিনি উদারনীতিবাদের জন্মভূমি ইউরোপের ইতিহাস অনুশীলন করেন এবং উদারনীতিবাদের প্রকৃত মর্মবস্তু উপলব্ধি করেন। উদারনীতিবাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল স্বাধীনতা। ধর্মীয় কুসংস্কার এবং সামন্ততান্ত্রিক কর্তৃত্ববাদের শৃংখল থেকে মানুষকে মুক্ত করে মানবসত্তার স্বাধীন বিকাশই ছিল উদারনীতিক রাজনীতিক দর্শনের লক্ষ্য। ভারতের ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই উদারনীতিক দর্শনের চিন্তাধারায় ভারতীয়দের উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন রাজা রামমোহন রায়। তাঁর উদারনীতিক চিন্তাধারার ব্যাপ্তি সমাজকালীন ভারতবর্ষের সমাজ জীবনের বিভিন্ন দিককে স্পর্শ করেছিল।

রামমোহনের উদারনীতিক চিন্তাধারার বলিষ্ঠ প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর স্বাধীনতা সম্পর্কিত ধারণার মধ্যে। ব্যক্তি ও জাতির জীবনে স্বাধীনতাকে তিনি অমূল্য সম্পদ বলে মনে করেছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে তিনি অভিনন্দিত করেছেন। এ হেন স্বাধীনতা প্রেমী রামমোহন ভারতের ক্ষেত্রে কিন্তু ব্রিটিশ শাসনকে স্বাগত জানিয়েছেন। তার কারণ হ'ল এই যে তিনি তাঁর সমকালীন যুগের ভারতবাসীদের স্বশাসনের পক্ষে উপযুক্ত বলে মনে করেন নি। তিনি ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার পৌর স্বাধীনতার সুফলগুলিকে ভারতীয় জনজীবনে সম্প্রসারণে আগ্রহী ছিলেন। এইভাবে তিনি ভারতবাসীকে পৌর স্বাধীনতা সম্পর্কে সচেতন করতে চেয়েছিলেন। তিনি সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য আজীবন নির্ভীকভাবে সংগ্রাম করেগেছেন। রামমোহন ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির সামর্থক ছিলেন। আইন প্রণয়ন এবং আইন প্রয়োগের ক্ষমতা পৃথক থাকা উচিত বলে তিনি মনে করতেন। তিনি ভারতীয়দের জন্যে আইন প্রণয়নের দায়িত্ব ইংল্যান্ডের প্রতিনিধিত্ব মূলক সংস্থা পার্লামেন্টের উপর ন্যস্ত থাকাটা যুক্তি যুক্ত বলে মনে করতেন। রামমোহন আইনের অনুশাসন তত্ত্বের সমর্থক ছিলেন। তিনি সরকারী চাকুরীতে নিয়োগের ব্যাপারে ইংরেজ ও ভারতীয়দের সমান অধিকার দাবী করেছিলেন। তিনি ব্রিটিশ সরকারের বৈষম্যমূলক জুরি আইনের বিরোধিতা করেছিলেন। ব্রিটিশ সরকার ভারতের জন্য জনকল্যাণমূলক আইন প্রণয়ন করবে এটিই তাঁর কাম্য। তিনি দেওয়াণী ও ফৌজদারী আইন বিধিবদ্ধ করে পুস্তকাকারে প্রকাশ করার কথা বলেন। তিনি বিচারবিভাগের স্বাধীনতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তিনি পঞ্চায়েতের সাহায্যে বিচার কার্য জুরিদের দ্বারা পরিচালনার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

সমাজ সংস্কারের পথে রামমোহনের ভূমিকা ও অবদান অবিস্মরণীয়। সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, পুরুষের বহু বিবাহ প্রথার বিরোধিতা, নারীর সম্পত্তির অধিকার সমর্থন, নারীশিক্ষার সমর্থন, জাতিভেদ প্রথার বিরোধিতা, শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার প্রভৃতি ক্ষেত্রে রামমোহনের অবদানের গুরুত্ব অপরিসীম। তাঁর

ধর্মচিন্তার মূলে ছিল এক সুমহান ঐক্যবোধের উপলব্ধি। রামমোহনের উদারনীতিক চিন্তা তাঁর আর্থনীতিক ধ্যানধারণার মধ্যেও প্রতিফলিত হয়েছে। রামমোহনের আন্তর্জাতিক চিন্তাভাবনাও বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে।

সমালোচকদের মতে, রামমোহন ছিলেন সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিতন্ত্রের দালাল। সামন্তযুগীয় ভোগবিলাসী জমিদার রামমোহনের চিন্তাধারা তাঁর ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত স্বার্থদ্বারা সীমাবদ্ধ ছিল।

রামমোহনের চিন্তাধারার মূল্যায়ণে বলা যায় যে মূলতঃ দুটি কারণে তিনি ব্রিটিশ শাসনকে সমর্থন করেন। প্রথমত, তিনি দেশীয় জনগণের কল্যাণার্থে ব্রিটিশ শাসনকে স্বাগত জানান এবং এই শাসনের সংস্কার কামনা করেন। দ্বিতীয়ত, তিনি ব্রিটিশ শাসনের পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে ভারতের আর্থনীতিক বিকাশের পথে সহায়ক বলে মনে করেছিলেন। ব্রিটিশ শাসনকে সমর্থন করা সত্ত্বেও রামমোহনের উদারনীতিক চিন্তার মধ্যে সাম্রাজ্যবাদোত্তর বিশ্বসংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণার ইংগিত পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন বিশ্বমানবতার পূজারী।

৩৭.৮ অনুশীলনী

১। রাজা রামমোহন রায়ের স্বাধীনতা সম্পর্কিত চিন্তাধারা বিশ্লেষণ করুন।

২। সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রে রামমোহনের ভূমিকার মূল্যায়ন করুন।

৩। রাজা রামমোহন রায়ের রাষ্ট্রচিন্তার একটি সমালোচনামূলক পর্যালোচনা করুন।

৪। রামমোহন রায়কে কী অর্থে আধুনিকতার পথিকৃৎ বলা হয়?

৫। সমাজে নারীর মর্যাদা বিষয়ে রামমোহনের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিন।

৬। আইন ও বিচারব্যবস্থার সংস্কারের জন্য রামমোহনের কি ধরণের প্রস্তাব ছিল?

৩৭.৯ গ্রন্থপঞ্জী

১। সৌরেন্দ্রমোহন রায় : বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা, সুবর্ণরেখা, ১৯৬৮ (১ম সংস্করণ)

২। প্রদীপ রায় : রামমোহন রায়; এক ঐতিহাসিক জিজ্ঞাসা, বুকট্রাষ্ট, ১৯৮২

৩। Rabindranath Tagore : Rammohan Raoy : The Inaugurator of Modern Age in India, Sadharan Brahmo Samaj.

৪। R. C. Majumder : Rammohan Roy, Asiatic Society.

৫। Thomas Pantham : The Socio-Religions and Political Thought of Rammohan Roy, in Pantham and Deutsch (ed) Political Thought in Modern India, Sage 1986

৬। R. Chakraborti : Rammohan Roy : His Vision of Social Change, in A. Mukhopadhyay (ed) Bengal Intellectual Tradition, K.P. Bagchi 1979.

একক ৩৮ ☐ স্বামী বিবেকানন্দ

গঠন

৩৮.০ উদ্দেশ্য
৩৮.১ প্রস্তাবনা
৩৮.২ জাতীয়তাবাদের ধারণা
৩৮.২.১ জাত, ব্যক্তি ও জাতীয়তা
৩৮.২.২ জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিক
৩৮.৩ সামাজিক ন্যায়
৩৮.৩.১ সমাজতান্ত্রিক চিন্তা
৩৮.৪ ধর্ম ও ধর্মসহিষ্ণুতার আদর্শ
৩৮.৫. সারাংশ
৩৭.৬ অনুশীলণী
৩৮.৭ প্রশ্নাবলী

৩৮.০ উদ্দেশ্য

সমাজ ও রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে ভারতীয় চিন্তনের স্বকীয়তা এই যে, রাষ্ট্রীয় জীবনের বাইরে অবস্থান করেও ভূয়োদর্শী যাঁরা তাঁরা নতুন ভাবনার, নতুন পথের দিশারী হয়েছেন। স্বামী বিবেকানন্দের ভূমিকা এক্ষেত্রে অনন্যসাধরণ। তাঁর সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তা নিয়ে লেখা এই এককটি পড়লে আপনি সম্যক বুঝতে পারবেন :

- ভারতীয় সমাজের মূল যে আত্মিক শক্তি তার পরিচয়;
- সমাজের যাবতীয় বৈষম্য, দুরাচারের বিরুদ্ধে জনসংহতি ও জনচেতনা উদ্বোধনের প্রয়োজন;
- এদেশে জাতীয়তাবোধের উন্মেষে জাতীয়তার প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে প্রাজ্ঞ পুরুষের উদ্দীপক অথচ সতর্ক বিশ্লেষণ;
- সমাজসংস্কার নয়, পরিপূর্ণ সমাজবিপ্লব যাঁর অভিপ্রেত, সেই স্বামীজীর সাম্যবাদী অবস্থান; এবং
- ধর্মসাধনার চূড়ান্ত উপলব্ধির স্তর থেকে প্রকৃত ধর্মবোধ কী সে বিষয়ে নির্মোহ, অসঙ্কীর্ণ মনোভাব।

৩৮.১ প্রস্তাবনা

স্বামী বিবেকানন্দ প্রচলিত অর্থে রাষ্ট্রদার্শনিক ছিলেন না। বাস্তব রাজনীতির সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল না। তিনি ছিলেন স্বদেশ প্রেমিক, মানবতাবাদী মহাচিন্তানায়ক যাঁর চিন্তাকে কোন দেশ বা কালের গন্ডী দিয়ে সীমাবদ্ধ করা যায় না। আদর্শ মানুষ ও আদর্শ সমাজ গড়ে তোলা, পরাধীন দেশকে জাগিয়ে তোলা

এবং বিশ্বের দরবারে ভারতকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। মানুষ সেবার মহান আদর্শই ছিল তাঁর জীবনের মাহমন্ত্র। তাঁর বিশাল চিন্তা রাজ্যের স্রোত বহুমুখী বিষয়ের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এই বিপুল চিন্তাস্রোতের মধ্যেই রাষ্ট্রদর্শনের বিভিন্ন প্রসঙ্গ সম্পর্কে তাঁর বিশিষ্ট ধ্যানধারণার পরিচয় পাওয়া যায়।

৩৮.২ জাতীয়তাবাদের ধারণা

পরাধীন ভারতবর্ষের অগৌরবের দিনে স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব ছিল এক ঐতিহাসিক প্রয়োজন। বিবেকানন্দের চিন্তাধারা তাঁর সমকালীন ভারতবর্ষের রাজনীতিক চিন্তার ক্ষেত্রে ছিল এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। ছিল এক বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। ব্রিটিশ শাসনযুগে উদারনীতিবাদের প্রথম উন্মেষ দেখা যায় রাজা রামমোহন রায়ের চিন্তায়। রামমোহন উদারনীতিবাদের জন্মভূমি ইউরোপের জ্ঞানবিজ্ঞান সমৃদ্ধ উন্নতর প্রগতিশীল সভ্যতার সুফলগুলিকে ভারতের মাটিতে আহরণ করতে চেয়েছিলেন এবং ব্রিটিশ শাসনকে ভারতবাসীর জীবনে ঈশ্বরের আশীর্বাদ বলে মনে করেছিলেন। রামমোহন সমকালীন ভারতবাসীদের স্বশাসনের পক্ষে উপযুক্ত বলে মনে করেন নি। ব্রিটিশ শাসনের ছত্রছায়ায় থেকে ভারতবাসী পৌর স্বাধীনতা ভোগ করুক সেটিই ছিল তাঁর কাম্য। রামমোহনের পরবর্তীকালে তাঁর অনুগামীরাও ব্রিটিশ সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে ভারতে আধুনিকতার অগ্রদূত বলে মনে করেন। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধাচরণ করার থেকে এই শাসনের প্রতি অনুশাসনের বিরুদ্ধাচরণ করার থেকে এই শাসনের প্রতি অনুগত থাকাকেই তাঁরা বাঞ্ছণীয় বলে ভাবতেন। আবেদন-নিবেদনের রীতিই ছিল তাঁদের দাবীপূরণের পথ।

স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন ভিন্ন পথের পথিক। আবেদন-নিবেদনের রীতিতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। পরানুকরণ এবং ভিক্ষার মাধ্যমে ভারতে স্বাধীনতা ও সভ্যতার বিকাশ ঘটবে এই দাসসুলভ মনোভাবের প্রতি তিনি ঘৃণা পোষণ করতেন। হীনম্পস্যতার পরিবর্তে আত্মবিশ্বাসের বলিষ্ঠ মনোভাবের দ্বারা দেশবাসীকে জাগিয়ে তোলাই ছিল তাঁর চিন্তাধারার অনন্য বৈশিষ্ট্য। বিবেকানন্দের বাণী ছিল আত্মশক্তি উন্মেষের অগ্নিবাণী। তাঁর সমকালীন উদারনীতিক চিন্তাধারার পরিপ্রেক্ষিতে বিবেকানন্দের বলিষ্ঠ চিন্তাধারা পরাধীন জাতির মনে শক্তি ও সাহসিকতার বীজ বপন করে। আত্মগ্লানি ও হতাশায় নিমজ্জমান পরাধীন ভারতবাসীর কাছে স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন এক নতুন যুগের, এক নতুন পথের দিশারী।

নির্ভীক স্বাদেশিকতার মন্ত্রে বিবেকানন্দ সমগ্র দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদ তাঁর চিন্তাধারায় একটি বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছে। বিবেকানন্দ জাতীয়তাবাদকে এক আধ্যাত্মিক পটভূমির উপর স্থাপন করেছিলেন। পরাধীনতার শৃংখল মুক্ত করার জন্যে তিনি দেশকে মাতৃরূপে বন্দনা করে দেশবাসীর হৃদয়ে স্বদেশপ্রেমের আবেগ সঞ্চার করেছিলেন। তাঁর ভাষায়, 'আগামী পঞ্চশৎ বর্ষ ধরিয়া সেই পরম জননী মাতৃভূমি যেন তোমাদের পরম আরাধ্যা দেবী হন, অন্যান্য অকেজো দেবতাগণকে এই কয়েক বর্ষ ভুলিলে কোন ক্ষতি নাই'। স্বদেশপ্রেমের অভয়মন্ত্রে তিনি দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তিনি

বলেন, 'আমাদের এই মাতৃভূমি গভীর নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া জাগ্রত হইতেছেন। আর কেহই এখন ইহার গতিরোধে সমর্থ নহে . . . . কোন বহিঃশক্তিই এখন আর ইহাকে দমন করিয়া রাখিতে পারিবে না।'

দেশকে মাতৃজ্ঞানে মর্যাদা দিয়ে বিবেকানন্দ যে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধের সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন তার মধ্যে একদিকে ছিল অন্ধ পরাণুকরণ বর্জন এবং অপরদিকে ছিল নিজ জাতির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য প্রকাশের চেষ্টাও উদ্যম। তিনি বলেন, 'হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরাণুকরণ, পরমুখাপেক্ষা এই দাস-সুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘণ্য নিষ্ঠুরতা-এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে ? এই লজ্জাকর কাপুরুষতা সহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে ?' বর্তমান ভারত প্রবন্ধে তিনি বলেছে, 'শ্বেতাঙ্গ যে ভাবের, যে আচারের প্রশংসা করে, তাহাই ভাল; তাহারা যাহার নিন্দা করে তাহাই মন্দ। হা ভাগ্য, ইহা অপেক্ষা নির্বুদ্ধিতার পরিচয় কি ?' বিজাতীয় অনুকরণের পরিবর্তে তিনি দেশবাসীকে নিজ দেশের জাতীয় বৈশিষ্ট্যের বিকাশের পথে অনুপ্রাণিত করতে চেয়েছিলেন।

৩৮.২.১ জাতি, ব্যক্তি ও জাতীয়তা

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনার তৃতীয় খন্ডে দেখা যায় যে বিবেকানন্দ জাতিকে 'ব্যস্টির সমষ্টি' বলে বর্নণা করেছেন। তিনি বলেন যে প্রত্যেক মানুষের যেমন ব্যক্তিত্ব আছে, প্রত্যেক জাতিরও সেইরূপ একটি ব্যক্তিত্ব আছে। বাণী ও রচনার পঞ্চম খন্ডে তাঁর বক্তব্য অনুসরণ করে বলা যায় যে যেমন এক ব্যক্তির অপর ব্যক্তি থেকে কতকগুলি বিষয়ে পার্থক্য আছে, প্রত্যেক ব্যক্তিরই যেমন কতকগুলি বিশেষত্ব আছে, সেইরূপ এক জাতিরও অপর জাতি থেকে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ লক্ষণগত প্রভেদ আছে। আর যেমন প্রত্যেক ব্যক্তিকেই প্রকৃতির কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করতে হয়, তেমনই প্রত্যেক জাতিরই জগতে কিছু বার্তা ঘোষণা করার আছে। ভারতের জাতীয় জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি বলেন, 'রাজনীতিক বা সামরিক শ্রেষ্ঠতা কোন কালে আমাদের জাতীয় জীবনের উদ্দেশ্য নহে – কখনও ছিলও না, আর জানিয়া রাখুন, কখনও হইবে না। তবে আমাদের জাতীয় জীবনের অন্য উদ্দেশ্য আছে। তাহা এই : সমগ্র জাতির আধ্যাত্মিক শক্তি সংহত করিয়া যেন এক বিদ্যুতাধারে রক্ষা করা এবং যখনই সুযোগ উপস্থিত হয়, তখনই এই সমষ্টিভূত শক্তির বন্যায় সমগ্র পৃথিবী প্লাবিত করা।'

এই আধ্যাত্মিকতাই ভারতীয় জনজীবনের বন্ধুসূত্র। অদ্বৈত দর্শন ও বেদান্তে বিশ্বাসী বিবেকানন্দ সর্বমানবের মধ্যে দেখেছেন ব্রহ্মের প্রকাশ। এই উপলব্ধি থেকেই তাঁর সর্বজনীন মানবতাবোধ। এই সর্বজনীন মানবতাবোধের ভিত্তিভূমিতে দাঁড়িয়েই তিনি সমগ্র ভারতবাসীকে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতিতে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। সকল প্রকার সংকীর্ণতার উর্দ্ধে উঠে বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে তিনি দেশবাসীর প্রতি জানিয়েছেন তাঁর উদাও আহ্বান, 'হে ভারত ভুলিও না-নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই! হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল-আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল-মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চন্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল-ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ . . . . . ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ।'

৩৮.২.২ জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা

বিবেকানন্দ দেশবাসীকে স্বদেশমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর জাতীয়তাবোধ কখনই অন্ধ স্বজাতি বাৎসল্য ছিল না। তাঁর জাতীয়তাবাদ ছিল মুক্ত এবং উদার প্রকৃতির। বিবেকানন্দ মনে প্রাণে দেশপ্রেমিক হলেও বিজাতি বিদ্বেষ পোষণ করেন নি। তিনি কখনই এ কথা মনে করেন নি যে পাশ্চাত্ত্য জগৎ থেকে আমাদের শিক্ষণীয় বা গ্রহণীয় কিছুই নেই। বর্তমান ভারত প্রবন্ধে তিনি প্রশ্ন রেখেছেন, তবে কি আমাদের পাশ্চাত্ত্য জগৎ হইতে শিখিবার কিছুই নাই?' তিনি স্পষ্টই বলেন যে আমরা সম্পূর্ণ নই এবং আমাদের সমাজ সর্বতোভাবে নিশ্ছিদ্র নয়। সুতরাং আমাদের শেখার অনেক আছে এবং সে জন্য আমাদের অবশ্যই যত্নশীল হতে হবে। পশ্চিমী সভ্যতার শ্রেষ্ঠ দিকগুলি যেমন বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা ও নিয়মানুবর্ত্তিতার আদর্শকে তিনি ভারতীয় জনজীবনে গ্রহণের কথা বলেছেন।

বস্তুতঃপক্ষে স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন প্রকৃত জাতীয়তাবাদী আদর্শের পূজারী। প্রকৃত জাতীয়তাবাদী আদর্শ অনুযায়ী প্রতিটি জাতি অন্য জাতির গুণ ও বৈশিষ্ট্যকে গ্রহণ করে তাকে নিজের সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল অনুযায়ী প্রয়োগ করতে পারে। তবে প্রতিটি জাতিই নিজস্ব মৌলিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সচেতন থাকবে এবং এই বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুন্ন রাখতে যত্নশীল হবে।

স্বামী বিবেকানন্দের এই প্রকৃত জাতীয়তাবাদের আদর্শ ছিল আন্তর্জাতিকতার আদর্শের অনুসারী। বৈদান্তিক বিবেকানন্দের সুগভীর মানবতাবোধ কেবল মাত্র স্বদেশের সীমার মধ্যে গন্ডীবদ্ধ থাকে নি। তাঁর মানবতাবোধ ছিল বিশ্বজনীন। প্রতিটি মানুষের মধ্যে এই বিশ্বজনীন মানবতাবোধ জাগ্রত হলে গড়ে উঠবে বিশ্বচেতনার অনুভূতি। এই বিশ্বচেতনার অনুভূতিই হল আন্তর্জাতিকতার মূলমন্ত্র। বাণী ও রচনার দ্বিতীয় খন্ডে তিনি বলেছেন, ''ক্রমশঃ জাতিতে মিলন হইতেছে – আমার নিশ্চয় ধারণা, এমন একদিন আসিবে, যখন জাতি বলিয়া কিছু থাকিবে না - জাতিতে জাতিতে প্রভেদ চলিয়া যাইবে। আমরা ইচ্ছা করি বা না করি; আমরা যে একত্বের দিকে অগ্রসর হইতেছি, তাহা একদিন না একদিন প্রকাশিত হইবেই হইবে''। বিবেকানন্দের আন্তর্জাতিকতার ধারণার মূলেও ছিল তাঁর অদ্বৈত-বেদান্ত দর্শন। তিনি বলেন, ''সর্বপ্রাণীর একত্ব বেদান্তের একটি প্রধান বিষয়। অজ্ঞান আর কিছু নায়, বহুত্বের ধারণা। . . . . যদি ভিতরে প্রবেশ করো তবে এই একত্ব দেখতে পাবে - মানুষে মানুষে একত্ব, উচ্চ-নীচে একত্ব, ধণী দরিদ্রে একত্ব, দেবতা মনুষ্যে একত্ব।''

৩৮.৩ সামাজিক ন্যায়

অদ্বৈত দর্শন ও ব্যবহারিক বেদান্তের প্রবক্তা স্বামী বিবেকানন্দ মানুষের মধ্যেই দেখেছেন দেবতাকে। সকল প্রকার অন্যায়ের শোষণশৃংখল থেকে মুক্ত করে মানুষকেতার মনুষ্যত্বের পূর্ণ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করাই ছিল তাঁর জীবনের মহান ব্রত। সত্যদ্রষ্টা চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ এ কথা উপলব্ধি করেছিলেন যে বৈষম্যযুক্ত সমাজব্যবস্থায় ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার কল্পনা এক স্বপ্নমাত্র। নিপীড়িত মানুষেব মুক্তির একমাত্র পথ হল সমাজের

বুক থেকে সর্বপ্রকার শোষণের অবসান ঘটানো এবং একমাত্র এইরূপে শোষণহীন সমাজেই ন্যায়বিচারের আদর্শের সার্থক রূপায়ণ সম্ভব। এই শোষণমুক্ত, ন্যায়বিচার ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বিবেকানন্দের চিন্তার মধ্যে দিয়ে তাঁর রাজনীতিক ধ্যান ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়।

বিবেকানন্দ সাধারণ মানুষকেই রাষ্ট্রশক্তির আধার বলে মনে করতেন। 'বর্তমান ভারত' প্রবন্ধে তিনি ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে ভারতের সাধারণ মানুষের শোষণ ও অবহেলার চিত্রটি তুলে ধরেছেন। 'বর্তমান ভারত' প্রবন্ধে তাঁর বক্তব্যকে অনুসরণ করে বলা যায় যে পুরোহিত প্রাধান্যকালে রাজা রাজ্যরক্ষা, নিজেদের বিলাস, বন্ধুদের পুষ্টি এবং পুরোহিত-কুলের তুষ্টির জন্য প্রজাদের শোষণ করতেন। সে শোষণ ক্ষত্রিয়-প্রাধান্যের সময়েও অব্যাহত ছিল। করগ্রহণে বা রাজ্যরক্ষায় প্রজাদের মতামত গ্রহণের প্রশ্ন ছিল না। সমাজ চলেছিল ঋষিবাক্য, শাস্ত্রবাক্যের দ্বারা। বিবেকানন্দের মতে, এই সাধারণ মানুষই হল সমাজশক্তির উৎসস্থল। তিনি বলেন, 'সমাজের নেতৃত্ব বিদ্যাবলের দ্বারাই অধিকৃত হউক, বা বাহুবলের দ্বারা, বা ধন-বলের দ্বারা, সে শক্তির আধার প্রজাপুঞ্জ। যে নেতৃসম্প্রদায় যত পরিমাণ এই শক্ত্যাধার হইতে আপনাকে বিশ্লিষ্ট করিবে। তাহা তত পরিমাণে দুর্বল,' তিনি আরও বলেন যে পৌরোহিত্য শক্তি এক সময় শক্তির আধার জনসাধারণ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করেছিল বলেই প্রজাশক্তির সাহায্যে রাজারা পুরোহতিদের পরাস্ত করতে পেরেছিল। রাজারাও নিজেদের সম্পূর্ণ স্বাধীন মনে করে প্রজাশক্তি ও নিজেদের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান তৈরী করেছিল। তার ফলে প্রজাশক্তির সাহায্যে বণিকেরা রাজাদের নিহত করে অথবা খেলার পুতুল বানিয়ে রাখে। এরপর বণিকেরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করেছে এবং জনসাধারণের সাহায্য অনাবশ্যক মনে করে জনসাধারণ থেকে নিজেদের দূরে রাখার চেষ্টা করেছে এবং এটাই হল বণিক শ্রেণীর মৃত্যুর কারণ। বিবেকানন্দের প্রশ্ন, 'আর যাহাদের শারীরিক পরিশ্রমে ব্রাহ্মণের আধিপত্য, ক্ষত্রিয়ের ঐশ্বর্য ও বৈশ্যের ধনধান্য সম্ভব, তাহারা কোথায়?' সত্যদ্রষ্টা ঋষির মতই তিনি অমোঘ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে পৃথিবীতে কালক্রমে শূদ্রশাসন দেখা দেবে। 'তথাপি এমন সময়ে আসিবে যখন শূদ্রত্ব সহিত শূদ্রের প্রাধান্য হইবে; . . . তাহারই পূর্বাভাসচ্ছটা পাশ্চাত্ত্য জগতে ধীরে ধীরে উদিত হইতেছে, এবং সকলে তাহার ফলাফল জানিয়া ব্যাকুল। সোস্যালিজম্, এনার্কিজম, নাইহিলজম প্রভৃতি সম্প্রদায় এই বিপ্লবের অগ্রগামী ধ্বজা।'

শূদ্র শাসনকে জানিয়ে তিনি বলেন যে অপর কয়টি প্রথাই অর্থাৎ পুরোহিত, শক্রিয় ও বৈশ্যশাসন জগতে চলেছে, পরিবেশে সেগুলির ত্রুটি ধরা পড়েছে। অন্ততঃ আর কিছুর জন্য না হলেও অভিনবত্বের দিক থেকে এটিরও একবার পরীক্ষা করা যাক। একই লোক চিরকাল সুখ বা দুঃখ ভোগ করবে, তার চেয়ে সুখদুঃখটা পর্যায়ক্রমে সকলের মধ্যে বিভক্ত হতে পারে, সেইটাই ভাল। তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে শূদ্রযুগ প্রথমে আসবে রাশিয়া অথবা চীনে। ভারতের অভ্যুত্থান তার পরেই। কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল নবভারতের আবাহণমন্ত্র, 'নতুন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটীর ভেদ করে, বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে বাজার থেকে।' জাতির মেরুদন্ড কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও সমবেদনা জানিয়ে তিনি বলেণ, 'ঐ যারা চাষাভূষা, তাঁতি-জোলা, ভারতের নগণ্য মানুষ, তারাই আবহমান কাল ধরে নীরবে কাজ করে যাচ্ছে, তাদের পরিশ্রমের ফলও তারা পাচ্ছে না। . . . ভারতের চিরপদদলিত শ্রমজীবী — তোমাদের প্রণাম করি।'

৩৮.৩.১ সমাজতান্ত্রিক চিন্তা

১৮৯৬ সালের ১লা নভেম্বর মেরী হেলকে লেখা চিঠিতে তিনি বলেন, 'I am a Socialist not because I think it is a perfect system but half a loaf is better than no bread.' অর্থাৎ 'আমি নিজেকে সমাজতন্ত্রী মনে করি। ঐ পদ্ধতি নিখুঁত বলে আমি সমাজতন্ত্রী নই, কিন্তু কিছু না থাকার চেয়ে ওর দ্বারা কিছু তো পাওয়া যাবে।' স্পষ্টতঃই তিনি সমাজতন্ত্রকে কোন আদর্শ সমাজব্যবস্থা বলে মনে করেন নি। কিন্তু তিনি এ কথা উপলব্ধি করেছিলেন যে সমকালীন আংশিক সংস্কার সমূহের দ্বারা ভারতের লক্ষ লক্ষ অবহেলিত দরিদ্র মানুষের অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব নয়। তিনি বলেন, 'সমস্ত ত্রুটির মূল এইখানে সত্যকার জাতি, যারা কুটীরে বাস করে, তারা তাদের ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্ব ভুলে গেছে। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টার্ণ-প্রত্যেকের পায়ের তলায় পিষ্ট হতে হতে তাদের মনে এই ধারণা জন্মেছে যে ধনীর পদতলে নিষ্পেষিত হবার জন্যই তাদের জন্ম।' ভারতের প্রথম সমাজতন্ত্রী স্বামী বিবেকানন্দ সর্বপ্রথম জাতির মূল সমস্যাটির উপর আলোকপাত করেন। সে সমস্যা হল অশিক্ষা ও দারিদ্র্যের সমস্যা।

বিবেকানন্দের লক্ষ্য ছিল অশিক্ষা ও দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত- বৈষম্যহীণ শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা। এই সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন হ'ল সকল মানুষের সমান অধিকার। এই সমান অধিকারের দাবীতে তিনি বলেন, 'একচেটিয় অধিকারের -একচেটিয়া দাবীর ছিল চলিয়া গিয়াছে।' 'বিশেষ অধিকারের ধারণা মনুষ্য জীবনের কলঙ্ক'। তাঁর মতে, অন্যকে বঞ্চিত করে নিজে সুবিধা ভোগ করার নামই অধিকারবাদ। তিনি বলেন, 'এই অধিকার-তারতম্যকে প্রচন্ড আঘাত করে উঠিয়ে দিতে হবেই। আমরা চাই কারো কোন বিশেষ অধিকার থাকবে না, অথচ প্রত্যেক ব্যক্তির উন্নতির সমান সুযোগ থাকবে।' বিবেকানন্দ এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন যে মানুষে মানুষে সম্পূর্ণ সাম্য কোনদিনই সম্ভব নয়। মানুষের বাহ্যিক রূপ, শক্তি ও স্বাভাবিক সামর্থের মধ্যে পার্থক্য অবশ্যই থাকবে। তাই তিনি বলেন, 'বৈচিত্র্যকে নষ্ট না করে সাম্য ও ঐক্যের দিকে অগ্রসর হওয়াই একমাত্র কাজ। এই বৈচিত্র্যে একত্বের ধারণাই সাম্যবাদী বিবেকানন্দের চিন্তাধারার অনন্য-সাধারণ বৈশিষ্ট্য। তাঁর চিন্তায় ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয়ের গুরুত্ব স্বীকৃত। তিনি বলেন, 'সমষ্টির জীবনে ব্যষ্টির জীবন, সমষ্টির সুখে ব্যষ্টির সুখ, সমষ্টি ছাড়িয়া ব্যষ্টির অস্তিত্বই অসম্ভব, এ অনন্ত সত্য জগতের মূল ভিত্তি,' সমষ্টির গুরুত্ব স্বীকার করলেও তিনি সমষ্টির যূপকাষ্ঠে ব্যক্তিসত্তাকে বলি দিতে রাজী ছিলেন না। তাঁর মতে, ব্যষ্টির স্বার্থরক্ষার জন্যই সমষ্টির কল্যাণের দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। বিবেকানন্দের চিন্তাধারায় ব্যষ্টি ও সমষ্টি, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্র সমন্বয় সূত্রে গ্রথিত। সমষ্টি ও ব্যষ্টি স্বার্থের সমন্বয়ের মধ্যে দিয়ে তিনি চেয়েছিলেন ব্যক্তিসত্তার পূর্ণ বিকাশ। নিপীড়িত মানবাত্মার মুক্তির জন্যই তিনি চেয়েছিলেন সামাজিক বিপ্লব। কিন্তু বিপ্লব বলতে তিনি রক্তক্ষয়ী শ্রেণীসংগ্রামকে বোঝেন নি। তাঁর দৃষ্টিতে বিপ্লব হ'ল চেতনার বিপ্লব মানুষের মূল্যবোধের আমূল পরিবর্তন এবং তার মধ্যে দিয়ে জনগণের অধিকার লাভ। শূদ্র জাগরণ যে অপ্রতিরোধ্য সে কথা স্বামীজী জানতেন। কিন্তু ভারতের মাটিতে হিংসার পথে রক্তক্ষয়ী বিপ্লব তাঁর অভিপ্রেত ছিল না। সেই কারণেই তিনি একটি গঠনমূলক পথ উদ্ভাবনে ব্রতী হয়েছিলেন। উচ্চবর্ণের জাতিগুলিকে তিনি বারঁবার সতর্ক করে দিয়েছেন। নিম্নবর্ণের মানুষদের

সুখদুঃখের অংশীদার হয়ে তাদের পাশে এসে দাঁড়াতে এবং তাদের সহযাত্রী হতে তিনি তাদের আহ্বান জানিয়েছেন। শ্রেণীসংগ্রাম নয়, পারস্পরিক প্রীতিসুলভ সহযোগিতা ও আদান প্রদানের মাধ্যমে শ্রেণী-সমন্বয়ই ছিল তাঁর সমাজতান্ত্রিক চিন্তার চরম লক্ষ্য।

বিবেকানন্দের সমাজতান্ত্রিক চিন্তা মার্কসবাদের থেকে স্বতন্ত্র প্রকৃতির। মার্কসীয় চিন্তাধারার ভিত্তি হ'ল ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। বিবেকানন্দ ইতিহাসের দ্বান্দ্বিকতাকে অস্বীকার করেন নি। কিন্তু তিনি বস্তুবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না। দ্বিতীয়ত, মার্কসবাদের একটি অন্যতম দিক হ'ল শ্রেণীসংগ্রাম। বিবেকানন্দ শ্রেণী সংগ্রামের পরিবর্তে শ্রেণী সহযোগিতায় বিশ্বাসী ছিলেন। তৃতীয়ত, মার্কসবাদ অনুসারে ধর্ম হ'ল আমজনতার আফিস্। কিন্তু বিবেকানন্দের কাছে ধর্ম ছিল সমাজগঠনের ঐক্যসূত্র। তিনি বলেন যে আমাদের কার্যের মূল কথাটি হ'ল ধর্মে এক বিন্দু আঘাত না করে জনসাধারণের উন্নতিবিধান। ধর্মের বহিরঙ্গ বা আনুষ্ঠানিক দিকটি'কে তিনি কখনই বড় করে দেখেন নি। তাঁর ধর্মচেতনার ভিত্তি হ'ল অদ্বৈতবাদ। অদ্বৈতবাদের মূল কথা হ'ল ব্রহ্মের সঙ্গে মানুষের একাত্মতা। সমাজজীবনে এই বৈদান্তিক দর্শনের রূপায়ণই ছিল বিবেকানন্দের চিন্তার সারমর্ম। তিনি একথা উপলব্ধি করেছিলেন যে নুইয়ে পড়া জাতিকে জাগিয়ে তোলার জন্য প্রয়োজন হ'ল আত্মবিশ্বাসের। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ব্রহ্ম বিরাজ করেন, প্রত্যেক মানুষই হ'ল ব্রহ্মের অংশ একথা মানুষকে বোঝাতে হবে। মানুষের মধ্যে দেবতার এই উপলব্ধি মানুষের মনে জাগিয়ে তোলে আত্মবিশ্বাস। এই উপলব্ধিই জাতপাত, সম্প্রদায়, ধর্ম নির্বিশেষে মানুষে মানুষে গড়ে তোলে ঐক্যের বন্ধন। প্রতিটি মানুষকে আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ করা এবং মানুষের হৃদয়বত্তার প্রসারের মাধ্যমে সমগ্র দেশবাসীকে ভ্রাতৃত্বের ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। তাই জড়বাদ নয়, অধ্যাত্মবাদ ছিল বিবেকানন্দের সমাজতন্ত্রের ভিত্তি। রক্তক্ষয়ী বিপ্লব নয়, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সহযোগিতাই ছিল তাঁর শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলার পথ। বিবেকানন্দের সমাজতন্ত্রবাদ ভারতীয় ঐতিহ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

বিবেকানন্দ বুঝেছিলেন যে শোষণমুক্ত সমাজ গড়ে তোলার পথে প্রধান অন্তরায় হ'ল দারিদ্র্য, অশিক্ষা, ধর্মীয় অনাচার ও শ্রেণীশোষণ। এই অন্তরায়গুলি দূর করে যে নতুন সমাজ গড়ে তোলার কথা তিনি চিন্তা করেছিলেন তার মূল কথা হ'ল প্রকৃত মানুষ গড়ে তোলা। সমাজ ও জাতির অগ্রগতির জন্য প্রয়োজন হ'ল ব্যক্তির সুস্থ, নীতিনিষ্ঠ ও সহৃদয় মন। সুস্থ ও নীতিনিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার জন্য তিনি শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন, শিক্ষা বলতে তিনি পুঁজিগত বিদ্যা অর্জনের কথা বলেন নি। শিক্ষা বলতে বোঝায় মানুষের অন্তর্নিহিত সহজাত গুণাবলীর যথোচিত বিকাশ। চরিত্রগঠন তথা মানুষ গড়ে তোলাই হ'ল শিক্ষার লক্ষ্য।

বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে এ সত্যটিও প্রতিভাত হয়েছিল যে ভারতে জাতীয় জাগরণের জন্যে প্রয়োজন হল নারী-জাগরণ। তিনি বলেন, "স্ত্রীজাতির অভ্যুদয় না হইলে ভারতের কল্যাণের সম্ভাবনা নাই। একপক্ষ পক্ষীর উত্থান সম্ভব নহে।' স্ত্রীজাতির শিক্ষা এবং স্বাবলম্বনের উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তাঁর চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে নারী জাগরণের অন্যতম সমর্থক হলেও তিনি ভারতীয় সংস্কৃতি, সভ্যতা ও ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই আদর্শ ভারতীয় নারী চরিত্র গঠনের কথা বলেন।

৩৮.৪ ধর্ম ও ধর্মসহিষ্ণুতার আদর্শ

স্বামী বিবেকানন্দের বলিষ্ঠ চিন্তাধারার অন্যতম দিক ছিল তাঁর ধর্ম সহিষ্ণুতার ধারণা। ১৮৯৩ সালে চিকাগো ধর্ম মহাসম্মেলনে তাঁর ভাষণ থেকে তাঁর ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি বলেন যে কেউ যদি মনে করে যে কেবলমাত্র তাঁর ধর্মের অস্তিত্ব বজায় থাকবে এবং অপর সকল ধর্মের বিনাশ ঘটবে তাহলে তিনি করুণার পাত্র। শীঘ্রই প্রত্যেক ধর্মের পতাকাতলে লেখা হবে 'বিবাদ নয়, সহায়তা; বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাব গ্রহণ; মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি। ধর্মকে তিনি মানুষের মুক্তির উপায় হিসেবে গ্রহণ করতে বলেছেন। নিছক আচারসর্বস্ব, মনুষ্যত্ব বিমুখ কোনো ধর্মাচরণকেই তিনি প্রশ্রয় দেননি। জীবের কল্যাণ সাধন হয়না যে ধর্মে, সেই ধর্মকে তিনি নির্দ্বিধায় পরিত্যাগ করতে বলেন। ক্ষুধিতের অন্নদাতা, নিরাশ্রয়ের আশ্রয় নইলে ঈশ্বরের অস্তিত্বেরও অর্থ নেই। 'জীবকে শিবজ্ঞানে' সেবা করার মহামন্ত্র তিনি দিয়েছেন। কেন না, প্রতিটি মানুষের মধ্যেই রয়েছে ঈশী সত্তা, এই অন্তর্নিহিত (divinity already in man) ঈশ্বরের জাগরণেই তার আধ্যাত্মিক মুক্তি। ভারতের অধ্যাত্মসাধনার এই হল শাশ্বত বাণী। এই সমুন্নত ধর্মভাবনার সামনে কোনও ধর্মেরই কোনও হানি হওয়ার, ক্ষুন্ন হওয়ার প্রশ্ন ওঠেনা। এমনকি এই ধর্ম-ভাবনায় মানুষের ঐহিক প্রয়োজনও যথাযথ গুরুত্ব পেতে পারে। সবচেয়ে বড়োকথা, মানুষকে স্বাবলম্বী হ'তে, আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হ'তে, আত্মশক্তির জাগরণ ঘটাতে স্বামীজী সকলকেই আহ্বান জানিয়েছেন নির্ভীক হওয়ার, বলিষ্ঠ হওয়ার, অন্যায়ের মুখোমুখি দাঁড়ানোর। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ' উপনিষদের এই বানী সদা জাগরূক থাকা দরকার সকলের মনে। বলা বাহুল্য, ভারতবর্ষ যেহেতু ধর্মভাবাপন্ন মানুষের দেশ, বহু ধর্মের দেশ, প্রাচীন সংস্কারের দেশ, সেহেতু এমনই একটি ধর্মভাবনার অতিশয় প্রয়োজন, যা আধুনিক জগতের সমস্ত চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার শক্তি দিতে পারে। শিকাগো মহাধর্মসম্মেলনে (১৮৯৩) তাই বিশ্বব্যাপী সাড়া জেগেছিল স্বামীজীর ধর্মপ্রবচন শুনে। এ ধর্ম মানুষের ধর্ম। কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের নয়।

সাধারণভাবে রাজনীতিজ্ঞ বলতে যা বোঝায় স্বামী বিবেকানন্দ তা ছিলেন না। তাথাপি ভারতের রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে তাঁর স্থান এবং অবদান অবিস্মরণীয়। পরাধীন অবদমিত জাতির বুকে তিনি জাগিয়ে তুলেছিলেন ভারতচেতনা। তিনি জগৎসভায় ভারতকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করে ভারতবাসীকে আত্মসচেতন করে তোলেন। স্বামী লোকেশ্বরানন্দ বলেন, "হীনম্মন্যতা যখন ভারতবাসীকে পেয়ে বসেছিল এবং নেতারা ভাবছিলেন পাশ্চাত্যের অনুকরণের ভিতর দিয়েই ভারতে মুক্তি আসবে, জাতির সেই দুঃসময়ের দিনে স্বামীজী সবাইকে শুনালেন ভারত আদৌ নিঃস্ব নয়, তারও জগতকে অনেক দেবার আছে এবং সে অনেক দিয়েছেও। . . . . . তাঁর ভিতর দিয়ে ভারত নিজেকে চিনেছে ও জেনেছে, নিজের ঐতিহ্যকে শ্রদ্ধা করতে শিখেছে।" তিনি প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ না করলেও তাঁর চিন্তাধারা ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের দিকচিহ্ন হিসেবে কাজ করেছে। তাঁর চিন্তার ভাবভূমিতেই জন্ম নিয়েছিল চরমপন্থী বিপ্লবী কর্মতৎপরতা। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পটভূমিতে তিনি এমন একটি দৃঢ়তা আনতে পেরেছিলেন যা ছিল নিতান্তই ভারতীয়। একই সঙ্গে তিনি ছিলেন বিশ্বজনীন মহামানব যাঁর আন্তর্জাতিকতার

ধারণা সকল জাতির মহামিলনের পথের নিশানা বহন করে। তিনি ছিলেন শান্তিপূর্ণ পথে শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার পথপ্রদর্শক। জাতপাত, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন গড়ে তুলে তিনি জাতীয় সংহতির ধারণাকে দৃঢ়ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। সর্বোপরি ধর্মান্ধতা নয়, পরধর্ম সহিষ্ণুতা ছিল তাঁর চিন্তার বিশিষ্ট দিক। স্বামী বিবেকানন্দের বিস্তার আবেদন ভারতবাসীর কাছে চিরকালীন আবেদন। অতীতের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে ভারতপথিক বিবেকানন্দ ভবিষ্যতেও ভারতবাসীকে স্বদেশপ্রেমে উজ্জীবিত করবেন। নতুন ভারত গড়ে তোলার পথে স্বামী বিবেকানন্দের অমর বাণী ভারতবাসীর চিরকালের পাথেয়।

৩৮.৫ সারাংশ

স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারা তাঁর সমসাময়িক ভারতে রাজনীতিক চিন্তার ক্ষেত্রে ছিল এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। প্রচলিত উদারপন্থী ভাবধারার বিরুদ্ধে বিবেকানন্দের চিন্তা ছিল এক বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। তিনি আবেদন-নিবেদনের রীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর বাণী ছিল আত্মশক্তি উন্মেষের অগ্নিবাণী। আত্মগ্লানি ও হতাশায় নিমজ্জমান পরাধীন ভারতবাসীর কাছে স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন এক নতুন যুগের ও নতুন পথের দিশারী।

বিবেকানন্দের চিন্তাধারার বিশিষ্ট দিক ছিল তাঁর জাতীয়তাবাদের ধারণা। তিনি জাতীয়তাবাদকে এক আধ্যাত্মিক পটভূমির উপর স্থাপন করেছিলেন। পরাধীনতার শৃংখল মোচনের জন্যে তিনি দেশকে মাতৃরূপে বন্দনা করে দেশবাসীর হৃদয়ে স্বদেশ প্রেমের আবেগ সঞ্চার করেছিলেন। তাঁর জাতীয়তাবোধের মধ্যে ছিল অন্ধ অনুকরণ বর্জন এবং নিজ জাতির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য প্রকাশের চেষ্টা। তিনি মনে করতেন যে প্রত্যেক জাতিরই নিজস্ব কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। আমাদের জাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্য হল আধ্যাত্মিক শক্তি। অদ্বৈত দর্শন ও বেদান্তে বিশ্বাসী বিবেকানন্দ সর্বমানবের মধ্যে দেখেছেন ব্রহ্মের প্রকাশ। এই উপলব্ধি থেকেই এসেছে তাঁর সর্বজনীন মানবতাবোধ। এই সর্বজনীন মানবতাবোধের ভিত্তিভূমিতে দাঁড়িয়েই তিনি সমগ্র ভারতবাসীকে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতিতে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। তিনি দেশবাসীকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করলেও তাঁর জাতীয়তাবোধ অন্ধ স্বজাতি বাৎসল্য ছিল না। তিনি কখনই বিজাতি-বিদ্বেষ পোষণ করেন নি । তিনি ছিলেন প্রকৃত জাতীয়তাবাদী আদর্শের পূজারী। তাঁর এই প্রকৃত জাতীয়তাবাদের আদর্শ ছিল আন্তর্জাতিকতার আদর্শের অনুসারী।

বিবেকানন্দ ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে এক শোষণমুক্ত সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। সাধারণ মানুষকেই তিনি রাষ্ট্রশক্তির আধার বলে মনে করতেন। 'বর্তমান ভারত' প্রবন্ধে তিনি ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে সাধারণ মানুষের শোষণ ও অবহেলার চিত্রটি তুলে ধরেছেন। সত্যদ্রষ্টা বিবেকানন্দ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে পৃথিবীতে কালক্রমে শূদ্রশাসন দেখা দেবে। তিনি নিজেকে সমাজতন্ত্রী বলেছেন। অশিক্ষা ও দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত এক শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। তিনি সকল মানুষের সমান অধিকারের সমর্থক ছিলেন। বিশেষ অধিকারের ধারণাকে তিনি মানবজীবনের কলঙ্ক বলে মনে করতেন।

বিবেকানন্দের চিন্তায় ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয়ের গুরুত্ব স্বীকৃত। সমষ্টি ও ব্যষ্টি স্বার্থের সমন্বয়ের মধ্যে দিয়ে তিনি চেয়েছিলেন ব্যক্তি সত্তার পূর্ণ বিকাশ। নিপীড়িত মানবত্মার মুক্তির জন্যেই তিনি চেয়েছিলেন সামাজিক বিপ্লব। বলতে তিনি রক্তক্ষয়ী শ্রেণী সংগ্রামের বোঝেন নি।

বিবেকানন্দের মূল কথা ছিল প্রকৃত মানুষ গড়ে তোলা। শিক্ষা বলতে তিনি পুঁজিগত বিদ্যা অর্জনের কথা বলেন নি। শিক্ষা বলতে বোঝায় মানুষের অন্তর্নিহিত সহজাত গুণাবলীর যথোচিত বিকাশ।

বিবেকানন্দের চিন্তাধারার বিশিষ্ট দিক ছিল তাঁর ধর্মনিরপেক্ষতার, ধর্ম সহিষ্ণুতার, ধর্মমিলনের ধারণা। এ চিন্তার আবেদন তাই চিরকালীন।

৩৮.৬ অনুশীলণী

১। স্বামী বিবেকানন্দের জাতীয়তাবাদ সম্পর্কিত ধারণা বিশ্লেষণ করুন।

২। সামাজিক ন্যায় সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের ধারণা ব্যাখ্যা করুন।

৩। কী অর্থে স্বামী বিবেকানন্দ সমাজতন্ত্রকে গ্রহণ করেছিলেন ?

৪। 'শূদ্রের জাগরণ' বলতে স্বামীজী কী বুঝিয়েছেন ?

৫। স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারার বিশিষ্ট দিকগুলি আলোচনা করুন।

৩৮.৭ গ্রন্থপঞ্জী

১। স্বামী রঙ্গনাথানন্দ : স্বামীজীর স্বাধীনভারতের স্বপ্ন, উদ্বোধন, ১৯৯২

২। সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় : বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা, সুবর্ণরেখা, ১৯৬৮ (১ম সংস্করণ)

৩। Dr. Subodh Chandra Sengupta : Swami Vivekananda and Indian Nationalism, Samsad 1984.

৪। Dr. R.K. Dasgupta : Swami Vivekananda's Vedantirc : Socialism RMIC, Golpark,

৫। Swami Lokeswarananda : Swami Vivekananda, His Life and Message, RMIC, 1994.

একক ৩৯ ☐ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

গঠন

৩৯.০ উদ্দেশ্য
৩৯.১ প্রস্তাবনা
৩৯.২ সংক্ষিপ্ত জীবনী
৩৯.৩ বঙ্কিম চিন্তায় বিবিধ প্রভাব
৩৯.৪ বঙ্কিমচন্দ্রের রাজনীতি ও সমাজ ভাবনা
৩৯.৫ বঙ্কিমচন্দ্র ও জাতীয়তাবাদ
৩৯.৬ বঙ্কিমচন্দ্র ও সাম্য
৩৯.৭ সারাংশ
৩৯.৮ অনুশীলণী
৩৯.৯ গ্রন্থপঞ্জী

৩৯.০ উদ্দেশ্য

এই এককটিতে যা আলোচিত হবে তার থেকে আমরা বুঝতে পারব :

- সমাজ ও রাজনীতি বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের ধ্যাণধারণা এবং তাঁর ওপর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যচিন্তার প্রভাব;
- জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে বঙ্কিমের পর্যালোচনা;
- সামাজিক সাম্য ও অসাম্য সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণ;

৩৯.১ প্রস্তাবনা

ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনা থেকেই ভারতবর্ষে ইংরেজী শিক্ষিত উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের সংস্পর্শে আসায় তাঁদের মনে সামাজিক ন্যায়বিচার ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পায় ও নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষা, মনন, শিল্প ও সাহিত্যের জগতেও নতুন চিন্তাধারার উন্মেষ ঘটে। এই নবজাগরণের পরিবেশে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্য ও বাঙালীর জাতীয় জীবনে এক নতুন প্রাণের বার্তা নিয়ে আবির্ভূত হন। সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম থেকে শুরু করে সমাজতত্ত্ব, সাম্য, মানবতা, স্বদেশপ্রীতি ইত্যাদি বিচিত্র বিষয়ে তিনি যে গভীর বিশ্লেষণ-ধর্মী মতামত প্রকাশ করেন তার প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। জাতীয়তাবোধ উন্মেষেও বঙ্কিমচন্দ্রের ভূমিকা বিশেষভাবে স্মরণীয়। স্বাদেশিকতাবোধ

জাগ্রত করার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক কল্যাণ, দরিদ্র জনসাধারণের জীবনযাত্রার উন্নতি, সমানাধিকার, নারীজাতির মর্যাদা প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে তিনি অক্লান্তভাবে তাঁর সাহিত্যপ্রতিভাকে নিয়োজিত করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র হলেন সেই বিরল প্রতিভা যাঁর মধ্যে আমরা পাশ্চাত্য আধুনিকতা ও যুক্তিবাদ এবং ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য ও সনাতন হিন্দু ধর্মের পুনরুজ্জীবনের এক অসামান্য মেলবন্ধন ঘটতে দেখি। তাঁর সাহিত্যরচনা ও কর্মজীবনের প্রায় দেড়শতক অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও সমাজ ও রাজনীতি আলোচনার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র আজও সমান প্রাসঙ্গিক।

৩৯.২ সংক্ষিপ্ত জীবণী

বঙ্কিমচন্দ্রের বহুমুখী প্রতিভার ব্যপ্তি, বিস্তৃতি ও পরিণতি লাভ করেছিল তাঁর কালজয়ী উপন্যাস সমূহে এবং জীবনলব্ধ তথ্য ও প্রত্যয় সমৃদ্ধ তাঁর অসংখ্য প্রবন্ধে। এই অনন্যসাধারণ প্রতিভার জন্ম ১৮৩৮ খ্রিষ্টাব্দের ২৬শে জুন তারিখে ২৪ পরগণা জেলার কাঁটালপাড়া গ্রামে। তাঁর পিতা শ্রী যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের ডেপুটি কালেক্টর। তিনি ফারসী ও ইংরেজীতে সুপন্ডিত ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রেরা চার ভাই — শ্যামাচরণ, সঞ্জীবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্র। এঁরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে যশস্বী হয়েছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র বাল্যকালে অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। পিতা যাদবচন্দ্র তাঁকে মেদিনীপুরে ইংরেজী স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন। এরপর হুগলী কলেজেও বঙ্কিম ইংরেজী শিক্ষা লাভ করেন। এই সময় বঙ্কিমের প্রিয় বিষয় ছিল ইতিহাস। বহুবিস্তৃত ইতিহাস চর্চার পরিচয় পরবর্তীকালে তাঁর রচিত উপন্যাস ও প্রবন্ধে আমরা ব্যাপকভাবে পাই। বঙ্কিমচন্দ্র সেকালের বিখ্যাত শিক্ষকদের কাছে বাংলাভাষায় পাঠ নিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সংস্কৃতচর্চাও করেছিলেন। তিনি চতুষ্পাঠীতে গিয়ে সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিতদের নিকট ব্যাকরণ, সাহিত্য, দর্শন, জ্যোতিষ এবং বিভিন্ন শাস্ত্রাদি অধ্যয়ণ করতেন। কর্মজীবনেও বঙ্কিম এই চর্চা বজায় রেখেছিলেন। তিনি দুবছর প্রেসিডেন্সি কলেজে আইন নিয়ে পড়াশোনা করেছিলেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম বি. এ পাশ করেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকাল অতিবাহিত হয়েছে ভক্তি, বিশ্বাস ও অধ্যাত্মবোধের পরিমন্ডলে। কাঁটালপাড়ায় তাঁর পিতৃগৃহে রাধাগোবন্দ জিউর নিত্যপূজা ও সেবা বঙ্কিমের মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিমের কর্মজীবন শুরু হয় যশোহরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে। এই সময় থেকে ১৮৯১ সাল পর্য্যন্ত তিনি মেদিনীপুর, খুলনা, বারুইপুর, ডায়মন্ডহারবার, বহরমপুর, বারাসাত, হাওড়া, হুগলী, আলিপুর প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে কর্মসূত্রে বদলি হয়েছেন। এই সময়কার বিচিত্র অভিজ্ঞতা, বিভিন্ন স্তরের মানুষকে কাছ থেকে দেখা, সবই তাঁর সাহিত্য সৃষ্টিতে অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে।

১৮৮৫ সালে বঙ্কিমচন্দ্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সভ্য হন। বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে ১৮৯২ সালে এন্ট্রান্স পরীক্ষার্থীদের জন্য 'বেংগলী সিলেকস্‌ন' প্রকাশ করেন। এই বছরেই তাঁকে 'রায়বাহাদুর' খেতাব দেওয়া হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র সৌখিন পুরুষ ছিলেন। পোষাক পরিচ্ছদে পরিচ্ছন্নতা ও পারিপাট্য রক্ষা করে চলতেন।

তিনি যদুভট্ট তানরাজ নামে এক বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞের কাছে সঙ্গীত চর্চা করেছিলেন। জ্যোতিষ গণনাও তাঁকে যথেষ্ঠ আকর্ষণ করত। বিজ্ঞানচর্চাতেও তাঁর অপার উৎসাহ ছিল।

এগারো বছর বয়সে বঙ্কিম প্রথম বিবাহ করেন। দশ বছর পর তাঁর প্রথম পত্নীর মৃত্যু ঘটে। ১৮৬০ সালে তিনি আবার বিবাহ করেন — হালিশহরের চৌধুরী বাড়ীর দ্বাদশ বর্ষীয়া কন্যা রামলক্ষ্মী দেবীকে।

১৮৫২ সালে 'সংবাদ-প্রভাকর' পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। তাঁর প্রথম উপন্যাস Rajmohon's Wife ইংরেজী ভাষায় রচিত। এর পরে বঙ্কিম ইংরেজীতে আর কোন উপন্যাস রচনা করেননি। তাঁর রচিত 'দুর্গশানন্দিনী'কেই প্রথম বাংলা উপন্যাসের মর্যাদা দেওয়া হয়। বঙ্কিমের উপন্যাসগুলিকে মোটামুটিভাবে তিনটি পর্বে ভাগ করা হয় —

প্রথম পর্ব — দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুন্ডলা ও মৃণালিণী;

দ্বিতীয় পর্ব — বিষবৃক্ষ, ইন্দিরা, যুগলাঙ্গুরীয়, চন্দ্রশেখর, রাধারাণী, রজণী, কৃষ্ণকান্তের উইল ও রাজসিংহ।

তৃতীয় পর্ব — আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী ও সীতারাম।

১৮৭২ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠকীর্তি 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার আবির্ভাব, বিভিন্ন বিষয়ে রচিত তাঁর অমূল্য প্রবন্ধগুলি 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত হত। আমাদের এই আলোচনায় তাঁর প্রবন্ধগুলিই হবে মূল ভিত্তি। ১৮৯৪ সালে এই মহান প্রতিভা চিরবিদায় গ্রহণ করেন।

৩৯.৩ বঙ্কিমচিন্তায় বিবিধ প্রভাব

ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে কোন নির্দিষ্ট যুগ বা কোন খ্যাতিমান ব্যক্তিত্বকে সঠিকভাবে জানতে গেলে কোন্ পরিবেশে বা কোন্ কোন্ সামাজিক শক্তির ক্রিয়ায় এবং ঘাত-প্রতিঘাতের তরঙ্গে তার আর্বিভাব তা অনুধাবন করা অপরিহার্য। বঙ্কিমচন্দ্র, ও তাঁর চিন্তাধারার সঠিক বিশ্লেষণ ও পূর্ণাঙ্গ পরিচয়ের জন্য তাঁর পূর্বগামী কালের পরিচয় আবশ্যক।

বঙ্কিমচন্দ্র যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন ভারতবর্ষের মাটিতে বৃটিশ শাসন দৃঢ় ভিত্তি পেতে শুরু করেছে এবং বঙ্কিম-পূর্ব কালকে আমরা একটি সমাজ-সংকটের কাল হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। এই সময় সনাতন ভাবধারা ও নতুন চিন্তাধারার মধ্যে সংঘাতের সূত্রপাত হয় এবং ভারতে ধীরে ধীরে এক নতুন ব্যক্তিসত্তা ও সংস্কৃতির আর্বিভাব ঘটতে থাকে। উনিশ শতকের প্রথমভাগে ভারতে মধ্যযুগীয় কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন শুরু হয় এবং এই আন্দোলনের ফলে ভারতে আধুনিক চিন্তাধারা ও সংগঠনের বিকাশ ঘটে।

এদেশের চিন্তানায়কগণ উদারনৈতিক, যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানাশ্রয়ী চিন্তাভাবনার প্রতি আকৃষ্ট হন। সচেতনতা ও নতুন দৃষ্টিভঙ্গী বিশেষভাবে গড়ে ওঠে বাংলার বিদগ্ধ সমাজে। সেকারণে অনেকেই এই সময়টিকে বাংলার রেনেসাঁস বা নবজাগরণের প্রারম্ভ বলে বর্ণনা করেন।

ছাত্র-অবস্থা থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র এক নিরপেক্ষ দর্শকের দৃষ্টি নিয়ে পারিপার্শ্বিক সমাজ ও রাজনীতির বিভিন্ন বিষয় ও ঘটনাকে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করেছেন। 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় কবিতা লেখার সুবাদে তিনি মধুসূদন দত্ত, ঈশ্বরগুপ্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি লেখকদের রচনার সঙ্গে পরিচিত হন।

রামমোহনের আধুনিক চিন্তাধারা, ধর্ম ও ইহজীবন সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ণ, দেবেন্দ্রনাথের খ্রীষ্টধর্মান্তকরণের বিরুদ্ধে আন্দোলন, আদি ব্রাহ্মসমাজের দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা, রাজনারায়ণ বসুর 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' পুস্তকটির প্রকাশ এ সমস্ত ঘটনাই নানাভাবে বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রভাবিত করেছিল। ডিরোজিও শিষ্যদের 'ইয়ং বেঙ্গল' আন্দোলন, 'সাধারণ জ্ঞানোপর্জিকা সভা', 'দেশ হিতৈষিণী সভা, তত্ত্ববোধিনী সভার, কার্যকলাপ, রাজেন্দ্রলালমিত্রের বিভিন্ন রচনা, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ বিষয়ক প্রস্তাব বঙ্কিমের মনে বিশেষ রেখাপাত করেছিল। কেশবচন্দ্র সেন সম্পর্কে বঙ্কিম অত্যন্ত শ্রদ্ধা পোষণ করতেন এবং তাঁকে 'শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের গুণভূষিত' বলে উল্লেখ করেছিলেন। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'হিন্দু প্যাট্রিয়টে' নীলকরদের অত্যাচার সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখে আলোড়ণ ফেলেছিলেন। 'নীলদর্পণ' নাটকের রচয়িতা দীনবন্ধু মিত্র ছিলেন বঙ্কিমের বিশিষ্ট বন্ধু। এই বন্ধুত্ব বঙ্কিমের সাহিত্য চর্চাকে বিশেষ সমৃদ্ধ করেছিল।

সমকালীন স্বাদেশিকতার চেতনাও বঙ্কিম মানসকে যথেষ্ট উদ্দীপ্ত করেছিল। দেশীয় শিল্পের পুনরুজ্জীবন এবং শরীরচর্চার জন্য নবগোপাল মিত্র 'হিন্দুমেলার' আয়োজন করেছিলেন। এই আয়োজন সারা দেশে যথেষ্ট উদ্দীপনার সঞ্চার করে। বঙ্কিম সাহিত্যের মাধ্যমে এই নবচেতনার প্রসার জাতীয়তাবোধের উদ্বোধনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল।

সরকারী চাকরীতে যোগদানের পর বিভিন্ন অঞ্চলে তিনি প্রত্যক্ষভাবে আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক কার্যকলাপ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন এবং সেই গবেষণালব্ধ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফল আমরা দেখতে পাই তাঁর রচিত বিভিন্ন প্রবন্ধ ও উপন্যাসে।

বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্য দর্শন এবং চিন্তারীতি দ্বারাও যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের মতই তাঁর প্রিয় পঠনীয় বিষয় ছিল ইউরোপীয় রেনেসাঁসের ইতিহাস। বহু প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাস চেতনার পরিচয় দিয়েছেন। ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে বিভিন্ন বিষয় আলোচনার রীতি আমাদের দেশে তুলনামূলকভাবে নতুন। এই রীতিটি বাংলা সাহিত্যে প্রচলন করেন অক্ষয়কুমার দত্ত এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্র। ইতিহাস ছাড়া ইউরোপে উদ্ভূত আরও দুটি বিষয় বঙ্কিমচন্দ্রকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। একটি অর্থনীতি, আর একটি রাজনীতি। 'বঙ্গদেশের কৃষক', 'সাম্য' এবং 'ভারতকলঙ্ক' প্রবন্ধে তিনটি বিষয়েরই সন্ধান মেলে। বাক্‌ল-এর History of Civilization in England এবং লেকি রচিত History of Rationalism in Europe' গ্রন্থ দুটি 'বঙ্গদেশের কৃষক' রচনাকালে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল।

কোঁৎ-এর প্রত্যক্ষ মানবতাবাদী জীবন-দর্শন বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজ-চিন্তাকে জাগ্রত করেছিল। লক্‌-এর অভিজ্ঞতাবাদী চিন্তাধারা, মঁতেস্কু, টেন প্রভৃতির জীবনদর্শন, হব্‌সের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, ডারউইনের খ্রীষ্টধর্ম বিরোধী ক্রমবিবর্তনবাদী বৈপ্লবিক চিন্তা এবং ভলতেয়ার, হিউম, রীড, রুশো, পেইন প্রভৃতি চিন্তানায়করা

বঙ্কিমকে প্রখর যুক্তিবাদের দিকে আকর্ষণ করেছিলেন। সাঁ সিঁমো, ফুৎরিয়ের, লুই ব্লাঁ প্রভৃতির সাম্যবাদী চিন্তা বঙ্কিমকে উদ্বুদ্ধ করেছিল 'সাম্য' গ্রন্থ রচনায়। তবে সাম্যচিন্তায় বঙ্কিমকে সবচাইতে বেশী প্রভাবিত করেছিলেন 'সাম্যাবতার রুশো'।

প্রবন্ধ রচনার প্রথম যুগে কোন পূর্ণ জীবনদর্শন আমরা বঙ্কিমের লেখায় পাইনা। জীবনের খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন দিকগুলিই তাঁর রচনার বিষয়বস্তু। এই বিচ্ছিন্ন চিন্তাগুলি পরবর্তীকালে একটি বৃহত্তর জীবন দর্শনের অঙ্গীভূত হয়ে ওঠে।

ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রকাশিত হয় দুটি গ্রন্থ, গ্রন্থকার রবার্ট সিলী, 'Ecce Homo' এবং 'Natural Religion'. সিলী খৃষ্টধর্মের একটি নতুন ব্যাখ্যা দিতে চেয়েছিলেন এবং culture বা সংস্কৃতিকে প্রায় ধর্মের বিকল্প হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন যীশুখৃষ্টের যুগোপযোগী এক মানবমূর্ত্তি গড়তে। বঙ্কিমচন্দ্রও অলৌকিকতাবর্জিত অনুশীলন তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন যার ভিত্তি ছিল যুক্তি। অনুশীলন ধর্মকে তিনি বলেছেন Doctrine of Culture. মহাভারতের কৃষ্ণের মধ্যে এই ধর্মের পূর্ণতাকে প্রত্যক্ষ করেছেন বঙ্কিম। তিনি বলেছিলেন। "কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করা এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে, তাঁহার মানবচরিত্র সমালোচন করাই আমার উদ্দেশ্য।"

বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক তথা মানবতাবাদী চিন্তায় যে জন ষ্টুয়ার্ট মিল, হার্বার্ট স্পেনসার এবং কোঁৎ-এর হিতবাদী এবং প্রত্যক্ষ মানবতাবাদী জীবনদর্শন ছায়া ফেলেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। ইউটিলিটারিয়ানদের প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায় বঙ্কিমের সমাজ-চিন্তায়। তবে যুক্তিবাদিতার পরিপ্রেক্ষিতে কোঁৎ-এর মতই তাঁকে সব থেকে বেশী সাহায্য করেছিল।

বঙ্কিম ভারতীয় সংস্কৃতির সেই বৈশিষ্ট্যকেই তাঁর রচনায় রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন যা জীবন্ত, যা যুগোপযোগী, আধুনিক পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলতে যার বাধা নেই।

৩৯.৪ বঙ্কিমচন্দ্রের রাজনীতি ও সমাজ ভাবনা

বঙ্কিমচন্দ্রর সমাজ ও রাজনীতি চিন্তার বিশিষ্টতা হ'ল একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সমাজদর্শন প্রতিষ্ঠা করা যার মূলে আছে একটি সমৃদ্ধ জাতি ও দেশগঠনের ভাবনা। জাতিগঠনের প্রশ্নকে সামনে রেখেই তিনি সমকালীন সমাজ, শৃঙ্খলা, ধর্ম, রাজনৈতিক তত্ত্ব, প্রতিষ্ঠান, মনুষ্যত্ব প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেছেন। শানিত বুদ্ধি, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশক্তি এবং সহৃদয় সহমর্মিতার সাহায্যে তিনি সমগ্র জাতির হৃদস্পন্দন অনুভব করতে পেরেছিলেন।

'বঙ্গদর্শনে' বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত "ভারত কলঙ্ক', 'বাঙ্গালীর বাহুবল', 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা', 'প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি', 'বাঙ্গালার ইতিহাস', 'জাতিবৈর', 'সাম্য', 'বঙ্গদেশের কৃষক', 'কমলাকান্তের' বিভিন্ন প্রবন্ধ প্রভৃতি রচনায় বঙ্কিমের সমাজ ভাবনা ও রাজনীতি বিষয়ক চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়।

সমকালীন রাজনৈতিক সংগঠন - যেমন ব্রিটিশ ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন, সভাসমিতি - যেমন হিন্দু মেলা, জ্ঞানোপার্জিকা সভা, তত্ত্ববোধিনী সভা; শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারমূলক আইন, সংবাদপত্র প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন বঙ্কিম, সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে নিজেকে কখনই যুক্ত করেননি তিনি, কিন্তু তাঁর বিভিন্ন রচনায় বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে রাজনীতির বিচিত্র প্রেক্ষাপট - শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন পর্যায়, স্বাধীনতা ও পরাধীনতা, জাতীয়তাবাদ, প্রশাসন ও মানবসম্পর্ক, দেশ ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা প্রভৃতি।

ইতিহাস চেতনাই হ'ল বঙ্কিমচন্দ্রের রাজনীতি ও সমাজ বিশ্লেষণের অন্যতম কেন্দ্রীয় উপাদান। বাংলা তথা ভারতবর্ষের ইতিহাস পুনর্গঠনে বঙ্কিমচন্দ্রের অনুপ্রেরণার উৎসে ছিল গভীর স্বদেশ প্রেম এবং গৌরবময় অতীত পুনরুদ্ধার করে জাতীয় জীবন ও সংস্কৃতির পুনর্গঠন। প্রবন্ধ তো বটেই বঙ্কিম তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসেও ইতিহাসকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন রাজনৈতিক জাগরণের অন্যতম শর্ত ইতিহাসবোধ।

বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস চর্চায় তুর্কি শাসন, পাঠান ও মোগল শাসনের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য এবং তাঁর সমসাময়িক কাল পর্য্যন্ত ইংরেজ শাসনের বিবিধ বিষয়ের মূল্যায়ণ লক্ষ্য করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন প্রবন্ধ থেকে বোঝা যায় তাঁকে আচ্ছন্ন করেছিল মূলত বাংলা দেশের ইতিহাস। তবে তাঁর ধ্যানের ভারতবর্ষের রূপ যে বাংলাদেশেই আছে সে বিষয়ে তাঁর কোনো সংশয় ছিল না। বিভিন্ন পর্যায়ে বাংলার পরাধীনতার ইতিহাস বিশ্লেষণ করে বঙ্কিম কতগুলি তথ্য তুলে ধরেছেন যেগুলি আজও পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমরা পরবর্তী অংশে জাতীয়তাবাদের আলোচনা প্রসঙ্গে সেগুলি উপস্থাপিত করব।

দেশের স্বাধীনতা বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব স্বতন্ত্র ভাবনা লক্ষ্য করা যায়। এই চিন্তা প্রথাগত ধারণাবদ্ধ নয়, মৌলিক ও যুক্তিনির্ভর। প্রচলিত সংস্কার অনুযায়ী স্বদেশবাসী শাসিত দেশই হ'ল স্বাধীন, বিদেশী কর্তৃক শাসিত দেশ মানেই পরাধীন দেশ। কিন্তু বঙ্কিম আদৌ এই প্রচলিত ধারণায় বিশ্বাসী ছিলেন না। এই প্রসঙ্গে তিনি ইংরেজী 'Liberty' ও 'Independence' শব্দদুটির ভিন্ন তাৎপর্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। দুটি শব্দেরই আক্ষরিক অর্থ 'স্বাধীনতা' হলেও বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিতে 'Liberty' শব্দটির ভূমিকা বা তাৎপর্য অনেক বেশী।

একটি দেশ প্রকৃত অর্থে স্বাধীন কিনা তা নির্ভর করে শাসিত প্রজাসাধারণের সুখ সমৃদ্ধি ও সুনিশ্চিত জীবনযাত্রার ওপর। বঙ্কিমচন্দ্র স্বচ্ছন্দে একটি দেশকে প্রকৃত স্বাধীন বলে স্বীকার করতে প্রস্তুত যদি সেই দেশের রাজা বা শাসক বহির্দেশীয় হয়েও জনসাধারণের সুখ ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে পারেন। অর্থাৎ বাহ্যত 'পরাধীন' একটি দেশকে স্বাধীন বলে অভিহিত করতে তিনি কুণ্ঠিত নন। আবার একই যুক্তিতে স্বদেশবাসী শাসিত একটি স্বাধীন দেশকে তিনি স্বাধীন আখ্যা দিতে রাজী নন যদি সেই দেশের সাধারণ মানুষ শোষিত ও নির্যতিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র দ্বিধাহীনভাবে ব্যক্ত করেছেন, আধুনিক (তাঁর সমসাময়িক) ভারতে একজন সাধারণ ভারতীয় ও ইংরেজের মধ্যে যে বৈষম্য তার চেয়ে অনেক বেশী পীড়াদায়ক বৈষম্য ও ব্যবধান ছিল

প্রাচীন ভারতে সাধারণ শূদ্রপ্রজাদের সঙ্গে রাজপুরুষ ব্রাহ্মণের। কাজেই ব্রাহ্মণশাসিত সেই প্রাচীন ভারতবর্ষকে তিনি কখনও স্বাধীন ভারতবর্ষ বলে মেনে নেননি। তিনি বলেছেন, "যে পীড়িত হয়। তাহার পক্ষে স্বজাতির পীড়ন ও ভিন্নজাতির পীড়ন, উভয়ই সমান।"

রাজনীতি বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের "প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি" প্রবন্ধটি মূল্যবান। মহাভারতের সভাপর্বে যুধিষ্ঠিরকে নারদ যে উপদেশ দিয়েছিলেন সেগুলিকে তালিকাবদ্ধ করেছেন তিনি। এই উপদেশে রাজাকে কৃষি, বাণিজ্য, আয়-ব্যয় শ্রবণ, দুর্গসংস্কার, সেতুনির্মান, পৌরকার্য দর্শন ও জনপদ সংরক্ষণের আটটি গুরুত্বপূর্ণ রাজকার্য সঠিকভাবে সমাধা করার কথা বলা হয়েছে। মন্ত্রিসভায় মন্ত্রণাকাজের গোপনীয়তা রক্ষা, পররাজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন, মন্ত্রীপদে যোগ্য ও অভিজ্ঞ লোকের নিয়োগ, কাজের দ্রুত সম্পাদন, খাদ্য সঞ্চয়, ন্যায়বিচার, সমদৃষ্টি নিয়ে রাজ্যশাসন, সৈন্যদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা প্রভৃতি যাবতীয় প্রশ্নে নারদ রাজাকে যা পরামর্শ দিয়েছিলেন, তা আজকের যুগেও সমান প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ। আর্থিক সমৃদ্ধি, প্রজার সুখস্বাচ্ছন্দ, জনসংযোগ রক্ষা এবং রাজকার্য সুসম্পন্ন করার যে উপদেশগুলি নারদবাক্যে বিদ্যমান সেগুলি আধুনিক রাষ্ট্রশাসককে মেনে চলার পরামর্শ দেন বঙ্কিম, "রাজনীতি বিশারদ ইংরেজেরাও তাহা গ্রহণ করিয়া তদনুসারে চলিলে, তাহাদিগের উপকার হয়।"

কমলাকান্ত পর্যায়ের 'পলিটিক্স', একটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা। কমলাকান্তর মুখ দিয়ে বঙ্কিম বলছেন, আমাদের দেশের ক্ষেত্রে রাজনীতির ইচ্ছা, "বোবার বাক্‌চাতুরীর কামনার মত, খঞ্জের দ্রুতগমণের আকাঙ্খার মত। অন্ধের চিত্রদর্শন লালসার মত . . . . . . , ফলিবার নহে। ভাই পলিটিক্‌স্‌ওয়ালারা, আমি কমলাকান্ত চক্রবর্তী তোমাদের হিতবাক্য বলিতেছি, পিয়াদাপ্প শ্বশুরবাড়ী আছে, তবু সপ্তদশ অশ্বারোহীমাত্র যে জাতিকে জয় করিয়াছিল, তাহাদের পলিটিক্স নাই। "জয় রাধে কৃষ্ণ। ভিক্ষা দাওগো!" ইহাই আমাদের পলিটিক্‌স্‌।" বঙ্কিম এক্ষেত্রে কটাক্ষ করেছেন এদেশের মৌলিকতা বর্জিত, পরনির্ভর রাজনীতির প্রতি। তাঁরমতে, সমকালীন রাজনীতির দুটি প্রবণতা — একটি কুকুর জাতীয় ও অন্যটি বৃষজাতীয়। কুকুরের প্রবণতা হ'ল দয়া দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর করা, শান্তিপূর্ণ ও ধৈর্যশীলতার সঙ্গে কাম্যবস্তুর জন্য অপেক্ষা করা আর আঘাত এলে রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়ন। সম্ভবতঃ তৎকালীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে যে নরমপন্থী রাজনীতির উদ্ভব হয়েছিল তাকেই বঙ্কিমচন্দ্র কটাক্ষ করেছেন। আর অন্যটি হল এই যে, বৃষ সব গরুকে হটিয়ে দিয়ে গায়ের জোরে জাবনা দখল করে নেয়। অর্থাৎ কোনো কৌশল নয়, শুধুমাত্র বলপ্রয়োগের পথ অবলম্বন করে দস্যুর মত নিজের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করে।

রামমোহনের মতই বঙ্কিমচন্দ্র প্রশাসন ও প্রচলিত বিচার ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। তাঁর মতে দেশের আইনব্যবস্থা ধনীর অত্যাচার থেকে দরিদ্রকে রক্ষা করতে অক্ষম, যারা মামলাসংক্রান্ত সর্বব্যাপারে - যেমন উকিল নিয়োগ, সাক্ষী যোগাড়, আমলা ও চাপরাশিদের জন্য — উৎকোচের ব্যবস্থা করতে সক্ষম তদের জন্যই বিচারালয়ের দ্বার উন্মুক্ত। অনেক সময় সর্বস্ব ব্যয় করেও সুবিচার পাওয়া যায়না। প্রায় সর্বত্রই মামলার নিষ্পত্তি হতে প্রচুর সময় লাগে। তবে ইংরেজ প্রবর্তিত বিচার ব্যবস্থার সমালোচনা করলেও বঙ্কিম তাকে হিন্দুশাসনকালের বিচারব্যবস্থার তুলনায় উন্নততর বলে বর্ণনা করছেন। কারণ

প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রদের প্রতি প্রযোজ্য আইন ছিল স্বতন্ত্র। কিন্তু ইংরেজ আমলে সকল প্রজাই একই নিয়মের অন্তর্ভুক্ত, কোনো শ্রেণীর জোরে কেউ আধিপত্যে অধিকারী নয়। তবে একথাও ঠিক কোন ইংরেজের বিচার করার অধিকার ভারতীয়দের ছিল না, প্রাচীন ভারতে কোন শূদ্রও ব্রাহ্মণের বিচার করতে পারতনা।

বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তায় রাষ্ট্র অপেক্ষা সমাজের গুরুত্বই ছিল বেশী। মানবজীবনের ধারক ও বাহক সমাজ। রাষ্ট্রের স্থান সেখানে গৌণ। সমাজের অগ্রগতির জন্য তিনি চেয়েছিলেন জাতির মানসজীবনে আমূল রূপান্তর যা সম্ভব শুধুমাত্র যুক্তিবাদী চিন্তার বিস্তারে। সমাজ ব্যবস্থার দোষত্রুটি স্বীকার করেও তিনি মানুষকে সমাজের কাছে অনুগত থাকতে উপদেশ দেন —

''সমাজকে ভক্তি করিবে। ইহা স্মরণ রাখিবে যে মনুষ্যের যত গুণ আছে, সবই সমাজে আছে। সমাজ আমাদের শিক্ষাদাতা, দন্ডপ্রণেতা, ভরণপোষণ ও রক্ষাকর্তা। সমাজই রাজা, সমাজই শিক্ষক।''

বঙ্কিমের প্রশ্ন, 'সামাজিক দুঃখ শুরু হল কবে থেকে ?' 'বাহুবল ও বাক্যবল' প্রবন্ধে তিনি সামাজিক দুঃখের স্বরূপ ও ইতিহাস বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে সমাজ সংস্থাপনের পর থেকেই সামাজিক দুঃখের শুরু এবং এই দুঃখের মূলে রয়েছে দারিদ্র্য। মানুষের সভ্যতার ইতিহাস এই সামাজিক দুঃখ নিবারণেরই ইতিহাস। বঙ্কিম রুশোকে অনুসরণ করে বলেছেন, মানুষ সমাজবদ্ধ হবার পুর্বে দারিদ্র্য ছিলনা। স্বাধীনতার হানিকেও বঙ্কিম সামাজিক দুঃখের অপর কারণ বলে উল্লেখ করেছেন।

রাজনীতি ও সমাজনীতির মূল উদ্দেশ্য হল সামাজিক দুঃখের উচ্ছেদ। বঙ্কিমের মতে সমাজশক্তির অত্যাচারই এই সামাজিক দুঃখের মূল কারণ। এই অত্যাচারী কখনও রাজা, কখনও সমাজশাসক — ইউরোপে ধর্মযাজকগণ, ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণকুল, আবার কখনও অন্য সংখ্যাগুরু গোষ্ঠী। বঙ্কিমের ধারণা 'বাহুবল' অথবা 'বাক্যবল'ই এই অন্যায় নিপীড়ণের বিরুদ্ধে উপযুক্ত অস্ত্র। শাসক-শক্তি অত্যাচারী হ'লে জনসাধারণ সংহত হয়ে বাহুবলের সাহায্যে সে অত্যাচার নিবারণ করতে পারে। কিন্তু বাহুবল হ'ল পশুবল। তাই তাঁর মতে পশুবলের সাহায্যে সাময়িকভাবে সবলের অত্যাচার নিবারণ করা গেলেও সমাজের স্থায়ী উন্নতি সম্ভব নয়, বরং বাহুবলের দ্বারা উন্নতি অপেক্ষা অবনতির সম্ভাবনাই বেশী। তাই বঙ্কিমচন্দ্র বাক্যবলের শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী বাক্যবল বলতে বঙ্কিম শিক্ষার কথাই বলেছেন — ''শিক্ষাদায়িনী উপদেশমালা যদি যথাবিহিত বলশালিনী হয়, তবেই সমাজের হৃদয়ঙ্গাতা হয়।'' তবে আত্মরক্ষার জন্য বাহুবল প্রয়োজনীয়। ভারতবর্ষের দুর্গতির কারণ যে বাহুবলের অভাবে ঘটেছে এই অভিমত বঙ্কিম বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধে ব্যক্ত করেছেন।

সামাজিক অগ্রগতির জন্য বঙ্কিমচন্দ্র চেয়েছিলেন জাতির মানস জীবনে আমূল রূপান্তর। তাঁর মতে সামাজিক অগ্রগতির নিয়ামক শাস্ত্র নয়, সমাজ অগ্রগতির নিয়ামক হল বিচারবুদ্ধি ও সামাজিক মূল্যবোধ। রামমোহন-বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কার আন্দোলনকে তিনি গ্রহণ করেননি। বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ প্রবর্তক অথবা বহু বিবাহ নিবর্তক সামাজিক আন্দোলনের করুণ পরিণতি দেখে বঙ্কিম এই সিদ্ধান্তে উপনীত

হয়েছিলেন যে, শাস্ত্রের নজীর দেখিয়ে বা আইনের সাহায্যে জাতীয় জীবনের বহুকাল সঞ্চিত কুসংস্কার নির্মূল করা অসম্ভব ব্যাপার। একমাত্র উপযুক্ত শিক্ষার সাহায্যেই মানুষের মনে মুক্তচিন্তা ও যুক্তিবোধের জাগরণ হতে পারে। মানুষের মনে সামাজিক মূল্যবোধগুলি প্রোথিত হলে সমাজসংস্কার হবে অতিসহজেই এবং একই সঙ্গে সমাজের ধারাও বাজায় থাকবে।

বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন এক আদর্শ দেশপ্রেমিক। তাঁর একনিষ্ঠ দেশপ্রেম থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল জাতি গঠনের ভাবনা। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাম্যের অভাব তাঁকে পীড়িত করেছিল। বিভিন্ন প্রবন্ধে এবং উপন্যাসে বারবার তিনি ব্যক্ত করেছেন তাঁর সাম্য চিন্তা এবং জাতীয়তাবাদী ভাবনা। এই দুটি বিষয়ে তাঁর বক্তব্য এবং বিশ্লেষণ পৃথক আলোচনার দাবী রাখে। আমরাও অচিরেই সেই আলোচনায় প্রবেশ করব।

৩৯.৫ বঙ্কিমচন্দ্র ও জাতীয়তাবাদ

ইংরেজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল তার অন্যতম ফলশ্রুতি হল প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন। তবে রামমোহন, দ্বারকানাথ, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামকমল সেন, রাধাকান্ত দেব প্রভৃতির চেষ্টায় চর্চার সূত্রপাত প্রাচীন সভ্যতা-সংস্কৃতি, সাহিত্য ও ধর্মশাস্ত্রের চর্চার সূত্রপাত হলেও ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রাচ্যবিদ্যা চর্চা হয়েছিল মূলত ইউরোপীয় মনীষীদের দ্বারা। ১৮৫০ -এর পরে প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ ডঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের ভারততত্ত্ব সম্পর্কিত গবেষণামূলক প্রবন্ধ, পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সংস্কৃতি সাহিত্যের অনুবাদ এবং কালী প্রসন্ন সিংহের মহাভারতের অনুবাদ শিক্ষিত দেশবাসীকে ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি সশ্রদ্ধ করে তোলে।

বঙ্কিমচন্দ্র ভারতবর্ষের গৌরবময় ঐতিহ্য সম্পর্কে ব্যাপক অধ্যয়ন ও চর্চা করেছিলেন। বস্তুত তাঁর জাতীয়তাবাদ ও জাতিগঠনের ধারণা সম্পর্কে সঠিক মূল্যায়ণ করতে গেলে প্রথমেই আমাদের তাঁর ইতিহাস চেতনার সঙ্গে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। অনুসন্ধানী পাঠক হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্র অসংখ্য প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ ও বিদেশী ভ্রমণকারীদের বিবরণ বিশ্লেষণ করে প্রাচীন ভারতের অজ্ঞাত ইতিহাস পুনরুদ্ধারে প্রয়াসী হয়েছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে রাষ্ট্র, সমাজব্যবস্থা, শিক্ষা ও সভ্যতার সঠিক পরিচয়ের জন্য সর্বাগ্রে ইতিহাসের জ্ঞান আবশ্যক - যে জ্ঞান শুধু রাজারাজড়ার সিংহাসন প্রাপ্তির কাহিনী নয় বা কেবলমাত্র যুদ্ধবিগ্রহ ও সন্ধিচুক্তির তথ্যও নয়, ইতিহাস আসলে মাটি ও মানুষের আলোচনা। একনিষ্ঠ ইতিহাস চর্চায় তাঁর অপরিসীম আগ্রহ ছিল, ভারতীয় রচয়িতা দ্বারা প্রণীত ভারত ইতিহাস-এর অভাব তাঁকে পীড়িত করেছিল। পাশ্চাত্য পন্ডিতদের ও মুসলমান ঐতিহাসিকদের রচিত ভারতের ইতিহাস বঙ্কিমচন্দ্রের মতে অজ্ঞতা, পরজাতি বিদ্বেষ ও বিজিতের প্রতি বিজেতার দম্ভপ্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। বঙ্কিমচন্দ্র বিশেষভাবে ব্যগ্র হয়েছিলেন বাংলার প্রকৃত ইতিহাস রচনায়। কিন্তু তাঁর প্রবন্ধগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বাংলা ও ভারতবর্ষ তাঁর চিন্তায় প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। বাংলাদেশের গৌরবকে তিনি বৃহত্তর আর্য-গৌরবের অংশ হিসাবেই দেখেছেন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে 'বঙ্গদর্শন' প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সহযোগিতায় সুপরিকল্পিত ভাবে বাংলাদেশ ও বাঙালীজাতির যথার্থ ইতিহাস রচনার সংকল্প গ্রহণ করলেন। এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য,

বঙ্কিমচন্দ্র নবীনচন্দ্রকে একটি পত্রে সমগ্র ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনার পরিকল্পনার কথাও জানিয়েছিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্য, তা লিখে উঠতে পারেননি। তবে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত ভারত কলঙ্ক', 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা' এবং 'প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি' নামক প্রবন্ধগুলিতে ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে বঙ্কিমের ইতিহাস চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলাদেশের ইতিহাস ও সমাজ জীবন সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে 'বাঙ্গালার ইতিহাস', 'বাঙ্গালার কলঙ্ক', 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা,' 'বঙ্গে ব্রাহ্মনাধিকার', 'বাঙ্গালীর উৎপত্তি' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই প্রবন্ধগুলিতে বঙ্কিমচন্দ্র একদিকে যেমন ঐতিহাসিক তত্ত্ব নির্মাণের চেষ্টা করেছেন অন্যদিকে বস্তুগত আলোচনার নিরিখে বাঙালীর শ্রেষ্ঠত্ব আবিষ্কারে প্রয়াসী হয়েছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তাঁর রাজনৈতিক ভাবনা জাতীয়তাবোধের ভাবনা দ্বারা পুষ্ট। কঠোর পরিশ্রমে একটি একটি করে তথ্য সমাবেশ করে তিনি ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের প্রকৃতি বিচার করেছেন, তিনি বিশেষ করে ভারতের পূর্বস্থাপিত অধিবাসীদের সঙ্গে বহিরাগত জাতির সংঘাতের ঘটনাগুলিকে আলোচ্য বিষয়রূপে গ্রহণ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে ইংরেজশাসনের পূর্বে ভারতীয় ঐক্য বা ভারতবোধ বলে কিছু ছিলনা। ভারতবর্ষ বারবার বাহিরের জাতি দ্বারা বিভিন্ন সময়ে আক্রান্ত হয়েছে। কখনও বিজেতা জাতি এইদেশ লুণ্ঠন করে চলে গেছে আবার কখনও বিজেতারা এ দেশের অধিবাসীদের সঙ্গে মিশে গেছে। এই বিদেশী আক্রমণ প্রতিহত করতে না পারার কারণ অনুসন্ধান করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র, তাঁর মতে প্রথম কারণ ভারতবর্ষীয়েরা স্বভাবতই স্বাধীনতার আকাঙ্খা রহিত," এবং দ্বিতীয়, "হিন্দু সমাজের অনৈক্য, সমাজমধ্যে জ'তিপ্রতিষ্ঠার অভাব, জাতি হিতৈষার অভাব।" এছাড়া ভারতবর্ষে জীবিকা সহজলভ্য, তাই ভারতবাসীরা কিছুটা অন্তর্মুখী, তারা কবি, দার্শনিক — বাহ্যসুখে তাদের অনাস্থা। তাদের সাহিত্যে কোথাও স্বাধীনতার গুণগান নেই। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন; 'তাহাদিগের বিবেচনায় যে ইচ্ছা রাজা হউক, আমাদের কি ? স্বজাতীয় রাজা, পরজাতীয় রাজা উভয় সমান।'

'ভারত কলঙ্ক' প্রবন্ধে বঙ্কিম বলছেন, 'জাতি শব্দে Nationality বা Nation বুঝিতে হইবে।' ভারতবর্ষে জাতীয় ঐক্যের অভাবের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি বলেছেন।

"এই ভারতবর্ষে নানা জাতি। বাসস্থানের প্রভেদে, ভাষার প্রভেদে, বংশের প্রভেদে, ধর্মের প্রভেদে নানা জাতি। বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, তৈলঙ্গী, মহারাষ্ট্রী, রাজপুত, জাঠ, হিন্দু, মুসলমান, ইহার মধ্যে কে কাহার সঙ্গে একতাযুক্ত হইবে? ধর্মগত ঐক্য থাকিলে বংশগত ঐক্য নাই, বংশগত ঐক্য থাকিলে ভাষাগত ঐক্য নাই, ভাষাগত ঐক্য থাকিলে নিবাসগত ঐক্য নাই।"

তবে বঙ্কিমের মতে ভারতে কখনোই ঐক্য প্রতিষ্ঠিত ছিলনা একথা ঠিক নয়। আর্যরা যখন এদেশে এসেছিল তখন তাদের মধ্যে ঐক্য বিরাজ করত। কিন্তু পরে আর্যবংশ বিস্তৃত হলে ভারতের নানা অংশে তারা ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে যায় এবং তাদের মধ্যে ভাষাগত ও ধর্মীয় বিভেদ দেখা দেয়। এর ফলে পূর্বের ঐক্য, এক জাতীয়ত্ব আর বজায় থাকেনি। বাইরের কোন্ আক্রমণেই ভারতবাসী তার ভাষাভেদ, বংশভেদ বা জাতিভেদ ভুলতে পারেনি। তাই সম্মিলিতভাবে একজাতীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারেনি।

অবশ্য এর দুটি ব্যতিক্রম ছিল। শিবাজীর অধিনায়কত্বে মারাঠাজাতি ও রঞ্জিত সিংহের অধিনায়কত্বে শিখজাতি।

জাতীয়তাবাদের ধারণাটি যে ইংরেজদেরই অবদান সে বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পূর্ণ নিশ্চিত ছিলেন। তাঁর ভাষায় — "ইংরেজ ভারতবর্ষের পরমোপকারী। ইংরেজ আমদিগকে নূতন কথা শিখাইতেছে। ..... সেই সকল শিক্ষার মধ্যে অনেক শিক্ষা অমূল্য। যে সকল অমূল্য রত্ন আমরা ইংরেজের চিত্তভাণ্ডার হইতে লাভ করিতেছি, তাহার মধ্যে দুইটির আমরা এই প্রবন্ধে উল্লেখ করিলাম — স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা এবং জাতিপ্রতিষ্ঠা। ইহা কাহাকে বলে তাহা হিন্দু জানিতনা"।

ইউরোপে রেনেসাঁস এর প্রভাবেই জাতীয়তা বোধের উন্মেষ ঘটে বলে বঙ্কিমের ধারণা। ভারতবর্ষেও রেনেসাঁস-এর প্রবর্তনের ফলেই ভাষা, শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতির উৎকর্ষ সাধিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র রামমোহনের পথ ধরেই জাতীয় উদ্দীপনা বৃদ্ধির জন্য ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষ বিধানে সচেষ্ট হন। এখানে প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় ঐসময় ইংরেজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবে (একধরণের উচ্ছৃঙ্খল প্রবণতা ও) দেশের ভাষা ও সংস্কৃতিকে অস্বীকার করার মানসিকতা দেখা দেয়? (ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলন স্মর্তব্য)। বঙ্কিমচন্দ্র এই অন্ধ পরাণুসরণকারী বাঙালীমানসকে স্বদেশীয় সাহিত্য সংস্কৃতির অভিমুখী করতে চাইলেন। তিনি জাতীয় জীবনের ঐক্যসাধনে বাংলা ভাষার উন্নতিবিধানের জন্য সোচ্চার হন। তিনি সর্বভারতীয় ভাষা হিসাবে ইংরেজীর পক্ষপাতী ছিলেন ঠিকই কিন্তু একথাও উপলব্ধি করেছিলেন যে ইংরেজীর মাধ্যমে দেশের সাধারণ মানুষ নিজেদের আশা-আকাঙ্খা ব্যক্ত করতে অক্ষম এবং বিদেশী ভাষা জাতীয় ঐক্যেরও অন্তরায়।

জাতীয়তাবাদী চিন্তার পথিকৃৎ বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবনাচিন্তা মূলত বাংলাকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছিল বটে; কিন্তু প্রাদেশিক সংকীর্ণতা কখনও তাঁর রচনাকে কলুষিত করেনি। বঙ্কিমচন্দ্র দেশপ্রেমকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে অভিহিত করেছিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক চিন্তার উন্মেষ ঘটে এবং ইতিহাস-সন্ধান, সমাজ-চেতনা, মূল্যবোধের পরিবর্তন প্রভৃতির স্বাভাবিক পরিণামই হ'ল গভীর দেশাত্মবোধ যা বঙ্কিম চন্দ্রের রচনায় এক সুস্পষ্ট রূপ লাভ করে। "মৃণালিনী" উপন্যাসেই সর্বপ্রথম আমরা স্বদেশ-ভাবনা ও জাতীয়তাবাদের আভাস দেখতে পাই। ঐতিহাসিক মিনহাজুদ্দীন লিখিত সপ্তদশ অশ্বারোহী নিয়ে বক্তিয়ার খিলজীর বাংলাদেশ জয়-এর অতিরঞ্জিত কাহিনীর প্রেক্ষাপটেই এই উপন্যাস রচিত। এই অলীক কাহিনী প্রত্যাখ্যান করে 'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিম তাঁর প্রবন্ধ 'বাঙ্গালার ইতিহাস' প্রকাশ করেন। তাতে তিনি বলেন "সপ্তদশ পাঠান কর্তৃক বঙ্গজয় হইয়াছিল, এ কলঙ্ক মিথ্যা। সপ্তদশ পাঠান কর্তৃক কেবল নবদ্বীপের রাজপুরী বিজিত হইয়াছিল।"

কমলাকান্তের রচনাগুলিতে বঙ্কিমচন্দ্রের "দেশপ্রেম উন্মত্ত কাবেগের মধ্য দিয়ে উদাও ঝঙ্কারে গীতিময় হয়েছে। বিশেষ করে 'আমার দুর্গোৎসব' এবং 'একটি গীত'-এ।" এই রচনাগুলিতে বঙ্কিম দেশপ্রেমের সহজাত সংস্কারকে যুক্তি ও তথ্যের অবলম্বন থেকে মুক্ত করে নিজস্ব মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। স্বদেশ-প্রেমিক বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ অবদান দেশকে জননীরূপে কল্পনা করা। কমলাকান্তের আর কোন দেবী নেই

দেশমাতৃকা ছাড়া, আর কোন পূজা নেই দেশপূজা ছাড়া। দেবী দুর্গাকে বঙ্কিম দেশজননীরূপে কল্পনা করেছেন। কমলাকান্তের কথায় —

'চিনিলাম, এই আমার জননী জন্মভূমি — এই মৃন্ময়ী-মৃত্তিকারূপিনী - অনন্তরত্ন ভূষিতা — এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা। রত্নমণ্ডিত দশভূজ — দশদিক — দশদিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তিশোভিত, পদতলে শত্রু বিমর্দিত, পদাশ্রিত বীরজন কেশরী শত্রুনিপীড়ণে নিযুক্ত!'

'আনন্দমঠ' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় ভাবটির সূচনা এখান থেকেই। আনন্দমঠের সন্তানদের দেশমাতৃকার মূর্তিও ঐশ্বর্যময়ী, বলিষ্ঠভাবের উদ্দীপক। এই উপন্যাস ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এক নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল। পূর্বে রচিত 'বন্দেমাতরম্' সংগীতটি বঙ্কিম আনন্দমঠে যথাযোগ্য ভাবে সন্নিবেশিত করেন। এই সংগীত-ভারতের মুক্তিসংগ্রামে বিপ্লবীদের প্রেরণার প্রধান উৎস হয়ে ওঠে, 'বন্দেমাতরম', শব্দটি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বীজমন্ত্র হয়ে দাঁড়ায়। বহুবিপ্লবী বন্দেমাতরম্ ধ্বনি উচ্চারণ করে হাসিমুখে ফাঁসির মঞ্চে আরোহন্ করেছিলেন। আনন্দমঠের বিভিন্ন ঘটনা ও চরিত্র পরবর্তীকালে বাংলার বিপ্লবীদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। 'অনুশীলন দল' - এর নামকরণ হয়েছিল বঙ্কিমের 'অনুশীলনতত্ত্ব' থেকে। বিপ্লবী শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ একসময় 'আনন্দমঠের' অনুকরণে ভবাণী মঠ গঠন করতে চেয়েছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র জাতীয়তবাদের সংকীর্ণতা সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। কারণ জাতীয়তাবাদের একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল বিভিন্ন জাতির স্বার্থকে পৃথকরূপে বিবেচনা করা। দুটি জাতির মধ্যে সংঘাত বা বিরোধ দেখা দিলে উভয়েই অপরের ক্ষতিসাধন করে নিজের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করে। কিন্তু বঙ্কিম চেয়েছিলেন জাতি ধর্ম ও বর্ণের সমমর্যাদা ও সমানাধিকার। সকল মানুষের সার্বিক মঙ্গলই ছিল তাঁর কাম্য। পাশ্চাত্য দেশপ্রেমের ভাবনাকে তাই তিনি মেনে নিতে পারেননি —

''ইউরোপীয় Patriotism ধর্মের তাৎপর্য্য এই যে, পর সমাজের কাড়িয়া ঘরের সমাজে আনিব। স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি করিব। কিন্তু অন্য সমস্ত জাতির সর্বনাশ করিয়া তাহা করিতে হইবে। এই দুরন্ত Patriotism প্রভাবে আমেরিকার আদিম জাতিসকল পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইল। জগদীশ্বর ভারতবর্ষে যেন ভারতবর্ষীয়ের কপালে এরূপ দেশবাৎসল্য-ধর্ম না লিখেন।''

জাতীয়তাবাদকে বঙ্কিমচন্দ্র একটি সুস্পষ্ট দার্শনিক পটভূমিতে দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এমন একটি জাতীয় সংস্কৃতি নির্মাণ করা যার মূলভিত্তি ভারতীয় মূল্যবোধ — কিন্তু সেই মূল্যবোধ যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত, কুসংস্কার মুক্ত এবং দেশপ্রেমের সঙ্গে সাযুজ্যপুর্ণ। এই প্রসঙ্গেই বঙ্কিমচন্দ্র মূলত ধর্ম ও সংস্কৃতির আলোচনা করেছেন 'ধর্মতত্ত্ব' ও 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রবন্ধে। বঙ্কিম যে জাতীয় সংস্কৃতির ভাবনা ভেবেছেন তার মর্মস্থল হল ধর্ম। কিন্তু ধর্ম বলতে তিনি বিশেষ কোন সম্প্রদায়কে বোঝাননি। 'ধর্ম' হ'ল সেই সত্য যা সকল সম্প্রদায়ের Religion এর মূল ভিত্তি। সিলীর Ecce Homo গ্রন্থে যীশুখৃষ্টের ঈশ্বরত্বের অস্বীকৃতি বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রভাবিত করেছিল। "The substance of religion is culture" — এই তত্ত্বটি তিনি 'কৃষ্ণচরিত্র' নির্মাণে ব্যবহার করেছিলেন। বঙ্কিমের মতে মহাভারতে আমরা যে কর্মবীর কৃষ্ণকে পাই তিনিই হচ্ছেন মানবতার পর্ণ আদর্শ।

বঙ্কিমের মতে জীবনের কর্মময় বিকাশেই সংস্কৃতির বিকাশ। অনুশীলন বলতে কর্মপ্রচেষ্টাকেই বোঝায়। মানবিক বৃত্তিগুলির সম্যক অনুশীলন ও সামঞ্জস্যময় স্ফুরণের মধ্যেই পূর্ণ মনুষ্যত্বের আদর্শ নিহিত। যুক্তিবাদী চিন্তার সাহায্যে সে আদর্শকে বঙ্কিম প্রতিষ্ঠিত করেছেন 'কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থে। তিনি কৃষ্ণচরিত্রে কোন অলৌকিকতাকে স্থান দেননি। তাঁর অভিপ্রেত 'আদর্শপুরুষ' হিসেবেই কৃষ্ণকে উপস্থিত করেছেন বঙ্কিম। তাঁর চিন্তায় ভারত সংস্কৃতি হ'ল গতিশীল ও যুগোপযোগী। তাঁর আদর্শে হিন্দুত্বের বিশিষ্ট রূপটি লুপ্ত হয়নি। হিন্দুধর্মের যে সত্য, সে অন্যকে তিরস্কৃত করে না, শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করে নেয়। এইখানেই ভারতীয় সংস্কৃতির ঔদার্য ও শ্রেষ্ঠত্ব।

৩৯.৬ বঙ্কিমচন্দ্র ও সাম্য

'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার কয়েকটি প্রবন্ধ এবং ''বঙ্গদেশের কৃষক' নামে প্রকাশিত ধারাবাহিক প্রবন্ধের কিছু অংশ নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৭৯ সালে 'সাম্য' গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। পরবর্তীকালে ''বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধটি 'বিবিধ প্রসঙ্গ' গ্রন্থের দ্বিতীয়ভাগে অন্তর্ভুক্ত করলেও 'সাম্য' প্রবন্ধটি আর ছাপেননি।

বঙ্কিমচন্দ্রের রাজনৈতিক তত্ত্বে সামাজিক সাম্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। বঙ্কিমপূর্ববর্তী বাংলার সারস্বত পরিমন্ডলে সাম্যচিন্তার যথেষ্ট আভাস পাওয়া যায়। রামমোহনের রচনাগুলিতে বেথাম ও মঁতেসফিউ-এর সাম্যচিন্তার প্রভাব পড়েছিল। একইভাবে রুশোর সাম্যচিন্তার প্রভাব ডিরোজিও এবং তাঁর শিষ্যদের বিভিন্ন কর্মপদ্ধতির মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। দক্ষিণারঞ্জণ মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, অক্ষয়কুমার দত্ত, শিশিরকুমার ঘোষ, কেশবচন্দ্র সেন, লালবিহারী দে, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি অনেকেই সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের দুঃখ দুর্দশার করুণ চিত্র তুলে ধরেছিলেন।

পাশ্চাত্য দার্শনিকরা সাম্যকে মূলত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র সম্পূর্ণ সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে সাম্য ও অসাম্যের সমস্যাটিকে বিচার করবার চেষ্টা করেছেন। তিনি সামাজিক সাম্যকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। আর অর্থনৈতিক সাম্যকে সামাজিক সাম্যের অংশ হিসেবেই গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেছেন, ''সমাজের উন্নতিরোধ বা অবনতির যে সকল কারণ আছে, অপ্রাকৃতিক বৈষম্যের আধিক্যই তাহার প্রধান। ভারতবর্ষের যে এতদিন হইতে এত দুর্দশা, সামাজিক বৈষম্যের আধিক্যই তাহার বিশিষ্ট কারণ''।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সাম্য আলোচনায় তিনজন পথপ্রদর্শকের অবদানকে স্বীকৃতি জানিয়েছেন। এঁরা হলেন বুদ্ধ, যীশু ও রূশো। বুদ্ধদেবের আবির্ভাবে ভারতবর্ষে যে সমৃদ্ধি ঘটেছিল বঙ্কিম তা অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করেছেন। বুদ্ধের সাম্য ও অহিংসার বাণী বঙ্কিমকে মুগ্ধ করেছিল। যীশুখৃষ্ট ক্রীতদাসদের শৃঙ্খলমুক্ত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন, সকল মানুষকে ভালবাসার বাণী শুনিয়েছিলেন। অপরদিকে রুশো প্রচার করেছেন, সাম্যই প্রাকৃতিক নিয়ম, সমাজভুক্তদের সম্মতিতেই সমাজের সৃষ্টি। বঙ্কিমচন্দ্র রুশোকেই সাম্য ও সমাজবাদের জনক বলে অভিহিত করেন।

রুশোর সাম্যচিন্তার মূল বৈশিষ্ট্য 'প্রাকৃতিক নিয়ম'-এর বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্র রুশোকে অনুসরণ করে লিখেছেন যে প্রাক-সভ্যযুগে প্রাকৃতিক অবস্থায় সব মানুষই ছিল সমান। সভ্যতার বিস্তৃতির ফলে বৈষম্য দেখা দেয়। তাই রুশোর মতে সভ্যতা হ'ল মানুষের অমঙ্গলের কারণ। Le contract social গ্রন্থে উল্লিখিত রুশোর চুক্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করে বঙ্কিম বলেছেন যে, নিয়মাবলী তৈরী করে যেমন কোম্পাণী গঠিত হয়, তেমনি সমাজ, রাজ্যশাসন ইত্যাদির পিছনে থাকে এক সামাজিক চুক্তি। রাজা প্রজাসাধারণের মঙ্গলসাধনে ব্যর্থ হলে চুক্তি অনুযায়ী তাঁকে সিংহাসন ত্যাগ করতে হয়। তাই তাঁর মতে ফরাসী বিপ্লবের ফলে যে নতুন সভ্যতার সৃষ্টি ও "মনুষ্যজাতির স্থায়ী মঙ্গল সিদ্ধ" হ'ল তার মূলে ছিল রুশোর মর্মবাণী। তবে বঙ্কিমচন্দ্র মোটেই রুশোর অন্ধভক্ত ছিলেন না। তাঁর মতে রুশো "অবিমিশ্র বিমল সত্য" প্রচার করেননি। 'তিনি মহিমময় লোক হিতকর নৈতিক সত্যের সহিত অনিষ্টকারক মিথ্যা মিশাইয়া সেই মিশ্র পদার্থকে আপনার অদ্ভুত বাগিন্দ্রজালের গুণে লোকবিমোহিনী শক্তি দিয়া ফরাসীদিগের হৃদয়াধিকারে প্রেরণ করিয়াছিলেন।" বঙ্কিম আরো লিখেছেন, "ভূমি সাধারণের — এই কথা বলিয়া রুশো যে মহাবৃক্ষের বীজ বপন করিয়াছিলেন। তাহার নিত্য নূতন ফল ফলিতে লাগিল। অদ্যাপি তাহার ফলে ইউরোপ পরিপূর্ণ। 'কম্যুনিজম' সেই বৃক্ষের ফল। 'ইন্টার ন্যাশনাল' সেই বৃক্ষের ফল।" 'কম্যুনিজম' ও 'ইন্টারন্যাশনাল' কথা দুটির উল্লেখ করলেও বঙ্কিম মার্ক্স-এঙ্গেলস-এর মতবাদসমূহের সঙ্গে সম্যক পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাননি কারণ তাঁদের রচনা তখন এদেশে সহজলভ্য ছিলনা।

'সাম্য' গ্রন্থে বঙ্কিম সাঁ সিঁমো, প্রুধো, রবার্ট ওয়েন, শার্ল ফ্যুরিয়ের, লুই ব্লাঁ প্রমুখের সাম্যবাদী চিন্তার উল্লেখ করেছেন। এঁদের সম্পর্কে অবহিত থাকলেও বঙ্কিম বিশেষভাবে গুণগ্রাহী ছিলেন ইংরেজ উদারতন্ত্রী আদর্শের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা জন স্টুয়ার্ট মিল-এর। মিল রচিত 'Principles of Political Economy, 'On Liberty', 'On the Subjection of Women' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি বঙ্কিমকে বিশেষভাবে আলোড়িত করেছিল। ব্যক্তির স্বাধীন বিকাশ ও নৈতিকতার উন্নয়ণ — মিলের চিন্তার এই দুটি দিকই তাঁকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছিল। মিল যেমন ভেবেছিলেন প্রচলিত ব্যবস্থাদির সংশোধনের মধ্য দিয়ে মানবজাতির প্রকৃত উন্নয়ণ সম্ভব। বঙ্কিম ও তেমনি ভাবতেন গুরুতর সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের আধিক্যগুলি ব্যক্তির সদিচ্ছার মধ্য দিয়ে নৈতিকতার বোধ জাগিয়ে তুলে দূর করা সম্ভব। মানবিকতা তত্ত্বের উদ্গাতা মিল 'Utilitarianism' গ্রন্থে বলেছেন, সামঞ্জস্যের অভাবেই দুঃখ আসে, অনুশীলনের মধ্য দিয়েই সেই দুঃখ অতিক্রম করা যায়। সমাজের সুষ্ঠু বিধানে, ব্যক্তির শুভবুদ্ধিতে সবই করা যায় — শারীরিক ও নৈতিক শিক্ষার সম্যক অনুশীলনই মানুষের পূর্ণতালাভের একমাত্র পথ। বঙ্কিমের অনুশীলন তত্ত্বে এবং 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রবন্ধে আমরা মিলের চিন্তার প্রতিধ্বনিই শুনতে পাই।

সাম্যতত্ত্বের সাধারণ তাৎপর্য বর্ণনা করে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন —

"মনুষ্যে মনুষ্যে সমান। কিন্তু একথার এমত উদ্দেশ্য নহে যে, সকল অবস্থার সকল মনুষ্যই সকল-অবস্থার সকল মনুষ্যের সঙ্গে সমান। নৈসর্গিক তারতম্য আছে। কেহ দুর্বল, কেহ বলিষ্ঠ, কেহ বুদ্ধিমান, কেহ

বুদ্ধিহীন। নৈসর্গিক তারতম্যে সামাজিক তারতম্য অবশ্য ঘটিবে। যে বুদ্ধিমান এবং বলিষ্ঠ, সে আজ্ঞাদাতা; যে বুদ্ধিহীন এবং দুর্বল সে আজ্ঞাকারী অবশ্য হইবে।.................. কিন্তু সাম্যতত্ত্বের তাৎপর্য্য এই যে, সামাজিক বৈষম্য, নৈসর্গিক বৈষম্যের ফল, তাহার অতিরিক্ত বৈষম্য ন্যায়বিরুদ্ধ এবং মনুষ্যজাতির অনিষ্টকর। যেসকল রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, তাহার অনেকগুলি এইরূপ অপ্রাকৃত বৈষম্যের কারণ। সেই ব্যবস্থাগুলির সংশোধন না হইলে, মনুষ্য জাতির প্রকৃত উন্নতি নাই।.................. কিন্তু সম্পূর্ণ সংশোধন কালসাপেক্ষ। তাই বলিয়া কেহ না মনে করেন যে, আমি জন্মগুণে বড়লোক হইয়াছি, অন্যে জন্মগুণে ছোটলোক হইয়াছে। তুমি যে উচ্চকূলে জন্মিয়াছ, সে তোমার কোন গুণে নহে। অন্য যে নীচ কুলে জন্মিয়াছ, সে তাহার দোষে নহে। অতএব পৃথিবীর সুখে তোমার যে অধিকার, নীচ কুলোৎপন্নেরও সেই অধিকার। তাহার সুখের বিঘ্নকারী হইওনা; মনে থাকে যেন সেও তোমার ভাই—তোমার সমকক্ষ।''

বঙ্কিমচন্দ্র জমিদার সম্প্রদায়ের উদ্ভব এবং তাদের প্রজাপীড়ন বিষয়ে 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত-এর বিরোধিতা করে তিনি লিখেছেন। ''জমিদারেরা যে প্রজাপীড়ক, সেই প্রজাপীড়ক রহিলেন। লাভের মধ্যে প্রজাদিগের চিরকালের স্বত্ব একেবারে লেখা হইল। প্রজারাই চিরকালের ভূস্বামী; জমিদারেরা কস্মিন্ কালে কেহ নহেন কেবল সরকারী তহশীলদার। কর্ণওয়ালিস্ যথার্থ ভূস্বামীর নিকট হইতে ভূমি কাড়িয়া লইয়া তহশীলদারকে দিলেন।............ এই 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' বঙ্গদেশের অধঃপাতের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মাত্র........... '' সরকারী অনুগ্রহপুষ্ট জামিদারদের অত্যাচার পীড়নের সঙ্গে সঙ্গে লোভী মহাজনদের নির্মম শোষণ যুক্ত হওয়ায় কৃষকদের অবস্থা হয়েছিল অবর্ণনীয়। আবার জমিদারদের অগোচরে বেতনভোগী নায়েব গোমস্তারাও নির্যাতন করত তারও বাস্তব বিবরণ দিয়েছেন বঙ্কিম। তবে তিনি জমিদারদের সমালোচনার পাশাপাশি একথাও উল্লেখ করেছেন, ''সকল জমিদার অত্যাচারী নহেন।''

বঙ্কিমচন্দ্র জানতেন দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় 'নিরানব্বই ভাগ'ই কৃষক। তাই পরাণ মন্ডল, হাসিম শেখ আর রামা কৈবর্ত প্রভৃতির মত কৃষক যারা জমিদারের শোষণ ও সামাজিক দুগর্তির শিকার তাদের অবস্থার উন্নতি না হলে সমাজের উন্নতি সম্ভব নয়। জমিদারদের দৌরাত্ম্য, শোষণের কারণ, বৈষম্যের সূত্র, সামাজিক বৈষম্য দূর করার ক্ষেত্রে ভারতে সংস্কার প্রচেষ্টা প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে তিনি আলোচনা করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে সমাজে ধনসঞ্চয় থেকেই, শ্রমবিন্যাস ও সামাজিক অসাম্যের সূত্রপাত। সমাজ 'শ্রমোপজীবী' ও 'বুদ্ধ্যপজীবী' এই দুইশ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। জ্ঞানান্বেষী বুদ্ধিজীবীরা শিক্ষা ও যোগ্যতার গুণে সমাজে প্রাধান্য পায় আর শ্রমজীবীরা তাদের বশবর্তী হয়ে শ্রম করে। উৎপাদনের প্রথম ভাগ অর্থাৎ মজুরির দরুণ বেতন পায় শ্রমজীবী। আর মুনাফা নামে দ্বিতীয় ভাগটির অধিকারী হয় বুদ্ধিজীবী। শ্রমজীবী সংখ্যায় যতই গরিষ্ঠ হোক না কেন মুনাফার কোন অংশ তারা পায়না। ফলে অসাম্যের বৃদ্ধি ঘটে

বঙ্কিমচন্দ্র বলেন লোকসংখ্যার বৃদ্ধিও অসাম্যের অন্যতম কারণ। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উপায় হিসাবে তিনি বিবাহ প্রবৃত্তি দমনের প্রস্তাব করেন। অসাম্যের তিনিটি কার্যকারণ প্রক্রিয়ার কথা বঙ্কিম উল্লেখ করেছেন—

১। (ক) শ্রমের বেতনের অল্পতা; নামান্তর দারিদ্র্য যার ফলে বৈষম্য বৃদ্ধি পায়।

(খ) পরিশ্রমের আধিক্যে অবকাশে ধ্বংস, অবকাশের অভাবে বিদ্যালোচনার অভাব। ফল মূর্খতা— এও বৈষম্যবর্দ্ধক।

(গ) বুদ্ধিজীবীদের প্রভুত্ব ও অত্যাচার। নামান্তর দাসত্ব। এটা বৈষম্যের পরাকাষ্ঠা।

সুতরাং মোট ফল দারিদ্য, মুর্খতা, দাসত্ব।

২। প্রকৃতির আনুকূল্যে ভারতীয়রা কায়িক সুখে পরাঙমুখ। আলস্য, শ্রমে অনীহা ও উদ্যমহীনতা তাদের প্রবল। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবে ঐহিক সুখে মানুষ ছিল নিস্পৃহ। তাই সামাজিক অসাম্য ধারাবাহিক।

৩। (ক) উৎপাদনের অনগ্রসরতার ফলে বানিজ্যের হানি।

(খ) বৈষম্য পীড়িত নিম্নবর্ণের লোকেরা নিস্তেজ। নম্র, অনুৎসাহী ও অবিরোধী, তাই রাজপুরুষেরাও দুর্বল। তাই ভারত বারেবারে বিদেশীদের কাছে পদানত হয়েছে।

(গ) শ্রমজীবীদের চিরস্থায়ী দুরবস্থা সারা সমাজের অবনতির কারণ ঘটায়। বঙ্কিমের ভাষায়, "যেমন এক ভান্ত দুগ্ধে দুই এক বিন্দু অম্ল পড়িলে সকল দুগ্ধ দধি হয়, তেমনই সমাজের এক অধঃশ্রেণীর দুর্দশায় সকল শ্রেণীরই দুর্দশা জন্মে।"

ধণী ও দরিদ্রের চিরন্তন অসাম্যের সমস্যাটি বঙ্কিম ব্যঙ্গবিদ্রুপের সাহায্যে উপস্থাপিত করেছেন কমলাকান্তের অন্তর্গত 'বিড়াল' প্রবন্ধে।

'সাম্য' গ্রন্থের পঞ্চম ও শেষ পরিচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্র সমাজে নারীর অধঃস্থ ভূমিকা নিয়ে সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, সব মানুষের সমান অধিকার। নারীও মানুষ, অতএব "পুরুষের তুল্য অধিকারশালিনী। যে যে কার্য্যে পুরুষের অধিকার আছে স্ত্রীগণেরও সেই সেই কার্য্যে অধিকার থাকা ন্যায় সঙ্গত।" স্ত্রী-পুরুষের যে সমস্ত সামাজিক বৈষম্যের প্রতি তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন তা হল : (ক) শিক্ষার সুযোগ, (খ) বিধবাদের পুনর্বিবাহের স্বাধীনতা, (গ) পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধিকার এবং (খ) পুরুষদের বহুবিবাহের অধিকার। এই একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে যখন আমরা নারীর অধিকার রক্ষায় বিভিন্ন আন্দোলন, তর্কবিতর্ক গড়ে তুলছি, তখন বিস্মিত হতে হয় প্রায় দেড়শত বছর পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র কী তীব্রভাষায় পুরুষশাসিত সমাজের নিয়মনীতির বিরুদ্ধে কশাঘাত হেনেছিলেন —

" . . . . জিজ্ঞাসা করি, স্ত্রীগণ পুরুষের বশবর্তিনী হয় ইহা বড় বাঞ্ছনীয়, পুরুষগণ স্ত্রী জাতির বশবর্ত্তী হয় ইহা বাঞ্ছনীয় নহে কেন? যত বন্ধন আছে সকল বন্ধনে স্ত্রীগণকে বাঁধিয়াছে, পুরুষজাতির জন্য একটি বন্ধনও নাই কেন? স্ত্রীগণ কি পুরুষাপেক্ষা অধিকতর স্বভাবতঃ দুশ্চরিত্র ? না রজ্জুটি পুরুষের

হাতে বলিয়া স্ত্রীজাতির এত দৃঢ় বন্ধন ? ইহা যদি অধর্ম না হয়, তবে অধর্ম কাহাকে বলে বলিতে পারি না।" বঙ্কিম তাঁর উপন্যাসের বিভিন্ন নারীকেও তাঁর আদর্শেই চিত্রিত করেছেন। তাঁরা সকলেই স্বাতন্ত্র্যবোধে, দুঃসাহসিক কর্মে, উপস্থিত বুদ্ধিতে, তেজস্বীতায় এবং ব্যক্তিত্বে অনেক সময়ই পুরুষকে অতিক্রম করে গেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র সর্বাত্মক সাম্যের কথা বলেছিলেন। পরবর্তীকালে অবশ্য সাম্য সম্পর্কে তাঁর চিন্তাধারার কিছু পরিবর্তন ঘটে এবং সাম্য সংক্রান্ত অন্যান্য রচনাগুলি প্রকাশিত হতে থাকলেও 'সাম্য' গ্রন্থটি তিনি আর পুনর্মুদ্রিত করেননি।

৩৯.৭ সারাংশ

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর রচিত উপন্যাস ও প্রবন্ধগুলির মাধ্যমে স্বদেশ ও সমাজ সম্পর্কে এক গঠনশীল ভাবনা প্রচার করতে চেয়েছিলেন। পাশ্চাত্য যুক্তবাদী চিন্তা, মানবতাবাদ, আধুনিক সভ্যতার শক্তি ও সম্পদ বঙ্কিমকে আকৃষ্ট করেছিল। একই সঙ্গে বঙ্কিম ছিলেন সনাতন ধর্মে বিশ্বাসী। আজন্ম হিন্দু সংস্কার লালিত এবং সমাজের প্রতি ভক্তিপরায়ণ। জন স্টুয়ার্ট মিল, স্পেন্সার, কোঁৎ, রুশো এবং ইউটোপীয় সমাজবাদদের ধ্যান-ধারণাকে তিনি তাঁর বিভিন্ন রচনায় গুরুত্ব দিয়েছেন। আবার একই সঙ্গে প্রভাবিত হয়েছেন তাঁর পূর্ববর্তী ও সমসাময়িক কালের অসংখ্য যুগান্তকারী প্রতিভার দ্বারা। সরকারী চাকরীসূত্রে বিভিন্ন স্থানে নিয়োজিত থাকায় বিভিন্ন স্তরের মানুষের কাছাকাছি আসার অভিজ্ঞতাও হয়েছে তাঁর।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস ইংরেজীতে প্রকাশিত Rajmohans' Wife. কিন্তু তাঁর প্রথম বাংলা উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'ই তাঁকে সাহিত্য সম্রাটের আসনে উপস্থাপিত করে। বঙ্কিমরচিত প্রায় সব উপন্যাসগুলিই রোমান্সধর্মী, বেশ কয়েকটি পারিবারিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে রচিত আবার কয়েকটি বিশেষবাবে ইতিহাস-আশ্রিত। তবে 'আনন্দমঠ' উপন্যাসটি স্বাতন্ত্র্যের দাবী রাখে কারণ এই উপন্যাসে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রখর দেশভক্তি ও গভীর ভবিষ্যৎ দৃষ্টির পরিচয় পাই। পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচনের বৈপ্লবিক রূপ এই উপন্যাসে পরিস্ফুট হয়েছে। বিপ্লবীদের মন্ত্র 'বন্দেমাতরম্' এই উপন্যাসেই যুক্ত হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশ করে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, অর্থনীতি, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ে বঙ্কিমের নিজের লিখিত এবং সমকালীন বিদগ্ধ লেখকদের রচিত প্রবন্ধ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হত।

বঙ্কিমচন্দ্র স্বদেশের গৌরবময় ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। প্রবল দেশপ্রেম থেকেই তিনি ইতিহাস চর্চা শুরু করেন এবং ভারতবর্ষের প্রাচীন সংস্কৃতি, শাস্ত্র, দর্শন ইত্যাদি অধ্যয়ণ করতে থাকেন। তিনি এর মাধ্যমে জাতীয়তাবোধ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। এই জাতীয়তাবোধের ধারণা ইংরেজদের অবদান হলেও তিনি চেয়েছিলেন ভারতবর্ষকে এমন একটা জাতি হিসেবে গড়ে তুলতে যার মূল

ভারতের সনাতন ধর্ম ও সংস্কৃতিতে প্রোথিত, অথচ যা উদার ও কুসংস্কারমুক্ত।

বঙ্কিম সামাজিক অসাম্যের বিরুদ্ধে প্রচুর প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। 'বঙ্গদেশের কৃষক' রচনাটিতে তিনি ভূমিসমস্যা ও কৃষকদের অত্যাচার ও বঞ্চনা এবং জমিদার ও মহাজনদের শোষণের কাহিনী বিশ্লেষণ করেছেন। কমলাকান্তর বিভিন্ন রচনায় ব্যঙ্গবিদ্রুপের কশাঘাতে তিনি সমকালীন সমাজের বিভিন্ন চিত্র এঁকেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র চেয়েছিলেন মনুষ্যত্বের বিকাশ যা সম্ভব অনুশীলনের মাধ্যমে। 'ধর্মতত্ত্ব' ও 'কৃষ্ণচরিত্র প্রবন্ধদুটি তারই প্রমাণ। মানব ও সমাজজীবনের প্রতিটি স্তরের সামঞ্জস্যের সাধনাই অনুশীলন যার মূলে আছে ঈশ্বরভক্তি। মহাভারতের কৃষ্ণচরিত্রই বঙ্কিমের আদর্শ পুরুষ। কর্মবীর কৃষ্ণই হলেন এক সম্পূর্ণ মানুষ যাঁর মধ্যে ঘটেছে মানবতার পূর্ণ বিকাশ।

সারাজীবনের সাহিত্য ও কর্মসাধানায় বঙ্কিমচন্দ্র স্বদেশপ্রীতির মাধ্যমে এই মানবতার উত্তরই চেয়েছিলেন তাই তাঁর রচনাগুলি আজও সমান প্রাসঙ্গিক।

৩৯.৮ অনুশীলণী

১। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র রাজনীতি ও সমাজের বিভিন্ন সমস্যা ও তার প্রতিকার সম্পর্কে কি অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন তা উপস্থাপিত করুন।

২। জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গীর মূল্যায়ণ করুন।

৩। সামাজিক সাম্য বলতে বঙ্কিমচন্দ্র কি বুঝেছিলেন? অসাম্য ও তার কারণ এবং তা দূর করার জন্য বঙ্কিম কি ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন ?

৪। বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাধারার ক্ষেত্রে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিকদের প্রভাব বিষয়ে আলোচনা করুন।

৫। বঙ্কিমপূর্ব ও সমকালীন ঘটনাবলীর দ্বারা বঙ্কিমমানস কিভাবে প্রবাবিত হয়েছিল — বিশ্লেষণ করুন।

৩৯.৯ গ্রন্থপঞ্জী

১। ভবতোষ দত্ত : চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র, ১৯৭৩

২। সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায় ঃ বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা (প্রথম খন্ড), ১৯৯১

৩। ক্ষেত্র গুপ্ত (সম্পাদিত) ঃ বঙ্কিমচন্দ্র ঃ আধুনিক মন, ১৯৮৯

৪। দেবাশিস চক্রবর্তী ঃ ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার ধারা, ১৯৯৭

৫। Amal Kumar Mukhopadhyay : The Bengali Intellectual Tradition, 1979

একক ৪০ □ শ্রী অরবিন্দ

গঠন

৪০.০ উদ্দেশ্য
৪০.১ প্রস্তাবনা
৪০.২ সংক্ষিপ্ত জীবনী
৪০.৩ অরবিন্দ ও চরমপন্থী আন্দোলন
৪০.৪ আধ্যাত্মিক জাতীয়তাবাদ
৪০.৫ অরবিন্দের রাষ্ট্রদর্শন ঃ রাষ্ট্র ও ব্যক্তি
৪০.৬ অরবিন্দের শিক্ষাচিন্তা
৪০.৭ সারাংশ
৪০.৮ অনুশীলণী
৪০.৯ গ্রন্থপঞ্জী

৪০.০ উদ্দেশ্য

এই এককটিতে আলোচিত হবে :

- চরমপন্থী আন্দোলনে শ্রী অরবিন্দের ভূমিকা;
- তাঁর ভাবনায় আধ্যাত্মিকতা ও জাতীয়তাবাদী চিন্তার সমন্বয়;
- রাষ্ট্র ও ব্যক্তি সম্পর্কে তাঁর মুল্যায়ণ এবং;
- শিক্ষা সম্পর্কে অরবিন্দের চিন্তাভাবনা;

৪০.১ প্রস্তাবনা

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে ভারতবর্ষের কোন্ কোন্ অংশে কিছু ইংরেজী শিক্ষিত যুবকের রাজনৈতিক চিন্তায় বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসন উৎখাতের তত্ত্বটি রূপ পায়। ক্রমশ এই তত্ত্বটিকে অবলম্বন করে নানা স্তরের মধ্য দিয়ে এই আন্দোলনের ব্যাপ্তি ঘটে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন ঘটনাবলীর বিকাশ এই চিন্তাধারা গড়ে ওঠায় বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। এই আন্দোলকে 'জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী আন্দোলন' এবং এই ধারার সঙ্গে যুক্ত নেতা ও কর্মীদের 'চরমপন্থী বলে আখ্যায়িত করা হয়। উদারনৈতিক নরমপন্থীদের নিয়মতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ কর্মপদ্ধতির বিরুদ্ধে চরমপন্থীদের সোচ্চার প্রতিবাদ ও সংগ্রামী দৃষ্টিভঙ্গী ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক নতুন গতি সঞ্চার করে। চরমপন্থী চিন্তাধারার প্রভাবে মহারাষ্ট্র পাঞ্জাব এবং বাংলার বিপ্লবী ও জঙ্গী জাতীয়তাবাদ বিকাশ লাভ করে। মহারাষ্ট্রে বাল গঙ্গাধর

তিলক, পাঞ্জাবে লালা লাজপৎ রায় এবং বাংলাদেশে বিপিন চন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ এবং ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রমুখ ছিলেন এই চরমপন্থী আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ। এঁরা সকলেই বৈদিক যুগ, প্রাচীন ভারতীয় দর্শন, নীতিশাস্ত্র এবং দেশীয় সংস্কৃতি ও ইতিহাসের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে স্বকীয় বিশিষ্টতায় উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কটির নাম শ্রী অরবিন্দ, যিনি শুধু ভারত নয় বিশ্বের আধুনিক চিন্তা ও দর্শনের ক্ষেত্রে এক নতুন দিক উন্মোচন করে গেছেন। ফরাসী বিপ্লব, আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম, ইতালী ও আয়ার্ল্যান্ডর মুক্তি আন্দোলন প্রভৃতি তাঁকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছিলেন। যোয়ান অব আর্ক ও মাৎসিনী ছিলেন তাঁর আদর্শ। স্বামী বিবেকানন্দের মানব দর্শন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রচিন্তা তাঁকে গভীরভাবে আলোড়িত করেছিল।

শ্রী অরবিন্দের চিন্তার মূল উৎস অধ্যাত্মবাদ হলেও সমাজ ও রাজনীতি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় তিনি স্বচ্ছ, বাস্তব ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী সহকারে আলোচনা করেছেন। সাংবিধানিকও আপোষমূলক কর্মপদ্ধতির পরিবর্তে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ও বৈপ্লবিক কর্মপন্থার দিকেই তাঁর ঝোঁক ছিল বেশী। অরবিন্দ বিভিন্ন সময়ে জাতীতাবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র বিষয়ে আলোচনা করেছেন; শিক্ষা সম্পর্কেও তাঁর মৌলিক চিন্তা ভাবনা ছিল। আমরা পর্যায়ক্রমে এই বিষয়গুলি আলোচনা করব।

৪০.২ সংক্ষিপ্ত জীবনী

অসাধারণ প্রতিভা ও মনীষার অধিকারী অরবিন্দ ১৮৭২ সালের আগষ্ট মাসে কলকাতা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শ্রীকৃষ্ণধন ঘোষ ছিলেন একজন খ্যাতনামা ডাক্তার। মাতামহ শ্রী রাজনারায়ণ বসু বিদগ্ধ পুরুষ ও জাতীয় ভাবাপন্ন এক বরেণ্য নেতা। ভারতীয় ধর্ম, সমাজ ও সভ্যতার উন্নতিতে রাজনারায়ণ বসুর অবদান ছিল অসামান্য। বাল্যকালে অরবিন্দ ঘোষ তাঁর দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিলেন। পিতা কৃষ্ণধন ঘোষ পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন, সেই কারণে পুত্র অরবিন্দের দার্জিলিং সেন্ট পল্স্ স্কুলে শিক্ষার সুরু। বছর দুয়েক পর কৃষ্ণধন সপরিবারে বিলাত যাত্রা করেন।

১৮৯০ সালে অরবিন্দ মাত্র আঠার বছর বয়সে আই-সি-এস পরীক্ষা দিলেন। এই পরীক্ষায় সমস্ত বিষয়ে সসম্মানে উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও অশ্বারোহণে স্বেচ্ছাকৃতভাবে অবতীর্ণ না হয়ে তিনি সার্ভিসে যোগদান করেননি। এরপর তিনি কেম্ব্রিজের কিংস কলেজে অধ্যয়ণ করেন। ১৮৯২ সালে অরবিন্দ ক্লাসিক্সের ট্রাইপোসে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। এই সময় থেকেই তিনি রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হন। কেম্ব্রিজের ভারতীয় মজলিশে তিনি রাজনীতি বিষয়ে বক্তৃতা দিতেন। প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদের একটি গুপ্ত বিপ্লবী সংস্থা Lotus and Dagger এর সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন।

প্রায় চোদ্দ বছর তিনি প্রবাসে কাটান। গ্রীক, লটিন্ ও অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষায় তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। দেশে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি বরোদা রাজ্যে প্রথমে প্রশাসনিক কার্যে এবং পরে বরোদা কলেজের সহ-অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। কলেজে অরবিন্দ ফরাসী ও ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করতেন। এই সময়

অরবিন্দ ছিলেন খাঁটি সাহেব; বেশভূষা। চাল-চলন, কথাবার্তা সবেতেই তাঁর ওপর ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সুস্পষ্ট ছাপ। কিন্তু অন্তরে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ ভারতীয়। বরোদায় থাকাকালীন ভারতীয় সাহিত্যে, ধর্মশাস্ত্র, দর্শন সবই অরবিন্দ আত্মস্থ করেছিলেন। তিনি প্রায় বারো বছর বরোদায় ছিলেন। এই সুদীর্ঘকাল অরবিন্দের জীবনে এক মাহেন্দ্রযুগ বলে অনেকে মনে করেন। এই সময় তিনি বেদ, উপনিষদ, ষড়দর্শন, গীতা, পুরাণ সবকিছুই অধিগত করেছিলেন এবং পরবর্তী জীবনে স্বদেশ সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করার জন্য আত্ম সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন।

'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকায় অরবিন্দ 'New Lamps for Old' শীর্ষক প্রবন্ধমালা লিখতে শুরু করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রচিন্তার দ্বারা তিনি বিশেষ প্রভাবিত হয়েছিলেন। 'আনন্দমঠ' -এর আদর্শে তিনি ভবাণী মন্দির প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন। অরবিন্দ ১৯০২ সাল নাগাদ একটি গুপ্ত বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত হন কিন্তু আভ্যন্তরীণ বিবাদের ফলে তাঁর বৈপ্লবিক তৎপরতার এই প্রথম প্রয়াস ব্যর্থ হয়।

১৯০৪ সালে বোম্বাই কংগ্রেসে যোগ দিয়েই অরবিন্দ প্রকাশ্য রাজনীতিতে অবতীর্ণ হলেন। এই সময় থেকেই ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে চরমপন্থীদের অস্তিত্ব স্পষ্ট হতে শুরু করে। ১৯০৬ সালে কলকাতা কংগ্রেসে অরবিন্দ ছিলেন চরমপন্থীদের পুরোধা। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন তাঁকে ভীষণভাবে আলোড়িত করেছিলেন যার জন্যে তিনি বরোদার সম্মাণীয় পদ ত্যাগ করে কলকাতায় চলে আসেন। কলকাতায় এসে অরবিন্দ 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার সম্পাদনা কার্যে যুক্ত হন এবং বাংলার বিপ্লবীদের ঐক্যবদ্ধ করেন।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় বহু ছাত্র সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জন করেছিল। তাদের জন্য কলকাতায় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ (National Council of Educaiton) গঠিত হয় এবং অরবিন্দ তার অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করেন। কিন্তু কিছুকাল পরেই কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতানৈক্যের ফলে তিনি ঐ পদ পরিত্যাগ করেন।

১৯০৭ সালে মেদিনীপুর জেলা সম্মেলনে অরবিন্দ কংগ্রেস জাতীয় দলের নেতা হিসেবে যোগদান করলেন। এখানেই প্রকাশ্যে নরমপন্থী নেতাদের সঙ্গে জাতীয় দলের বিরোধ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। একই বছরে সুরাট কংগ্রেসে নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের বিরোধ চরম আকার ধারণ করে এবং চরমপন্থীরা অরবিন্দের সভাপতিত্বে এক পৃথক সম্মেলনে মিলিত হন। ক্রমশঃ অরবিন্দ সারা ভারতের নেতা হিসেবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন।

এরপর ১৯০৮ সালে রাজনৈতিক ডাকাতি ও গুপ্তহত্যার ষড়যন্ত্রের নায়ক হিসেবে অরবিন্দ অভিযুক্ত ও কারারুদ্ধ হন। এটিই 'আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলা' বলে খ্যাত। এই মামলায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন অরবিন্দের পক্ষ সমর্থন করেছিলেন। দেশবন্ধুর অক্লান্ত পরিশ্রম, বুদ্ধিমত্তা ও বাগ্মিতায় প্রায় একবছর পর অরবিন্দ নির্দোষ প্রমাণিত হন।

এই একবছরের কারাবাস অরবিন্দের আধ্যাত্মিক জীবনগঠনে বিশেষ অনুকূল হয়েছিল। এই সময় 'ঐশ আদেশ' পেয়েছিলেন তিনি। এরপর তাঁর স্বদেশচিন্তায় ধর্মভাব বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয়। দেশের সেবায় এই অধ্যাত্ম চেতনা জাগ্রত করার জন্য তিনি ইংরেজীতে 'কর্মযোগিন্' ও বাংলায় 'ধর্ম' নামে দুটি

পত্রিকার প্রকাশনা শুরু করেন। কর্মযোগ প্রচারই হ'ল তাঁর উদ্দেশ্য। জীবনে বেদান্ত ও যোগাদর্শ প্রয়োগই হ'ল কর্মযোগ।

১৯১০ সালে সকলের অলক্ষ্যে তিনি পণ্ডিচেরী যাত্রা করেন। তাঁর সক্রিয় রাজনৈতিক জীবনের এখানেই শেষ। ১৯১৪ সালে পণ্ডিচেরী থেকে অরবিন্দ 'আর্য' নামে একটি ইংরেজী পত্রিকার প্রকাশন শুরু করলেন। বেদ-রহস্য, উপনিষদের ব্যাখ্যা, দিব্য জীবনের আদর্শ, ভারতের সংস্কৃতি, মানবসমাজের বিবর্তনের বিশ্লেষণ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে অরবিন্দ অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও গভীর উপলব্ধির পরিচয় দিয়েছেন।

১৯২৬ সালে পণ্ডিচেরীতে অরবিন্দ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। যোগসাধনা ও আধ্যাত্মিক উপলব্ধিই এই অনাড়ম্বর আশ্রমজীবনের উদ্দেশ্য। মৌলিক চিন্তা প্রসূত ও জ্ঞানগর্ভ যেসব গ্রন্থ অরবিন্দ রচনা করেছিলেন তার অধিকাংশই এই পর্বে অর্থাৎ সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর নেবার পর লিখিত। বিভিন্ন সময়ে রচিত ও প্রকাশিত গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল 'Life Divine', 'Savitri'. 'Essays on the Geeta', 'Synthesis of Yoga', 'The Human Cycle', 'The Ideal of Human Unity' ইত্যাদি।

১৯৫০ সালে মহাযোগী শ্রী অরবিন্দের প্রয়াণ হয়। পণ্ডিচেরীর আশ্রম-প্রাঙ্গণেই তাঁকে সমধিস্থ করা হয়।

৪০.৩ অরবিন্দ ও চরমপন্থী আন্দোলন

১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ভারতের রাজনৈতিক জীবনে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কংগ্রেসের উদারনৈতিক নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি আস্থাশীল ছিলেন। তাঁরা মনে করতেন ব্রিটিশ শাসনই ভারতকে প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক ও জাতীয় মর্যাদাসম্পন্ন করে তুলতে পারে। আদি-পর্বে কংগ্রেসের নেতারা ব্রিটিশ শাসনের স্থায়িত্বশীলতাকে কাম্য বলে মনে করতেন। তাঁরা ভাবতেন ব্রিটেনের সংস্পর্শে এসে ভারত তার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতা থেকে মুক্ত হবে। ডব্লু. সি. ব্যানার্জী, দাদাভাই নৌরজী, ফিরোজ শাহ্ মেহতা, গোবিন্দ রানাডে, গোপাল কৃষ্ণ গোখলে, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ ছিলেন এই যুগের কংগ্রেস নেতা। এঁরা অধিকাংশই ছিলেন বিত্তবান, জমিদার, পুঁজিপতি অথবা উচ্চপদস্থ রাজ কর্মচারী। এঁরা সুশৃঙ্খল রাজনৈতিক অগ্রগতি দাবি করেছিলেন। সর্বপ্রকার বিদ্রোহ বা সংঘাতমূলক কাজকর্মের পরিবর্তে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পথকেই একমাত্র রাজনৈতিক পথ বলে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা পশ্চিমী ধাঁচে সংবাদপত্র ও রাজনৈতিক মঞ্চের মাধ্যমে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন চালিয়ে প্রশাসনিক সংস্কার আদায়ে উদ্যোগী হয়েছিলেন। কিন্তু ১৮৯২ সালের ইন্ডিয়ান কাউন্সিল এ্যাক্ট কংগ্রেসের দাবীগুলিকে রূপায়িত করেনি। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, ভারতীয়দের সিভিল সার্ভিসের অধিকার দাবী, ভারতীয় শিল্পের স্বার্থবিরোধী শুল্কনীতি ইত্যাদির সমালোচনা ব্রিটিশ শাসকেরা সুনজরে দেখেননি। ফলে এই পর্ব থেকেই সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের সঙ্গে ভারতীয় স্বার্থের সংঘাত শুরু হয়ে যায়। নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশ্বাসী ভারতীয় বুদ্ধিজীবিদের একাংশ কংগ্রেসের পদ্ধতির সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠেন। শুরু হয় বিকল্প মত ও পক্ষের সন্ধান।

ঊনিশ শতকের শেষভাগে মহারাষ্ট্রের দামোদরহরি চাপেকার কংগ্রেসের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেছিলেন, শুধুমাত্র বক্তৃতা দিয়ে কংগ্রেস ভারতীয়দের ঐক্যবদ্ধ করতে পারবে না।

স্বামী বিবেকানন্দ কংগ্রেসের সমালোচনা করে জানিয়েছিলেন কংগ্রেসের প্রতি তাঁর কোন আস্থা নেই কারণ শুধুমাত্র কয়েকটি প্রস্তাব পাশ করিয়ে দেশের স্বাধীনতা আনা যায়না। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাস ও সমালোচনামূলক প্রবন্ধের সাহায্যে পরোক্ষে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতর সমালোচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত 'আনন্দমঠ' উপন্যাস ও 'বন্দেমাতরম্' কবিতা তৎকালীন যুবসমাজে বিপ্লবী আদর্শে উদ্বুদ্ধ করেছিল। রবীনদ্রনাথ ঠাকুরও এই আবেদন-নিবেদন সর্বস্ব রাজনীতিকে কখনোই সমর্থন করেননি। আপোষকামী রাজনৈতিক নেতাদের ভিক্ষাবৃত্তি তাঁকে মর্মাহত করেছিল।

এই সময় থেকেই ভারতে ব্রিটিশ শাসন ও শোষণের অনমনীয় নীতির বিরুদ্ধে এবং কংগ্রেসের নরমপন্থী নেতাদের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে চরমপন্থী চিন্তাধারার বিকাশ ঘটে। এই চিন্তাধারার প্রভাব সবচেয়ে বেশী লক্ষ্য করা যায় মহারাষ্ট্র, বাংলা এবং পাঞ্জাবে।

মহারাষ্ট্রে সংগ্রামী জাতীয় চেতনার জনক ছিলেন বাল গঙ্গাধর তিলক। নরমপন্থীদের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে তিনি গণ-আন্দোলনমুখী রাজনীতির প্রবর্তন করেছিলেন। ইংরাজী সাপ্তাহিক 'মারাঠা' এবং মারাঠী সাপ্তাহীক 'কেশরী'র মাধ্যমে যুবশক্তির মধ্যে জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী আদর্শ সঞ্চারিত করেছিলেন তিলক। শিবাজী উৎসব ও গণপতি উৎসব প্রবর্তন করে তিনি রাজনীতিতে সাধারণ মানুষের যোগদানের পথ প্রশস্ত করেছিলেন। ' হোমরুল' আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন তিলক।

পাঞ্জাবের চরমপন্থী আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন লালা লাজপৎ রায়। তিনি নরমপন্থী কংগ্রেস আন্দোলনকে ইংরেজী শিক্ষিত ও সঙ্গতিসম্পন্ন ভারতীয়দের বাৎসরিক অনুষ্ঠান বলে বর্ণনা করেছিলেন। তাঁর মতে এই উৎসব নেতাদের আত্মগরিমা ও বাগাড়ম্বর প্রকাশের মঞ্চমাত্র। তিনি স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে সর্বভারতীয় স্তরে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। লাজপৎ রায় নিখিলভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি ছিলেন এবং শ্রমিক সংগঠনগুলিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী ও ভারতীয় পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।

বাংলাদেশে চরমপন্থী নীতি ও কর্মধারা প্রচার করেছিলেন মূলতঃ বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ ও ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। এঁরা সকলেই বৈদিক যুগ, প্রাচীন ভারতীয় দর্শন, নীতিশাস্ত্র এবং দেশীয় সংস্কৃতি ও ইতিহাসের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপান্যাসের 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত বিশেষ করে বাংলাদেশের সংগ্রামমুখী আন্দোলনকে উদ্দীপিত করেছিলো। অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র এবং ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'মাতৃবাদ' (Mother Cult) প্রচার করেছিলেন অরবিন্দ আনন্দমঠের আদর্শে ভবানী মন্দীর প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছিলেন।

বাংলা তথা ভারতবর্ষের চরমপন্থী আন্দোলনে অরবিন্দ ঘোষ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে

আছেন। বিলাত থেকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তণের পর তাঁর প্রথম রাজনৈতিক ভূমিকা ছিল 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকায়, 'New Lamps for Old' প্রবন্ধ মামলায় তাঁর বক্তব্য প্রচার করা।

অরবিন্দ কংগ্রেসের আন্দোলন, কর্মপদ্ধতি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে তীক্ষ্ণ সমালোচনামূলক প্রবন্ধ লেখেন। তিনি কংগ্রেসকে 'একটি ব্যর্থ সংগঠণ' বলে অভিহিত করেন। ঊনিশ শতকের শেষভাগে অরবিন্দই সম্ভবত প্রথম সমালোচক যিনি কংগ্রেসকে 'বিজাতীয়' ও 'জনসমর্থনহীন' প্রতিষ্ঠান এবং কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দকে 'দুর্বল, ভীরু ও স্বার্থপর, ভন্ড এবং অন্ধভাবাচ্ছন্ন' বলে বর্ণনা করেছেন। অরবিন্দ লিখেছিলেন — "a body like the congress, which represents not the mass of the population, but a single and very limited class, could not honestly be called national." তাঁর মতে, উচ্চবিত্ত পরিচালিত কংগ্রেস জনসাধারণের দুঃখদুর্দশা দূর করতে সক্ষম হবেনা।

ঊনিশ শতকের শেষভাগ থেকে সারা বিশ্বের সামন্ততন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনগুলি ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। এর ফলে জাতীয় আন্দোলন নতুন চেতনার বিকাশ ও নতুন রাজনৈতিক পদ্ধতির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। অরবিন্দ ফরাসী বিপ্লব, আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামে, ইতালীর মুক্তি সংগ্রাম এবং আয়ারল্যান্ডের 'সিন্ ফিন্' আন্দোলন দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

১৯০৪ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে অরবিন্দ বিশিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। তিনি নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন বিরোধী কংগ্রেস কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ করতে সচেষ্ট হন এবং সুসংবদ্ধ কর্মসূচীভিত্তিক আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তার কথা প্রচার করেন। মহারাষ্ট্রের বালগঙ্গাধর তিলক, পাঞ্জাবের লালা লাজপৎ রায় এবং বাংলার অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র পাল ও ব্রহ্মাবান্ধব উপাধ্যায় একসাথে মিলিত হয়ে কংগ্রেসের নরমপন্থী মতাদর্শ ও কর্মসূচীর বিরুদ্ধে এক বিকল্প চরমপন্থী রাজনৈতিক পন্থা উদ্ভাবন করলেন।

১৯০৬ সালের কলকাতা কংগ্রেসে নরমপন্থী ও চরমপন্থী মতাদর্শের সংঘাত তীব্র আকার ধারণ করে। চরমপন্থীরা অধিবেশন ছেড়ে বেড়িয়ে এলেও তাঁদের চাপে চারটি বিষয়ে নরমপন্থীদের সম্মতি দিতে হয়েছিল। সেই চারটি বিষয় হ'ল— স্বরাজ, জাতীয় শিক্ষা, স্বদেশী পণ্যের ব্যবহার ও বিদেশী বস্ত্র বয়কট। বিশেষ করে বয়কটের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রস্তাব কংগ্রেসের নরমপন্থীদের দিয়ে অনুমোদন করানো চরমপন্থীদের পক্ষে এক বিশেষ সাফল্য সূচিত করেছিল।

এই বয়কট আন্দোলন ক্রমশঃ সারা ভারতে ছাড়িয়ে পড়ে। এই সময়ে শ্রী অরবিন্দ বয়কটকে কেন্দ্র করে তাঁর নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ (Passive Resistance) এর তত্ত্ব রচনা করেন। অরবিন্দর মতে, বিদেশী সরকারের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ জাতীয় প্রতিরোধ তিনটি পন্থা অবলম্বন করতে পারে — নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ (Passive Resistance), আগ্রাসী প্রতিরোধ (Agressive Resistance), এবং সশস্ত্র বিপ্লব (Armed Revolt)। একটি পরাধীন জাতি তার স্বাধীনতা অর্জনে জন্য উপরোক্ত তিনটি পদ্ধতির কোনটি অবলম্বন করবে তা নির্ধারিত হয় তার দাসত্বের বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে।

'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ' তিনটি মূল সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথমত, অন্যান্য এবং দমনমূলক কোন আইন লঙ্ঘন করা শুধুমাত্র সমর্থনযোগ্য নয়, ক্ষেত্রবিশেষে তা অবশ্যকর্তব্যও বটে। দ্বিতীয়ত, অন্যান্য প্রশাসনিক নির্দেশ এবং বলপূর্বক (Coercive) হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সঙ্গত ও অবশ্য পালনীয় কর্তব্য এবং তৃতীয়ত, বিদেশী দ্রব্য বর্জন করা, বিদেশী দ্রব্য ব্যবহারকারীদের বর্জন করা এবং স্বৈরাচারী ন্যায়নীতিহীন সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা করা একান্ত কাম্য।

অরবিন্দ বলেছিলেন, ভারতীয়রা যদি সরকারী বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষাদান করতে, সরকারী অফিসে চাকরী করতে এবং বিদেশী পুলিশকে মান্য করতে অসম্মত হয় তাহলে বিদেশী প্রশাসনের পক্ষে আর একদিনও কাজ চালানো সম্ভব হবে না। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন অরবিন্দের 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের' ধারণার সঙ্গে গান্ধীজীর 'সত্যাগ্রহের' ধারণার পার্থক্য অনেকটাই। অহিংসা গান্ধীজীর মূলমন্ত্র, কিন্তু 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের ভিত্তি অহিংসা নয়।

অরবিন্দ ও অন্যান্য চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ বয়কটকে সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য ও বিদেশী অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে প্রয়োগের জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। বয়কট আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ভারতের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করাই ছিল তাঁদের মূল লক্ষ্য।

জাতীয় শিক্ষার প্রশ্নেও নরমপন্থী ও চরমপন্থী নেতৃত্বের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা যায়। স্বদেশী বয়কট আন্দোলনের প্রাণশক্তি ছিল বাংলার ছাত্র-যুবসমাজ। ব্রিটিশ শাসক ছাত্রদের সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করাকে অপরাধ বলে ঘোষণা করে, 'বন্দেমাতরম্' উচ্চারণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এর প্রতিবাদে ছাত্ররা সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বয়কটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা পরীক্ষা বর্জন করে। ছাত্র আন্দোলন যাতে নিয়ন্ত্রণের বাইরে না চলে যায় সেইজন্য নরমপন্থী নেতারা বিকল্প শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলায় উদ্যোগী হলেন।

১৯০৬ সালে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠিত হয়। সরকারী শিক্ষা ব্যবস্থার বিকল্প হিসাবে বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কলেজের প্রতিষ্ঠাতা-অধ্যক্ষ ছিলেন শ্রী অরবিন্দ। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সংগ্রাম-বিমুখ পরিচালনা ব্যবস্থা এবং পাঠ্যসূচীকে অরবিন্দ মেনে নিতে পারেননি ফলে তিনি শ্রীঘ্রই কলেজের সঙ্গে সকল সংশ্রব ত্যাগ করেন।

অরবিন্দ 'বন্দেমাতরম' পত্রিকার মাধ্যমে স্বদেশী আন্দোলনের সমর্থনে জনমত গড়ে তোলেন। ব্রিটিশ শাসনের অবসানই যে মুক্তির একমাত্র পথ সেকথা তিনি স্পষ্ট ভাষায় প্রচার করেছিলেন।

চরমপন্থী নেতৃবৃন্দের সাফল্যে নরমপন্থী নেতারা ভীত হয়েছিলেন এবং ১৯০৭ সালের সুরাট কংগ্রেসে তাঁরা সর্বশক্তি দিয়ে চরমপন্থীদের বিচ্ছিন্ন করতে প্রয়াসী হলেন। বিতর্কিত খসড়া প্রস্তাব এবং সভাপতি পদের জন্য মনোনয়ন ঘিরে অধিবেশনের প্রথম দিন থেকেই তীব্র বাদানুবাদ ও ধস্তাধস্তি শুরু হয় এবং অবশেষে অধিবেশন ভণ্ডুল হয়ে যায়। নরমপন্থীরা পরে পৃথক সম্মেলন করেন। অপরদিকে চরমপন্থীরাও

স্বতন্ত্র একটি সভায় ১৯০৬ সালের প্রস্তাবগুলি পুনরায় অনুমোদন করেন। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রী-অরবিন্দ। পরবর্তী একবছরের মধ্যেই নরমপন্থীরা চরমপন্থীদের সম্পূর্ণ ভাবে বিচ্ছিন্ন করে কংগ্রেসে নিজেদের আধিপত্য ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হলেন।

৪০.৪ আধ্যাত্মিক জাতীয়তাবাদ

শ্রী অরবিন্দের সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হ'ল তাঁর জাতীয়তাবাদের ধারণা। ভারতবর্ষকে তিনি যে একটি জাতি হিসেবে কল্পনা করেছিলেন তা উদ্ভূত হয়েছিল তাঁর জাতীয়তাবাদ ও জাতি-আত্মার (Nationalism and Nation-soul) ধারণা থেকে।

জাতীয়তাবাদকে শ্রী অরবিন্দ প্রচলিত অর্থে গ্রহণ করেননি। জাতীয়তাবাদের বস্তুগত ভিত্তির উপর তাঁর বিশেষ আস্থা ছিল না। একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী দৈনন্দিন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থপূরণের মধ্য দিয়েই আত্মসচেতন হয়ে ওঠে এবং ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ হয় — অন্যথায় কখনোই একটি জাতি গড়ে উঠতে পারেনা একথা অরবিন্দ বিশ্বাস করতেননা। তাঁর মতে, একটি জাতি তখনই বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে যখন তার মধ্যে জাতীয় আত্মা জাগ্রত হয়। মানুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক বিবর্তনের একটি ধাপ হল জাতীয়তা। জাতীয়তাবাদকে অরবিন্দ নিছক দেশাত্মবোধের দৃষ্টিতে দেখেননি। তার পশ্চাতে তিনি এক নিগূঢ় আধ্যাত্মিক সাধনার চিন্তা পোষণ করতেন। তিনি লিখেছিলেন "জাতীয়তা একটা রাজনীতিক কর্মপদ্ধতি নহে, জাতীয়তা ভগবানসম্ভূত ধর্ম। জাতীয়তা কখনই বিনষ্ট হইবে না। . . . . ভাগবৎ শক্তিতেই জাতীয়তা টিকিয়া থাকিবে। যে কোন প্রকার অস্ত্রই ইহার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হউক না কেন, জাতীয়তা অমর, কারণ ইহা মানবীয় জিনিস নহে . . . . ।"

অরবিন্দ তাঁর দেশবাসীকে নিজের জাতির বিশেষ গৌরবের প্রতি সজাগ হবার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাঁর একাধিক রচনায় ও বক্তৃতায় তিনি বারবার উল্লেখ করেছেন ভারতবর্ষের মহান আদর্শ ও ঐতিহ্যের কথা। তিনি ভারতবর্ষকে দেখেছেন পৃথিবীর একটি প্রাচীনতম ও উন্নততম সভ্যতা হিসাবে। ভারত ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গীর উপর ভিত্তি করেই তিনি নির্মাণ করেছিলেন এই মহান ভারতবর্ষের ধারণা। দেশ ও তার অধিবাসীদের মধ্যে তিনি ঈশ্বরের সন্ধান করেছিলেন। রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের এই সংমিশ্রণ চিন্তাকে হিন্দু পুনর্জাগরণ প্রয়াস বলে মনে করেন। শ্রী অরবিন্দ বিশ্বাস করতেন যে, ভারতবর্ষের মহত্ত্ব ঈশ্বরের মহত্ত্বেরই বহিঃপ্রকাশ।

অরবিন্দ বলেছিলেন পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার আলোকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের স্বরূপ অনুধাবন করা সম্ভব নয়। অন্যান্য দেশের মত কেবলমাত্র পার্থিব সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি। শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার। শক্তিশালী সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন নির্মাণ, সামরিক শক্তি অর্জন, রাজনৈতিক ক্ষমতার সম্প্রসারণ এবং এই সবের সাহায্যে পৃথিবীর অন্যান্য জাতির উপর প্রভুত্ব করা কখনোই ভারতবর্ষের

একমাত্র লক্ষ্য হতে পারে না। পার্থিব অগ্রগতির প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু সেটাই শেষ কথা নয়। ভারতবর্ষের সামনে মূল ও বৃহত্তর অভীষ্ট হ'ল তার আধ্যাত্মিক বিকাশ ও উন্নতি।

আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রশ্নটি শুধুমাত্র ভারতবর্ষের স্বার্থের সঙ্গেই জড়িত নয়, সমগ্র বিশ্বের বৃহত্তর স্বার্থ ও কল্যাণেরও পক্ষে তা অতি প্রয়োজনীয়। কারণ আধুনিক বিশ্ব পার্থিব উন্নয়ণ ও দৈনন্দিন সুখস্বাচ্ছন্দ্য আহরণের তীব্র প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে আজ সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছে যাবতীয় নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ এবং এই অবনয়ণের মধ্যেই নিহিত রয়েছে আধুনিক সভ্যতার ব্যর্থতার কারণ। ভারতবর্ষই একমাত্র দেশ, যে তাঁর আধ্যাত্মিক সম্পদের বলে বলীয়ান হয়ে সারা পৃথিবীকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব দিতে পারে এবং প্রকৃত উন্নতির পথ প্রদর্শন করতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষকে যদি এই দায়িত্ব পালন করতে হয়, তবে সর্বাগ্রে তার প্রয়োজন রাজনৈন্তিক স্বাধীনতা। এই জন্যই শ্রী অরবিন্দ দ্বিধাহীনভাবে দাবি করেছিলেন ভারতবর্ষের জন্য পূর্ণ রাজনৈতিক স্বরাজ। তিনি বলেছিলেন —

" . . . . to strive for anything less than a strong and glorious freedom would be to insult the greatness of our past and the magnificient possibilities of our future."

তবে রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে অরবিন্দ চরম লক্ষ্য হিসাবে দেখেননি। রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভ তাঁর কাছে ছিল আরও বৃহত্তর লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার একটি উপায় মাত্র এবং এই বৃহত্তর লক্ষ্য হ'ল ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তার হৃত গৌরব ও ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার করা। প্রকৃত পক্ষে 'স্বরাজ' বলতে তিনি শুধুমাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে বোঝাননি। স্বরাজের মধ্য দিয়ে অরবিন্দ ভারতের সনাতন ভাবধারা ও রাজনীতিতে বৈদান্তিক আদর্শের প্রতিষ্ঠা চেয়েছেন। তাঁর মতে দেশপ্রেম ও আত্মদানের মাধ্যমেই স্বরাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব। ভারতবর্ষ ছিল তাঁর কাছে দেশমাতৃকা। দেশের মুক্তিসাধনা তাঁর কাছে যজ্ঞের ন্যায় আর সেই যজ্ঞের আরাধ্যা হলেন দেশমাতৃকা। আত্মাহুতির মাধ্যমে অরবিন্দ দেশমাতৃকার মুক্তি কামনা করেছিলেন। আর সেই দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি কল্পনা করেছিলেন এমন এক উন্নত মানবগোষ্ঠীর যার মাধমে ভারতের সনাতন অন্তরাত্মার পুনরুজ্জীবন ঘঠবে।

শ্রী অরবিন্দের জাতীয়তাবাদী চিন্তায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারার সমন্বয় ঘটেছিল। ফরাসী বিপ্লবের পর থেকেই ইউরোপের বিভিন্ন দেশে স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষের ঐক্যের আকাঙ্খা ও স্বদেশপ্রেমের আবেগ প্রবল হয়। সমকালীন পাশ্চাত্য চিন্তাবিদ ও দার্শনিক বার্ক, মাৎসিনী, মিল প্রমুখের চিন্তাধারায় ভারতীয় নেতৃবৃন্দ বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। অরবিন্দও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। মাৎসিনী জাতীয়তাবাদের এক নৈতিক ও বিশ্বজনীন স্বরূপ প্রকাশ করেছিলেন যা অরবিন্দকে আকৃষ্ট করেছিল। জাতীয়তাবাদকে পর্যালোচনা করার সমকালীন যান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে পবিত্র দেশপ্রেম ও আধ্যাত্মিক ঐক্যের আবেগ সঞ্চারিত করেছিলেন অরবিন্দ। বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবাদী চিন্তা দ্বারাও বিশেষ অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন অরবিন্দ, তাঁর মতে দেশকে মাতৃরূপে কল্পনা করা বঙ্কিমচন্দ্রের অবদান। তাঁর ভাবনায় স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাবের কথা পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে।

৪০.৫ অরবিন্দের রাষ্ট্র দর্শন ঃ রাষ্ট্র ও ব্যক্তি

শ্রী অরবিন্দ সমাজ ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও বিবর্তনকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনটি উপাদানের কথা বলেছেন — ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও মানবসমাজ, এগুলির প্রতিটি অপরের আনুকূল্যে নিজ পথে বিকশিত হয়ে থাকে। প্রাকৃতিক প্রবণতায় ব্যক্তি তার জীবনের বাহির ও অন্তরকে গোষ্ঠীর সাহায্যে বিকশিত করে আবার গোষ্ঠীও ক্রমে ক্রমে বৃহত্তর মানবসমাজে মিশে যায়। একদিকে ব্যক্তিমানুষ ও অপরদিকে বৃহত্তর মানবসমাজ গোষ্ঠীকে পরিপুষ্ট করে।

শ্রী অরবিন্দের মতে রাষ্ট্র হ'ল সংগঠিত জনসমাজ যার জন্য ব্যক্তি সবসময়ই স্বার্থত্যাগ করছে। রাষ্ট্র চায় ব্যক্তির অধিকার হরণ করে গোষ্ঠীর যূপকাষ্ঠে তাকে বলি দিতে। বস্তুতঃ রাষ্ট্র বা সামগ্রিক স্বার্থের কাছে ব্যক্তি স্বার্থের নতিস্বীকার আসলে কয়েকজন বিশেষ ব্যক্তি বা শ্রেণীর স্বার্থের কাছে নতিস্বীকার। বর্তমান রাষ্ট্রে ক্ষমতাশীল দল বা শ্রেণী জনগণের আশা আকাঙ্খাকে প্রতিফলিত করে না, রাষ্ট্রের যান্ত্রিক ও আমলাতান্ত্রিক পরিবেশ দেশের শ্রেষ্ঠ মনন ও চিন্তনের কোন চিহ্নই দেখা যায়না। তাঁর মতে রাষ্ট্র সকলের সর্বাঙ্গীন মঙ্গলসাধনতো করেই না বরং সঙ্ঘবদ্ধভাবে ক্ষতিসাধন করে।

অরবিন্দ রাষ্ট্র সম্পর্কে জৈব মতবাদের ধারণাকে গ্রহণ করেননি, "জীবের যা ধর্ম অর্থাৎ স্বাধীন, সুষম ও বৈচিত্রপূর্ণ বিকাশ — তার অবকাশ রাষ্ট্রের মধ্যে অনুপস্থিত।" তাঁর মতে রাষ্ট্র হচ্ছে একটি বিশেষ নিয়ন্ত্রণী শক্তি যা কাজ করে যান্ত্রিকভাবে এবং যার আচরণ স্থূল, নিষ্প্রাণ ও নিষ্করণ। 'The Ideal of Human Unity' গ্রন্থে তিনি বলেছেন,

" . . . . the state is not an organism ; it is a machinery, and it works like a machine, without tact, taste, delicacy or intuition. It tries to manufacture, but what humanity is here to do is to grow and create." এই প্রসঙ্গে বিশিষ্ট ব্রিটিশ চিন্তাবিদ হবহাউসের (L.T.Hobhouse) সঙ্গে অরবিন্দের চিন্তার মিল লক্ষ্য করা যায় যিনি বলেছিলেন, "State is a clumsy machine."

প্রকৃতিগতভাবে মানুষ চায় চিন্তার স্বাধীনতা, নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী জীবনের বিকাশ ও তার সৃষ্টিশীল কর্মোদ্যমের উপযুক্ত পরিবেশ। কিন্তু রাষ্ট্র তার অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। শ্রী অরবিন্দ বলেছেন ব্যক্তির উন্নতিই রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ আদর্শ হওয়া উচিত। কিন্তু রাষ্ট্র একটি বিশেষ দর্শন বা আদর্শ যা একটি বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থসিদ্ধির সহায়ক, তা সাধারণের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করে। রাষ্ট্র পরিচালিত শিক্ষা, সংস্কৃতি ও আদর্শের উপযোগীতা থাকলেও তা বহুক্ষেত্রে ব্যক্তির চিন্তা ও স্বাধীনতায় অনাবশ্যক ও অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ হয়ে দাঁড়ায়। অরবিন্দের মতে বৈচিত্র্যের মধ্যেই জীবনের সার্থকতা। তাই সবকিছুকে একই ছাঁচে গড়ার কল্পনা প্রকৃতি বিরোধী। তবে প্রকৃতি বিভেদের মধ্যে সংহতি সাধনও করে। বহু ও বিচিত্রের মধ্যে ঐক্য আনে। অরবিন্দ ঐক্যের ওপর জোর দিয়েছেন, কারণ ঐক্য ছাড়া স্থায়িত্ব, শৃঙ্খলা ও দৃঢ়তা থাকেনা।

শ্রী অরবিন্দ আদর্শ মানবসমাজের যে চিত্র কল্পনা করেছেন সেখানে রাজারাজড়া, যাজক সম্প্রদায় ও অভিজাত শ্রেণীর আধিপত্য থাকবেনা। প্রতিষ্ঠিত হবে মানুষের সমানাধিকার। "স্বাধীন সমবায়ী সম্পর্কের ভিত্তিতে মানুষ সাম্প্রদায়িক ও জাতীয় যূথবদ্ধতা অতিক্রম করে বিশ্বজনীন সাম্য, মৈত্রী ও মুক্তির আস্বাদ পাবে।" তিনি আধ্যাত্মিক আদর্শে প্রতিষ্ঠিত এক সমাজের কথা ভেবেছেন যা সকলের জীবনকেই করে তুলবে সুন্দর ও সার্থক।

আদর্শবাদী রাষ্ট্রতত্ত্বের সঙ্গে কোথাও কোথাও শ্রী অরবিন্দের রাষ্ট্রপচিন্তার সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। হেগেল প্রমুখ জার্মানি আদর্শবাদীরা অরবিন্দের মতই অধ্যাত্মবাদে বিশ্বাস করতেন। অরবিন্দ বিশ্বাতীত দিব্য আধ্যাত্মিক সত্তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। হেগেলের মতই তিনি জাতির অন্তরাত্মায় বিশ্বাসী ছিলেন কিন্তু জার্মান দার্শনিকগণ রাষ্ট্রকে সর্বশক্তিমান হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তাঁদের মতে রাষ্ট্র থেকেই মানুষের অধিকার সৃষ্টি। ইংরেজ আদর্শবাদীগণও যেমন গ্রীণ, ব্রাডলে, বোসানকোয়েত — রাষ্ট্রশক্তির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অরবিন্দের ভাষায় রাষ্ট্র হ'ল একটি নিয়ন্ত্রণী শক্তি যা কৌশল ও কোমলতাহীন এক যন্ত্রমাত্র। গ্রীক আদর্শবাদী প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের সঙ্গেও অরবিন্দের রাষ্ট্র সম্পর্কিত ধারণার যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। তাঁদের মতে রাষ্ট্রের স্থান ব্যক্তির উপরে। কিন্তু অরবিন্দের মতে ব্যক্তিই প্রধান, ব্যক্তির আত্মিক উন্নতিই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।

অরবিন্দের মতে প্রাচীন সমাজ রাষ্ট্রদ্বারা শাসিত হ'ত না। কিন্তু কালক্রমে রাষ্ট্রের অধীন সরকারের হাতে যখন শাসনক্ষমতা এল তখন থেকেই সংখ্যাগরিষ্ঠ অথবা সংখ্যালঘিষ্ঠ শাসকদের দাপটে ব্যক্তিস্বাধীনতা সংকুচিত হতে থাকে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র থেকেই গণতান্ত্রিক অধিকারের চেতনা জন্মলাভ করে এবং মানুষ নিজের বিবেক ও প্রবণতা অনুযায়ী নিজের মত প্রকাশ করতে চায়। এইভাবেই গড়ে ওঠে তার নিজস্ব ব্যক্তিসত্তা। সেই স্বাধীনতা তাই অবাধ হওয়া প্রয়োজন, আবার একই সঙ্গে সেই যুক্তিবোধ গড়ে ওঠা প্রয়োজন যা অপরের অনুরূপ স্বাধীনতা ও মর্যার্দার অধিকারকে স্বীকার করে নেয়। কিন্তু এই যুক্তিবোধ সকল মানুষের মনে যথাযথ বিকশিত না হলে লোকে সংকীর্ণ স্বার্থ দ্বারা চালিত হয়। অপরের সঙ্গে সুসমঞ্জস সম্পর্ক গড়ে না তুলে বিবাদ বিরোধে লিপ্ত হয়ে ওঠে।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের এই সংকট, যার পরিণতি সামাজিক ও রাজনৈতিক অরাজকতা— তার থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায়, শ্রী অরবিন্দের মতে, উপযুক্ত শিক্ষার বিস্তার। এই সর্বজনীন শিক্ষার মাধ্যমেই মানুষের মনে সঠিক যুক্তিবোধের উন্মেষ ঘটাতে হবে।

৪০.৬ শ্রী অরবিন্দের শিক্ষাচিন্তা

'A System of National Education' গ্রন্থে শ্রী অরবিন্দ তাঁর শিক্ষা সম্পর্কে মৌলিক চিন্তাভাবনাকে লিপিবদ্ধ করেছেন।

তাঁর মতে মানুষ সকল শিক্ষণীয় বিষয়ই অন্তরে ধারণ করে থাকে। শিক্ষার ভূমিকা হ'ল বহির্জগতের অভিজ্ঞতার সঙ্গে শিক্ষার্থীর অন্তর্লোকের মিলন ঘটিয়ে দেওয়া। আর শিক্ষকের কাজ হ'ল শিক্ষার্থীর প্রবণতা

অনুযায়ী তার জ্ঞানার্জনের প্রয়াসকে সঠিক পথে পরিচালনা করা। এক্ষেত্রে শিক্ষক শুধুই একজন পথপ্রদর্শক। খবরদারি করা তাঁর কাজ নয়।

অরবিন্দ বলেছেন, "the mind has to be consulted in its own growth." প্রত্যেক শিক্ষার্থীর নিজস্ব মানসিক বৈশিষ্ট্য, ক্ষমতা ও প্রবণতা থাকে যার সন্ধান শিক্ষকের থাকা অবশ্যকর্তব্য। শিক্ষক বা অভিভাবক যদি শিক্ষার্থীর রুচি ও প্রবণতাকে উপেক্ষা করে তার ভবিষ্যৎ কর্মজীবন আগে থেকেই নির্ধারণ করে দেন তবে তার ফল হবে বিষময়। অরবিন্দের মতে, "Everyone has in him something divine, something his own . . . . . the chief aim of education should be to help the growing soul to draw out that in itself which is best and make it perfect for a noble use."

শ্রীঅরবিন্দ ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে প্রাধান্য দিলেও তার সংকট সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। ব্যক্তিস্বাধীনতা মানুষের ইচ্ছা, প্রবণতা, আবেগ ইত্যাদির প্রকাশ ও বিকাশ সম্ভব করে তোলে। তাই স্বাধীনতা হওয়া উচিত অবাধ। কিন্তু একই সঙ্গে অপরের অনুরূপ স্বাধীনতা ও অধিকারকেও সমান মর্যাদা দিতে হবে।

সঠিক যুক্তিবোধ যদি বিকশিত না হয় তাহলে ব্যক্তি সংকীর্ণ স্বার্থ দ্বারা চালিত হয় এবং অপরের সঙ্গে সমন্বয়ের পরিবর্তে তার উপর নিজস্ব মতামত চাপিয়ে দিয়ে বিরোধে লিপ্ত হয়। অরবিন্দ বলছেন এর ফলে গণতন্ত্রের নামে অসংখ্য অজ্ঞ অভাগা মানুষের উপর শ্রেণীবিশেষের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। অপর পক্ষে পদানত মানুষ যথার্থ গণতন্ত্রের দাবীতে সাম্য ও স্বাধীনতার জন্য ঐ শ্রেণীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় এবং সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এর পরিণতি হ'ল এক প্রতিযোগিতামূলক সমাজ সম্পর্ক যা অরবিন্দের মতে "not a rational order of society."

ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের এই সংকট থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে অরবিন্দ সর্বজনীন শিক্ষাবিস্তারের কথা বলেছেন যার প্রধান লক্ষ্য হ'ল মানুষের মনে যুক্তি বোধের সঞ্চার। এই শিক্ষাব্যবস্থার কর্মসূচী হবে ত্রিবিধঃ

(১) কোন কিছুকে বিচার করতে হলে কেমনভাবে দেখতে ও জানতে হয় তা বোঝানো;

(২) সঠিক ও অর্থবহ প্রণালীতে চিন্তা করতে শেখানো; এবং

(৩) চিন্তাভাবনা ও জ্ঞানকে যাতে সবাই নিজের ও অপরের কল্যাণে নিয়োগ করতে পারে তাদের সেইভাবে তৈরি করা।

অরবিন্দের মতে শিক্ষার্থীর মানসিক পশ্চাৎপট বিবেচনা করা প্রয়োজন। মানুষের চরিত্র ও প্রকৃতি নির্ধারিত হয় পূর্বকৃত কর্মফলের ভিত্তিতে। বংশ, জাতি, দেশ, কাল ও পরিবেশ দ্বারা মনুষ্যচরিত্র প্রভাবিত হয়। নিজ প্রকৃতি সহ আত্মা মাতৃজঠরে দেহ ধারণ করে। পিতামাতার সত্তা নিয়ে জন্মগ্রহণের পর কালক্রমে মানুষ পরিবার, জাতি ও সমাজের গুনাগুণ অর্জন করে। সুতরাং শিক্ষার্থীর মানসিক বিকাশের আনুপূর্বিক প্রভাব, পরিবেশ এবং তার অতীত সম্পর্কেও জ্ঞান থাকা দরকার।

শ্রী অরবিন্দ মনকে চারটি স্তরে বিন্যস্ত করেছেন — চিত্ত, মানস, বুদ্ধি ও স্বজ্ঞা। চিত্ত হ'ল স্মৃতির

ধারক ও বাহক। সেখানে সঞ্চিত নিষ্ক্রিয় স্মৃতি থেকে সক্রিয় স্মৃতি উৎপন্ন হয়। নিষ্ক্রিয় স্মৃতি অতীতের ছাপমাত্র। মানুষের জীবনে তার প্রত্যক্ষ কোন ভূমিকা নেই যদিও সেই অচেতন ছাপ মুছে ফেলা সম্ভব নয়। সক্রিয় স্মৃতি নিরন্তর মনকে বিকশিত করে।

দ্বিতীয় স্তর হ'ল মানস। পঞ্চেন্দ্রিয় হ'ল মানসের ভিত্তি। শিক্ষার্থীকে কোন বিষয়ে শেখানোর সময় যদি সেই বস্তুটি সরাসরি তার সামনে প্রদর্শন করা যায় তবে সহজেই সেই বিষয়টি তার মনে গেঁথে যায়। মানসিক শক্তি মানসস্তর প্রসূত এবং সেকারণেই মানসের প্রতিনিয়ত পরিশীলন প্রয়োজন। এ ব্যাপারে অরবিন্দ যোগসাধনার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং ছোটবেলা থেকেই যোগাভ্যাসের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন।

মনের তৃতীয় স্তর বুদ্ধি, পঞ্চ ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান এই স্তরে সুসংবদ্ধ হয়। বৌদ্ধিক স্তরের ক্রিয়াগুলি কখনও সৃজনশীল ও সামঞ্জস্যবিধানকারী আবার কখনও অনুসন্ধানী ও বিশ্লেষণমূলক। কল্পনাশক্তি, সৌন্দর্যবোধ, যুক্তিবোধ প্রভৃতি এই স্তর থেকেই উৎসারিত হয়। একজন শিক্ষকের মূল কর্তব্য হ'ল শিক্ষার্থীর কল্পনাশক্তির বিকাশে সহায়তা করা। প্রথমে তার দৃষ্টি বস্তুর প্রতি আকর্ষণ করে ধীরে ধীরে মননক্রিয়ায় প্রবৃত্ত করা প্রয়োজন। তা নাহলে অধীত জ্ঞান বোঝাস্বরুপ হয়ে দাঁড়ায়। প্রায়োগিকে দৃষ্টিতে প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে নায়শাস্ত্র ও সৌন্দর্যতত্ত্বের সংযোগ প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

শ্রীঅরবিন্দ বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন মনের শেষ স্তরকে যা হল স্বজ্ঞা (intuition)। বুদ্ধির মত স্বজ্ঞাত বিস্তৃতিলাভের সুযোগ নেই। প্রতিভাবান মানুষের মেধা ও মনীষার ভিত্তি হল স্বজ্ঞা। শিক্ষককে সহানুভূতি সম্পন্ন সংবেদনশীল মন নিয়ে শিক্ষার্থীর সুপ্ত মন ও প্রবণতাকে জানার চেষ্টা করতে হবে।

শ্রীঅরবিন্দ তত্ত্বগত শিক্ষার পাশাপাশি ধ্যান, উপাসনা ও অনুষ্ঠানের গুরুত্বকে স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে শিক্ষার বিষয় ও পদ্ধতি নির্বাচন দেশের মাটির দিকে লক্ষ্য রেখেই হওয়া উচিত। শিশুকে ছ'বছর বয়সের আগে বিদ্যালয়ে প্রেরণ না করাই ভাল, কারণ তার আগে শিশুর দৈহিক ও মানসিক গঠন উপযুক্ত হয়না। তিনি শিক্ষার্থীকে মাতৃভাষায় শিক্ষা দেবার সপক্ষে মত প্রদান করেছেন। শিক্ষার সঠিক প্রণালী হল ছাত্রদের সহজাত আবেগ, মেলামেশার অভ্যাস এবং সহজাত প্রকৃতি ও প্রবণতা বুঝে তাদের উপযুক্ত পথে পরিচালনা করা। শিক্ষার্থীর সহজাত নীতিবোধ জাগ্রত করা বিশেষ প্রয়োজন, যদিও অরবিন্দ জানতেন পাঠ্যপুস্তক বা সিলেবাসের সাহায্যে সেটা সম্ভব নয়। অসার বক্তৃতা নয়, শিক্ষার্থীর সামনে রাখতে হবে অনুকরণীয় আদর্শ চরিত্র। শিক্ষকের চরিত্রে জ্ঞানতৃষ্ণা, দেশাত্মবোধ, মহানুভবতা, আত্মত্যাগ, সততা ও সাহসিকতা থাকা প্রয়োজন যা সহজেই ছাত্রদের কাছে গ্রহণীয় হতে পারে।

৪০.৭ সারাংশ

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী শ্রী অরবিন্দ আধুনিক চিন্তা ও দর্শনের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছিলেন। তিনি বৈদান্তিক ভাবধারার সঙ্গে পশ্চিমী রাষ্ট্রদর্শনকে সংমিশ্রিত করেন। ইতিহাস, সমাজ, দর্শন ও রাজনীতি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় তিনি স্বচ্ছ, বাস্তব ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী সহকারে আলোচনা করেছেন।

শৈশব অবস্থাতেই অরবিন্দ উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে গিয়েছিলেন। তাঁর প্রবাসজীবনের কালপর্ব প্রায় চোদ্দ বছর। বিদেশে থাকাকালীনই অরবিন্দ রাজনীতির সংস্পর্শে আসেন। Lotus and Dagger নামে একটি গুপ্ত বিপ্লবী সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হন তিনি।

দেশে ফিরে অরবিন্দ কিছুদিন বরোদায় অধ্যাপনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বাংলায় তাঁর প্রথম গুপ্তসমিতি গঠনের প্রয়াস ব্যর্থ হয়। কংগ্রেসের তোষণনীতির তীব্র সমালোচক ছিলেন তিনি। মহারাষ্ট্রের বাল গঙ্গাধর তিলক এবং পাঞ্জাবের লালা লাজপৎ রায়ের মত অরবিন্দ বাংলায় চরমপন্থী নীতি ও কর্মধারা প্রচার করতে শুরু করেন। অরবিন্দ, বিপিন চন্দ্র পাল এবং ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মিলে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরোধী কংগ্রেসকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ করে বিকল্প চরমপন্থী রাজনৈতিক কর্মসূচী উদ্ভাবন করলেন। স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনে অরবিন্দ বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি বিপিনচন্দ্র পাল নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ এর তত্ত্ব প্রচার করেন।

প্রথমদিকে অরবিন্দ ফরাসী বিপ্লবের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাস ও বন্দে মাতরম্' মন্ত্র তাঁকে উজ্জীবীত করেছিল। কিন্তু হঠাৎই তিনি রাজনীতির মঞ্চ থেকে অন্তরালে চলে গেলেন এবং ক্রমে যোগসাধনা ও আধ্যাত্মিকতার জীবনে আশ্রয় নিলেন।

অরবিন্দের জাতীয়তাবাদী চিন্তায় পবিত্র দেশানুরাগ ও আধ্যাত্মিকতার আবেগ সঞ্চারিত হয়েছিল। জাতিকে তিনি দিব্য অভিব্যক্তিরূপে দেখেছেন।

ভারতবর্ষের জন্য পূর্ণ রাজনৈতিক স্বরাজ দাবী করেছিলেন অরবিন্দ আর স্বরাজের মাধ্যমে তিনি ভারতের সনাতন ভাবধারা ও বৈদান্তিক আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। অরবিন্দ রাজনীতির আধ্যাত্মিক রূপায়ণ কামনা করতেন।

অরবিন্দ আধুনিক ধনতন্ত্রকে সমর্থন করেননি। আবার সমাজতন্ত্রকেও তিনি মুষ্টিমেয় কিছু ক্ষমতাবাদের রাজত্ব হিসেবে দেখেছেন। সমাজজীবনে অর্থনৈতিক সমতা ও নিরাপত্তার গুরুত্ব তিনি স্বীকার করেছেন।

অরবিন্দ বিশ্বাস করতেন জৈব অস্তিত্বই মানুষের জীবনের একমাত্র কাম্য হতে পারে না, তাকে আয়ত্বে এনে অতিক্রম করা এবং উন্নততর অতিমানষের পর্যায়ে উন্নীত করাতেই মানবজীবনের সার্থকতা। এই উদ্দেশ্যে তিনি ধ্যান ও যোগসাধনার উপর জোর দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁর আদর্শে পন্ডিচেরীতে প্রতিষ্ঠিত অরবিন্দ আশ্রমও হয়ে ওঠে আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ও যোগসাধনার কেন্দ্রস্বরূপ।

৪০.৮ অনুশীলণী

১। ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে শ্রী অরবিন্দের ভূমিকা আলোচনা করুন।

২। চরমপন্থী আন্দোলনের চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতিতে শ্রী অরবিন্দের ভূমিকার মূল্যায়ণ করুন।

৩। অরবিন্দের 'আধ্যাত্মিক জাতীয়তাবাদ' ব্যাখ্যা করুন। এই জাতীয়তাবাদের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ করুন।

৪। শ্রী অরবিন্দের চিন্তায় রাষ্ট্র ও ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্কের মূল্যায়ন করুন।

৫। শ্রী অরবিন্দের শিক্ষাভাবনার উপর আলোকপাত করুন।

৪০.৯ গ্রন্থপঞ্জী

১। সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় : বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা (দ্বিতীয় খন্ড) ১৯৯০

২। দেবাশিস চক্রবর্তী : ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার ধারা, ১৯৯৭

৩। Amal Kumar Mukhopadhyay : The Bengali Intellectual Tradition, 1979.

৪। V.P. Verma : Modern Indian Political Thought, 1998

৫। A. Appadorai : Indian Political Thinking Through the Ages, 1992.

একক ৪১ □ বাল গঙ্গাধর তিলক

গঠন

৪১.০ উদ্দেশ্য

৪১.১ প্রস্তাবনা

৪১.২ উদারনীতিবাদের (Liberalism) মূলসূত্রগুলি

৪১.২.১ নরমপন্থী ও চরমপন্থী (Moderates and Extremists) : মৌলিক পার্থক্য

৪১.৩ তিলক : জীবন ও কর্ম।

৪১.৪ তিলকের সামাজিক চিন্তা ভাবনা।

৪১.৪.১ সমাজ সংস্কার

৪১.৪.২ সমাজ সংস্কার স্থগিত রাখা প্রসঙ্গে

৪১.৪.৩ আইনের মাধ্যমে সমাজ সংস্কার

৪১.৪.৪ জাতীয় শিক্ষা

৪১.৫ তিলকের রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা

৪১.৫.১ স্বরাজ

৪১.৫.২ জাতীয়তাবাদ

৪১.৫.৩ চরমপন্থা (Extremism)

৪১.৫.৪ নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ (Passive Resistance)

৪১.৬ সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন

৪১.৭ সারাংশ

৪১.৮ অনুশীলনী

৪১.৯ গ্রন্থপঞ্জী

৪১.০ উদ্দেশ্য

ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতীয়তাবাদী নেতা বাল গঙ্গাধর তিলকের সামাজিক-রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং চিন্তাভাবনা সম্পর্কে লেখা হয়েছে। এই একক পাঠশেষে আপনি যা জানতে পারবেন তা হ'ল :

- অসামান্য দেশপ্রেমী তিলকের গৌরবময় জীবন ও কর্মের কথা।
- ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর অসাধারণ অবদানের কাহিনী।
- তাঁর সমাজসংস্কার ও জাতীয় শিক্ষা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ভাবনা।
- তাঁর ইতিহাসখ্যাত স্বরাজ সম্পর্কিত তত্ত্ব।
- জাতীয়তাবাদ, চরমপন্থা ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ বিষয়ে তাঁর মূল্যবান রাজনৈতিক চিন্তাধারা।

৪১.১ প্রস্তাবনা

১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত নেতারা দল পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন। ফলে কংগ্রেসের সেই আদিযুগে পাশ্চাত্য ধ্যান ধারণা ও রীতিনীতি দলকে প্রভাবিত করেছিল। সেই কারণেই উদারনীতিবাদ (Liberalism) হয়ে ওঠে কংগ্রেসের ভাবাদর্শ।

৪১.২ উদারনীতিবাদের মূলসূত্রগুলি

তখনকার. কংগ্রেসী নেতারা উদারনীতিবাদের নিম্নলিখিত মূল সূত্রগুলিকে গ্রহণ করেছিলেন :

(ক) মানুষের মর্যাদায় বিশ্বাস,

(খ) স্বৈরাচারী শাসনের বিরোধিতা,

(গ) আইনের অনুশাসন (Rule of Law) ,

(ঘ) জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা; সংস্কৃতি নির্বিশেষে সমস্ত স্ত্রী-পুরুষের সাম্য,

(ঙ) ধর্মনিরপেক্ষতা (Secularism)।

কংগ্রেসের উদারনীতিবাদী নেতাগণ বিশ্বাস করতেন, ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা ভারতে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় সফল হয়েছে। ব্রিটিশ উদারনীতিবাদ অনুসরণ করে তাঁরা রাষ্ট্র ও সমাজের আকস্মিক পরিবর্তন নয়, ধীরে ধীরে বিবর্তনভিত্তিক উন্নতিতে বিশ্বাস করতেন। এই কারণে তাঁরা সাংবিধানিক পদ্ধতি (Constitutional methods) অনুযায়ী সব পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন। উদারনীতিবাদী নেতাগণ ধর্মনিরপেক্ষতায় (Secularism) বিশ্বাসী ছিলেন। অর্থাৎ ধর্ম থেকে রাজনীতিকে পৃথক করার পক্ষপাতী ছিলেন। জাতীয় ঐক্য সম্পর্কে সচেতন এই নেতারা উপলব্ধি করেছিলেন, রাজনীতির স্বার্থে ধর্মীয় পার্থক্যকে ব্যবহার করলে জাতীয় ঐক্য ব্যাহত হবে। ইতিহাসে এঁরাই 'নরমপন্থী' নামে পরিচিত।

৪১.২.১ নরমপন্থী ও চরমপন্থী মৌলিক পার্থক্য

নতুন প্রজন্মের শিক্ষিত ভারতীয়গণ — যাঁরা চরমপন্থী নামে পরিচিত — নরমপন্থীদের সমস্ত ধ্যান ধারণা বাতিল করে দিলেন। আদর্শ ও কর্মপদ্ধতি — উভয়দিক থেকেই নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য ছিল। চরমপন্থীরা নরমপন্থীদের সাংবিধানিক পদ্ধতি (Constitutional methods) এবং বিবর্তনমূলক কৌশল (evolutionary strategy) সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। সরকারের প্রতি আবেদন নিবেদন এবং আইন মেনে আন্দোলনের নীতি যে ফলপ্রসূ হয় না তা তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁরা চরমপন্থা অবলম্বন করে ব্রিটিশ সরকারের উপর চাপসৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। তাঁরা হিন্দু সমাজের প্রাচীন ঐতিহ্য এবং ধর্মীয় কার্যকলাপ থেকে কিছু আচার-অনুষ্ঠান বাছাই করে নিয়ে আধুনিক কালে পুনঃপ্রবর্তন করেছিলেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে তিলক প্রবর্তিত শিবাজীর রাজ্যাভিষেক উৎসব এবং গণপতি উৎসবকে গণ-উৎসবে পরিণত করার কথা বলা যায়। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল এইসব উৎসবের মধ্যে দিয়ে সাধারণ মানুষের আবেগকে জাগিয়ে তুলে বিদেশী সরকারের বিরুদ্ধে তাঁদের আন্দোলনের স্বপক্ষে জনমত গঠন করা।

এইভাবে চরমপন্থীরা জাতীয় আন্দোলনে এক নতুন পথ এবং এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর সন্ধান দিয়েছিলেন। প্রধানতঃ এঁদের প্রয়াসের ফলেই ভারতে বৃটিশ শাসনের প্রকৃতির পুণর্মূল্যায়ন করে তার চরম ক্ষতিকারক দিক সম্পর্কে জনসাধারণ গভীরভাবে ভাবতে শুরু করলেন।

কিংবদন্তী ত্রয়ী, লালা লাজপৎ রায়, বাল গঙ্গাধর তিলক এবং বিপিনচন্দ্র পাল — "লাল বাল পাল" নামে যাঁরা জনসমক্ষে অধিক পরিচিত—তরুণ চরমপন্থীদের নেতা ছিলেন। তাঁরা প্রত্যেকেই ভারতের জাতীয়তাবাদী চিন্তা ও আন্দোলন গঠনে নিজস্ব অবদান রেখে গেছেন। আমরা এখানে বাল গঙ্গাধর তিলকের সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারা এবং ভারতের জাতীয় আন্দোলনে তাঁর অবদানের বিষয়ে আলোচনা করব।

৪১.৩ তিলক : জীবন ও কর্ম

লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক ১৮৫৬ সালের ২৩ শে জুলাই ভারতের পশ্চিম উপকূলে মহারাষ্ট্রের রত্নগিরি জেলায় এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার শিক্ষক-পিতার প্রভাবে তিনি বাল্যকাল থেকেই সংস্কৃত ভাষার অনুরাগী ছিলেন। হয়ত সেই কারণেই তিলক অল্প বয়স থেকেই ভারত ও তার জনগণের সুপ্রাচীন ধর্ম ও ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন। দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে সবশেষে মারাঠা রাজ্যই ব্রিটিশ শাসনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। সেজন্য তিলক বাল্যকাল থেকেই ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের আকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপিত হয়েছিলেন।

তিলকের দশবছর বয়সে তাঁর বাবা পুণে শহরে বদলী হয়ে যান। ফলে তিলক উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পান। ১৮৭৬ সালে গ্র্যাজুয়েট হবার পর তিনি আইনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। কিন্তু আইনজীবীর পেশা গ্রহণ না করে তিনি শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে তিনি পুণে শহরে New English School স্থাপন করেন। এরপর তিলক 'মারাঠী' নামে একটি ইংরাজী সাপ্তাহিক ও 'কেশরী' নামে একটি মারাঠী সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন। দুটিই প্রকাশিত হয় ১৮৮১ সালে, জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার চার বছর আগে। এই দুটি সাপ্তাহিকের সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করে তিলক মহারাষ্ট্র তথা পশ্চিম ভারতের নানাবিধ সামাজিক, রাজনৈতিক সমস্যার সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়েন।

নব্বইয়ের দশকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনগুলিতে তিলক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে থাকেন। ১৮৯১-এর কংগ্রেস অধিবেশনে ভারতীয়দের স্বার্থের অনুকূলে তিলক অস্ত্র আইন (Arms Act) সংশোধন এবং সামরিক বাহিনীতে আরও বেশী সংখ্যায় ভারতীয়ের প্রবেশের দাবী করেন। তিলক তাঁর দুটি সাপ্তাহিকে যে সব বিষয় নিয়ে লিখে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন সেগুলি হ'ল — কমিশনার ক্রফোর্ড - এর দুর্নীতিগ্রস্থ প্রশাসন, অন্যায্য ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা, ব্রিটিশ সরকারের "বিভেদ সৃষ্টি কর এবং শাসন কর" ("Divide and Rule") নীতি, মুসলমানদের প্রতি ব্রিটিশ পক্ষপাতিত্ব ইত্যাদি। অনেকটা তিলকের চেষ্টাতেই মহারাষ্ট্রে গণপতি ও শিবাজী উৎসব নতুন করে শুরু হয়। এর ফলে ভারতীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে জনগণের মনে গর্বের সঞ্চার হয় এবং তাঁরা নতুন উৎসাহে জাতীয় আন্দোলনে যোগ দেন।

১৮৯৭ সালের জুলাই মাসে "কেশরী" পত্রিকায় রাষ্ট্রদ্রোহী লেখা প্রকাশের অভিযোগে ব্রিটিশ সরকার

এক বিচারের প্রহসন করে। তিলককে আঠারো মাসের সশ্রম কারাদন্ড দেওয়া হয়।

১৮৯৮ থেকে ১৯০৮ পর্যন্ত জাতীয় আন্দোলনের বীর নেতা তিলক অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। এই সময়ে ত্রয়ী নেতা 'লাল বাল পাল' বাংলা ভাগ রদ করার জন্য এক চার দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে দেশব্যাপী আন্দোলন শুরু করেন — স্বরাজ, স্বদেশী, বহিষ্কার (বয়কট) এবং জাতীয় শিক্ষা। তিলকের সমগ্র দেশব্যাপী ঝটিকা সফরের সময় তাঁর সেই ইতিহাস খ্যাত স্লোগানে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে, "স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার এবং তা আমি অর্জন করবই।" ("Swaraj is my birthright and I will have it.")

বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ' আন্দোলন অনুসরণ করার জন্য তিলক কংগ্রেসকে ক্রমাগত চাপ দিতে থাকেন। ফলে কংগ্রেস নরমপন্থী ও চরমপন্থী এই দুই গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে যায়। বাংলায় সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ১৯০৮ সালের জুলাই মাসে তিলককে গ্রেপ্তার করে এক হাজার টাকা জরিমানা এবং ছয় বৎসরের কারাদন্ড প্রদান করা হয়।

মান্দালয়ে কারারুদ্ধ অবস্থায় তিলক তার প্রখ্যাত 'গীতা রহস্য' রচনা করেন। এই গ্রন্থে তিনি গীতার ব্যাখ্যা করেন এবং জনগণকে কর্মযোগের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিঃস্বার্থ সামাজসেবায় ব্রতী হতে আহ্বান করেন।

১৯১৬ সালে তিলক আয়ারল্যান্ডের হোমরুল আন্দোলনে প্রভাবিত হয়ে "হোমরুল লীগ" প্রতিষ্ঠা করেন। মুশলিম লীগের মধ্যে লক্ষ্ণৌ চুক্তি (১৯১৬) সম্পাদনেও তিলক অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

১৯১৮-১৯ সালে ইংল্যান্ডে অবস্থানের সময়ে তিলক ভারতের আত্মনিয়ন্ত্রণ অর্জনের স্বপক্ষে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি ব্রিটিশ শ্রমিকদলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করেন। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সংস্কার বিল সংক্রান্ত যৌথ সিলেক্ট কমিটির সামনে তিলক তাঁর "হোমরুল লীগের" পক্ষ থেকে জোরালো বক্তব্য পেশ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ প্যারিস শান্তি সম্মেলনে (১৯১৯) যোগদান করতে তিলক ব্যর্থ হন, কারণ ব্রিটিশ সরকার তাঁকে ফ্রান্সে যাবার পাশপোর্ট দিতে অস্বীকার করে। অবশ্য তিনি সম্মেলনের সভাপতির নিকট প্রেরিত এক স্মারকলিপিতে এই যুক্তিভিত্তিক সিদ্ধান্ত উপস্থিত করেন যে স্বনিয়ন্ত্রিত ভারত এশিয়া মহাদেশে শান্তির দুর্গ হিসাবে কাজ করতে পারবে। স্বাধীনতা অর্জনের ঠিক পরেই জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনে নেতৃত্বদান থেকে আরম্ভ করে বিশ্বশান্তি অর্জনের নানা ক্ষেত্রে ভারতের ভূমিকা তাঁর এই সিদ্ধান্তের যাথার্থ্যই প্রমাণ করে।

১৯১৯ সালে তিলক যখন ইংল্যান্ডে তখনই পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে জেনারেল ডায়ারের নেতৃত্বে নৃশংস গণ-হত্যাকান্ড ঘটে যায়। পাঞ্জাবে ব্রিটিশ সরকারের নানাবিধ অত্যাচার চলছিলই। এবার জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ডের বিরুদ্ধে ঘৃণায় ও ক্রোধে সমগ্র দেশ গর্জে ওঠে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই প্রতিবাদের পুরোভাগে এসে দাঁড়ান। তিনি ব্রিটিশ সরকারের কাছে পাওয়া 'স্যার' উপাধি ত্যাগ করেন। এই পরিস্থিতিতে জাতীয় নেতা হিসাবে গান্ধীর আবির্ভাব ঘটে। দেশে ফিরে তিলক ১৯১৯ সালের অমৃতসর কংগ্রেসে গান্ধীর আসন্ন অসহযোগ আন্দোলনকে স্বাগত জানালেন। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, ব্রিটেনের অর্থনৈতিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে "স্বদেশী" আন্দোলন গান্ধীরও আগে তিলক সমর্থন করেছিলেন। ১৯২০

সালের ১লা আগস্ট তিলকের মৃত্যুতে ভারতের জাতীয় আন্দোলনে একটি যুগের অবসান ঘটে। গান্ধীর নেতৃত্বে শুরু হয় পরবর্তী যুগ।

I. M. Reisner & N.M.Goldberg তিলকের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে বলেছেন, "তিলক তাঁর দেশের জাতীয় স্বাধীনতা এবং জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জনে একনিষ্ঠ সৈনিক ছিলেন। সংগত কারণেই তিনি গৌরব অর্জন করেছেন এবং ভারতের প্রথম জনবরেণ্য নেতা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছেন ("A dedicated fighter for his country's national freedom and democratic rights of the people that he was, Tilak justly gained prestige and was acknowledged the first popular leader of India")।

অনুশীলনী - ১

(ক) উদারনীতিবাদের মূলসূত্রগুলির উল্লেখ করুন।

(খ) নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মৌলিক পার্থক্য কি কি ?

(গ) তিলকের জীবন ও কর্ম সংক্ষেপে পর্যালোচনা করুন।

৪১.৪ তিলকের সামাজিক চিন্তা-ভাবনা

তিলকের সামাজিক চিন্তা-ভাবনাকে আমরা দুটি অংশে ভাগ করতে পারি — সমাজ সংস্কার ও জাতীয় শিক্ষা।

৪১.৪.১ সমাজ সংস্কার

তিলকের সমাজ সংস্কার সম্পর্কে ধ্যানধারণা অন্যান্য চিন্তাবিদদের থেকে আলাদা ছিল। এই সম্পর্কে তিলকের চিন্তা-ভাবনা সঠিকভাবে অনুধাবন না করলে তাঁকে ভুল বোঝার সম্ভাবনা আছে।

তিলক সমাজ সংস্কারের মোটেই বিরোধী ছিলেন না। তিনি মনে করতেন, সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও আচার-অনুষ্ঠান সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চয়ই পরিবর্তিত হয়। বস্তুতঃ তিনি তাঁর নিজস্ব চিন্তানুযায়ী গোঁড়ামীকে (Orthodoxy) প্রতিরোধ করতে চেয়েছিলেন। অবশ্য তাঁর সমাজ-সংস্কার তত্ত্ব উদারনৈতিক সংস্কারবাদীদের (liberal reformer) থেকে স্বতন্ত্র ছিল। তিলক জনগণের ঐতিহ্য অনুসারে স্বতঃস্ফূর্ত ক্রমবিবর্তনে বিশ্বাস করতেন। অতীতের সঙ্গে সম্পর্কে ছেদ করে অকস্মাৎ যে পরিবর্তন আসে তা কখনই স্থায়ী হতে পারে না, বরং তা সমাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। তিলক মনে করতেন, আমাদের ঐতিহ্যের গ্রহণীয় উপাদানগুলি অবশ্যই রক্ষা করতে হবে।

এই প্রসঙ্গে বলা যায়, তিলক কখনই পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণকে সমর্থন করেন নি। পাশ্চাত্যের সবকিছুই ভাল—এইরকম একপেশে ধারণা তিনি পছন্দ করতেন না। আসলে তিলক ছিলেন মুক্তমন চিন্তাবিদ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের যা কিছু ভাল তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলেন তিনি। তাঁর জাতীয় শিক্ষা সম্পর্কিত পরিকল্পনা এই বিষয়ে একটি উপযুক্ত দৃষ্টান্ত।

৪১.৪.২ সমাজসংস্কার স্থগিত রাখা প্রসঙ্গে

তিলক মূলতঃ তিনটি কারণে সমাজসংস্কার স্থগিত রাখার প্রস্তাব করেছিলেন। প্রথমতঃ তিনি মনে করতেন ভারতীয় সমাজের ত্রুটিগুলির অধিকাংশই বিদেশী শাসনের অভিশাপের ফল। সুতরাং সমাজসংস্কার থেকেও অগ্রাধিকার পাবে দেশের স্বরাজ।

দ্বিতীয়তঃ সমাজ সংস্কার সাধনের উদ্যোগ জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে। কিন্তু জাতীয় আন্দোলনের সাফল্যের জন্য জাতীয় ঐক্য একান্ত প্রয়োজন।

তৃতীয়তঃ যথাসময়ে আপনিই সমাজের পরিবর্তন আসবেই। অযথা ব্যস্ততা দেখালে সামাজিক সুস্থিতি বিঘ্নিত হয়।

৪১.৪.৩ আইনের মাধ্যমে সমাজ সংস্কার

তিলক প্রধানতঃ দুটি কারণে আইনের মাধ্যমে সমাজ সংস্কারের বিপক্ষে ছিলেন। প্রথমতঃ দীর্ঘমেয়াদী স্বতঃস্ফূর্ত সমাজসংস্কার স্থায়ী ও কল্যাণকর হয়। আইনের মাধ্যমে সমাজসংস্কার উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয়, ফলে অযথা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়তঃ আইনের দ্বারা সমাজ সংস্কার প্রচেষ্টার অর্থ হল সাম্রাজ্যবাদী বিদেশী শক্তিকে আমাদের দেশের সামাজিক—রাজনৈতিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে আহ্বান করা।

৪১.৪.৪ জাতীয় শিক্ষা

তিলক প্রথম জীবনে শিক্ষাদানের মাধ্যমে সামাজিক মঙ্গল সাধনের দায়বদ্ধতা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তিনি পুণে শহরে ১৮৮০ সালে New English School প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি পরবর্তীকালে Deccan Education Society এবং বিখ্যাত Fergusson College স্থাপন করেন। তিলকসহ চরমপন্থী জাতীয়তাবাদীগণ ভারতে ইংরেজ প্রবর্তিত পশ্চিমী-ঘেঁষা (Westernised) শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে অসন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁরা মনে করতেন, এই শিক্ষাব্যবস্থা এমন এক শ্রেণীর জন্ম দেয় যারা রক্তের সূত্রে ভারতীয়, কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তি ও সংস্কৃতির দিক থেকে বৃটিশকুলের ঘনিষ্ঠ। তিলক এবং সমমনস্ক চিন্তা-নায়কগণ চেয়েছিলেন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা জনসাধারণের মনে তাঁদের ধর্ম, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে সম্ভ্রম গড়ে তুলুক। এই কারণে তাঁরা 'জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা' (National Education System) প্রতিষ্ঠায় মনোনিবেশ করেন।

তাঁদের ভাবনা ছিল, 'জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায়' স্কুল এবং কলেজগুলিকে কেবলমাত্র ভারতীয়রাই পরিচালনা করবে। ধর্মীয় শিক্ষার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হবে। কারণ মানুষের ব্যক্তিত্বের উপর ধর্মের একটা বিশেষ প্রভাব আছে। ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তি শৌর্য-বীর্যশালী হবার সঙ্গে সঙ্গে তার নৈতিক চরিত্রেরও বিকাশ হয়। অবশ্য তিলকের মতে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা এবং বিজ্ঞান-কারিগরী শিক্ষারও প্রয়োজন আছে। তার সাহায্যে তরুণ-তরুণীরা বর্তমান যুগ ও জগতের চাহিদার উপযুক্ত করে নিজেদের গড়ে তুলতে পারবে।

অনুশীলনী - ২

(ক) তিলকের সামাজিক চিন্তা-ভাবনা বিষয়ে একটি নীতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখুন।

(খ) তিলকের সমাজ সংস্কার বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখুন।

(গ) সমাজ সংস্কার সম্পর্কে তিলকের তত্ত্ব কি ছিল?

(ঘ) তিলক কেন সমাজ সংস্কার স্থগিত রাখার পক্ষপাতী ছিলেন?

(ঙ) তিলক কেন আইনের মাধ্যমে সমাজ সংস্কারের বিরোধী ছিলেন।

(চ) তিলকের জাতীয় শিক্ষা সম্পর্কে ধারণা পর্যালোচনা করুন।

৪১.৫ তিলকের রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনা

কিংবদন্তী ত্রয়ী 'লাল-বাল-পাল' ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নতুন যুগের সূচনা করেছিলেন। আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে, এই তিন চিন্তানায়ক আধুনিক ভারতের রাজনৈতিক ধ্যানধারণা এবং রাজনৈতিক পদ্ধতির ক্ষেত্রে (Political ideas and political methods of modern India) মূল্যবান অবদান রেখে গেছেন। বিবেকানন্দ, তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রী অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী প্রমুখ চিন্তানায়কগণ রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে ভারতীয় ধর্ম ও ঐতিহ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের দর্শন ও সংস্কৃতির মিলন ঘটিয়েছিলেন। তাঁরা আগেই বুঝেছিলেন, দ্রুত পরিবর্তনের যুগে পাশ্চাত্যের আধুনিক ধ্যানধারণাকে অস্বীকার করলে ভারতের অগ্রগতি ব্যাহত হবে। এই প্রসঙ্গে Dennis Dalton বলেছেন, "এই বিশেষ ভারতীয় চিন্তাবিদদের উদ্দেশ্য ছিল, তাঁদের নিজস্ব ঐতিহ্যের সাথে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা এবং একই সঙ্গে দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজের দাবী অনুযায়ী নতুন ধ্যান ধারণা প্রবর্তন করা।" ("The purpose of these particular Indian thinkers was at once to preserve continuity with their own tradition and to introduce conceptual innovations demanded by a society in the midst of rapid transition.")।

তিলকের রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনা এখানে সংক্ষেপে উপস্থিত করা হ'ল।

৪১.৫.১ স্বরাজ্য বা স্বরাজ

(তিলক 'স্বরাজ্য' শব্দটির ব্যবহার করেছেন, কারণ সংস্কৃত শব্দ 'স্বরাজ' অর্থে মারাঠী ভাষায় 'স্বরাজ্য' ব্যবহার করা হয়।)

অদ্বৈতবেদান্তবাদী তিলক বিশ্বাস করতেন, মানুষের চূড়ান্ত লক্ষ্য হ'ল পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হওয়া। ভাগবত গীতার শিক্ষানুযায়ী এই মিলিত হওয়া সম্ভব একমাত্র কর্মযোগের মাধ্যমে, অর্থাৎ যখন কোন ব্যক্তি বহুজনের হিতের জন্য, বহুজনের সুখের জন্য নিঃস্বার্থ ও নিষ্কামভাবে কর্ম করবে। স্বরাজ অর্জনের আন্দোলন এই কর্মযোগেরই অঙ্গ।

লক্ষণীয়, বিবেকানন্দ ও গান্ধীও তিলকের মত গীতার কর্মযোগ আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে জনসেবাব্রত গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিলক যে স্বরাজ আন্দোলন শুরু করেছিলেন তা পরবর্তীকালে গান্ধীর আমলে এক বিশাল জনজোয়ারে পরিণত হয়।

কিন্তু স্বরাজের অর্থ কি ? স্ব অর্থ ব্যক্তি নিজে এবং রাজ অর্থ শাসন। ব্যক্তির নিজের উপরে নিজের শাসন। তিলক এবং পরবর্তীকালে গান্ধী স্বরাজের একই রকম ব্যাখ্যা করে বলেছেন : শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা নয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং আধ্যাত্মিক (Spiritual), সব দিক থেকেই ব্যক্তি শৃঙ্খলমুক্ত হবে—সর্বপ্রকারে সে স্বনিয়ন্ত্রিত হবে। সুতরাং বলা যেতে পারে, বিবেকানন্দ এবং পরবর্তী চিন্তাবিদগণ পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সম্পর্কে ধারণার সঙ্গে ভারতের আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা সম্পর্কে ধারণার মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। কারন তাঁরা হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন Denis Dalton-এর ভাষায়, "উচ্চস্তরের আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা অর্জন করতে হলে মানুষের নিম্নস্তরের স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন।"[*] ("Man must have freedom in the lower realms to achieve the spiritual freedom of the highest")।

তিলক হোমরুল আন্দোলনের লক্ষ্য স্বরাজ বা রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে কিভাবে আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা (Spiritual connotation) দিয়েছিলেন, তা সংক্ষেপে বলা দরকার। তিলক 'গীতারহস্যে' লিখেছেন, "হোমরুল আন্দোলনের প্রাণ ছিল স্বাধীনতা ... এই স্বাধীনতাই হল ব্যক্তির আত্মার অন্তর্নিহিত শক্তি, যে আত্মাকে বেদান্ত অনুযায়ী ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না এবং যা ঈশ্বরেরই অঙ্গীভূত।"

অতএব স্বাধীনতা ব্যক্তির আত্মার অন্তর্নিহিত শক্তি এবং ঈশ্বরের থেকে অবিচ্ছিন্ন। সে কারণে স্বরাজ বা স্বাধীনতাকে অস্বীকার করলে একই সঙ্গে আত্মা এবং ঈশ্বরকে অসম্মান করা হয়। স্বরাজ ব্যক্তির ঐশ্বরিক অধিকার (divine right)। আগেই বলা হয়েছে, স্বাধীনতা আন্দোলন চলাকালীন বাল গঙ্গাধর তিলক এক কিংবদন্তী শ্লোগান রচনা করেছিলেন:

"স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার এবং আমি তা অর্জন করবই।"

স্বরাজের এই "জন্মগত অধিকার" স্বরাজের আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের বুঝে নিতে হবে।

৪১.৫.২ জাতীয়তাবাদ

তিলকের জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা মানুষের আধ্যাত্মিক একতা (Spiritual Unity of mankind) সম্বন্ধে বেদান্তের আদর্শ এবং মাৎসিনী, বার্ক, মিল ও উইলসন প্রভৃতি প্রচারিত পশ্চিমী জাতীয়তাবাদের মিলনে গড়ে ওঠে তিলকের জাতীয়তাবাদ সম্পর্কিত চিন্তাভাবনা। তিলক জানতেন, জাতীয়তাবাদের ভিত্তি বস্তুনির্ভর এবং ভাব-নির্ভর, উভয়ই (both objective and subjective)। একই ভাষা, ভূখণ্ড ও ধর্ম জনসাধারণের মনে ভাব-নির্ভর একতাবোধের (subjective feeling of oneness) জন্ম দেয়। এই ভাব বা আবেগ-নির্ভর একতার অনুভূতিই জাতীয়তাবাদ বিকাশের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিলকের বিশ্বাস ছিল, পতাকা, প্রতীক এবং সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসব প্রভৃতির মাধ্যমে যদি জনগণের অন্তর্নিহিত একতাবোধকে জাগ্রত করা যায় তাহলে জাতীয়তাবাদকে শক্তিশালী করা সম্ভব হবে। এইভাবে তিলক গণপতি এবং শিবাজী উৎসবের পুনঃপ্রবর্তন করে জাতীয়তাবাদী চেতনা বৃদ্ধি করেন। আবার সামাজিক এবং অর্থনৈতিক আন্দোলনকে সংগঠিত করেও তিলক জাতীয়তাবাদী অনুভূতিকে শক্তিশালী

করতেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, পুণে ১৮৭৭ সালের দুর্ভিক্ষের সময় তিনি ভূমি রাজস্ব প্রদানের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন।

তিলক বলতেন, কোন আঞ্চলিক ভাষা সেই অঞ্চলের একতাবোধকে বিকশিত করে। সেই একতাবোধকে শক্তিশালী করতে হবে। তবে তিলকের মতে কোন ভাষা নয়, হিন্দু ধর্মই সমস্ত ভারতে ঐক্যের শক্তি হিসাবে কাজ করেছে। হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী অবধি সমস্ত হিন্দুদের মধ্যে চিন্তা ও আচরণের ক্ষেত্রে একতা সাধনে রামায়ণ ও মহাভারত এক অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছে। অবশ্য তিলকের বিশ্বাস ছিল, ইতিহাসগত উত্তরাধিকার এবং ভাষাগত ও ধর্মীয় একতা জাতীয়তাবাদের ভিতকে শক্তিশালী করলেও যথেষ্ট বলশালী করতে পারে না। তার জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতাদর্শকে সামনে রেখে জনগণকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ব্যাপকভাবে সংগঠিত করা। তিলক জাতীয়তাবাদের অর্থনৈতিক দিকটিকে যথেষ্টই গুরুত্ব দিয়েছিলেন। রাণাডে, নওরোজী, রমেশ দত্ত, গোখেল প্রমুখ নরমপন্থী জাতীয়তাবাদীদের অর্থনৈতিক চিন্তাভাবনাকে তিলক সমর্থন করতেন। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে পার্থক্যও ছিল। তাঁদের মতের বিরুদ্ধে গিয়ে তিনি বলেছেন, অর্থনৈতিক সমস্যাগুলিকে তুলে ধরতে হবে জনগণের রাজনৈতিক চেতনাবৃদ্ধি এবং স্বাধীনতা আন্দোলনকে শক্তিশালী করার জন্য। এই উদ্দেশ্যে তিলক তাঁর 'কেশরী ' সংবাদপত্রে ভূমিরাজস্ব, ভূমি দলপ্রথা, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশ, যুদ্ধে সরকারী অর্থের বিপুল অপব্যয় এবং ইংরাজ রাজকর্মচারীদের বিলাসবহুল জীবনযাত্রা ইত্যাদি বিষয়ে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। জাতীয়তাবাদী ধ্যান ধারণা এবং আন্দোলনে তিলকের অবদান বিশ্লেষণ করে আমরা ভারতীয় ঐতিহ্য ও ধর্মের সঙ্গে পাশ্চাত্য চিন্তাধারার যে সম্মেলন লক্ষ করি তা নিঃসন্দেহে আমাদের শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

৪১.৫.৩ চরমপন্থা

নরমপন্থী এবং চরমপন্থীদের ধ্যানধারণার মূল পার্থক্যগুলি পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। এখানে তিলক অনুসৃত চরমপন্থার মূলসূত্রগুলি আলাদা করে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

(ক) ব্রিটিশ রাজের চরিত্র

নরমপন্থীদের ন্যায় ব্রিটিশরাজের মানবহিতৈষী চরিত্র অথবা ব্রিটেনের ন্যায়বিচারের প্রতি অনুরাগ সম্পর্কে তিলকের মনে বিন্দুমাত্র মোহ ছিল না। এ বিষয়ে তাঁর মনে কোন দ্বিধা ছিল না যে, অন্যান্য দেশের মত ব্রিটেনও নিজস্বার্থের তাগিদেই কাজ করে। ভারতে ব্রিটেন সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল ভারতীয়দের উন্নতিকল্পে নয়, ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠন করার জন্য।

(খ) সাংবিধানিক বনাম প্রতিরোধের রাজনীতি (Constitutional versus Pressure Politics)

তিলক মনে করতেন, একমাত্র সাংবিধানিক সরকার (Constitutional Government) থাকলেই সাংবিধানিক পদ্ধতির (Constitutional methods) কোন অর্থ হতে পারে। কিন্তু একটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ভারতকে শাসন করছে এবং ভারতের কোন সংবিধান (Constitution) নেই, রয়েছে ফৌজদারী আইন ব্যবস্থা (Penal Code)।

(গ) উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি **(Ends and Means)**

উদারনীতিবিদগণ উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি উভয়েই শুদ্ধতায় (Purity of both ends and means) বিশ্বাস করতেন। তিলক পদ্ধতির শুদ্ধতার গুরুত্বকে কখনই অস্বীকার করেননি। কিন্তু এই সম্পর্কে কোন অনমনীয় নীতি গ্রহণ করার পক্ষে ছিলেন না। প্রয়োজনে লক্ষ্য অর্জনে যে কোন পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে। তিলক তাঁর মতের সমর্থনে গীতা ও মহাভারতের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন।

(ঘ) ধর্ম ও রাজনীতি

পশ্চিমী উদারনীতিবিদদের অনুসরণে নরমপন্থীরা রাজনীতি থেকে ধর্মকে তফাতে রাখার পক্ষে ছিলেন। কিন্তু তিলক এই নীতির প্রতি সমর্থন জানিয়েও প্রয়োজনে এই নীতি থেকে সরে আসতে চেয়েছিলেন। তিলকের ধারণায় জাতীয় আন্দোলনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল স্বরাজ। জনগণকে এই আন্দোলনে সামিল করবার জন্য তিলক স্বরাজের ধর্মীয় ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন এবং দাবী করেছিলেন যে স্বরাজ আমাদের ধর্মীয় প্রয়োজন। জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সম্পর্কে জনগণের উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য তিলক ধর্মীয় উৎসবেরও সাহায্য নিয়েছিলেন।

৪১.৫.৪ নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ (Passive Registance)

নরমপন্থীদের অভিমত ছিল, বিদেশী দ্রব্য, আদালত ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বয়কট, ব্রিটিশ সরকারকে ভূমিরাজস্ব প্রদানে অস্বীকার—এইসব অসাংবিধানিক বা বেআইনী কাজ ভারতীয়রা করবে না। তিলক মনে করতেন যে এই কাজগুলিকে অসাংবিধানিক আখ্যা দেওয়া যায় না, কারণ ভারত কোন সংবিধান অনুযায়ী শাসিত হয় না। ১৮৫৮ সালের রানী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্রকে সাংবিধানিক দলিল বলা চলে না, কারণ একে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট আইন হিসাবে অনুমোদন করেনি।

বাংলা ভাগের বিরুদ্ধে ১৯০৫-০৮ সালের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলনের সময়ে তিলক ঔপনিবেশিক আইনগুলিকে ন্যায়বিরোধী ও দমনমূলক আখ্যা দিয়ে তীব্র আক্রমণ করেছিলেন। "টি. এইচ. গ্রীণের মত তিলক কু-আইনের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কার্যকলাপের যাথার্থ্য স্বীকার করেছিলেন।" ("He, like T. H. Green, justified direct political action against bad laws.")

ঐ আন্দোলনের সময় স্বদেশী, বয়কট ও জাতীয় শিক্ষা সংক্রান্ত নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের কর্মসূচীকে তিলক ও শ্রী অরবিন্দ পরিচালনা করেছিলেন। এই প্রতিরোধ আন্দোলনকে গান্ধীর অসহযোগ ও আইন-অমান্য আন্দোলনের পূর্বসূরী মনে করা যেতে পারে।

আবেদন-নিবেদনের নরমপন্থী নীতির কার্যকারিতা সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ হয়ে তিলক প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক প্রতিরোধের ডাক দিয়েছিলেন। তাঁর মতে বিভিন্ন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক চিন্তা ভাবনা বিভিন্ন অর্থ বহন করে। শাসক গোষ্ঠীর কাছে যা সংবিধান সম্মত ও আইনসম্মত (Constitutional and legal), তা কেবল উপনিবেশের জনগণের দৃষ্টিকোণ থেকেই নয়, উদার মানবতাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকেও অন্যায় ও অনৈতিক (Unjust and immoral) প্রতীয়মান হতে পারে। সুতরাং তিলক এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে শুধু সংবিধান বা আইনের মাপকাঠিতে নয়, ন্যায়বিচার ও নৈতিকতার মাপকাঠিতেও

সরকারী নিয়মকানুন ও আইনের মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। তিলকের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, অন্যায় ও অনৈতিক আইনকে প্রতিরোধ করা জনগণের একই সঙ্গে অধিকার ও কর্তব্য।

৪১.৬ সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন

বাল গঙ্গাধর তিলক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের একজন প্রথম সারির নেতা ছিলেন। তিনি একাধারে তাত্ত্বিক ও কর্মী (theorist and activist) ছিলেন। চরমপন্থী চিন্তাবিদ হিসাবে তিনি জাতীয় শিক্ষা, স্বরাজ, জাতীয়তাবাদ, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ ইত্যাদি বিষয়ে যুক্তিপূর্ণ তত্ত্ব রচনা করেছেন এবং সেই তত্ত্ব অনুযায়ী আন্দোলন পরিচালনা করেছেন। রাজনৈতিক তত্ত্ব রচনা ও রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনা, উভয়ক্ষেত্রেই তিনি তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। তিলক দেশের মাটি ও মানুষের কাছাকাছি ছিলেন। দেশের ঐতিহ্য, ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর প্রগাঢ় বাস্তব জ্ঞান তাঁর আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করেছিল। ফলে তিনি আবেদন নিবেদনের রাজনীতি বাতিল করে বলিষ্ঠ আন্দোলনের পথ গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। 'লাল-বাল-পালের' শক্তিশালী চিন্তাধারা ও নেতৃত্ব মৃতপ্রায় জাতীয় আন্দোলনে প্রাণ সঞ্চার করেছিল।

এই প্রসঙ্গে বলা যায়, তিলকের চিন্তাধারায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভাবনার মিলন আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে। আসলে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের আধুনিক বিজ্ঞান-ভিত্তিক ধ্যান-ধারণার মিলন ঘটিয়ে স্থবির ভারতীয় সমাজকে গতিশীল করার এক মহৎ কর্মযজ্ঞ শুরু করেছিলেন। সেই কর্মযজ্ঞে শ্রী অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী প্রমুখ মনীষীদের সঙ্গে তিলকও যথাযোগ্য অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিলক স্বরাজের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিয়ে হোমরুল আন্দোলনকে জনপ্রিয় করতে পেরেছিলেন।

তাঁর জাতীয়তাবাদ সম্পর্কিত ধারণাও বেদান্তদর্শনে উল্লিখিত মানুষের আধ্যাত্মিক একতা এবং পাশ্চাত্যের জাতীয়তাবাদ সম্পর্কিত চিন্তার এক অভিনব সমাহার। জাতীয়তাবাদকে শক্তিশালী করবার জন্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সাহায্য নিলেও তিলক পাশ্চাত্য চিন্তার অনুসরণে বলেছিলেন, জাতীয়তাবাদের আসল শক্তি হল রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা (Political mobilization)। তিলক বেদান্তবাদী হলেও তাঁর আধুনিক স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গীকে ধর্মের গোঁড়ামী কুয়াসাচ্ছন্ন করতে পারে নি।

প্রসঙ্গতঃ একথাও স্মরণে রাখতে হবে, তাঁর জাতীয়তাবাদ সম্পর্কিত ধারণা হিন্দু সমাজকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। মুসলমান-বৌদ্ধ-শিখ-খৃষ্টান ইত্যাদি ধর্মের মানুষ এই বৃত্তে আসেন নি। এমনকি হিন্দুধর্মের নিম্নবর্ণের মানুষ তথা দলিত সমাজও তাঁর জাতীয়তাবাদ সম্পর্কিত ভাবনার বাইরে থেকে গেছে।

অন্যদিকে, তিলককে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের মহানায়ক গান্ধীর যথার্থ পূর্বসূরী বলা যায়। গান্ধীর স্বরাজ, স্বদেশী ও বয়কট সম্পর্কে ধারণা নিঃসন্দেহে তিলকের ঐসব বিষয়ে ভাবনা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। একই ভাবে বলা যায়, গান্ধীর অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন তিলকের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলন দ্বারা যথেষ্ট অনুপ্রাণিত হয়েছিল।

পরিশেষে, অনন্যসাধারণ দেশপ্রেমী তিলক ব্রিটিশ সরকার দ্বারা কি পরিমাণ নির্যাতিত হয়েছিলেন তা N. C. Kelkar - এর এই মন্তব্য থেকে পরিষ্কার বোঝা যাবে : "সরকার সর্বতোভাবে বিশ্বাস করত

.... নিউ পার্টির এই শীর্ষ নেতাকে জড়িয়ে না নিলে সরকারের ব্যাপক দমনমূলক কার্যকলাপ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।" [৫] ("The Government never concealed their belief .... that no campaign of repressive prosecutions could ever be complete unless it involved this towering leader of the New Party.")।

৪১.৭ সারাংশ

তিলক জাতীয় আন্দোলনের চরমপন্থী নেতা হিসাবে গত শতাব্দীর শেষভাগে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর রাজনৈতিক-সামাজিক চিন্তাভাবনাও খুব মূল্যবান। তাঁর সামাজিক চিন্তা-ভাবনার দুটি প্রধান দিক হল—সমাজসংস্কার এবং জাতীয় শিক্ষা। তিলকের রাজনৈতিক চিন্তাভাবনাকে স্বরাজ, জাতীয়তাবাদ, চরমপন্থা, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ — এই সব অংশে বিভক্ত করা যায়। পরবর্তীকালে গান্ধীর চিন্তা-ভাবনা এবং কর্মপন্থাকে তিলক অনেকখানি প্রভাবিত করেছিলেন। নেতা হিসাবে তিলকের কর্মযজ্ঞের বিশালতা এবং চিন্তাবিদ হিসাবে তাঁর অসাধারণ মননশীলতা আমাদের এক কথায় অভিভূত করে।

৪১.৮ অনুশীলনী

ক) স্বরাজ এবং জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে তিলকের চিন্তাধারা পর্যালোচনা করুন। ধর্ম বিষয়ক ধারণা তাঁর এই চিন্তাধারাকে কীভাবে প্রভাবিত করেছে ?

খ) তিলক অনুসৃত চরমপন্থার মূলসূত্রগুলি ব্যাখ্যা করুন।

গ) তিলকের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ তত্ত্ব আলোচনা করুন।

ঘ) তিলকের চিন্তাধারায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন কিভাবে ঘটেছিল তা সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

ঙ) তিলককে গান্ধীর যথার্থ পূর্বসূরী কিভাবে বলা যায় সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।

৪১.৯ গ্রন্থপঞ্জী

1. Bal Gangadhar Tilak · "His Writings and Speeches." (Madras : Ganesh and Co., 1918).

2. Dennis Dalton : "Indian Idea of Freedom." (Gurgaon, Haryana : Academic Press, 1982)

3. N. R. Inamdar : "The Political Ideas of Lokmanya Tilak." in "Political Thought in Modern India," ed. T. Pantham and K.L. Deutsch (New Delhi : Sage, 1986).

4. I. M. Reisner and N. M. Goldberg ed. : "Tilak and the Struggle For Indian Freedom". (New Delhi : People's Publishing House, 1966).

5. N. C. Kelkar : "Landmarks in Lokamanya's Life." (Madras, 1924).

6. I. M. Reisner and N. M. Goldberg : "Tilak and the Struggle for Indian Freedom", P. 661.

7. Dennis Dalton : "Indian Idea of Freedom", p.1

8. Ibid,. p.12.

9. N. R. Inamdar : "The Political Ideas of Lokmanya Tilak," p. 119.

10. N. C. Kelkar : "Landmarks in Lokamanya's Life", pp. 132-133.

একক ৪২ □ মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

গঠন

৪২.০ উদ্দেশ্য

৪২.১ প্রস্তাবনা

৪২.২ গান্ধী : স্বাধীনতা আন্দোলনের মহানায়ক

৪২.২.১ গান্ধীর দর্শন

৪২.২.২ গান্ধী : জীবন ও কর্ম

৪২.৩ গান্ধীর মূল আদর্শগুলি (Fundamental Ideals)

৪২.৩.১ স্বনির্ভরতা (Autonomy)

৪২.৩.২ সত্য (Truth)

৪২.৩.৩ অহিংসা (Non-violence)

৪২.৩.৪ সাম্য (Equality)

৪২.৩.৫ স্বরাজ

৪২.৩.৬ সত্যাগ্রহ

৪২.৩.৭ সর্বোদয়

৪২.৪ রাষ্ট্র সম্পর্কে গান্ধীর ধারণা

৪২.৪.১ আধুনিকতা ও আধুনিকীকরণ (Modernity and modernisation) : গান্ধীর সমালোচনা

৪২.৪.২ অছি ব্যবস্থা (Trusteeship)

৪২.৫ সমাজসংস্কার বিষয়ে গান্ধীর ভাবনা

৪২.৫.১ জাতিভেদ প্রথা

৪২.৫.২ অস্পৃশ্যতা

৪২.৫.৩ নারীমুক্তি

৪২.৬ গান্ধী : একবিংশ শতাব্দীতে প্রাসঙ্গিকতা

৪২.৭ গান্ধী : সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন

৪২.৮ সারাংশ

৪২.৯ অনুশীলনী

৪২.১০ গ্রন্থপঞ্জী

৪২.০ উদ্দেশ্য

একক ২-এ বিংশ শতাব্দীতে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ ও নেতা এবং ভারতীয় জাতির জনক মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর অমূল্য কর্মময় জীবন ও চিন্তাভাবনা বিষয়ে লেখা হয়েছে।

এই একক পাঠ শেষে আপনি জানতে পারবেন :

- আজীবন সত্যান্বেষী মহাত্মা গান্ধীর অসাধারণ জীবন ও কর্মের কথা।
- ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের মহানায়ক রূপে গান্ধীর ভূমিকার কথা।
- তাঁর বিশ্বখ্যাত অহিংসার দর্শনের প্রকৃত অর্থ।
- তাঁর স্বরাজ, সত্যাগ্রহ ও সর্বোদয় বিষয়ে যুগান্তকারী চিন্তা ভাবনার কথা।
- স্বমাজসংস্কারক হিসাবে অস্পৃশ্যতা ও বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে তাঁর বলিষ্ঠ বক্তব্য।
- আধুনিকতা ও আধুনিকীকরণ সম্পর্কে তাঁর সময়োচিত সাবধানবাণী।
- রাষ্ট্র সম্পর্কে তার সুবিখ্যাত তথ্য।
- অছিব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব।

৪২.১ প্রস্তাবনা

১৯১৫ সালে ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে গান্ধীর আবির্ভাব হয়; ঐ সালে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে আসেন। একক ১-এ আমরা বলেছি, তিলককে গান্ধীর যথার্থ পূর্বসূরী বলা যায়। গান্ধীর স্বরাজ, স্বদেশী, বয়কট সম্পর্কে ধারণা এবং গান্ধীর অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনের উপর তিলকের স্পষ্ট প্রভাব চোখে পড়ে। ১৯১৫ - এর আগে গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবিদ্বেষী শ্বেতাঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের অধিকার রক্ষায় অহিংস সত্যাগ্রহের পথ বেছে নিয়েছিলেন। ভারতে তিনি তাঁর পূর্ব অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করেন এবং ধীরে ধীরে জাতীয় আন্দোলনে প্রধান নেতার ভূমিকা গ্রহণ করেন।

৪২.২ গান্ধী : স্বাধীনতা আন্দোলনের মহানায়ক

গান্ধী ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের এক শূন্যতাময় পরিস্থিতিতে ভারতে পদার্পন করেছিলেন। নরমপন্থীদের উপর জনগণের আস্থা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল; কারণ তাঁদের আবেদন-নিবেদনের নীতি ব্রিটিশ সরকারের অত্যাচার ও শোষণের তীব্রতা একটুকুও কমাতে পারেনি। ওদিকে চরমপন্থীরাও অকেজো হয়ে পড়েছিল। তাঁদের উপর সরকারের দমনের মাত্রা ক্রমেই বেড়ে চলেছিল' তাঁদের অধিকাংশ নেতাকেই ব্রিটিশ সরকার জেলে পুরেছিলেন। গান্ধী শুধু নরমপন্থী-চরমপন্থী নয়, সমস্ত ভারতীয়কেই তাঁর অহিংস

অসহযোগ আন্দোলনে (১৯২০-২২) সামিল হতে আহ্বান করলেন এবং সেই আহ্বান অনেকাংশেই সফল হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে বলা দরকার গান্ধী নরমপন্থী-চরমপন্থী উভয়ের ধ্যানধারণাই কিছু পরিমাণে গ্রহণ করেছিলেন। কিছু বর্জনও করেছিলেন। তিনি নরমপন্থীদের মত ব্রিটিশ গণতন্ত্র ও পার্লামেন্টীয় ব্যবস্থার প্রশংসা করতেন। কিন্তু তাঁদের ধারণানুযায়ী ভারতীয় সভ্যতা অপেক্ষা ব্রিটিশ সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বকে মানতে রাজী ছিলেন না। গান্ধী নরমপন্থীদের মত বিশ্বাস করতেন, ব্রিটিশ উপনিবেশবাদ ভারতীয় অর্থনীতিকে চূড়ান্ত শোষণ করছে, কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের অনুগ্রহ পাবার আশায় আবেদন-নিবেদনের নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। অপরদিকে, গান্ধী চরমপন্থীদের মত মনে করতেন, ভারতীয় সভ্যতা অপেক্ষা পাশ্চাত্য বা ব্রিটিশ সভ্যতা শ্রেষ্ঠ নয়, কিন্তু চরমপন্থীদের ভারতীয় ঐতিহ্য পুনরুজ্জীবনের দৃষ্টিভঙ্গীকে তিনি কখনই পুরোপুরি সমর্থন করেননি। একই সঙ্গে চরমপন্থীদের সন্ত্রাসবাদী পদ্ধতিকেও তিনি পছন্দ করেননি। আবেদন-নিবেদন নয়, সন্ত্রাসবাদ নয়, গান্ধীর ছিল অহিংস সত্যাগ্রহের পথ, যা আমরা পরে ব্যাখ্যা করবো।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে ১৯২০-২২ সালের অসহযোগ আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা প্রাপ্তি পর্যন্ত ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে গান্ধীই ছিলেন সর্বপ্রধান নেতা। তিনিই প্রথম জাতীয়তাবাদী নেতা যিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে জনগণের ভূমিকাকে স্বীকৃতি দেন— আন্দোলনকে গণমুখী করে তোলেন।

গান্ধী আন্দোলনের এমন এক কর্মসূচী প্রনয়ণ করেন যার মধ্যে জনগণের বিভিন্ন অংশ — শ্রমিক, কৃষক, শিল্পপতি, ছাত্র, আইনজীবী ও অন্যান্য পেশাভুক্ত ব্যক্তি এবং সর্বোপরি মহিলাগণ — সবাই নিজ নিজ ভূমিকা পালন করতে পারেন। তাঁর নেতৃত্বে জনগণ দলে দলে কারাবরণ করেছিলেন, বিদেশী সরকারের পুলিশ ও সেনাবাহিনীর লাঠি ও গুলির সামনে নির্দ্বিধায় বুক পেতে দিয়েছিলেন। বিশেষতঃ মহিলারা — যাঁরা শতাব্দীর পর শতাব্দী সংকীর্ণ গার্হস্থ্য জীবনে আবদ্ধ ছিলেন— হাজারে হাজারে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছিলেন। পুরুষদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে অসীম সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন। মহিলাদের এই বিপুল সংখ্যায় যোগদান শুধু স্বাধীনতা আন্দোলনকেই শক্তিশালী করে নি, ভারতের নারী মুক্তি আন্দোলনেও এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেছিল। এই প্রসঙ্গে E. Stanley Jones-এর উক্তি স্মরণীয়। তিনি লেখেন মহিলাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে সামিল করে গান্ধী "বিস্ময়কর নারীত্ব সম্পদের সদ্ব্যবহার করেছিলেন এবং জাতি পুণর্গঠনে তাঁদের এক সৃষ্টিশীল শক্তিতে পরিণত করেছিলেন।" (By drawing woman into the independence movement, Gandhi "tapped the amazing resources of womanhood and made them a constructive force in national reconstruction.")

৪২.২.১ গান্ধীর দর্শন

গান্ধীর নিজস্ব কোন দর্শন বা গান্ধীবাদ (Gandhism) বলে কিছু আছে কিনা এই নিয়ে পণ্ডিত

মহলে বিতর্ক আছে। ভিখু পারেখ মন্তব্য করেছেন, গান্ধীবাদ বলে কিছু নেই. কিন্তু কোন গান্ধীবাদী গান্ধীর কিছু আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সাহসের সাথে তাঁর নিজস্ব পরীক্ষানিরীক্ষা করতে পারেন এবং প্রয়োজনে গান্ধী অনুসৃত ধারাকেও ছাড়িয়ে যেতে পারেন। গান্ধী নিজেও বলেছেন, তিনি সারাজীবন দেশের কাজে ব্যয় করেছেন, কোন গুরুগম্ভীর তত্ত্ব বা গান্ধীবাদ রচনা করেন নি।

গান্ধীবাদ বা গান্ধীর দর্শনের অস্তিত্ব আছে কি না এই বিতর্কে জড়িয়ে না পড়েও এ কথা বিনা দ্বিধায় বলা চলে, কিছু নির্দিষ্ট আদর্শ (ideals) অনুসরণ করে গান্ধী সারাজীবন এক মহৎ কর্মযোগে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর এই সব আদর্শ সম্পর্কে (স্বনির্ভরতা, সত্য, অহিংসা, স্বাধীনতা, সাম্য) তিনি তাঁর ধারণাও নির্দিষ্টভাবে পরিস্ফুট করেছেন। গান্ধীর কৃতিত্ব এইখানেই যে, ব্যক্তি জীবনে বা সমাজজীবনে প্রচলিত কিছু আদর্শ বা মূল্যবোধকে (সত্য, অহিংসা ইত্যাদি) তিনি সাফল্যের সঙ্গে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে প্রয়োগ করতে পেরেছেন।

৪২.২.২ গান্ধী : জীবন ও কর্ম

১৮৬৯ সালের ২রা অক্টোবর গান্ধী গুজরাটের পোরবন্দর শহরে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতামাতা উভয়েরই সততা, নীতিজ্ঞান বোধ ও দয়াধর্ম তাঁকে অল্প বয়স থেকেই প্রভাবিত করেছিল। তবে গান্ধী তাঁর আত্মচরিতে স্বীকার করেছেন, মাতার গভীর ধর্মবোধ ও আত্মত্যাগের প্রবণতা তাঁর জীবনে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করেছিল। গান্ধী পরিবার নিষ্ঠাবান হিন্দু (বৈষ্ণব) ধর্মাবলম্বী হলেও তাঁর পিতার জৈন, মুসলিম ও পার্শী বন্ধুদের প্রতি উদারতা গান্ধীকে সব ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শিখিয়েছিল। স্ত্রী কস্তুরবায় প্রবল, অথচ শান্ত ব্যক্তিত্ব গান্ধীকে পরবর্তী জীবনে অহিংস প্রতিরোধ আন্দোলন সংগঠনে উদ্বুদ্ধ করে।

১৮৮৮ সালের সেপ্টেম্বরে উনিশ বছর বয়সে গান্ধী আইনশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য লন্ডনে যান। যাত্রার পূর্বে তাঁর মা তাঁকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলেন, তিনি চরিত্ররক্ষার্থে মদ, মাংস ও নারী সম্পর্কে সংযত থাকবেন। লন্ডনে গান্ধী পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে চলনে-বলনে পোষাক-পরিচ্ছদে নিজেকে 'ইংরাজ ভদ্রলোক' ("English Gentleinan") হিসাবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতে লাগলেন। তবে কিছুদিনের মধ্যে গান্ধী বিদেশী বন্ধুদের সান্নিধ্যে এসে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়ের সভ্যতা-সংস্কৃতি, দর্শন ও ইতিহাস সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হন।

১৮৯৩ সালে গান্ধী লন্ডনের আইন ডিগ্রী অর্জন করে দক্ষিণ-আফ্রিকায় যান আইনজীবী (ব্যারিস্টার) পেশা অনুসরণ করবার জন্য। এই দক্ষিণ আফ্রিকাতেই তাঁর চিন্তা ও কর্মধারায় এক বিরাট পরিবর্তন আসে।

দক্ষিণআফ্রিকার প্রথম কয়েক বছর গান্ধী আগের মতই ব্রিটিশ সভ্যতার অনুরাগী হিসাবেই জীবন কাটিয়েছিলেন। কিন্তু ১৯০৬ সালে জুলু বিদ্রোহের সময় তিনি ব্রিটিশ সেনাদের শুশ্রুষাকারী হিসাবে কাজ

করতে গিয়ে দেখলেন, জুলুদের প্রতি ব্রিটিশ সেনারা কি অমানুষিক অত্যাচার করেছে। জুলু বিদ্রোহ দমনের নামে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী অগণিত অসামরিক জুলুদের উপর নির্মম অত্যাচার চালিয়েছে। ব্রিটিশ "সভ্যতা-সংস্কৃতির" প্রকৃত স্বরূপ অবশেষে গান্ধীর চোখে ধরা পড়ল। এর কিছুদিন পর ব্রিটিশ সরকার এক "কালা কানুন" জারি করে দক্ষিণ-আফ্রিকার সব ভারতীয়কে আদেশ করে তারা যেন আঙ্গুলের ছাপ দিয়ে তাদের নাম নথিভুক্ত করে। প্রতিবাদ হিসাবে গান্ধী জোহানেস্‌বার্গে তিনহাজার ভারতীয়কে নিয়ে এক অহিংস আইন অমান্য আন্দোলন সংগঠিত করেন। বলা যায়, এটাই ছিল গান্ধীর জীবনে প্রথম সত্যাগ্রহ আন্দোলন। তখন থেকে গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় নানা অবিচারের প্রতিবাদে একের পর এক অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলন করতে থাকেন। ১৯০৯ সালে প্রকাশিত "হিন্দু স্বরাজ" পুস্তকে গান্ধী তাঁর সত্যাগ্রহ ও স্বরাজ সম্পর্কে ধারণা ব্যাখ্যা করেন। এই সব চিন্তাভাবনার উপর থুরো (Yhoreau) ও টলস্টয়ের (Tolstoy) প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। নিজের ভাবনার সংকট কাটিয়ে ওঠার জন্যে তিনি টলস্তয়ের সঙ্গে পত্রালাপও করেন।

এইভাবে দক্ষিণ আফ্রিকার অভিজ্ঞতা এবং সেই প্রসঙ্গে নানা রাজনৈতিক দার্শনিক জিজ্ঞাসার উত্তর সন্ধানের প্রয়াস তাঁর চিন্তাভাবনা ও কর্মপদ্ধতিকে এক পরিণত রূপ দেয়। এই অবস্থায় ১৯১৫ সালে তিনি ভারতে ফিরে আসেন। এই প্রসংগে বি.আর.নন্দা সঠিকভাবেই মন্তব্য করেছেন, 'দক্ষিণ আফ্রিকা তাঁর জন্যে যা করেছিল তার তুলনায় তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার জন্যে যা করেছিলেন তার গুরুত্ব অনেক কম।" ("What Gandhi did to South Africa was less important than what South Africa did to him.")

আগেই বলা হয়েছে, গান্ধী যখন ভারতে পৌঁছলেন তখন কংগ্রেসের নরমপন্থী ও চরমপন্থী এই দুটি গোষ্ঠীর পারস্পরিক কলহের ফলে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এ কথা নির্দ্বিধায় বলা চলে, গান্ধী স্বাধীনতা আন্দোলনে শুধু নতুন প্রাণ-সঞ্চারই করলেন না, তাকে এক অহিংস গণ আন্দোলনে পরিণত করলেন।

১৯১৯ সালে অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে নিরীহ লোকদের উপর নৃশংসভাবে যথেচ্ছ গুলি চালিয়ে চারশ ব্যক্তিকে হত্যা ও পনেরোশ ব্যক্তিকে ঘায়েল করা হয়। প্রতিক্রিয়া স্বরূপ সমস্ত ভারতব্যাপী ধিক্কার ও বিক্ষোভের প্রেক্ষাপটে গান্ধী এক বিশাল অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০-২২) শুরু করেন। আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষ এই আন্দোলনে উত্তাল হয়ে ওঠে। কিন্তু বিহারের চৌরিচৌরা নামক স্থানে আন্দোলন সহিংস রূপ নিয়ে নেয়। পুলিশের পীড়ন সহ্য করতে না পেরে আন্দোলনকারীরা থানা আক্রমণ করে জনগণ দুজন পুলিশ কর্মচারীকে হত্যা করে। গান্ধী আন্দোলন প্রত্যাহার করেন। অতঃপর স্বাধীনতা আন্দোলনের পুরোধা নেতা গান্ধীর নেতৃত্বে বেশ কিছু অহিংস আন্দোলন সংগঠিত হয়। তবে প্রায় দশ বছর অন্তর অন্তর আরো দুটি ঐতিহাসিক সত্যাগ্রহ আন্দোলন ঘটে। আইন অমান্য আন্দোলন (Civil Disobedience Movement, 1930-31) এবং ভারত ছাড় আন্দোলন (Quit India Movement, 1942-44) । সমস্ত আন্দোলনেরই সাধারণ উদ্দেশ্য ছিল স্বরাজ অর্জন।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট দ্বি-খন্ডিত ভারত স্বাধীনতা অর্জন করলেও ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা প্রায় গৃহযুদ্ধের রূপ নেয়। সত্তরোর্ধ গান্ধী তখন উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিম ভারতে উন্মত্ত সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ রোধ করবার জন্য বিভিন্ন স্থানে পদযাত্রা ও অনশন শুরু করেন। ১৯৪৬ সালের নভেম্বর ও ডিসেম্বরে তিনি সমগ্র বাংলায় ১১৬ মাইল ব্যাপী ৪৭ টি গ্রাম পরিক্রমা করেন। অতঃপর তিনি বিহার, দিল্লী, পাঞ্জাব ইত্যাদি প্রদেশে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা সভা ও অনশনের আয়োজন করেন। ১৯৪৭ সালেও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বন্ধের জন্যে তিনি কলকাতায় অনশন ও নোয়াখালিতে পদযাত্রা করেন। ১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারী, গান্ধী দিল্লীর বিড়লা ভবনে অনুষ্ঠিত এক প্রার্থনা সভায় যাওয়ার পথে নাথুরাম গডসে নামে এক উগ্র হিন্দুত্ববাদী মারাঠী আততায়ীর গুলিতে প্রাণ হারান। এইভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনের মহানায়ক সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার মহান উদ্দেশ্যে নিজের জীবন বলি দেন।

ঐ দিন দিল্লী থেকে বেতার ভাষণে জওহরলাল নেহেরু দেশবাসীকে বলেন, আমাদের 'জীবনের আলো নিভে গেল '(Light is out of life)' । আমাদের জাতির জনক আর আমাদের মধ্যে নেই। নেহরু আরও বলেন কিন্তু এ আলো নেভে না। এ আলো সাধারণ আলো নয়। এ আলো আরও বহুদিন জ্বলবে।

৪২.৩ গান্ধীর মূল আদর্শগুলি

গান্ধীর মূল আদর্শগুলি গান্ধীর বক্তব্য ও কার্যকলাপ বোঝার পক্ষে খুব জরুরী। এগুলি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা যাক।

৪২.৩.১ স্বনির্ভরতা

গান্ধী বিশ্বাস করতেন যে, প্রত্যেকটি মানুষের স্বাতন্ত্র্য থাকবে। এর অর্থ, নৈতিক জীব (moral beings) হিসাবে আমাদের অধিকার আছে যে অপরে আমাদের সত্ত্বাকে শ্রদ্ধা করবে। সঙ্গে সঙ্গে অপরের সত্ত্বাকে শ্রদ্ধা করার দায়িত্বও প্রত্যেকের ওপর বর্তায়। আমরা যদি এই দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করি তাহলে আমরা ব্যক্তিকে লক্ষ্য (ends) হিসাবে দেখছি, লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যম (means) হিসাবে নয়। বলপ্রয়োগ দ্বারা কোন ব্যক্তিকে তার আশা-আকাঙ্খা পরিত্যাগ করতে বাধ্য করে তাকে আমার আশা-আকাঙ্খা অনুযায়ী চালাতে পারব না। প্রত্যেক ব্যক্তিরই ব্যক্তি হিসাবে স্বনির্ভরতা (Autonomy) রয়েছে এবং সবাইকে সে কথা মানতে হবে। গান্ধীর স্বনির্ভরতার আদর্শের সঙ্গে তাঁর সত্য ও অহিংসার আদর্শেরও ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। এবারে তা ব্যাখ্যা করা হচ্ছে।

৪২.৩.২ সত্য

গান্ধী প্রতিটি ব্যক্তির স্বনির্ভরতায় বিশ্বাস করতেন। তিনি বলতেন চরম সত্যের (absolute truth) অস্তিত্ব আছে কিন্তু কোন ব্যক্তি আলাদাভাবে তা জানতে পারে না। ব্যক্তি নিজে কোন আপেক্ষিক সত্য (relative truth) জানতে পারে। একজন ব্যক্তির জানা আপেক্ষিক সত্য তার দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিক। আবার অন্য ব্যক্তির জানা আপেক্ষিক সত্য তার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সঠিক। অতএব সবার জানা আপেক্ষিক

সত্য তাদের নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সঠিক। অতএব এই সিদ্ধান্তে আসা যায়, কেউই যেহেতু চরম সত্য (absolute truth) জানে না, অতএব কেউই তার জানা আপেক্ষিক সত্য মানাতে অপরকে বাধ্য করতে পারে না। হিংসা প্রয়োগে তো একেবারেই নয়। এইখানেই গান্ধীর স্বনির্ভরতা ও অহিংসার আদর্শের ভিত্তিভূমি খুঁজে পাওয়া যাবে।

আমরা কেউই চরম সত্য জানি না, প্রত্যেকেই আপেক্ষিক সত্য জানি। অতএব অপরের প্রতি বলপ্রয়োগ না করে তাঁর স্বনির্ভরতাকে শ্রদ্ধা করতে হবে এবং তাঁর প্রতি অহিংস আচরণ করতে হবে। প্রসঙ্গত বলা যায়, চরম সত্য (absolute truth) কোন ব্যক্তি, জাতি, দেশ ও কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, তা এসবকে ছাপিয়ে যায় (transcends)। কোন নির্দিষ্টকালে বিভিন্ন ব্যক্তি চেষ্টা দ্বারা চরম সত্যের কিছু আভাস পেতে পারে মাত্র।

৪২.৩.৩ অহিংসা

আমরা দেখিয়েছি স্বনির্ভরতা ও অহিংসার আদর্শ কিভাবে গান্ধীর সত্য সম্পর্কিত আদর্শকে ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে। গান্ধী বলতেন, হিংসা শুধু হিংসার পাত্রকেই অমানুষ করে তোলে। তিনি আরও বলেন, শুধু ব্যক্তিই হিংস্র আচরণ করে না, সামাজিক প্রতিষ্ঠানও হিংসার জন্ম দেয়। এই প্রসঙ্গে গান্ধী দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও বৈষম্যের উদাহরণ দিয়েছেন।

৪২.৩.৪ সাম্য

গান্ধী সাম্য বলতে সবার জন্য কঠোর আর্থিক সাম্য বোঝাতেন না। তাঁর মতে সাম্যের অর্থ হ'ল, প্রত্যেকেই তাঁর প্রয়োজনের অনুপাতে স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করবে। জনগণের মধ্যে তীব্র আর্থিক বৈষম্য থাকবে না। কিন্তু এক্ষেত্রে সম্পত্তির রাষ্ট্রীয় মালিকানা তিনি পছন্দ করেন নি, কারণ রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ব্যক্তির স্বনির্ভরতা বা স্বাধীনতাকে নষ্ট করে। গান্ধীর ধারণায় প্রত্যেকে নিজ হাতে কাজ করলে সাম্যের লক্ষে পৌঁছানো সম্ভব। এই কারণে গান্ধীর আদর্শ গ্রামে কেবল তাদেরই ভোটাধিকার দেওয়া হয়েছে যারা নিজ হাতে চরকা কাটে। গান্ধীর মতে সাম্যের পরিবেশ না থাকলে স্বনির্ভরতা ও অহিংসার আদর্শ রূপায়ণ সম্ভব নয়।

অনুশীলনী-১

(ক) গান্ধীকে স্বাধীনতা আন্দোলনের মহানায়ক বলা হয় কেন?

(খ) গান্ধীর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

(গ) গান্ধীর 'স্বনির্ভরতা' সংক্রান্ত ধারণা সংক্ষেপে বলুন।

(ঘ) গান্ধীর 'সত্য' সংক্রান্ত ধারণা সংক্ষেপে বলুন।

(ঙ) গান্ধীর 'অহিংসা' সংক্রান্ত ধারণা সংক্ষেপে বলুন।

(চ) গান্ধীর 'সাম্য' সংক্রান্ত ধারণা সংক্ষেপে বলুন।

৪২.৩.৫ স্বরাজ

গান্ধীর মতে স্বরাজের অর্থ হল আত্ম-শাসন (Self-rule) অর্থাৎ নিজের উপর নিজের নিয়ন্ত্রণ। এই আত্ম-শাসন বা আত্মনিয়ন্ত্রণের অর্থ শুধু ব্রিটিশ শাসন মুক্ত হওয়া নয় — সর্বার্থে ব্যক্তিকে পরশাসনমুক্ত হতে হবে। গান্ধী বলেছেন, তাঁর স্বরাজ সংক্রান্ত ধারণাকে একটা বর্গক্ষেত্র বলা চলে। একদিকে রয়েছে রাজনৈতিক স্বাধীনতা, অপর দিকে রয়েছে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। বাকি একদিকে রয়েছে নৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতা, এবং অন্যদিকে ধর্মীয় স্বাধীনতা। কিন্তু গান্ধীর ধারণানুসারে এই ধর্ম সাধারণ অর্থে ধর্ম নয়; যে সত্য সর্বব্যাপী এবং অবিনশ্বর সেই সত্যকেই এখানে ধর্ম বলা হয়েছে। সেই সত্য সন্ধানের স্বাধীনতাও সকলের থাকবে।

গান্ধী অন্যত্র বলেছেন, কেবল ব্রিটিশ শাসনমুক্ত হলেই স্বরাজ আসবে না, প্রকৃত স্বরাজ আনতে হলে রাজনৈতিক স্বাধীনতার সাথে ব্যাপক সমাজ-সংস্কারও করা দরকার। এই সমাজ-সংস্কার প্রধানতঃ তিন রকম : হিন্দু-মুসলমান একতা, অস্পৃশ্যতা বিলোপ এবং গ্রামের সর্বাঙ্গীন উন্নতি। কিন্তু গান্ধী এ কথাও বলেছেন, এই সমাজ সংস্কারের সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক রয়েছে মানুষের মনে । মানুষের মনেই কুসংস্কার, ধর্মীয় উন্মাদনা এবং বিচারবুদ্ধিহীন আবেগের বাস। প্রত্যেক ব্যক্তিকে এই মানসিক বাধা কাটিয়ে উঠে আত্মনিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এইভাবে সমাজ সংস্কার হলে প্রকৃত স্বরাজ অর্জন করা সম্ভব হবে।

গান্ধীর মতে স্বরাজ অর্জনের জন্য "অংশগ্রহণকারী গণতন্ত্র" ("Participatory Democracy") থাকা প্রয়োজন। তিনি পশ্চিমী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় স্বরাজ ভোগ করা সম্ভব নয় মনে করতেন, কারণ তাঁর মতে, "ক্ষমতায় সবাই অংশগ্রহণ না করলে গণতন্ত্র একটা অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।" পশ্চিমী গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ শাসন ব্যক্তির স্বাধীনতাকে ধ্বংস করে। গ্রামের অসংখ্য লোককে "সর্বোচ্চ স্থানে অবস্থিত কুড়ি জন লোক" শাসন করে। গান্ধী পরিকল্পিত "অংশগ্রহণকারী গণতন্ত্রে" গ্রামীন সরকারের (Village Government) খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে ব্যক্তি এবং তাঁর ধারণা অনুযায়ী এইভাবেই সরকারী ক্ষমতা সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হবে।

৪২.৩.৬ সত্যাগ্রহ

গান্ধীর স্বরাজ হল লক্ষ্য (end), সেই লক্ষ্যে পৌঁছবার উপায় বা পদ্ধতি (means) হল সত্যাগ্রহ। সত্যাগ্রহী কোন অন্যায়ের বিরুদ্ধে অহিংস এবং নৈতিক প্রতিবাদ জানাবে, প্রতিপক্ষকে কোন আঘাত করে নয়, নিজ ত্যাগ ও দুঃখবরণ করে। সে আশা করবে নৈতিক শক্তির মুখোমুখি হয়ে প্রতিপক্ষের হৃদয়ের পরিবর্তন হবে এবং সে অন্যায়ের পথ পরিত্যাগ করবে। সত্যাগ্রহের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে— সত্যের প্রতি আগ্রহ, অহিংসা, প্রতিপক্ষ সম্পর্কে শ্রদ্ধা এবং প্রতিবাদকারীর নৈতিক আচরনবিধি।

গান্ধী মনে করতেন, সত্যাগ্রহ এবং নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। নিষ্ক্রিয়

প্রতিরোধ হল দুর্বলের অস্ত্র। কার্যসিদ্ধির জন্য প্রতিরোধকারী প্রয়োজনে হিংসার আশ্রয় নেয়। কিন্তু সত্যাগ্রহ শক্তিমানের অস্ত্র এবং সত্যাগ্রহে কোনভাবেই বলপ্রয়োগ করা হয় না।

গান্ধীর ধারণায় সত্যাগ্রহী পারিবারিক নিয়মকে বৃহত্তর সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে। সত্যাগ্রহী "পরাজয় কি জানে না, কারণ সে অক্লান্তভাবে সত্যের জন্য লড়াই করে।" মৃত্যুকে সত্যাগ্রহী মনে করে "মুক্তি" এবং কারাগারকে "স্বাধীনতার সিংহদ্বার"। গান্ধী সত্যাগ্রহকে "আত্মার শক্তি" ("Soul force") বলে অভিহিত করেছেন; সত্যাগ্রহীর মৃত্যু যদি সংগ্রামের শেষ না হয়ে "মুক্তি" হয়, তবে সত্যাগ্রহীর আত্মাকেও অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। J. Smuts যথার্থই বলেছেন, যেখানে যুক্তি দিয়ে বোঝানো ব্যর্থ হয়, সেখানে প্রতিপক্ষের সহানুভূতি আদায়ের জন্য আত্মত্যাগের নীতিগ্রহণ নিঃসন্দেহে "রাজনৈতিক পদ্ধতির ক্ষেত্রে গান্ধীর সুস্পষ্ট অবদান।"

৪২.৩.৭ সর্বোদয়

"সর্বোদয়" শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল সবার "উদয়" অর্থাৎ সবার মঙ্গল। গান্ধী সর্বোদয় বলতে বুঝেছেন, ব্যক্তির বৈষয়িক, আত্মিক সব দিক থেকে মঙ্গল অর্থাৎ ব্যক্তির সামগ্রিক জীবনের সুষম বিকাশ। সমস্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রেই এই জাতীয় মঙ্গলের কথা ভাবা হয়েছে।

আসলে সর্বোদয়কে এমন একটি সমাজ বলা চলে যেখানে এক বিশেষ ধরণের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা রয়েছে। এই সমাজ যেসব আদর্শ দ্বারা পরিচালিত হয় সেগুলি হল — অহিংসা, সম্প্রীতি ও সাম্য, সকলের মঙ্গল, নতুন মূল্যবোধ, আত্মসংযম, কায়িক পরিশ্রম, বৃহৎ সরকারের পরিবর্তে গ্রামীন সরকার বৃহৎ শিল্পের পরিবর্তে গ্রামীন ও ক্ষুদ্র শিল্প। সর্বোদয়ের মূল কথা হ'ল — "সবার উপর মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।" এই মানুষ বর্তমান যুগে অসাম্য, অবিচার ও অত্যাচারের কারণে তার স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছে। গান্ধীর উদ্দেশ্য ছিল, স্বমহিমায় মানুষকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।

গান্ধী মনে করতেন বৃটিশ শাসন ভারতের শক্তিশালী গ্রাম পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে ধংস করেছে। তিনি ওই পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে তাকে গ্রামীণ সরকারের ক্ষমতা ও দায়িত্ব দিতে চান। দৈনন্দিন জীবনের মূল প্রয়োজনগুলি অর্থাৎ আহার, বাসস্থান, বস্ত্র, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের দায়িত্ব এই গ্রামীণ সরকারের উপর থাকবে। গ্রামীণ সরকারকে নির্বাচিত করবে গ্রামীণ জনগণ। পূর্বে আলোচিত গান্ধীর "স্বরাজ" সংক্রান্ত ধারণার মধ্যে আমরা এই গ্রামীণ সরকারের কথা পড়েছি।

গান্ধী অর্থনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণের কথাও বলেছেন অর্থাৎ গ্রামীণ ও ক্ষুদ্রশিল্পের বিকাশ করতে চেয়েছেন। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রামস্তর থেকে রচনা করতে হবে। তাঁর মতে মানুষ আত্মসংযম দেখিয়ে সহজ সরল জীবন যাপন করবে। বৈষয়িক বিষয়ে মাত্রাতিরিক্ত লোভ শুধু নৈতিক দিক থেকেই ক্ষতিকারক নয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রেও সংকট ঘনীভূত করে।

৪২.৪ রাষ্ট্র সম্পর্কে গান্ধীর ধারণা

গান্ধী সারাজীবন অহিংসার পূজারী ছিলেন। তিনি মনে করতেন রাষ্ট্র হ'ল "সংগঠিত হিংসা" অর্থাৎ রাষ্ট্র নামক সংগঠনের প্রকৃতির ভিত্তিই হল পীড়ন ও হিংসা। রাষ্ট্র বলপূর্বক মানুষের বশ্যতা আদায় করে। এই কারণে গান্ধী রাষ্ট্র-বিরোধী মনোভাব পোষণ করতেন। গান্ধীর ধারণায়, যদিও রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপে কোথাও কোথাও শোষণ ও বঞ্চনার অবসান ঘটা সম্ভব, তবুও আসলে রাষ্ট্র মানুষের চরম ক্ষতিসাধন করে। কারণ রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগ ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও নৈতিক চরিত্রকে ধ্বংস করে দেয়। গান্ধী বলতেন, রাষ্ট্র যেহেতু "হৃদয়হীন যন্ত্র" ("Soulless machine"), অতএব কোনভাবেই তার হিংস্র স্বভাবের পরিবর্তন করা যায় না।

গান্ধী বাস্তববাদী চিন্তাবিদ হিসাবে বুঝেছিলেন, রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণভাবে বিলোপ করা অসম্ভব। সেজন্য তিনি "অহিংস রাষ্ট্রের" ("Non-violent State") কথা বলেছেন। সে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকবে, কিন্তু সে ন্যূনতম বলপ্রয়োগ করবে। গান্ধীর স্বরাজ ও সর্বোদয়ের আদর্শ সম্পর্কে জানতে গিয়ে যে গ্রামীণ সরকারের কথা জানা গেছে সেই সরকার, গান্ধীর মতে, এইরকম ন্যূনতম বল প্রয়োগই করবে। গ্রামীণ সরকারের কাজকর্ম ও আচরণের ভিত্তি হবে হিংস্রতা নয়, নীতিবোধ ও দায়িত্বশীলতা। এই প্রসঙ্গে গান্ধীর বিখ্যাত "রামরাজ্য" ধারণার কথা মনে আসে। গান্ধী "রামরাজ্য" বলতে বুঝিয়েছেন পূর্ণাঙ্গ গণতন্ত্র, যেখানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই সহিষ্ণুতা অনুশীলন করবে। সমাজের সকল স্তরে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে।

গান্ধী সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে পরিষ্কার পার্থক্য করে সমাজকে রাষ্ট্র অপেক্ষা অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। সমাজ রাষ্ট্রের ন্যায় বলপ্রয়োগ করে না। সমাজের পরিমন্ডলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের স্ফূরণ ও নৈতিক উন্নতি সহজ ও স্বাভাবিকভাবে হতে পারে।

৪২.৪.১ আধুনিকতা ও আধুনিকীকরণ (Modernity and Modernisation) : গান্ধীর সমালোচনা

গান্ধী আধুনিকতা ও আধুনিকীকরণের সুবিধাগুলি কখনও অস্বীকার করেননি, কিন্তু তিনি মনে করতেন এই সব সুবিধা পাবার জন্য মানুষকে খুব বেশী মূল্য দিতে হচ্ছে। আধুনিক বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার সুবাদে মানুষের গড় আয়ু বেড়ে গেছে, উৎপাদন বেড়ে গেছে এবং দুর্ভিক্ষ ও খরাকে অনেকটা প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে। অতিরিক্ত দৈহিক পরিশ্রমের হাত থেকে শ্রমজীবীকে বাঁচানো সম্ভব হয়েছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গণহত্যার জন্য মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রও তৈরী হয়েছে। গ্রাম থেকে শহরে আসা শ্রমজীবী মানুষদের মধ্যে কর্মহীনতা দেখা দিয়েছে। শ্রমিকদের কাজ বৈচিত্রহীন হয়ে পড়েছে। এবং সাধারণভাবে সমস্ত মানুষের মধ্যে অসহায়তা ও নিঃসঙ্গতাবোধ দ্রুত ছড়িয়ে যাচ্ছে।

আধুনিকতা ও আধুনিকীকরণ প্রসঙ্গে গান্ধীর সমালোচনা পড়ে অনেকে গান্ধীকে প্রগতিবিরোধী আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু গান্ধীর সমালোচনার একটা বিশেষ মূল্যও রয়েছে। গান্ধীর সমালোচনাকে গ্রহণ না করেও আমরা যদি আধুনিকতা ও আধুনিকীকরণ সম্পর্কে তাঁর সাবধান বাণীকে খেয়াল রাখি তাবে আমাদের অগ্রগতির পথ সুগমই হবে।

অনুশীলনী-২

(ক) গান্ধী স্বরাজ বলতে কি বুঝতেন?

(খ) গান্ধী-প্রচারিত সত্যাগ্রহের অর্থ কি?

(গ) গান্ধীর সর্বোদয় ধারণার উপর একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন।

(ঘ) গান্ধী কেন রাষ্ট্রবিরোধী ছিলেন? সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

(ঙ) গান্ধী কি আধুনিকতা ও আধুনিকীকরণের বিপক্ষে ছিলেন?

৪২.৪ অছি ব্যবস্থা (Trusteeship)

গান্ধীর অছি ব্যবস্থা সম্পর্কে তত্ত্বের মূল কথা হল, ত্যাগের মাধ্যমে ভোগ। গান্ধী অর্থনৈতিক-সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার সংকল্পে অছি ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে চেয়েছেন। পুঁজিপতিদের কাছে আবেদন করে তাদের হৃদয়ের পরিবর্তন করতে হবে এবং তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির একটা অংশ অছি ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা হবে। গান্ধী আইনের মাধ্যমে প্রগতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি মনে করতেন, একমাত্র মানুষের মনের পরিবর্তন হলেই আইন কার্যকর হতে পারে। কিন্তু অছি ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রের আইন নিয়ন্ত্রণ করবে, গান্ধী এই অভিমত পোষণ করেছেন। গান্ধী সমাজতন্ত্রীদের মত ব্যক্তিগত সম্পত্তির রাষ্ট্রীয়করণের মাধ্যমে সামাজিক অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে চাননি। কারণ তিনি মনে করতেন এর ফলে রাষ্ট্রের ক্ষমতা অত্যধিক বৃদ্ধি পাবে এবং রাষ্ট্র ক্রমে স্বৈরাচারী হয়ে ব্যক্তির সর্বপ্রকার অধিকার খর্ব করবে।

অছি ব্যবস্থা প্রত্যেকের জন্য সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ আয় বেঁধে দেবে। কোন্ পণ্য কি পরিমাণে উৎপাদিত হবে তা নির্ধারিত হবে সামাজিক প্রয়োজনের দ্বারা, মুনাফায় পরিমাণের দ্বারা নয়। গান্ধীর অছি ব্যবস্থা সম্পর্কিত তত্ত্বের উদ্দেশ্য যে মহৎ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু সমালোচকরা এই তত্ত্বের বাস্তবমূল্য সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কখনও কোন দয়ালু পুঁজিপতি তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তির কিছু অংশ জনসেবায় দান করতে পারেন। কিন্তু শ্রেণী হিসাবে পুঁজিপতিরা কোন দেশে তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকাংশ দান করবেন এমন সম্ভাবনা অবিশ্বাস্য বলে মনে হতে পারে।

৪২.৫ সমাজসংস্কার বিষয়ে গান্ধীর ভাবনা

এই এককে গান্ধীর স্বরাজ বিষয়ে ধারণাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা হয়েছে, গান্ধীর মতে দেশ ব্রিটিশ শাসনমুক্ত হলেই স্বরাজ আসবে না। প্রকৃত স্বরাজ আনতে হলে রাজনৈতিক স্বাধীনতার সাথে ব্যাপক সমাজসংস্কারও করা দরকার। সামাজিক সাম্য ও স্বাধীনতা না থাকলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। গান্ধীর সমাজসংস্কার বিষয়ে তিনটি ভাবনাকে এখন আলোচনা করা যেতে পারে, জাতিভেদ প্রথা, অস্পৃশ্যতা ও নারীমুক্তি।

৪২.৫.১ জাতিভেদ প্রথা

গান্ধী বর্তমান হিন্দুসমাজে প্রচলিত জাতিভেদ প্রথার তীব্র বিরোধী ছিলেন। তিনি প্রাচীন হিন্দুদের বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার বিরোধী ছিলেন না। কর্মের ভিত্তিতে সেখানে বর্ণব্যবস্থা রচিত হয়েছিল। বিভিন্ন বর্ণের ব্যক্তিরা বিভিন্ন কাজ করত। যদিও ব্যক্তির বর্ণ নির্ধারিত হত জন্ম দ্বারা, তবুও বর্ণভূক্ত থাকার জন্য তাকে প্রয়োজনীয় কর্ম সম্পাদন করতে হত। ব্রাহ্মণের সন্তান ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মালেও উপযুক্ত কর্মের অভাবে তার ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট হয়ে যেত। একইভাবে, কর্মগুণে শুদ্রের সন্তান ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করতে পারত। কিন্তু বর্তমান জাতিভেদ প্রথা, গান্ধীর মতে, বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিরোধী। জাতিভেদ প্রথা হিন্দুধর্ম বিরোধী। এই প্রথা সমাজে অত্যাচার ও অবিচারকে সমর্থন করে। গান্ধী যথাশীঘ্র সম্ভব এই জাতিভেদ প্রথা ধ্বংস করতে দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন।

৪২.৫.২ অস্পৃশ্যতা

গান্ধী হিন্দুদের একটি অংশকে অস্পৃশ্য মনে করার বিরুদ্ধে সারাজীবনই জেহাদ ঘোষণা করেছেন। ১৯২৫ সালে একটি ভাষণে তিনি আবেগমথিত কণ্ঠে বলেছিলেন, অস্পৃশ্যতা যদি হিন্দুধর্ম হয়, তবে ঈশ্বর তোমার প্রতি আমার কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা, যত শীঘ্র একে ধ্বংস করবে ততই সবার মঙ্গল হবে। গান্ধী তথাকথিত অস্পৃশ্যদের নামকরণ করেছিলেন "হরিজন"; বলেছিলেন ওরা "হরিজন" অর্থাৎ ভগবানের লোক আমরা "দুর্জন" অর্থাৎ দুষ্ট লোক।

সন্দেহ নেই, গান্ধীর অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলন মূলতঃ মানবিকতার আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও সত্য যে গান্ধী মনে করতেন, হিন্দু জনসংখ্যার এক পঞ্চমাংশকে দূরে সরিয়ে রাখলে জাতীয় স্বাধীনতা ও সমাজ পুনর্গঠনের লক্ষ্যে কখনই পৌছানো যাবে না। তিনি তাঁর অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলনকে হিন্দুদের সমাজ সংস্কারের মধ্যে নিবদ্ধ রাখতে চান নি। তিনি মন্তব্য করেছিলেন, অস্পৃশ্যতার দুষ্টক্ষত চারদিকে এমনভাবে ছড়িয়ে গেছে যে কেবল হিন্দুদের মধ্যে একতা আনাই যথেষ্ট নয়। হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রীষ্টান, পার্শী, ইহুদি সবাইকেই শুভেচ্ছা ও সম্প্রীতির বন্ধনে বাঁধতে হবে। কারণ আমরা সবাই শুধু এক ভারতীয় পরিবারেরই সন্তান নই, আমরা এক বিশ্ব মানব পরিবারেরও সন্তান।

৪২.৫.৩ নারীমুক্তি

৪২.২ এককে দেখা গেছে, ভারতীয় নারীরা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে হাজারে হাজারে গান্ধী পরিচালিত বিভিন্ন স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন। এইভাবে জাতির স্বাধীনতা আন্দোলন শুধু শক্তিশালী হয়েছিল তাই নয়, ভারতীয় নারীদের মুক্তি আন্দোলনেও এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছিল। অসংখ্য মহিলা তাঁদের ক্ষমতা সম্পর্কে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠেন এবং নারীপুরুষের সমান অধিকার ও মর্যাদার কথা ভাবতে শুরু করেন।

গান্ধীর অভিমত ছিল, নারীদের অধিকার অর্জনের প্রতিবন্ধক হিসাবে অসংখ্য সামাজিক প্রথা ছড়িয়ে আছে, যথা, বাল্যবিবাহ, বৈধব্য, বিশেষতঃ শিশু বৈধব্য, বৈশ্যাবৃত্তি, কুসংস্কার, পর্দাপ্রথা, মদ্যপান এবং নারীর আর্থিক পরাধীনতা। গান্ধী সারাজীবন এই সব প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন। তিনি পরিবারে স্ত্রীর উপর স্বামীর প্রভুত্বের নিন্দা করে পরিবারে সাম্যের পরিবেশ সৃষ্টি করতে বলেছেন। একই সঙ্গে তাঁর অহিংসার নীতিও পরিবারের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা জরুরী বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। গান্ধী "মনুস্মৃতি" গ্রন্থে নারীদের সম্পর্কে প্রদত্ত বিধান তাঁদের পক্ষে চরম অবমাননাকর বলে মন্তব্য করেছেন। মোট কথা, মানুষের স্বাধীনতা ও সাম্যে বিশ্বাসী গান্ধী নারীদের ক্ষেত্রেও একই মনোভাব পোষণ করতেন এবং পরিবারে ও পরিবারের বাইরে তাঁদের পুরুষদের সঙ্গে একই আসনে বসাবার পক্ষপাতী ছিলেন।

৪২.৬ গান্ধী : একবিংশ শতাব্দীতে প্রাসঙ্গিকতা

একবিংশ শতাব্দীতে গান্ধীর প্রাসঙ্গিকতা যথেষ্টই রয়েছে। বিংশ শতাব্দীর কয়েকটি গুরুতর সমস্যা একবিংশ শতাব্দীতেও থেকে যাবে। সেই সমস্যাগুলি সম্পর্কে গান্ধীর মূল্যবান চিন্তা-ভাবনা অনুধাবন করলে একবিংশ শতাব্দীতেও তাঁর প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকে না।

প্রথমতঃ রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ দ্রুত হারে বাড়ছে। ফলে কেন্দ্রীভূত বিশাল রাষ্ট্রের আধিপত্যও ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। এইভাবে ব্যক্তির স্বাধীনতা দিন দিন কমছে। গান্ধী এই সংকটের প্রতিবিধান হিসাবে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের কথা বলেছেন। তাঁর পঞ্চায়েত সরকার ব্যবস্থা সমাজের নীচু থেকে উঁচু অবধি সমস্ত স্তরে ক্ষমতা ছাড়িয়ে দেবার কথা বলেছে।

দ্বিতীয়তঃ আধুনিক অর্থনীতির বিশ্বায়ন (Globalization of the modernized economy) সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে গান্ধী বলেছিলেন, এর ফলে অর্থনৈতিক কুফলই শুধু দেখা দেয় তাই নয়, সংস্কৃতির বিশ্বায়নও (Globalization of culture) ঘটে। এর ফলে অঞ্চল ভেদে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ধ্বংস হয় এবং একইরকম সংস্কৃতি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। গান্ধী বরাবরই বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণের উপর খুব গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ তিনি মনে করতেন ব্যক্তির স্বনির্ভরতা (Autonomy) রক্ষার জন্য এর প্রয়োজনীয়তা আছে। গান্ধীর এই সব চিন্তাধারা একবিংশ শতাব্দীতে যথেষ্ট মনোযোগ আকর্ষণ করবে।

তৃতীয়তঃ গান্ধী পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে মৌলিক বক্তব্য রেখেছেন। তাঁর ভাষায়, "বর্তমানে ভোগপ্রধান সমাজের পরিবেশ সম্পর্কে দায়বদ্ধতার অনুভূতি নেই এবং গান্ধী এই ধরণের নৈতিক উদাসীনতার মোকাবিলা করতে ইচ্ছুক।" ("Today's consumer society has little sense of obligation to the environment, and Gandhi wants to challenge this kind of moral apathy".) গান্ধী পরিবেশ দূষণের মূল প্রতিকার হিসাবে বলেছিলেন, জনগণ নৈতিক কর্তব্য হিসাবে স্বেচ্ছায় ভোগের আকাঙ্খা কমিয়ে আনবে; এইভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের যথেষ্ট লুণ্ঠন বন্ধ হবে এবং মানুষ, অন্যান্য প্রানী, অরণ্য, পর্বত, সমুদ্র সবাইকে নিয়ে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করা যাবে। গান্ধীর এই আত্মসংযমের নৈতিক তত্ত্ব হয়ত অনেকের কাছে বাস্তবমূল্যহীন মনে হতে পারে। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীতে যখন ক্রমেই পরিবেশ দূষণের সমস্যা তীব্রতর হবে তখন গান্ধীর বক্তব্য অনেক বেশি গুরুত্ব পাবে।

চতুর্থতঃ গান্ধীর অহিংসা-সম্পর্কিত চিন্তাধারা একবিংশ শতাব্দীতেও — যখন পারমাণবিক বিশ্বযুদ্ধের আশংকা এবং আঞ্চলিক সংঘাতের আশংকা পাশাপাশি থেকেই যাবে প্রাসঙ্গিকতা হারাবে না। আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী, এই বক্তব্য মানতে গান্ধী কোনদিনই রাজী ছিলেন না। হিংসাকে বাদ দিয়ে কোন পদ্ধতিতে আন্তর্জাতিক সংঘাতের সমাধান করা যায় গান্ধী সেই কথাই ভেবেছেন। সেই সঙ্গে এই চিন্তাও করেছেন, রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থাকে কিভাবে এমন করে পুনর্গঠিত করা যায় যাতে হিংসা সৃষ্টিকারী পরিস্থিতিকেই বাতিল করে দেওয়া সম্ভব হয়।

যাইহোক, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, উপরিউল্লিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে গান্ধীর চিন্তাভাবনা একবিংশ শতাব্দীতেও প্রাসঙ্গিকতা হারাবে না।

৪২.৭ গান্ধী : সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন

বিংশ শতাব্দীতে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহামানব গান্ধীর মূল্যায়ন করা সহজ নয়, তবুও তাঁর সংক্ষিপ্ত মূল্যায়নের চেষ্টা করা যেতে পারে।

প্রথমতঃ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের মহানায়ক হিসাবে প্রায় তিন দশকের অধিককাল ধরে গান্ধীর ভূমিকা এক কথায় অবিস্মরণীয়। ১৯১৫ সালে তিনি যখন দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে আসেন তখন নরমপন্থী এবং চরমপন্থীদের পারস্পরিক বিরোধে স্বাধীনতা আন্দোলন বিভ্রান্ত ও মৃতপ্রায়। গান্ধীর অহিংস সত্যাগ্রহের আদর্শ স্বাধীনতা আন্দোলনে পুণরায় প্রাণ সঞ্চার করে তাকে এক নতুন পথের সন্ধান দিল। গান্ধীর সত্যাগ্রহ আদর্শের নিজস্ব নৈতিক মূল্য ছাড়াও এক অভিনব সামাজিক-রাজনৈতিক কর্মপদ্ধতি হিসাবেও এর অসামান্য গুরুত্বকে স্বীকার করতে হয়। এশিয়া আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে স্বাধীনতার আন্দোলনকারীরা গান্ধী-প্রদর্শিত সত্যাগ্রহ পদ্ধতি সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করেছেন।

দ্বিতীয়তঃ সমাজ সংস্কারক হিসাবে গান্ধীর ভূমিকা অতুলনীয়। তিনি সঠিকভাবেই বুঝেছিলেন যে অচল, অনড়, কুসংস্কারগ্রস্ত ভারতীয় সমাজের আমূল সংস্কার না করলে ভারতকে বিদেশী শাসনমুক্ত করে

কোন লাভ হবে না। দেশ অন্ধকারেই থেকে যাবে। অস্পৃশ্যতা, জাতিভেদ প্রথা, নারীদের প্রতি বৈষম্য, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ — এই সব সামাজিক কলঙ্ক মোচনের জন্য তিনি সারাজীবন ধরে তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছিলেন। বস্তুতঃ অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তিনি তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের মহানায়ক গান্ধীকে আমরা এক অসামান্য সমাজ সংস্কারক হিসাবেও দেখতে পাই।

তৃতীয়তঃ বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব গান্ধীর একবিংশ শতাব্দীতেও যথেষ্ট প্রাসঙ্গিকতা থাকবে। (এখানে ২.১২ অংশের আলোচনা লিখুন।)

চতুর্থতঃ গান্ধীর অনন্য বৈশিষ্ট্য হ'ল, সত্য, বিশ্বাস, অহিংসা, সাম্য — এই সমস্ত আদর্শকে (ideals) তিনি নির্দ্বিধায় তাঁর ব্যক্তিগত জীবন এবং রাজনৈতিক জীবনে একই সাথে প্রয়োগ করেছেন। সম্ভবতঃ সমগ্র বিশ্বে তিনিই একমাত্র নেতা যিনি তাঁর প্রতিটি ঘোষিত ধারণা ও বিশ্বাস নিজের জীবনে প্রয়োগ করেছেন। তা করতে গিয়ে তাঁকে ব্যক্তিগত জীবনে বহু শোক ও দুঃখ বরণ করতে হয়েছে। তথাপি তিনি পথচ্যুত হন নি। শুধু তাঁর পক্ষেই বলা সম্ভব ছিল, "আমার জীবনই আমার বাণী।" রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এইসব আদর্শ প্রযোজ্য নয়, সব রাজনীতিজ্ঞদের এই সাবধান বাণী গান্ধী গ্রহণ করেন নি — এইখানেই তাঁর অভিনবত্ব। এই প্রসঙ্গে Dennis Dalton মন্তব্য করেছেন, "গান্ধীর তিনদশক ব্যাপী জাতীয় নেতৃত্ব এই ইঙ্গিত দেয় যে রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাই হল আদর্শ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করবার একেবারে সঠিক স্থান।" ("Gandhi's three decades of national leadership suggest that political experience may serve as precisely the right place for testing or perfecting ideals".)।

গান্ধী মনে করতেন, সত্যাগ্রহীর বৈশিষ্ট্য হল, সে মানুষকে বিশ্বাস করবে, এমন কি প্রতিপক্ষের প্রতিও তার বিশ্বাস থাকবে। গান্ধীর মতে,অবিশ্বাস হল দুর্বলতার লক্ষণ এবং সত্যাগ্রহে দুর্বলতার স্থান নেই, সত্যাগ্রহী সবল ও ভয়মুক্ত। গান্ধী তাঁর ব্যক্তিগত ও প্রকাশ্য জীবনে সততা ও বিশ্বাসকে সমান গুরুত্ব দিয়েছেন; বিনিময়ে তিনি জনগণের অসীম বিশ্বাস অর্জন করেছেন।

পরিশেষে বলা যায়, মহামানব গান্ধীর অবদান শুধু ভারত ভূখন্ডেই সীমাবদ্ধ নেই, সমস্ত বিশ্বে ছড়িয়ে আছে। মানব সভ্যতায় তাঁর অবদানের কথা বিশ্ববাসী চিরকাল মনে রাখবে।

৪২.৮ সারাংশ

১৯১৫ সালে গান্ধী দক্ষিণ-আফ্রিকা থেকে ভারতে আসেন। তারপর প্রায় তিনদশক ধরে তিনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রধান নেতার ভূমিকা পালন করেন। গান্ধী শুধু অহিংস আন্দোলনে বিশ্বাসী ছিলেন তাই নয়; অহিংসা স্বনির্ভরতা, সত্য, স্বাধীনতা, সাম্য — এই সমস্ত আদর্শকে তিনি সাফল্যের সঙ্গে রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন।

গান্ধীর ধারণায় কেবল ব্রিটিশ শাসনমুক্ত হলেই ভারতের স্বরাজ আসবে না। প্রকৃত স্বরাজ আনতে হলে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও আত্মিক স্বাধীনতাও প্রয়োজন। স্বরাজের লক্ষ্যে পৌঁছবার পদ্ধতি হল সত্যাগ্রহ। সত্যাগ্রহের অর্থ হ'ল, প্রতিবাদকারী অন্যায়ের বিরুদ্ধে অহিংস ও নৈতিক প্রতিবাদ জানাবে, প্রতিপক্ষকে আঘাত করে নয়, নিজে ত্যাগ ও দুঃখবরণ করে। উদ্দেশ্য, প্রতিপক্ষের বিবেকবুদ্ধি জাগ্রত করা। গান্ধী সর্বোদয় বলতে বুঝেছেন, প্রতিটি ব্যক্তির সর্বার্থে মঙ্গল অর্থাৎ বৈষয়িক, আত্মিক সব দিকে থেকে তার সামগ্রিক জীবনের সুষম বিকাশ। যে সমাজব্যবস্থায় সর্বোদয় সম্ভব সেই সমাজব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হ'ল — অহিংসা, সম্প্রীতি, সাম্য, নতুন মূল্যবোধ, আত্মসংযম, কায়িক পরিশ্রম ও বিকেন্দ্রীকরণ।

গান্ধী সারাজীবন অহিংসার পূজারী ছিলেন। তিনি মনে করতেন, রাষ্ট্রের প্রকৃতিই হল পীড়নমূলক ও হিংসাত্মক। সুতরাং গান্ধী রাষ্ট্রবিরোধী ছিলেন। তিনি আধুনিকতা ও আধুনিকীকরণের অনেক সুবিধা স্বীকার করে নিয়েও এর কুফল সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন, যথা, মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রের ঢালাও উৎপাদন, কর্মহীনতা, কর্মে বৈচিত্র্যহীনতা, মানুষের নিঃসঙ্গতাবোধ, আঞ্চলিক সংস্কৃতি বিপন্ন হয়ে পড়া ইত্যাদি।

গান্ধী অছিব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তিনি পুঁজিপতিদের কাছে আবেদন করেছিলেন, তাঁরা যেন তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির একটা অংশ অছিব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করে। এই অছিব্যবস্থা জনসাধারণের মধ্যে অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করবে। স্বাধীনতা আন্দোলনের পুরোধা নেতা গান্ধী সমাজসংস্কারক হিসাবেও খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। কারণ তিনি জানতেন, ব্যাপক সমাজ সংস্কার ব্যতীত রাজনৈতিক স্বাধীনতা মূল্যহীন হয়ে পড়ে। তিনি জাতিভেদ প্রথা, অস্পৃশ্যতা, নারীমুক্তি বিষয়ে ব্যাপক আন্দোলন সৃষ্টি করেছিলেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার্থে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয় এবং দৃষ্টান্তবিহীন। বস্তুতঃ এই অবদানের কারণেই তাঁকে শহীদের মত্যুবরণ করতে হয়। একবিংশ শতাব্দীতে গান্ধীর প্রাসঙ্গিকতা পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়, যদি একবিংশ শতাব্দীতেও বিশ্বময় বজায় থাকবে এমন চারটি সমস্যা সম্পর্কে তাঁর অমূল্য চিন্তাধারা আমরা স্মরণ করি। সেগুলি হল— (১) রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ, (২) আধুনিক অর্থনীতির বিশ্বায়ন, (৩) পরিবেশ দূষণ, (৪) হিংসা ও সংঘাত। এই সঙ্গে স্মরণে রাখতে হবে আমাদের দেশে অস্পৃশ্যতা, নারীর পরাধীনতা, বিশ্বায়নের মুখে এদেশের নানা আঞ্চলিক সংস্কৃতির বিপন্নতা ইত্যাদির কথা এবং এইসব বিষয়ে গান্ধীর অসামান্য ভাবনা-চিন্তা ও দিশা প্রদর্শনের কথা।

গান্ধীর মূল্যায়ন করতে হলে তাঁর কর্মজীবনের কয়েকটি দিকের কথা ভাবা দরকার। প্রথমতঃ, স্বাধীনতা আন্দোলনের মহানায়ক; দ্বিতীয়তঃ, অসাধারণ সমাজসংস্কারক; তৃতীয়তঃ একবিংশ শতাব্দীতে প্রাসঙ্গিকতা এবং চতুর্থতঃ, সত্য, অহিংসা ইত্যাদি কিছু আদর্শের ব্যক্তিগত এবং রাজনৈতিক জীবনে একই

সাথে প্রয়োগ। এইসব বিবেচনা করে দ্বিধাহীনভাবেই বলা যায় ভারত তথা বিশ্বের কল্যাণে গান্ধীর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এবং যত দিন যাবে তাঁর প্রাসঙ্গিকতা ততই বৃদ্ধি পাবে। তাঁর মৃত্যুর বহুকাল পরে যেভাবে দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবৈষম্যের অবসান করে অহিংস বিপ্লব ঘটে গেল, অথবা যেভাবে প্যালেস্টাইন সমস্যা ক্রমাগত সমাধানের দিকে এগোচ্ছে, তা দেখে এই বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়। একথা বলাই যায় যুগ যুগ ধরে বিশ্ববাসীর অন্তরে তাঁর জন্য শ্রদ্ধার আসন পাতা থাকবে।

৪২.৯ অনুশীলনী

ক) গান্ধী পরিকল্পিত অছি ব্যবস্থা সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

খ) গান্ধীর সমাজসংস্কার বিষয়ে ভাবনার পর্যালোচনা করুন।

গ) জাতিভেদ প্রথা সম্পর্কে গান্ধীর কি দৃষ্টিভঙ্গী ছিল?

ঘ) অস্পৃশ্যতা প্রসঙ্গে গান্ধীর ভাবনা সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

ঙ) গান্ধীর নারীমুক্তি সম্পর্কে ধারণার উপর একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন।

চ) একবিংশ শতাব্দীতে গান্ধীর প্রাসঙ্গিকতা বিষয়ে আলোচনা করুন।

ছ) গান্ধীর কর্মজীবন ও চিন্তাধারার সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন করুন।

৪২.১০ গ্রন্থপঞ্জী

1) Bhikhu Parekh : "Gandhi's Political Philosophy." (Notre Dame : University of Notre Dame Press, 1989).

2) B.R. Nanda : "Mahatma Gandhi." – (Bombay : Allied Publishers, 1958)

3) Dennis Dalton : "Mahatma Gandhi – Non-violent Power in Action." (New York : Columbia University Press, 1993).

4) Dennis Dalton ed. : "Mahatma Gandhi – Selected Political Writings." (Indianapolis Cambridge : Hackett, 1996).

5) Raghavan N. Iyer : " The Moral and Political Thought of Mahatma Gandhi" (Oxford / London : Oxford University Press, 1978).

6) Ronald J. Terchek : " Gandhi– Struggling for Autonomy." (Lanham / New York : Rowman & Littlefield, 1998).

7) Ronald J. Terchek and Nitis Das Gupta : " Gandhi and the Autonomous Woman", "Gandhian Studies", Vol. 2, No. 1, July- December, 1997, 23-42.

8) E. Stanley Jones : "Mahatma Gandhi – An Interpreter" (London : Hodder and Stoughton, 1948), p. 179.

9) B. R. Nanda : "Mahatma Gandhi", p. 121.

10) Ronald J. Terchek : "Gandhi – Struggling for Autonomy", p. 235.

11) Dennis Dalton : "Mahatma Gandhi – Non-violent Power in Action", p. 199.

একক ৪৩ □ ভীমরাও রামজী আম্বেদকর

গঠন

৪৩.০ উদ্দেশ্য
৪৩.১ প্রস্তাবনা
৪৩.২ আম্বেদকর : জীবন ও কর্ম
৪৩.৩ আম্বেদকর : সামাজিক চিন্তাধারা
৪৩.৪ আম্বেদকর : অর্থনৈতিক চিন্তাধারা
৪৩.৫ আম্বেদকর : রাজনৈতিক চিন্তাধারা
৪৩.৬ আম্বেদকর : সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন
৪৩.৭ সারাংশ
৪৩.৮ অনুশীলনী
৪৩.৯ গ্রন্থপঞ্জী

৪৩.০ উদ্দেশ্য

একক ৪৩ লেখা হয়েছে ভারতের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সংবিধান বিশেষজ্ঞ, অসাধারণ সাংগঠনিক প্রতিভার অধিকারী এবং বঞ্চিত-শোষিত জনগণের মহান নেতা ভীমরাও রামজী আম্বেদকরের অসামান্য কর্মজীবন এবং সুগভীর চিন্তাধারা সম্পর্কে । এই একক পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন :

- আম্বেদকরের বলিষ্ঠ জীবন সংগ্রামের কথা।
- দেশ-বিদেশের শিক্ষা জগতে তাঁর বহু সম্মান লাভের কথা।
- তাঁর অমূল্য সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা।
- পশ্চাৎপদ জনগণের নেতা হিসাবে সারাজীবনব্যাপী তাঁর বিশাল কর্মকাণ্ডের কাহিনী।
- ভারতীয় সংবিধানের রূপকার হিসাবে তাঁর গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার কথা।

৪৩.১ প্রস্তাবনা

বিংশ শতাব্দীতে ভারতমাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুসন্তান ভীমরাও রামজী আম্বেদকর (১৮৯১-১৯৫৬) অসাধারণ খ্যাতি অর্জন করেন তথাকথিত অস্পৃশ্যদের নেতা এবং স্বাধীন ভারতের সংবিধানের রূপকার হিসাবে। জওহরলাল নেহরু তাঁকে হিন্দুসমাজের সমস্ত দমনকারী শক্তির বিরুদ্ধে "বিদ্রোহের প্রতীক" বলে সম্মানিত করেন। আম্বেদকরের কর্মজীবন প্রায় পঞ্চাশ বছর পরিব্যাপ্ত ছিল। এই দীর্ঘ সময়ে তিনি তাঁর

নিজের মহার বর্ণভুক্ত এবং অন্যান্য অনেক অস্পৃশ্য বর্ণভুক্ত জনতাকে সংগঠিত করে আন্দোলন করেন। তিনটি রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে পরাধীন ও পরে স্বাধীন ভারতের ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসাবে কাজ করেন এবং বিস্তারিতভাবে দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত মতামত প্রচার করেন ও লেখেন। আম্বেদকরের জীবন বলিষ্ঠ আত্মবিশ্বাস, রক্ত-ঘাম-ঝরা জীবনযুদ্ধ এবং নীচুতলার স্বজনদের প্রতি গভীর মমতাবোধের এক আশ্চর্য নিদর্শন।

৪৩.৩ আম্বেদকর : জীবন ও কর্ম

১৮৯১ সালের ১৪ই এপ্রিল মধ্য প্রদেশের মহাউ (এখন মাহু) অঞ্চলে আম্বেদকরের জন্ম হয়। তিনি মহার বর্ণভুক্ত ছিলেন এবং তাঁর পিতা রামজী মালোজী আম্বেদকর ছিলেন সেখানকার সামরিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। আম্বেদকর নিম্নবর্ণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন বলে নানারকম সামাজিক বৈষম্যের শিকার হয়েছেন, কিন্তু তাঁকে তাঁর গ্রাম থেকে প্রথাগত পেশা গ্রহণ করতে হয়নি। ডাপলিতে স্থানীয় বিদ্যালয়ে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং পরে সাতারার সরকারী বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। বিদ্যালয় জীবনে অস্পৃশ্য বর্ণভুক্ত বলে তিনি নানাভাবে অসম্মানিত হন। সহপাঠিরা তাঁর সঙ্গে খেলতে চায় না। শিক্ষকেরা তাঁর বই, খাতা স্পর্শ করতে অস্বীকার করেন। সংস্কৃত ভাষা পড়তে আগ্রহী হলেও তার বদলে পার্শি পড়তে বাধ্য হন। এই ভাবে অপমানের আগুনে দগ্ধ হতে হতে ভবিষ্যৎ ভারতের নিম্নবর্ণভুক্তদের অবিসম্বাদী নেতার চরিত্র ইস্পাত কঠিন রূপ ধারণ করতে থাকে।

১৯১৩ সালে আম্বেদকর বম্বের এলফিনস্টোন কলেজ থেকে স্নাতক হন। বরোদার মহারাজা গাইকোয়াড়ের সাহায্যে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং সেখান থেকে পি. এইচ. ডি. অর্জন করেন। তারপর কোলাপুরের মহারাজার পৃষ্ঠপোষকতায় আম্বেদকর লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়নের সুযোগ পান এবং সেখান থেকে ডি. এস. সি. লাভ করেন এবং ব্যারিস্টারিও পাশ করেন। এইভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংল্যান্ড দুবার যাতায়াত করে আম্বেদকর বিদেশে শিক্ষাগ্রহণ সমাপ্ত করে ১৯২৩ সালে ভারতে ফিরে আসেন।

১৯৩০-৩২ সালে লন্ডনে গোলটেবিল বৈঠকের তিনটি অধিবেশনেই আম্বেদকর নিম্নবর্ণভুক্ত ব্যক্তিদের প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দেন। তখন নিম্নবর্ণের স্বতন্ত্র নির্বাচনী এলাকা নিয়ে গান্ধী-আম্বেদকরে বিরোধ হয়। এই বিরোধ চূড়ান্ত রূপ নেয় ১৯৩২ সালে যখন ব্রিটিশ সরকার নিম্নবর্ণের স্বতন্ত্র নির্বাচনী এলাকা ঘোষণা করে। গান্ধী ১৯৩২ সালে পুনের কারাগারে এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে আমৃত্যু অনশনের সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর অভিমত ছিল এর ফলে হিন্দু সমাজ থেকে নিম্নবর্ণভুক্তগণ একেবারে দূরে সরে যাবেন। যাইহোক, গান্ধীর স্বাস্থ্যের অবনতি হতে থাকায় পুণের চুক্তি হল এবং আম্বেদকর স্বতন্ত্র নির্বাচনী এলাকার দাবী ছাড়তে রাজী হলেন। কিন্তু দুটি শর্ত তিনি আরোপ করেন — (১) অস্পৃশ্যতা দূর করতে গান্ধী ও তাঁর অনুগামীগণ সাহায্য করবেন; (২) সমস্ত নির্বাচিত রাজনৈতিক সংস্থায় অস্পৃশ্যদের সংরক্ষিত আসন থাকবে। এই পুণে চুক্তি

আম্বেদকরের নেতৃত্বের বিশেষ সাফল্যের পরিচায়ক। এই প্রথম ভারতের রাজনৈতিক কার্যকলাপে নিম্নবর্ণভূক্তদের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত হল।

১৯৩৭ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার উদ্দেশ্য নিয়ে আম্বেদকর "Independent Labour Party" প্রতিষ্ঠা করেন। পার্টির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হয়েছিল — শুধু নিম্নবর্ণের উন্নতিসাধনই নয়, "মূলতঃ শ্রমিকশ্রেণীর উন্নতিসাধানই লক্ষ্য থাকবে। আরও বলা হয়েছিল, জনস্বার্থে শিল্পের রাষ্ট্রীয় মালিকানার নীতি গ্রহণ করতে হবে।

১৯৪২ সাল থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত Viceroy's Executive Council-এ শ্রমমন্ত্রী হিসাবে কাজ করার সময় আম্বেদকর শুধু মহার এবং অন্যান্য তফশিলভুক্ত বর্ণের জন্য কল্যাণমূলক কাজই করেন নি, সাধারণ শ্রমিকদের স্বার্থের অনুকূলে শিল্প-সালিশী সংক্রান্ত আইন ও অন্যান্য শ্রম আইন প্রবর্তন করার চেষ্টাও করেন। ১৯৪৬ সালে তিনি গণপরিষদে নির্বাচিত হন। আম্বেদকর কংগ্রেস দলের কঠোর সমালোচক হলেও ১৫ই আগস্ট ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হবার পর তিনি প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর ক্যাবিনেটে শ্রমমন্ত্রী হিসাবে যোগ দেন। সেই সাথেই তাঁকে গণপরিষদের সংবিধান খসড়া কমিটির সভাপতির দায়িত্ব-ভারও দেওয়া হয়।

অবশ্য ভারতীয় সংবিধানে আম্বেদকরের ধ্যান-ধারণা থেকে অনেক বেশী প্রতিফলিত হয়েছে কংগ্রেসের মতাদর্শ। তবুও সংবিধানের কিছু ক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে আম্বেদকরের অবদান প্রত্যক্ষ করা যায়। যেমন, তফশিলী বর্ণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা, অস্পৃশ্যতাকে বেআইনী ঘোষণা, গণতন্ত্র রক্ষার প্রয়োজনে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার, স্বতন্ত্র বিচার ব্যবস্থা, মৌলিক অধিকারের মধ্যে সাম্যের অধিকারের অন্তর্ভুক্তি ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, আম্বেদকরকে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫২ সালে ভারতীয় সংবিধান রচনায় অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য আইন বিষয়ক সর্বোচ্চ ডিগ্রী ''ডক্টর অফ ল'' প্রদান করে।

দীর্ঘদিন ধরে হিন্দু সমাজের মনুবাদী কাঠামো ভেঙে বর্ণভেদ তথা জাতপাত ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে দলিত সমাজের মুক্তির চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত আম্বেদকর শুধু ব্যর্থতার স্বাদই পান। হিন্দু সমাজের বাইরে সাম্যের খোঁজ বেরিয়ে বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকেন। বস্তুতঃ ১৯৪৮ সাল থেকেই বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের কথা ভাবছিলেন তিনি। ১৯৫৬ সালের অক্টোবরে নাগপুরে তিনি কয়েক হাজার তফশিলী বর্ণভুক্ত অনুগামীসহ বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে তিনি এই পথ গ্রহণ করেন। ন্যায়বিচারের স্বপক্ষে সমাজ বদলের সংগ্রাম এর পর আর বেশিদিন তিনি চালাতে পারেন নি। ১৯৫৬ সালের ৬ই ডিসেম্বর আম্বেদকরের জীবনাবসান হয়।

অনুশীলনী — ১

বড় প্রশ্ন :

ক) আম্বেদকরের জীবন ও কর্ম পর্যালোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

খ) আম্বেদকর বিদেশে কোথায় কি কি ডিগ্রী অর্জন করেছিলেন?

গ) গান্ধী-আম্বেদকর পুনা চুক্তি কি ?

ঘ) ভারতীয় সংবিধান রচনার জন্য কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় আম্বেদকরকে কোন্ সালে কি ডিগ্রী প্রদান করে?

ঙ) ভারতের সংবিধানের কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে আম্বেদকরের অবদান প্রত্যক্ষ করা যায়?

৪৩.৪ আম্বেদকরের সামাজিক চিন্তাধারা

আম্বেদকর নিম্নবর্ণভুক্তদের সামাজিক দুর্দশা ও গ্লানির জন্য হিন্দুধর্মের বর্ণব্যবস্থাকে দায়ী করেছেন; তাঁর মতে বিদেশী শাসকের শোষণ এবং জাতীয় নেতাদের ভ্রান্ত রাজনীতি এই দুর্দশাকে আরও তীব্র করে তুলেছিল। কর্মের ভিত্তিতে মনু যে বর্ণব্যবস্থা সৃষ্টি করেছেন তাকে "এক ধরণের রাজনৈতিক ধাপ্পাবাজির খেলা" ("a kind of political jugglery") বলে অভিহিত করে আম্বেদকর বলেছেন এর আসল উদ্দেশ্য হল নিম্নবর্ণের উপর উচ্চবর্ণের আধিপত্য ও অত্যাচার বংশানুক্রমে কায়েম করা। আম্বেদকরের মতে এই মানবতাবিরোধী ও অপরাধমূলক বর্ণব্যবস্থা হিন্দুধর্মে পরবর্তীকালে সৃষ্টি হয়েছে। হিন্দুশাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী আম্বেদকর প্রমাণ করেছেন, ঋগবেদে শুদ্র বলে কোন বর্ণের অস্তিত্বই নেই। তিনি কৌটিল্য, ম্যাক্স্ ওয়েবার ও ম্যাক্স্মুলারের রচনাবলীর দীর্ঘ বিশ্লেষণ করে একথাও প্রমাণ করেছেন যে আদি হিন্দুসমাজে শুদ্ররা ক্ষত্রিয়ের সম্মান পেতেন।

হিন্দুধর্ম পরবর্তীকালে যে জাতিভেদ প্রথা সৃষ্টি করেছিল তাকে মানবসভ্যতার কলঙ্ক মনে করা যেতে পারে। আম্বেদকরের ভাষায়," হিন্দু সভ্যতাকে কোন সভ্যতাই বলা চলে না। একে বলা উচিত মানবতাকে দমন ও শৃঙ্খলিত করার এক দানবিক কৌশল।"

সমাজতত্ত্ব ও পুরাতত্ত্বকে বিস্তারিত বিশ্লেষণ করে আম্বেদকর যুক্তি দিয়ে বুঝিয়েছেন, হিন্দু পন্ডিতদের বর্ণব্যবস্থা, কুল, গোত্র, আর্য-অনার্য সম্পর্কিত যাবতীয় তত্ত্ব কোন ঐতিহাসিক সত্য নয়, মিথ্যাচার ও প্রতারণা মাত্র। শৈশবে ও যৌবনে নিম্নবর্ণের ব্যক্তি হিসাবে পীড়ন ও নিগ্রহের অসংখ্য তিক্ত স্মৃতি তাঁকে এই জাতীয় তথ্যনিষ্ঠ গবেষণায় অনুপ্রাণিত করেছে।

নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, আম্বেদকর দলিত শ্রেণী তথা পিছিয়ে পড়া মানুষদের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি 'বহিস্কৃত হিতকারিণী সভা' গঠন করেছেন, বিভিন্ন পত্রিকায় দীপ্ত ভাষায় প্রবন্ধ লিখেছেন, তাদের জন্য সত্যাগ্রহ আন্দোলন করেছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য তাঁর নেতৃত্বে ১৯২৭ সালের ২৫ ডিসেম্বর মহারাষ্ট্রের চাভাদর সরোবরের সত্যাগ্রহ। এই সরোবরের জল সব শ্রেণী ও ধর্মের লোকেরাই পান করতে পারত। পশুরাও পারত। এর জল স্পর্শ করাও নিষিদ্ধ ছিল শুধু দলিতদের ক্ষেত্রে। ওইদিন কয়েক হাজার দলিত আম্বেদকরের নেতৃত্বে ওই সরোবরের তীরে হাজির হয়ে তার জল পান করেন। ঠিক

যেমন গান্ধীর নেতৃত্বে হাজার হাজার ভারতীয় লবন সত্যাগ্রহে যোগ দিয়ে লবন তৈরি করেছিল। জল পানের পর দলিতরা তাঁদের দাসত্বের মতাদর্শগত উৎস মনুস্মৃতি ওই সরোবরের তীরেই দহন করেন।

একদিকে ব্রিটিশ সরকার অন্যদিকে গান্ধী ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। ভাইসরয়ের ক্যাবিনেটের সদস্য হিসাবে তাদের আর্থিক-সামাজিক উন্নতির চেষ্টা করেছেন এবং জীবনের শেষভাগে গণপরিষদের খসড়া কমিটির সভাপতি হিসাবে সংবিধানের মাধ্যমে তাদের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছেন। একথাও পরিস্কার হওয়া দরকার, আম্বেদকর আজীবন শুধু নিম্নবর্ণের স্বার্থের কথাই ভাবেন নি, তিনি সামগ্রিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষের ("downtrodden people") স্বার্থের কথাই মনে রেখেছেন।

আম্বেদকর গান্ধীর অস্পৃশ্যতা বিরোধী মনোভাবকে স্বীকৃতি দিলেও হৃদয়ের পরিবর্তনের সাথে অস্পৃশ্যতারও অবলুপ্তি হবে গান্ধীর এই বিশ্বাসের অংশীদার ছিলেন না। তিনি মনে করতেন, বর্ণব্যবস্থা মানুষ সৃষ্টি করেছে এবং মানুষকেই তা অবলোপ করতে হবে। অন্যকথায়, আম্বেদকর নৈতিক আবেদনের মাধ্যমে নয়, আইনের সাহায্যে অস্পৃশ্যতা অবলোপ এবং নিম্নবর্ণভুক্তদের সুযোগ সুবিধা দানে আস্থাশীল ছিলেন। বস্তুতঃ এ বিষয়ে তিনি অনেকটাই সফল। কারণ স্বাধীন ভারতে অস্পৃশ্যতা আইনতঃ নিষিদ্ধ করে দণ্ডমূলক অপরাধ হিসাবে ঘোষিত হয়েছে। সেইসাথে নির্বাচন, শিক্ষা, চাকরী ইত্যাদি নানাক্ষেত্রে নিম্নবর্ণভুক্ত বা তফশিলী বর্ণভুক্তদের প্রতি সরকার "সুবিধাদানের জন্য বৈষম্যমূলক নীতি" ("policy of compensatory discrimination") গ্রহণ করেছে।

আম্বেদকরের স্বচ্ছ দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল যে পিছিয়ে পড়া মানুষদের সামাজিক দুঃখ-কষ্ট দূর করার সমস্যাটি শুধু অর্থনৈতিক নয়, শিক্ষাগতও। শিক্ষা না পেলে চেতনা জাগে না। পাছে শুদ্রদের মনে চেতনা জাগে সেই জন্যে তাদের চিরকাল শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে। ব্রাহ্মণ্যবাদীরা তথা মনুস্মৃতি শুদ্রদের বেদপাঠ এমনকি শ্রবণও মহাপাপ বলে ঘোষণা করেছিল। অথচ শিক্ষা ও চেতনা ছাড়া কেউ আত্মসম্মান অর্জনের সংগ্রাম করতে পারে না। সেই জন্যেই আম্বেদকর বুঝেছিলেন, শুধু সাক্ষরতা নয়, চাই উচ্চশিক্ষা যা তাদের আত্মসচেতন করবে, নিজেদের মানুষ হিসাবে ভাবতে শেখাবে। আম্বেদকর মন্তব্য করেছেন,"নিম্নবর্ণের উন্নতির সমস্যাকে মনে করা হয় অর্থনৈতিক। একে মস্ত ভুল বলা যায়। .... সমস্যাটি হচ্ছে তাদের মন থেকে দুর করতে হবে হীনমন্যতাবোধ যা তাদের উন্নতির অন্তরায় হয়ে অপরের দাসানুদাস করে রেখেছে। ....উচ্চশিক্ষা বিস্তার ছাড়া এই উদ্দেশ্য সফল হতে পারে না।" ("The problem of raising the lower order is deemed to be economic. This is a great mistake .... The problem is to remove from them that inferiority complex which has stunted their growth and made them slaves to others .... Nothing can achieve this purpose except the spread of Higher education.")

শুধু বলে এবং লিখেই ক্ষান্ত হন নি তিনি। স্বোপার্জিত অর্থ অকাতরে ব্যয় করে, নানাজনের কাছে ভিক্ষা করে অর্থ সংগ্রহ করে একের পর এক স্কুল, হস্টেল ও কলেজ স্থাপন করেন দলিত সন্তানদের জন্য।

তাঁর প্রতিষ্ঠিত মিলিন্দ কলেজের প্রথম স্নাতকদল (১৯৫০) হয়ে ওঠে মহারাষ্ট্রে দলিত মুক্তি আন্দোলন ও সেই আন্দোলনের মুখপাত্র দলিত সাহিত্যের প্রথম সংগঠক ও কর্মীদল।

৪৩.৫ আম্বেদকরের অর্থনৈতিক চিন্তাধারা

যদিও আম্বেদকর বিশ্বাস করতেন যে সামাজিক সংস্কার ছাড়া অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক সংস্কার সম্ভব নয়, তবুও তিনি অনগ্রসর মানুষদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা করেছেন। আম্বেদকরের অভিমত ছিল, অবহেলিত কৃষক ও শ্রমিকদের মধ্যে দরিদ্রতম হল নিম্নবর্ণের মানুষেরা। কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে ব্রিটেনের শোষণনীতি নিম্নবর্ণের মানুষসহ সমগ্র কৃষক ও শ্রমিক সমাজকে দুর্দশা ও বঞ্চনার শেষ প্রান্তে পৌঁছে দিয়েছে। ওদিকে "উচ্চবর্ণের জাতীয় নেতারা জাতীয় আন্দোলন পরিচালনা করতে গিয়ে আর্থিক সমস্যাকে একেবারেই প্রাধান্য দেন নি, তাঁদের মূল উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ সরকারের সাথে রাজনৈতিক দাবী নিয়ে দরাদরি করে নিজেদের ভবিষ্যত গুছিয়ে নেওয়া।

অনগ্রসর শ্রেণীর বিভিন্ন প্রাদেশিক ও সর্বভারতীয় সম্মেলনে আম্বেদকর সাধারণ কৃষকদের অর্থনৈতিক সমস্যাগুলিকে সুস্পষ্টভাবে সনাক্ত করে উপযুক্ত প্রতিকার দাবী করেছেন। তিনি জমিদারী, রায়তারী প্রথার বিরুদ্ধে এবং কৃষকদের জমির মালিকানা স্বত্ব স্বীকৃতির স্বপক্ষে ঐ সব সভায় জোরালো বক্তব্য রেখেছেন। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে ভূমি থেকে রাজস্ব আদায় পদ্ধতির বিরুদ্ধে তিনি নিম্নবর্ণের কৃষকদের আন্দোলন করার ডাক দিয়েছেন। আম্বেদকর ১৯২৮ সালে একটি বিল এনে মহার সম্প্রদায়ভুক্ত চাষীদের যৎসামান্য অর্থের বিনিময়ে শৃঙ্খলিত শ্রমিক (Bonded Labour) হিসাবে কাজ করবার প্রথাকে বাতিল করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠের কায়েমী স্বার্থ এই বিল অনুমোদিত হতে দেয় নি।

আম্বেদকরের ধারণায় সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণীর শ্রমিক সংগঠনগুলি — যথা INTUC, AITUC ইত্যাদি— সাধারণ বঞ্চিত শ্রমিকদের স্বার্থ দেখে না। সেজন্য তিনি নিজেই "Independent Labour Party" নামে একটি শ্রমিকদল গঠন করেন। তিনি জমির উপর থেকে জনসংখ্যার চাপ কমাবার জন্য শিল্প বিকাশের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতেন। শিল্প ক্ষেত্রে তিনি শিল্পের রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও পরিচালনাই কাম্য মনে করতেন। শ্রমিকদের কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে তাঁর দল এক কর্মসূচী ঘোষণা করে। তার মধ্যে ছিল — জমি বন্ধকী ব্যাংক, শ্রমিক সমবায় এবং শ্রমিকদের জন্য বিক্রয় বাজার গড়ে তোলা, বিভিন্ন জনকল্যাণমুখী কাজের সঙ্গে শ্রমিকদের যুক্ত করা, শ্রমিকদের স্বার্থে কর ব্যবস্থার সংস্কার করা এবং শ্রমিকদের জন্য বাধ্যতামূলক প্রয়োজনীয় শিক্ষার আয়োজন করা। ১৯৩৮ সালে বোম্বাই আইনসভা অনুমোদিত "শিল্প বিরোধী সংক্রান্ত আইন"-কে শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী বলে তিনি সমালোচনা করেছিলেন এবং তার বিরুদ্ধে অন্যান্য শ্রমিক সংগঠনগুলির সঙ্গে মিলিতভাবে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে গিয়েছিলেন।

অনুশীলণী — ২

বড় প্রশ্ন :

ক) আম্বেদকরের সামাজিক চিন্তাধারা ব্যাখ্যা করুন।

খ) আম্বেদকরের অর্থনৈতিক চিন্তাধারা পর্যালোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

গ) "সুবিধাদানের জন্য বৈষম্যমূলক নীতি" ("a policy of compensatory discrimination") কাকে বলে?

ঘ) আম্বেদকর কেন বলেছিলেন পিছিয়ে পড়া মানুষদের সামাজিক দুঃখ-কষ্ট দূর করার সমস্যাটি শুধু অর্থনৈতিক নয়, মূলতঃ শিক্ষাগত ?

ঙ) আম্বেদকর সাধারণ-কৃষকদের অর্থনৈতিক কল্যাণের জন্য কি কি দাবী তুলেছিলেন?

চ) "Independent Labour Party" কি উদ্দেশ্যে, কে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ?

৪৩.৬ আম্বেদকরের রাজনৈতিক চিন্তাধারা

আম্বেদকরের রাষ্ট্রদর্শন অনুসারে রাষ্ট্র ব্যক্তির জীবন, সুখ ও স্বাধীনতাকে রক্ষা করবে, ব্যক্তিকে দায়িত্ব সচেতন করবে এবং সামাজিক ও আর্থিক বৈষম্য দূর করবে। তিনি বলেছেন রাষ্ট্র লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য সাধনের উপায়মাত্র ("not an end in itself, but a means to an end.")।

তিনি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করতেন; তবে এই গণতন্ত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন নয়। তিনি সংখ্যালঘুর জন্য আসন সংরক্ষণ ব্যবস্থাও সমর্থন করেন নি। তাঁর ইচ্ছা ছিল ভোটাধিকারের ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতই সংখ্যালঘু একই মান ও মর্যাদাসম্পন্ন হবে। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠের তুলনায় সংখ্যালঘুর ভোটাধিকারের ন্যূনতম বয়স কম থাকবে। উদ্দেশ্য, এইভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘু ভোটদাতাদের অনুপাত কমবে। তাঁর মতে আমাদের দেশে রাজনৈতিক সংখ্যাগরিষ্ঠ ("political majority") নেই, আছে বর্ণভিত্তিক সংখ্যাগরিষ্ঠ যারা জন্মের ভিত্তিতে চিরন্তন সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকে। কিন্তু রাজনৈতিক সংখ্যাগরিষ্ঠ সচল এবং পরিবর্তনশীল হয়। চিন্তা ও মত বিনিময়ের ভিত্তিতে এই রাজনৈতিক সংখ্যাগরিষ্ঠ এক সময়ে সংখ্যালঘুতেও পরিণত হতে পারে। আমাদের দেশের অচলায়তনে বর্ণভিত্তিক সংখ্যাগরিষ্ঠের অবসান না হলে প্রকৃত গণতন্ত্র কার্যকর হতে পারবে না।

তাঁর পরিকল্পিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কতগুলি বৈশিষ্ট্য আম্বেদকর সনাক্ত করেছেন — (১) সকলের গ্রহণযোগ্য আইন, (২) সরকার ও জনগণ উভয়েরই দায়িত্ববোধের বিকাশ, (৩) "প্রতিরোধ

ও ভারসাম্যের নীতি' অনুযায়ী শাসনব্যবস্থায় সংগঠন, (৪) প্রতিটি গোষ্ঠীর সমান প্রতিনিধিত্ব, (৫) নির্বাচনের ভিত্তিতে সরকার গঠন, (৬) বহুদলীয় দায়িত্বশীল ব্যবস্থা, (৭) রাজনৈতিক গণতন্ত্রের সমান্তরাল সামাজিক ও অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের উপস্থিতি। সর্বশেষ বৈশিষ্ট্যটি সম্পর্কে আম্বেদকর জোর দিয়ে বলেছেন, রাজনৈতিক সাম্যের সাথে যদি সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্যের সহাবস্থান হয়, তবে এই অসংগতির ফলে গণতন্ত্রের বুনিয়াদই ধ্বংস হয়ে যাবে।

পরিশেষে বলা যায় ভারতীয় সংবিধানের অন্যতম রূপকার হিসাবে সংবিধানে আম্বেদকরের কিছু নিজস্ব রাজনৈতিক চিন্তার স্পষ্ট ছাপ দেখা যায়। প্রথমতঃ শক্তিশালী ও দায়িত্বশীল কেন্দ্রীয় সরকার। তিনি মনে করতেন, অবহেলিত মানুষদের স্বার্থেই এর প্রয়োজনীয়তা আছে। দ্বিতীয়তঃ নাগরিকদের জন্য নির্দিষ্ট কিছু মৌলিক অধিকার। তৃতীয়তঃ রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিসমূহ যার উদ্দেশ্য হল, সাধারণ লোকের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতিসাধন। চতুর্থতঃ সংখ্যালঘুদের নানাবিধ সুবিধা প্রদান। পঞ্চমতঃ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং তপশিলভুক্ত শ্রেণীগুলির জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা।

৪৩.৭ আম্বেদকর : সংক্ষিপ্ত মুল্যায়ন

ভীমরাও রামজী আম্বেদকর অনগ্রসর সমাজের প্রথম এমন একজন মানুষ যিনি তাঁদেরই একজন হিসাবে তাঁদের দুঃখ, দুর্দশা, অসহায়তা সঠিকভাবে উপলব্ধি করে সঠিক নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তিনি মহার সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। মহারাষ্ট্রের মহার-সহ অন্যান্য অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের মানুষদের সেই যুগে বর্ণহিন্দুরা পশুর থেকেও নীচুস্তরের জীব বলে মনে করত। এই সব মানুষদের গলায় মাটির পাত্র বা কোমরে ঝাঁটা ইত্যাদি বেঁধে প্রকাশ্যে বের হতে হত। বিদেশী ইংরাজ শাসক এবং দেশীয় উচ্চবর্ণের হিন্দুরা কেউই কারো স্বার্থ বিসর্জন দিতে রাজী ছিল না। ইংরাজরা তাদের অর্থনৈতিক শোষণের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উপাদান হিসাবে এদের ব্যবহার করেছিলেন। একইভাবে উচ্চবর্ণের রাজনৈতিক নেতারা "আগে স্বাধীনতা পরে অন্যকথা" বুলির আড়ালে অবহেলিতদের সামাজিক অর্থনৈতিক সমস্যাকে লুকিয়ে রেখে রাজনৈতিক দাবি নিয়ে আন্দোলন করত। উদ্দেশ্য, নিজেদের ভবিষৎ গুছিয়ে নেওয়া। এইরকম পরিস্থিতিতে আম্বেদকরের আবির্ভাবকে একটি "ঐতিহাসিক প্রয়োজন" ("historical necessity") বলা যায়। উচ্চবর্ণের নেতাদের যাবতীয় দ্বি-চারিতা ও কপটতার মুখোশ খুলে দিয়ে বঞ্চিতদেরই একজন তাদের জ্বালা-যন্ত্রণার কথা বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন।

উচ্চবর্ণের নেতারা যতই অস্পৃশ্যতা ও বর্ণব্যবস্থার কুফল সম্পর্কে বলুন, তাঁদের কেউই আম্বেদকরের মত এ বিষয়ে বিধ্বংসী ও দীপ্ত সমালোচনা করেন নি। আম্বেদকরের মতে বর্ণব্যবস্থা শুধু অপরাধমূলক নয়, রাজনৈতিক ধাপ্পাবাজির খেলা এবং মানবসভ্যতার কলঙ্ক। পেছিয়ে পড়া মানুষদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এই কশাঘাতের একান্তই প্রয়োজন ছিল।

আম্বেদকর সম্পর্কে আর একটি কথা খুবই প্রাসঙ্গিক। তিনি নিঃসন্দেহে তাঁর সময়ে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পন্ডিত ছিলেন। কিন্তু সংগ্রামী জীবন যাঁদের তাঁরা কেবল পন্ডিত হন না, তাঁদের পান্ডিত্যকে, তাদের রচনাকে তাঁদের জীবনসংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। বহুক্ষেত্রেই এইসব রচনা "একাডেমিক গবেষণার" সীমার আবদ্ধ না থেকে হয়ে ওঠে আন্দোলনের দাবি সনদ। এই ভাবে আম্বেদকরের অবিস্মরণীয় রচনাবলী অনিবার্যভাবেই হয়ে ওঠে দলিত শ্রেণী তথা পিছিয়ে পড়া মানুষের মুক্তি সংগ্রামের ঐতিহাসিক তথা দার্শনিক ভিত্তি এবং তার দাবি সনদ । আম্বেদকরের বয়স যখন মাত্রই পঁচিশ তখনই প্রকাশিত হয় তাঁর লেখা বই 'কাস্টস্ ইন ইন্ডিয়া — দেয়ার মেকানিজম, জেনেসিস অ্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট (১৯১৬)। তারপর একে একে প্রকাশিত হতে থাকে 'অ্যানিহিলেশন অফ কাস্টস (১৯৩৬), 'হু অয়্যার দ্য শূদ্রজ' (১৯৪৮) ইত্যাদি গ্রন্থ।

এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, ভারতে সংখ্যালঘু রাজনীতির মূলধারাটি আম্বেদকরই প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি এ বিষয়ে অনেকটাই সফল; স্বাধীন ভারতের সংবিধানই তার প্রমাণ। কিন্তু তিনি বিচ্ছিন্নতাবাদকে কখনই সমর্থন করেননি,— তিনি চেয়েছিলেন, অনুন্নত সংখ্যালঘুদের উপযুক্ত সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশ সাধন করে তাঁদের জনজীবনের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনা। আম্বেদকরের "রাজনৈতিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা" প্রতিষ্ঠার আকাঙ্খাও তাঁর জাতীয় ঐক্য আদর্শের একটি প্রমাণ। তিনি বর্তমান ভারতে প্রচলিত বর্ণভিত্তিক বা জন্মভিত্তিক সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে স্থাণু সংখ্যাগরিষ্ঠতা বলে সমালোচনা করেছেন। নিম্নবর্ণ ও উচ্চবর্ণের সবাইকে নিয়ে সচল রাজনৈতিক সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রচলন করতে হবে, যেখানে বর্ণ অপেক্ষা রাজনৈতিক ভাবনা-চিন্তাই পরস্পরকে বেশী আকৃষ্ট করবে। এই ভাবে ভারতীয় গণতন্ত্র পুষ্ট হবে।

এই প্রসঙ্গে আম্বেদকর সম্পর্কে আর একটি কথা মনে আসে। তিনি ভাল করেই জানতেন যে নিম্নবর্ণভুক্তগণ শ্রমজীবী মানুষদের দরিদ্রতম অংশ। সুতরাং তিনি নিম্নবর্ণের উন্নতির উদ্দেশ্যে কাজ করবার সময়ে সমস্ত শ্রমজীবী মানুষদের উন্নতির কথাও বলতেন।

পরিশেষে বলা যায়, ভারতীয় সংবিধান রচনায় আম্বেদকরের নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা অপেক্ষা ভারতের জাতীয় কংগ্রেস দলের মতাদর্শই অধিক কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। তবুও সংবিধান পাঠ করলে কয়েকটি ক্ষেত্রে তাঁর সুস্পষ্ট অবদান প্রত্যক্ষ করা যায়। যাইহোক "সামাজতন্ত্রী, ধর্মনিরপেক্ষ, সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র" ভারত গড়ে তুলবার পেছনে তাঁর কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। সর্বোপরি, তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে যুগ যুগ ধরে অবহেলিত, নিগৃহীত, পদদলিত জনগোষ্ঠীর জন্য সংবিধান যে শিক্ষা, চাকরী, নির্বাচন সংক্রান্ত ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে তার সুদুর প্রসারী কল্যাণময় প্রভাব আমরা প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করছি। জওহরলাল নেহেরুর ভাষায়, "He was a symbol of revolt against all the oppressive features of Hindu Society." "সবার নীচে, সবার পিছে, সর্বহারাদের মাঝে" তিনি অবশ্যই চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

৪৩.৮ সারাংশ

অসাধারণ পন্ডিত, অতুলনীয় কর্মবীর ভীমরাও রামজী আম্বেদকরের (১৮৯১-১৯৫৬) কর্মজীবন প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পরিব্যাপ্ত ছিল। তাঁর জীবন বলিষ্ঠ আত্মবিশ্বাস, তীব্র জীবনসংগ্রাম ও পিছিয়ে পড়া মানুষের প্রতি গভীর দায়বদ্ধতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

আম্বেদকর অস্পৃশ্য মহার বর্ণভুক্ত ছিলেন। বাল্যকাল থেকেই নানারকম সামাজিক অসম্মানের শিকার হতে হতে অস্পৃশ্যদের ভাবী নেতার চরিত্র ইস্পাত-কঠিন রূপ ধারণ করতে থাকে। বরোদার মহারাজা ও কোলাপুরের মহারাজার পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংল্যান্ডের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বোচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। তিনি অসাধারণ মেধাবী ছাত্র ছিলেন। মূলতঃ তাঁর নেতৃত্বে আন্দোলনের ফলেই তিরিশের দশকে ব্রিটিশ সরকার সমস্ত নির্বাচিত রাজনৈতিক সংস্থায় নিম্নবর্ণের আসন সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু করে।

আম্বেদকর ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবার জন্য "Independent Labour Party" প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪২-৪৬ সালে তিনি Viceroy's Executive Council -এ শ্রমমন্ত্রী হিসাবে কাজ করেছিলেন। সব সময়ই তিনি নিম্নবর্ণসহ সাধারণ শ্রমিক-কৃষকদের উন্নতিসাধনের লক্ষ্যে কাজ করেছেন। তিনি স্বাধীন ভারতের প্রথম শ্রমমন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছিলেন। সেই সাথে তাঁকে গণপরিষদের খসড়া কমিটির সভাপতির দায়িত্বও দেওয়া হয়। মূলতঃ তাঁরই অক্লান্ত প্রচেষ্টাতেই ভারতের সংবিধানে তফশিলী বর্ণের জন্য শিক্ষা, নির্বাচন, চাকরী ইত্যাদি ক্ষেত্রে সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয়। তাঁকে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫২ সালে ভারতীয় সংবিধান রচনায় অসামান্য কৃতিত্বের জন্য সর্বোচ্চ ডিগ্রী "ডক্টর অফ ল" প্রদান করে। ১৯৫৬ সালের অক্টোবরে নাগপুরে তিনি কয়েক হাজার নিম্নবর্ণভুক্ত অনুগামীসহ বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। ১৯৫৬ সালের ৬ই ডিসেম্বর আম্বেদকর প্রয়াত হন।

আম্বেদকরের সামাজিক চিন্তাধারায় তিনি বর্ণব্যবস্থা ও অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে তাঁর সুচিন্তিত মতামত তীব্র ভাষায় প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে বর্ণব্যবস্থার উদ্দেশ্য হল, নিম্নবর্ণের উপর উচ্চবর্ণের আধিপত্য ও অত্যাচার বংশানুক্রমে কায়েম করে রাখা। তিনি হিন্দু ধর্মীয় শাস্ত্র, সমাজতত্ত্ব ও পুরাতত্ত্বের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন — হিন্দু পন্ডিতদের বর্ণব্যবস্থা, কুল, গোত্র, আর্য-অনার্য সম্পর্কিত যাবতীয় তত্ত্ব কোন ঐতিহাসিক সত্য নয়, মিথ্যাচার ও প্রতারণা মাত্র। পিছিয়ে পড়া মানুষদের সামাজিক সমস্যা ও দুঃখ-কষ্ট দূর করতে হলে প্রথমে প্রয়োজন তাদের উচ্চশিক্ষা, যা তাদের নিজেদের মানুষ হিসাবে ভাবতে শেখাবে।

আম্বেদকরের অর্থনৈতিক চিন্তাধারার মূল কথা ছিল, ব্রিটেনের শোষণ-নীতি নিম্নবর্ণের মানুষসহ সমগ্র কৃষক ও শ্রমিক সমাজকে দুর্দশা ও বঞ্চনার শেষ প্রান্তে পৌঁছে দিয়েছে। ওদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণীর জাতীয় নেতারা এদের আর্থিক সমস্যাকে একেবারেই প্রাধান্য দেন নি। ফলে বঞ্চিতদের সমস্যা আরও

গভীর ও জটিল হয়েছে। কৃষকদের উন্নতিকল্পে জমিদারী ও রায়তারী প্রথার বিরুদ্ধে এবং কৃষকদের জমির মালিকানা স্বত্ব স্বীকৃতির পক্ষে আম্বেদকর নানাবিধ আন্দোলন সংগঠিত করেন। সাধারণ-শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষায় কোন দল বা সংগঠনের আগ্রহ নেই, এইরকম মনোভাবের বশবর্তী হয়ে আম্বেদকর শ্রমিকদের মঙ্গলসাধনের উদ্দেশ্য নিয়েই "Independent Labour Party" নামে একটি শ্রমিক দল গঠন করেন। শিল্পের রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও পরিচালনা, শ্রমিক সমবায় ও শ্রমিকদের জন্য বিক্রয় বাজার গঠন, শ্রমিকদের স্বার্থে কর ব্যবস্থার সংস্কার, শ্রমিকদের জন্য বাধ্যতামূলক প্রয়োজনীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি কর্মসূচী তাঁর দল ঘোষণা করে।

আম্বেদকরের রাজনৈতিক চিন্তাধারা অনুসারে রাষ্ট্র ব্যক্তির জীবন, সুখ ও স্বাধীনতাকে রক্ষা করবে, ব্যক্তিকে দায়িত্ব সচেতন করবে এবং সামাজিক ও আর্থিক বৈষম্য দূর করবে। আম্বেদকর গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু তিনি জোরালোভাবে বলেছেন যে, রাজনৈতিক গণতন্ত্রকে সার্থক করতে হলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করতেই হবে। ভারতীয় সংবিধানের অন্যতম স্থপতি আম্বেদকরের সামাজিক-রাজনৈতিক চিন্তার প্রতিফলন সংবিধানের বিভিন্ন অংশে দেখা যায়; যথা, মৌলিক অধিকার, রাষ্ট্রপরিচালনায় নির্দেশমূলক নীতি, তফশিলী বর্ণভুক্তদের জন্য শিক্ষা, চাকরী, নির্বাচন সংক্রান্ত সংরক্ষণের ব্যবস্থা ইত্যাদি।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আম্বেদকরের আবির্ভাবকে একটি "ঐতিহাসিক প্রয়োজন" ("historical necessity") হিসাবে দেখা যেতে পারে। ইংরাজরা নিম্নবর্ণের হিন্দুদের চরমভাবে শোষণ করছিল। ওদিকে উচ্চবর্ণের হিন্দুরাও নিম্নবর্ণের জন্য নিজেদের স্বার্থত্যাগ করতে রাজী ছিল না। তারা আন্দোলন করত তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক দাবি-দাওয়া নিয়ে। নিম্নবর্ণের সামাজিক-আর্থিক দুরবস্থার বিষয়টি তাদের আন্দোলনের বিষয় ছিল না। এই রকম অবস্থায় বঞ্চিতদের যন্ত্রণার অবসান ঘটাতে তাদেরই একজনকে নেতৃত্ব দিতে হবে, এই ঐতিহাসিক প্রয়োজনটি আম্বেদকরই মিটিয়ে ছিলেন।

আম্বেদকরের ছিল সংগ্রামী জীবন। তাই তাঁর পান্ডিত্যপূর্ণ সব রচনা একাডেমিক গবেষণার সীমায় আবদ্ধ না থেকে হয়ে উঠেছিল আন্দোলনের দাবিসনদ। যদিও ভারতে সংখ্যালঘু রাজনীতির মূলধারাটি আম্বেদকর প্রতিষ্ঠা করেছেন, তবুও তিনি বিচ্ছিন্নতাবাদকে কখনই সমর্থন করেন নি। তাঁর লক্ষ্য ছিল, সংখ্যালঘুদের নানাবিধ উন্নতি ঘটিয়ে তাঁদের জনজীবনের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনা।

নতুন সংবিধানে ভারতকে "সমাজতন্ত্রী, ধর্মনিরপেক্ষ, সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র" রূপে গড়ে তোলার পেছনে আম্বেদকরের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। কিন্তু লাঞ্ছিত অবহেলিতদের বন্ধু হিসাবে তাঁর কর্মকাণ্ড সম্ভবতঃ তাঁর জীবনের সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল দিক। ধূলায় যাঁদের আসন পাতা, তাঁদের মনে তাঁর জন্যে শ্রদ্ধার আসন চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে।

৪৩.৯ উৎস নির্দেশ

1. Dr. Ambedkar's speech on 1 September, 1951, cited in Eleanor Zelliot, "The Social and Political Thought of B.R. Ambedkar" in "Political Thought in Modern India", P. 173.

৪৩.১০ অনুশীলনী

বড় প্রশ্ন :

ক) আম্বেদকরের রাজনৈতিক চিন্তাধারা পর্যালোচনা করুন।

খ) রাজনৈতিক-সামাজিক নেতা হিসাবে আম্বেদকরের কার্যকলাপের সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

গ) আম্বেদকরের মতে রাষ্ট্রের লক্ষ্য কি ?

ঘ) আম্বেদকর "রাজনৈতিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা" বলতে কি বুঝেছেন?

ঙ) দলিত সমাজের পারিস্থিতি সম্পর্কে আম্বেদকর রচিত দুটি বইয়ের নাম উল্লেখ করুন।

৪৩.১১ গ্রন্থপঞ্জী

1. Eleanor Zelliot : "The Social and Political Thought of B. R. Ambedkar" in "Political thought in Modern India", ed. Pantham and Deutsch (New Delhi, Beverly Hills etc. ; Sage, 1986).

2. দেবাশিস চক্রবর্তী : "ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার ধারা" (কলকাতা : সেন্ট্রাল বুক পাবলিশার্স, ১৯৯৭)

3. নীতিশ বিশ্বাস : "ড. বি. আর. আম্বেদকর" (কলকাতা : ঐকতান, ১৯৫৫)

4. মনোরঞ্জন বড়াল : "ড. ভীমরাও আম্বেদকর : কর্মজীবনের কয়েকটি দিক।" (কলকাতা : পথসংকেত প্রকাশনা, ১৯৯০)।

একক ৪৪ □ জয়প্রকাশ নারায়ণ

গঠন

৪৪.০ উদ্দেশ্য
৪৪.১ প্রস্তাবনা
৪৪.২ জয়প্রকাশের রাজনৈতিক মতাদর্শের (Political ideologies) বিবর্তন
    ৪৪.২.১ গান্ধীর ক্রমবর্ধমান প্রভাব
৪৪.৩ জয়প্রকাশ : জীবন ও কর্ম
    ৪৪.৩.১ মার্ক্সবাদ
    ৪৪.৩.২ গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র
    ৪৪.৩.৩ সর্বোদয় ভিত্তিক গণতন্ত্র
    ৪৪.৩.৪ সর্বাত্মক বিপ্লব
৪৪.৪ জয়প্রকাশ : ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রকৃত ধারক ও বাহক
৪৪.৫ সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন
৪৪.৬ সারাংশ
৪৪.৭ অনুশীলনী
৪৪.৮ গ্রন্থপঞ্জী

৪৪.০ উদ্দেশ্য

একক ৪৪ লেখা হয়েছে ভারতের সুবিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা ও তাত্ত্বিক জয়প্রকাশ নারায়ণ সম্পর্কে। এই একক পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন :

- জয়প্রকাশ নারায়ণের গভীর রাজনৈতিক মূল্যবোধ ও অসামান্য দেশপ্রেমের কথা;
- তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারার বিবর্তনে গান্ধীর আশ্চর্য প্রভাবের কথা;
- তাঁর বর্ণাঢ্য ও রোমাঞ্চকর জীবন এবং সারাজীবনব্যাপী কর্মযজ্ঞের কাহিনী;
- মার্ক্সবাদ, গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র, সর্বোদয়-ভিত্তিক গণতন্ত্র ও সর্বাত্মক বিপ্লব সম্পর্কে তাঁর তত্ত্ব।
- একনায়কতন্ত্রের কবল থেকে ভারতীয় গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে তাঁর গৌরবদীপ্ত ভূমিকা;
- সুপ্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য ও দর্শনের ধারক-বাহক হিসাবে জয়প্রকাশের জীবন।

৪৪.১ প্রস্তাবনা

সাম্প্রতিককালে জয়প্রকাশ নারায়ণ ভারতীয় রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে আসেন ভারতীয় গণতন্ত্রের পরিত্রাতা হিসাবে তাঁর অনন্যসাধারণ ভূমিকার জন্য। ১৯৭৫ সালের ২৬শে জুন সমস্ত ভারতে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে ভারতীয় গণতন্ত্রকে প্রকৃতপক্ষে একনায়কতন্ত্রে পরিণত করা হয়। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও

জনগণের মৌলিক অধিকার বিনষ্ট করা হয়। বিরোধী দলের সব নেতা কারারুদ্ধ হন। সেই সময়ে অবিচার-অত্যাচারের বিরুদ্ধে জয়প্রকাশ সমস্ত জাতিকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং ১৯৭৭ সালের মার্চে লোকসভা নির্বাচনে স্বৈরাচারী সরকারের পরাজয় ঘটাতে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন।

কিন্তু শুধু জরুরী অবস্থার ভূমিকায় জন্যই নয়, দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে ভারতীয় রাজনীতিতে জয়প্রকাশ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রেখেছিলেন। তিনি একাধারে রাজনৈতিক নেতা ও তাত্ত্বিক ছিলেন। মননশীলতা ও নৈতিক চেতনার দিক থেকে জয়প্রকাশের সঙ্গে অধিকাংশ সমসাময়িক নেতার কোন তুলনাই চলে না। তিনি তাঁদের মত ক্ষমতালোভী ছিলেন না। জীবনে অনেকবার সুযোগ আসা সত্ত্বেও এই নির্লোভি, চরিত্রবান দেশপ্রেমিক নিজেকে সযত্নে ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে দূরে সরিয়ে রাখতেন।

৪৪.২ জয়প্রকাশের রাজনৈতিক মতাদর্শের (political ideologies) বিবর্তন

জয়প্রকাশের রাজনৈতিক মতাদর্শস্থবির ছিল না, অভিজ্ঞতা ও অর্জিত জ্ঞানের ভিত্তিতে তার বিবর্তন ঘটে। তিনি প্রথম জীবনে মার্ক্সবাদে বিশ্বাস করতেন, তারপর তিনি একে একে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র, সর্বোদয়ভিত্তিক গণতন্ত্র ও সবশেষে সর্বাত্মক বিপ্লবে আস্থা প্রকাশ করেন।

চিন্তাবিদ হিসাবে জয়প্রকাশের অভিনবত্ব হল; কোন রাজনৈতিক মতাদর্শ (political ideologies) সম্পর্কে তাঁর কোন গোঁড়ামী ছিল না। তিনি নির্দিষ্ট কিছু রাজনৈতিক মূল্যবোধ (political values) বিশ্বাস করতেন— সেগুলি হল, স্বাধীনতা, সাম্য এবং ভ্রাতৃত্ব। তিনি এগুলিকে "আলোর নিশানা" ("beacons of light") আখ্যা দিয়ে বলেছেন, এই আলোর নিশানায় পৌঁছবার জন্য তিনি সারাজীবন পরিভ্রমণ করেছেন। কোন বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শ তাঁকে আলোর নিশানার দিকে এগিয়ে যেতে বাধা দিলে তিনি ঐ মতাদর্শ ত্যাগ করে নতুন মতাদর্শ গ্রহণ করবেন। এইভাবে একে একে চারটি মতাদর্শ তিনি পরিক্রমা করেছেন। রাজনৈতিক মূল্যবোধকে তিনি "লক্ষ্য" ("ends") এবং রাজনৈতিক মতাদর্শকে "মাধ্যম" ("means") আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর কাছে মতাদর্শ হল মূল্যবোধের লক্ষ্যে পৌঁছবার মাধ্যম মাত্র।

এ যুগে রাজনৈতিক মতাদর্শ নিয়ে রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে বিবাদ-সংঘাত লেগেই থাকে। সেক্ষেত্রে মতাদর্শ নিয়ে জয়প্রকাশের মুক্তচিন্তা তাঁকে ব্যতিক্রমী চিন্তাবিদ হিসাবে চিহ্নিত করে। জয়প্রকাশকে বাস্তববাদী চিন্তাবিদও বলা যায়, কারণ বর্তমান জগতে সর্বক্ষেত্রে মতাদর্শের মিশ্রণ ঘটছে ; যেমন পুরো ধণতন্ত্রী বা পুরো সমাজতন্ত্রী আদর্শে বিশ্বাসী কোন রাষ্ট্রই বর্তমানে নেই।

এই প্রসঙ্গে বলা যায়, জয়প্রকাশ শুধু তাত্ত্বিক ছিলেন না, তিনি রাজনৈতিক নেতাও ছিলেন। জনগণের মঙ্গল সম্পর্কে তিনি সর্বদা সচেতন ছিলেন। নির্দিষ্ট মূল্যবোধগুলিকে, যথা, স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বকে লক্ষ্য হিসাবে সামনে রেখে তিনি মার্ক্সবাদকে বাস্তবে অনুসরণ করতে গিয়ে দেখলেন, এই তত্ত্বের কিছু অসম্পূর্ণতা আছে। এই অসম্পূর্ণতা দূর করতে গিয়ে তিনি পরবর্তী তত্ত্ব, গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রে পৌঁছন এবং তাকে অনুসরণ করতে থাকেন। একইভাবে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্তি পাবার জন্য

রচিত হল সর্বোদয়ভিত্তিক গণতন্ত্র। তাকে প্রয়োগ ধরতে গিয়ে যেসব অসুবিধা দেখা দিল সেগুলির প্রতিবিধান করবার জন্য রচনা করলেন সর্বাত্মক বিপ্লবের তত্ত্ব। সর্বদাই জয়প্রকাশের লক্ষ্য ছিল মূল্যবোধগুলিকে অর্জন করা।

সুতরাং আমরা দেখছি, (১) জয়প্রকাশ রাজনৈতিক মূল্যবোধগুলিকে লক্ষ্য রেখে রাজনৈতিক মতাদর্শকে সেই লক্ষ্যপূরনের পদ্ধতি হিসাবে দেখেছেন; (২) তিনি প্রতিটি তত্ত্বকে বাস্তবায়িত করতে চেয়েছেন। তিনি একইসাথে তাত্ত্বিক এবং কর্মী ছিলেন; (৩) বিভিন্ন তত্ত্ব নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করতে গিয়ে জয়প্রকাশ এক তত্ত্বের কিছু উপাদান অন্য তত্ত্বের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছেন (তাঁর রাজনৈতিক মূল্যবোধগুলি রূপায়ণের কথা মনে রেখে)। এইভাবে মার্ক্সবাদ যুক্ত হয়েছে গান্ধীর কিছু ধারণার সঙ্গে। গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রে তিনি সমাজতন্ত্রের সঙ্গে গান্ধীবাদের মিলন ঘটিয়েছেন। আবার সর্বাত্মক বিপ্লবে তিনি গান্ধীর সর্বোদয় ধারণার সঙ্গে কিছু মার্ক্সবাদী ধারণার সংযোজন ঘটিয়েছেন। এইভাবেই এগিয়েছে তাঁর মৌলিক, সৃজনশীল ভাবনা এবং সেই ভাবনার সূত্রে গড়ে উঠেছে তাঁর নিজস্ব তত্ত্ব।

৪৪.২.১ গান্ধীর ক্রমবর্ধমান প্রভাব

প্রথম থেকেই জয়প্রকাশের ওপর গান্ধীর প্রভাব ছিল। জয়প্রকাশের চিন্তাধারায় বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রভাব ক্রমেই স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। জয়প্রকাশের স্ত্রী প্রভাবতীদেবী গান্ধীর শিষ্যা ছিলেন। তিনি গান্ধী নির্দেশিত পথে আজীবন দেশসেবায় ব্রতী ছিলেন। বিভিন্ন কারণে জয়প্রকাশের উপর গান্ধীর প্রভাব পড়েছিল। স্ত্রী প্রভাবতীর মাধ্যমে জয়প্রকাশের উপর গান্ধীর প্রভাব এ রকম একটি কারণ হতে পারে।

জয়প্রকাশের প্রথম প্রচারিত মতবাদ মার্ক্সবাদে গান্ধীর কিছু ভাবনার পরিস্কার আভাস মেলে। তাঁর পরবর্তী মতবাদ গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রে তিনি সমাজতন্ত্রের সঙ্গে গান্ধীবাদের এক অভিনব সমন্বয় করেন। শেষ দুটি মতবাদ সর্বোদয়-ভিত্তিক গণতন্ত্র ও সর্বাত্মক বিপ্লবকে পুরোপুরি গান্ধীবাদই বলা চলে।

অনুশীলনী — ১

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

ক) ১৯৭৫ - ৭৭ সালে জয়প্রকাশ কোন্ ভূমিকার জন্য খ্যাতি অর্জন করেন?

খ) জয়প্রকাশ কি কি রাজনৈতিক মতাদর্শ রচনা করেছিলেন ?

গ) জয়প্রকাশ কোন্ কোন্ মূল্যবোধে বিশ্বাস করতেন?

ঘ) জয়প্রকাশের উপর গান্ধীর প্রভাবের বিষয়ে কি কোন ব্যক্তিগত সম্পর্কের ভূমিকা ছিল?

বড় প্রশ্ন :

ঙ) জয়প্রকাশের রাজনৈতিক মতাদর্শের বিবর্তন বিশ্লেষণ করুন।

৪৪.৩ জয়প্রকাশ : জীবন ও কর্ম :

জয়প্রকাশ নারায়ণের জীবন অকল্পনীয় সাহস, অতুলনীয় দেশপ্রেম এবং অসামান্য আত্মত্যাগের এক জ্বলন্ত উদাহরণ। রূপকথার রাজকুমারের মতই তাঁর এ্যাডভেঞ্চারময় জীবন। ১৯০২ সালের ১১ই অক্টোবর বিহারের (বর্তমানে উত্তরপ্রদেশের) সিতাব দিয়ারা গ্রামে এক নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে জয়প্রকাশ নারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মায়ের সততা, স্নেহ ও সরলতা শৈশবাবস্থায় তাঁর চরিত্র গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণ করে তিনি পাটনা কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন এবং সেখান থেকে ১৯১৯ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। তারপর পাটনা কলেজে ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসে যোগ দেন। কিন্তু ১৯২১ সালে গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে সাড়া দিয়ে তিনি কলেজ পরিত্যাগ করেন।

অসহযোগ আন্দোলন সমাপ্ত হলে তিনি পাটনার একটি বেসরকারী কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেন। তারপর ১৯২২ সালে তাঁর স্ত্রী প্রভাবতী দেবীকে সবরমতী আশ্রমে গান্ধী ও তাঁর স্ত্রী কস্তুরবায় কাছে রেখে জয়প্রকাশ উচ্চশিক্ষার্থে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে যান।

আমেরিকাতে পড়াশোনা করবার সময় তিনি কারখানা, খেতখামার, হোটেল, নানা জায়গায় অত্যন্ত পরিশ্রম করে জীবিকার্জন করেন; আমেরিকায় অর্থনীতির উপর বিশ্বব্যাপী মন্দার করালছায়া প্রত্যক্ষ করেন এবং নিগ্রোদের উপর শ্বেতাঙ্গদের শোষণ ও অত্যাচার লক্ষ্য করেন। জয়প্রকাশ উইস্‌কন্‌সিন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র থাকাকালীন কিছু বিদেশী মার্ক্সবাদী চিন্তাবিদের সংস্পর্শেও আসেন। এই পরিস্থিতিতে তিনি আমেরিকায় ছাত্রাবস্থায় মার্ক্সবাদে বিশ্বাস করতে শুরু করেন।

১৯২৯ সালে ওহাইও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সাথে বি. এ. ও এম.এ. পাশ করে জয়প্রকাশ ভারতে ফেরেন। মার্ক্সবাদে বিশ্বাসী জয়প্রকাশ ১৯৩৪ সালে নরেন্দ্র দেব, অশোক মেহতা, অচ্যুত পটবর্ধন প্রমুখ ব্যক্তিদের সঙ্গে নিয়ে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যন্তরেই "কংগ্রেস সমাজতান্ত্রিক দলের" সৃষ্টি করেন। ১৯৩৬ সালে তাঁর বিখ্যাত পুস্তক "Why Socialism ?" প্রকাশিত হয়।

কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে এবং যুদ্ধের সময়ে সোভিয়েত রাশিয়া ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির আচার-আচরণে জয়প্রকাশ ক্ষুব্ধ হন। মার্ক্সবাদে তাঁর আস্থা ক্ষুণ্ণ হয়। ১৯৪০ সালের মার্চে জামসেদপুরে তিনি ব্রিটিশ সরকারের যুদ্ধ-প্রচেষ্টার সঙ্গে সর্বপ্রকার অসহযোগিতা করবার আহ্বান জানিয়ে এক বৈপ্লবিক বক্তৃতা দেন।

এই কারণে তিনি গ্রেপ্তার ও কারারুদ্ধ হন। মুক্তি পাবার পর তাঁকে বিনা বিচারে রাজস্থানের দেওলী কারাগার ক্যাম্পে আটকে রাখা হয়। সেখানে তাঁর স্ত্রী প্রভবতী দেবী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলে তিনি স্ত্রীর মাধ্যমে তাঁর সহকর্মীদের কাছে কিছু চিঠি পাচার করতে যান এবং ধরা পড়েন। ঐ চিঠিগুলিতে জয়প্রকাশ তাঁর সহকর্মীদের পরামর্শ দিয়েছিলেন— আত্মগোপন কর, অস্ত্রশস্ত্র ও অর্থসংগ্রহ কর এবং ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হও।

এরপর জয়প্রকাশকে হাজারীবাগের কেন্দ্রীয় কারাগারে আনা হয়। ১৯৪২ সালের ৮ই নভেম্বর দেওয়ালীর রাতে পাঁচজন সহবন্দীকে নিয়ে জয়প্রকাশ কারাগারের উচু পাঁচিল টপকে পালিয়ে যান। উত্তর বিহারের সীমান্ত সংলগ্ন নেপালের অরণ্যসঙ্কু তরাই অঞ্চলে তাঁরা আস্তানা পাতেন। সেখান থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উদ্দেশ্যে তিনি দুটি খোলা চিঠি লেখেন। ঐ দুটি চিঠিতে জয়প্রকাশ '৪২ এর ভারতছাড় আন্দোলনের সংগ্রামীদের হতাশাগ্রস্থ

না হতে অনুরোধ করেন। তিনি ব্রিটিশের বিরুদ্ধে অহিংস ও সশস্ত্র আন্দোলন দুয়েরই প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে দুরকম আন্দোলনই চালিয়ে যেতে আহ্বান করেন। তরাই অঞ্চলে জয়প্রকাশ " আজাদ দস্তা" নামে একটি গেরিলাবাহিনী সংগঠিত করেন। একদিন তিনি তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে যখন ঐ জঙ্গলে গেরিলা বাহিনীর সদস্যদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছিলেন তখন নেপালের পুলিশ তাঁদের গ্রেপ্তার করে থানায় বন্দি করে। কিন্তু রাতের অন্ধকারে গেরিলা যোদ্ধারা থানা আক্রমণ করে এবং দুপক্ষের অবিশ্রান্ত গুলি বিনিময়ের মধ্যে জয়প্রকাশ সঙ্গীদের নিয়ে পালিয়ে যান।

১৯৪৩ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর জয়প্রকাশকে দিল্লী ও রাওলপিণ্ডি স্টেশনের মধ্যে একটি ট্রেন থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। তারপর লাহোর ফোর্টে জয়প্রকাশকে নির্জন ঘরে বন্দী রেখে তাঁর উপর অকথ্য অত্যাচার চালান হয়। ১৯৪৬ সালের এপ্রিলে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়।

১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারী গান্ধী হত্যার ঘটনায় জয়প্রকাশের চিন্তাধারায় একটা পরিবর্তন আসে। এই সময়ে তিনি গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র রচনা করতে গিয়ে গান্ধীবাদ দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হন। তিনি সমাজতন্ত্রের সাথে গান্ধীবাদের সমন্বয় ঘটাবার চেষ্টা করেন।

১৯৫২ সাল থেকে জয়প্রকাশ, বিনোবা ভাবের ভূদান আন্দোলনে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, হাজার হাজার গ্রামদানের ফলে সামাজিক ক্ষেত্রে গান্ধীবাদী অহিংস বিপ্লব ঘটানো সম্ভব হবে। এই ভাবে ভারতের কৃষিক্ষেত্রে ভূমিহীন চাষী ও ক্ষেত মজুরদের চরম দারিদ্র দুর করে সামাজিক সুস্থিতি ও মঙ্গলের লক্ষ্যে পৌছানো যাবে।

১৯৫৭ সালে জয়প্রকাশ "From Socialism to Sarvodaya" এবং ১৯৫৯ সালে "A Plea for Reconstruction of the Indian Polity" লেখেন। তিনি এই দুটি বইয়ে সমাজতন্ত্র ও সর্বোদয় উভয়েরই লক্ষ্য সাম্য বলে অভিমত প্রকাশ করেন। কিন্তু প্রথম ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ করতে হয়; দ্বিতীয় ক্ষেত্রেই স্বেচ্ছায় ত্যাগের মাধ্যমে সাম্য আনা সম্ভব। অহিংসাবাদী জয়প্রকাশের তাই সর্বোদয়ই বেশী পছন্দ ছিল।

কিন্তু ১৯৬৯ সাল থেকে জয়প্রকাশের মধ্যে অস্থিরতা প্রকাশ পেতে থাকে। তিনি নানারূপ সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অনাচারের বিরুদ্ধে এক অহিংস সামগ্রিক বিপ্লবের কথা ভাবতে থাকেন, যার নাম তিনি পরবর্তীকালে দিয়েছেন সর্বাত্মক বিপ্লব (Total Revolution)। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস বিভক্ত হবার পর ১৯৬৯ সাল থেকে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ধীরে ধীরে নিজের ক্ষমতা বাড়াতে থাকেন। জয়প্রকাশ সমস্ত ভারত ঘুরে জনগণকে হতাশা, বিষাদ ও ভয় থেকে মুক্ত হতে আহ্বান জানান। একই সঙ্গে তিনি সর্বব্যাপী দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেন। তরুণ ও যুবসমাজের ওপর এর বিপুল প্রভাব পড়ে। ১৯৭৪ সালের ৫ই জুন পাটনায় গান্ধী ময়দানে এক মহতী জনসভায় তিনি সর্বাত্মক বিপ্লবের ডাক দিলেন। তিনি একই সাথে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, মতাদর্শগত, শিক্ষাগত ও আত্মিক বিপ্লবের আহ্বান জানালেন।

১৯৭৫ সালের ২৬ শে জুন মাঝরাতে প্রধানমন্ত্রী ইন্দ্রিরা গান্ধীর সুপারিশে রাষ্ট্রপতি সমস্ত ভারতে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন। জয়প্রকাশ সমেত সমস্ত বিরোধী নেতাদের কারারুদ্ধ করা হয়। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং জনগণের মৌলিক অধিকার স্থগিত করে দেওয়া হয়। কার্যতঃ ভারতীয় গণতন্ত্র অকস্মাৎ স্বৈরাচারী একনায়কতন্ত্রে পর্যবসিত হয়।

জয় প্রকাশের শারীরিক অবস্থার খুব অবনতি হওয়াতে তাঁকে কিছুদিন পরে মুক্তি দেওয়া হল। অসুস্থ

অবস্থায় জয়প্রকাশ গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে সমগ্র জাতিকে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এলেন। তিনি নিজে কোন রাজনৈতিক দলে যোগ না দিলেও কয়েকটি দলের মিলন ঘটিয়ে জনতা দল তৈরী করলেন। ১৯৭৭ সালের মার্চে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে জনতা দল লোকসভায় বিপুলভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করল। মোরারজী দেশাই প্রধানমন্ত্রী হলেন এবং জরুরী অবস্থা প্রত্যাহৃত হয়ে ভারতে পুনরায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হল।

১৯৭৭ সালের ১৬ই জুলাই ভারতীয় বিদ্যাভবন জয়প্রকাশকে সংবর্ধনা জানিয়ে একটি "তাম্রপাত্র" প্রদান করে। ঐ "তাম্রপাত্রে" খোদিত ছিল, জয়প্রকাশ ভারতীয় গণতন্ত্রের পরিত্রাতা হিসাবে "১৯৭৭ সালের এক অভিনব ব্যালট-বাক্স বিপ্লবের সাহায্যে দেশীয় স্বৈরাচার থেকে" ভারতবাসীকে স্বাধীনতার রাজ্যে পৌঁছে দেন (As a messiah he led the Indians to freedom "from native dictatorship through a unique ballot-box revolution in 1977".)। বলা হয়, গান্ধী বিদেশী প্রভুর কবল থেকে ভারতের স্বাধীনতাকে পুনরুদ্ধার করেন; জয়প্রকাশ দেশী প্রভুর কবল থেকে ভারতের স্বাধীনতাকে পুনর্জীবিত করেন।

জয়প্রকাশ মোরারজী দেশাই সরকারের কার্যকলাপে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। কারণ দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলেও এই সরকার তাঁর সর্বাত্মক বিপ্লবের আদর্শ অনুসরণ করবার কোন আগ্রহই দেখাল না। জনগণের মঙ্গলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক-অর্থনৈতিক পদক্ষেপ নিতে এই সরকার ব্যর্থ হল। ১৯৭৯ সালের ৮ই অক্টোবর জয়প্রকাশের জীবনাবসান হয়।

ভারতমাতার সুসন্তান, আজীবন আত্মত্যাগী জয়প্রকাশ নারায়ণের আদর্শ ও স্বপ্ন হয়ত সফল হয় নি। কিন্তু মানুষের মর্যাদা, সাম্য, গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা অক্ষুন্ন থাকবে — এমন নতুন সমাজ গড়বার যে স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন তা যুগ যুগ ধরে মানুষকে অনুপ্রাণিত করবে।

৪৪.৩.১ মার্ক্সবাদ

আগেই বলা হয়েছে, জয়প্রকাশ রাজনৈতিক মতাদর্শকে রাজনৈতিক মূল্যবোধ অর্জনের পদ্ধতি হিসাবে দেখতেন। রাজনৈতিক মতাদর্শ নিয়ে এত গোঁড়ামী, এত সংঘাত চারিদিকে দেখা যায়, কিন্তু জয়প্রকাশের মন এই ক্ষেত্রে আশ্চর্য মুক্ত ছিল। তিনি তাঁর মূল্যবোধগুলি (স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব) রূপায়িত করার জন্য এক মতাদর্শ ত্যাগ করে শুধু অন্য মতাদর্শই গ্রহণ করতেন না, প্রয়োজনে মতাদর্শ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেন। এক মতাদর্শের মধ্যে অন্য মতাদর্শের কিছু উপাদান গ্রহণ করতেন। এইভাবে জয়প্রকাশ মার্ক্সবাদের সঙ্গে গান্ধীর কিছু চিন্তাধারা ও উদারনৈতিক গণতন্ত্রের কিছু ভাবনার সম্মিলন ঘটিয়ে তাঁর নিজস্ব বৈপ্লবিক মতাদর্শ রচনা করেছিলেন।

জয়প্রকাশ ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত তাঁর "Why Socialism ?" গ্রন্থে মার্ক্সবাদের ব্যাখ্যা করেন। তিনি মার্ক্সবাদকে সামাজিক-অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের এক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। জয়প্রকাশ মার্ক্সবাদের মূলসূত্রগুলি গ্রহণ করেছিলেন, যেমন, প্রথমতঃ শ্রমের উদ্বৃত্ত মূল্যতত্ত্ব। শ্রমিক শ্রেণী ছাড়া অন্যকোন শ্রেণী সম্পদ সৃষ্টি করতে পারে না। কিন্তু তারা যে সম্পদ সৃষ্টি করে তার বাজার মূল্যের সামান্য অংশই তারা ভোগ করে। উদ্বৃত্ত মূল্য (যার পরিমাণ অনেক) ভোগ করে উৎপাদক নিজে, মালপত্তরের ব্যবসায়ী, ঋণদানকারী ব্যাংক ইত্যাদি। দ্বিতীয়তঃ শ্রেণী সংগ্রাম। মানুষের ইতিহাসই হল শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস। সমস্ত উৎপাদন ও মালিকানা যে শ্রেণীর হাতে থাকে সেই শ্রেণীই সম্পদহীন শ্রেণীকে শোষণ করে। রাষ্ট্র এই শোষক শ্রেণীর রক্ষকের কাজ করে। সাম্যবাদের মাধ্যমে যখন শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে তখন রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যাবে এবং রাষ্ট্র অবলুপ্ত হবে।

কিন্তু জয়প্রকাশ কট্টরপন্থী মার্ক্সবাদী ছিলেন না। তিনি "Why Socialism ?" গ্রন্থে মার্ক্সবাদ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উদারনৈতিক গণতন্ত্রের চিন্তাধারার স্বাক্ষরও রেখেছেন। যেমন, জয়প্রকাশ বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের পাশাপাশি নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের কথাও বলেছেন। সেই সঙ্গেই গান্ধীর চিন্তাধারার কথাও বলেছেন। ভারতের কৃষিক্ষেত্রে সোভিয়েত মডেল অনুযায়ী সমবায় ও যৌথ খামার ব্যবস্থার (co-operative and collective farming) সুপারিশ করার সাথে সাথে জয়প্রকাশ গান্ধীকে অনুসরণ করে বলেছেন, কৃষিক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে। বলপ্রয়োগ পরিহার করতে হবে এবং অতিদ্রুত আধুনিক যন্ত্রপাতি প্রবর্তন করা চলবে না।

৪৪.৩.২ গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র

আগেই বলা হয়েছে, জয়প্রকাশের রাজনৈতিক চিন্তাধারার ক্রমবিবর্তনে তিনি ক্রমেই গান্ধীর দিকে চলে এসেছেন। তাঁর প্রথম রাজনৈতিক মতবাদ মার্ক্সবাদে তিনি গান্ধীর কিছু ধারণা নিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর পরবর্তী মতবাদ গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রে তিনি সমাজতন্ত্রের সঙ্গে গান্ধীবাদের এক অভিনব মিল ঘটিয়েছিলেন। বস্তুতঃ জয়প্রকাশের এই মতবাদের নামকরণ হওয়া উচিত গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র নয়, গান্ধীবাদী সমাজতন্ত্র

জয়প্রকাশ মনে করতেন, সমাজতন্ত্রের সঙ্গে গান্ধীবাদের মিলন ঘটানো সম্ভব, কারণ উভয় মতবাদই একই ধরণের মূল্যবোধকে (values) বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করে। এগুলি হল সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্য, শোষণের হাত থেকে মুক্তি আত্মবিকাশের স্বাধীনতা এবং সমাজ ও ব্যক্তির পারস্পরিক দায়বদ্ধতা ইত্যাদি। কোন কোন ক্ষেত্রে জয়প্রকাশ এই দুটি মতাদর্শের মিলন ঘটিয়েছিলেন তা এখন আলোচনা করা যেতে পারে।

প্রথমতঃ জয়প্রকাশের মতে যথার্থ সমাজতন্ত্র মানুষের বৈষয়িক উন্নতির চেষ্টা করে। কিন্তু সেই সঙ্গে গান্ধীকে অনুসরণ করে মানুষের নৈতিক উন্নতির কথাও ভাবা দরকার। তাঁর মতে সমাজতন্ত্রে যদি জীবনের প্রতিটি দিকের পরিকল্পনা করা হয়, তবে নৈতিক উন্নতি নিয়েও পরিকল্পনা করতে হবে। বিষয়টি ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দেওয়া যুক্তিযুক্ত হবে না।

দ্বিতীয়তঃ সমাজতন্ত্রের ধারণানুযায়ী ‘‘উদ্দেশ্যই উপায়ের যাথার্থ্য’’ ("End justifies means")। অর্থাৎ উদ্দেশ্য সঠিক হলে উদ্দেশ্য পূরণের পথ বা উপায়ের ভাল-মন্দ বিচার করার কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু জয়প্রকাশ মনে করতেন, গান্ধী সঠিকভাবেই বলেছেন, কোন মন্দ পথ বা উপায় অনুসরণ করে কখনও কোন ভাল উদ্দেশ্য পূরণ করা সম্ভব নয়। উদাহরণ হিসাবে জয়প্রকাশ বলেছেন, সোভিয়েত রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র গঠনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হল, কারণ পদ্ধতি বা উপায়ের ন্যায়-অন্যায় বিচার করা হয় নি। অতএব সমাজতন্ত্রের ভাবনায় উদ্দেশ্য বা উপায়ের গুরুত্বকে স্বীকার করা দরকার।

তৃতীয়তঃ জয়প্রকাশ মনে করতেন, রাষ্ট্রের সাহায্য নিয়ে সমাজতন্ত্র গঠনের প্রচেষ্টা কখনই সার্থক হতে পারে না। তিনি সামাজিক পরিবর্তনের গান্ধীবাদী পদ্ধতির স্বপক্ষে ছিলেন। এই পদ্ধতির মধ্যে গঠনমূলক ও প্রতিরোধমূলক উভয় ধরণের কার্যকলাপ থাকবে। শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র —সমাজের সর্বস্তরের লোকদের সংগঠিত করে তাদের চেতনা ও শিক্ষার মান উন্নত করতে হবে। এই কাজ গঠনমূলক। সাথে সাথে অহিংস প্রতিরোধ করতে হবে অসাম্য, অবিচারের বিরুদ্ধে। সমাজতন্ত্র গঠন করতে হলে নতুন পরিবেশ, নতুন মানুষ, নতুন মূল্যবোধ সৃষ্টির প্রয়োজন। এইভাবে জয়প্রকাশ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় ‘‘গান্ধীবাদী বৈপ্লবিক পদ্ধতির’’ প্রয়োজনের কথা বলেছেন।

চতুর্থতঃ জয়প্রকাশ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কেন্দ্রীকরণ চরম ক্ষতিকারক বলে মনে করেন। তিনি সোভিয়েত রাশিয়ার দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছেন। সেখানে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক সুবিধাভোগী পরিচালক শ্রেণী (managerial class) সৃষ্টি হয়েছিল যারা সাম্যের আদর্শকে বানচাল করে দিয়েছিল। রাজনৈতিক কেন্দ্রীকরণের ফলস্বরূপ স্বৈরাচারী একনায়কতন্ত্র দেখা দিল। এই কেন্দ্রীকরণ সমস্যা ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক উৎস রাষ্ট্রেরই বিশাল সমস্যা। গান্ধীবাদী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণই সমাজতন্ত্র গঠনে প্রকৃত সাহায্য করবে।

যাইহোক্, জয়প্রকাশ মন্তব্য করেছেন, সমাজতন্ত্রের সঙ্গে গান্ধীবাদ যুক্ত হলে সমাজতন্ত্রের দোষ-ক্রটি গান্ধীবাদ শোধন করতে পারবে।

অনুশীলনী — ২

বড় প্রশ্ন :

ক) জয়প্রকাশের কর্ম ও জীবন সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

খ) জয়প্রকাশ প্রচারিত মার্ক্সবাদ পর্যালোচনা করুন।

গ) জয়প্রকাশ প্রচারিত গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের উপর একটি টীকা লিখুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

ঘ) জয়প্রকাশ প্রচারিত মার্ক্সবাদে অন্যান্য কোন্ কোন্ মতাদর্শের সন্ধান পাওয়া যায় ?

ঙ) জয়প্রকাশ রচিত গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের সঠিকভাবে কি নামকরণ হওয়া উচিত ছিল ?

৪৪.৩.৩ সর্বোদয় ভিত্তিক গণতন্ত্র

''সর্বোদয়'' শব্দের অর্থ হল সবার মঙ্গল। জয়প্রকাশ কালক্রমে সমাজতন্ত্রের বাস্তবমূল্য সম্পর্কে আস্থা হারিয়ে 'সর্বোদয়' প্রচারে আগ্রহী হয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, জীবন সম্পর্কে বৈষয়িক দৃষ্টিভঙ্গী মানুষকে ধন-সম্পদ সম্পর্কে অতিরিক্ত লোভী করে তুলেছে এবং ব্যক্তি, গোষ্ঠী এবং জাতি — সবার পারস্পরিক দ্বন্দ্ব বাড়িয়ে তুলেছে। এই পরিস্থিতিতে সাম্য ও স্বাধীনতার আদর্শ রূপায়িত করা খুবই কঠিন কাজ। রাষ্ট্র বলপ্রয়োগ দ্বারা এই উদ্দেশ্য সাধন করতে গেলে সফল হবার সম্ভাবনা নেই। কমিউনিস্ট দেশগুলির অভিজ্ঞতা থেকেই তা বোঝা যায়।

জয়প্রকাশের মতে, এই পরিস্থিতিতে সমাজতন্ত্রের আদর্শ অর্থাৎ সাম্য ও স্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভব সর্বোদয়-ভিত্তিক গণতন্ত্রে। এই সহজ সরল গণতন্ত্রে নতুন মূল্যবোধ কাজ করবে — ব্যক্তি নির্লোভি হবে, অপরের জন্য ত্যাগ স্বীকারে রাজী থাকবে। ব্যক্তি হৃদয়ঙ্গম করবে তার নিজের মঙ্গল নিহিত আছে ''সর্বোদয়'' অর্থাৎ সবার মঙ্গলের মধ্যে। পারস্পরিক বোঝাপড়া, ভালবাসা ও আত্মত্যাগের ভিত্তিতেই জনগণ সাম্য ও স্বাধীনতার আদর্শকে স্বেচ্ছায় রূপায়িত করবে — সমাজতন্ত্রীদের ধারণানুযায়ী রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগের দরকার হবে না।

এই রকম নতুন মূল্যবোধ, নতুন মানুষ ও সহজ সরল জীবন রচনা করার জন্য সর্বোদয়-ভিত্তিক গণতন্ত্রে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ হবে। সরকারের গঠনব্যবস্থা এমন হবে যে গ্রামস্তর থেকেই সরকারী ক্ষমতা ছড়িয়ে দেওয়া হবে। গ্রামস্তরে থাকবে গ্রাম পঞ্চায়েত যারা গ্রামের জনগণের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, প্রাথমিক শিক্ষা ও প্রাথমিক চিকিৎসার দায়িত্ব পাবে। গ্রাম পঞ্চায়েতকে নির্বাচন করবে গ্রামের জনগণ।

কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচন করবে একটি পঞ্চায়েত সমিতিকে যারা অঞ্চলের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। কয়েকটি পঞ্চায়েত সমিতি নির্বাচন করবে একটি জিলা পরিষদকে যারা জিলার শাসনব্যবস্থার দায়িত্ব নেবে। এইভাবে জিলা পরিষদ নির্বাচন করবে প্রাদেশিক সভাকে এবং প্রাদেশিক সভা নির্বাচন করবে জাতীয় সভাকে। এই জাতীয় সভার হাতে থাকবে দেশরক্ষা, মুদ্রাব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, ইত্যাদি। লক্ষ্যণীয়, জয়প্রকাশের গণতন্ত্রে কোন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব থাকবে না।

একইভাবে জয়প্রকাশ সর্বোদয়ী গণতন্ত্রে অর্থনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণের কথা বলেছেন। সমাজের মূল উদ্দেশ্য হবে, সবার প্রাথমিক প্রয়োজনগুলি মেটানো, যেমন, খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, চাকরী ইত্যাদি। সেইজন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনা শুরু হবে নীচু থেকে। গ্রামের আয়তন ছোট বলে কয়েকটি গ্রাম নিয়ে গঠিত একটি অঞ্চলকে ভিত্তি করেই পরিকল্পনা গড়ে উঠবে।

স্বাভাবিকভাবেই এইরকম অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ক্ষুদ্রশিল্পের উপরই বেশী নির্ভর করা হবে। ক্ষুদ্রশিল্প যথেষ্ট পরিমাণ চাকরীর সুযোগ সৃষ্টি করবে এবং সম্পদের ব্যাপক বন্টন করবে। সেই সঙ্গে স্থানীয় চাহিদা মেটাবার জন্য স্থানীয় প্রাকৃতিক ও মানবীয় সম্পদেরও পুরো সদ্ব্যবহার করবে।

জয়প্রকাশ মন্তব্য করেছেন, সর্বোদয়ী গণতন্ত্রকে সফল করতে হলে "সমাজ চেতনা" ("Spirit of Community") সৃষ্টি করতে হবে এবং "দৃষ্টান্ত, সেবা, ত্যাগ ও ভালবাসার সাহায্যে নৈতিক পুনরুজ্জীবনের এই কাজ সুসম্পন্ন করতে হবে" (a task of moral regeneration to be brought about by example, service, sacrifice and love."[2]).

জয়প্রকাশ মনে করতেন, এই যুগে ব্যক্তির স্বাধীনতা, সাম্য, এমন কি তার অস্তিত্বও বিপন্ন হয়েছে বৃহৎ রাষ্ট্র ও বৃহৎ অর্থনৈতিক সংগঠনের চাপে। উদারনৈতিক গণতন্ত্রে বিশাল রাষ্ট্র রয়েছে। ব্যক্তি নির্বাচনে হয়ত তার একটি ভোট দেয় — কিন্তু সমগ্র রাজনৈতিক পদ্ধতিতে এককভাবে তার তেমন কোনও ভূমিকা থাকে না। একইভাবে, বৃহৎশিল্প, একচেটিয়া পুঁজিব্যবস্থাও ব্যক্তির কর্মজীবনে নিঃসঙ্গতা ও অসহায়তা বোধ নিয়ে আসে। সর্বোদয় ব্যবস্থা এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তির ভূমিকাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়, তাকে যথেষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য প্রদান করে। "প্রকৃত স্ব-শাসন" ("real self-government") - এর স্বাদ ব্যক্তি অনুভব করে। সুতরাং সমাজতন্ত্রের আদর্শ — সাম্য ও স্বাধীনতা অর্জন — একমাত্র এই সমাজেই রূপায়ন করা সম্ভব।

৪৪.৩.৪ সর্বাত্মক বিপ্লব

সর্বোদয়ের পর জয়প্রকাশের চিন্তাধারার বিবর্তন তাঁকে তাঁর সর্বাত্মক বিপ্লব তত্ত্বে পৌঁছে দেয়। ৪৪.৩ অংশে জয়প্রকাশের জীবন ও কর্ম আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখেছি, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নানারকম অবিচার-অত্যাচার দীর্ঘকাল প্রত্যক্ষ করার পর ১৯৬৯ সাল থেকে জয়প্রকাশের মধ্যে একজাতীয় অস্থিরতা দেখা দিল। ১৯৬৯ সাল থেকে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ধীরে ধীরে স্বৈরাচারী শাসক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে শুরু করেন। সর্বোদয় মতাদর্শে বিশ্বাসী জয়প্রকাশের মনে হতে লাগল আবেদন — অনুরোধ দ্বারা তাঁর নতুন সমাজ গড়বার কাজ সফল হবে না। প্রয়োজন ব্যাপক গণ-আন্দোলন — অবশ্যই শান্তিপূর্ণ গান্ধীবাদী পদ্ধতি অনুসরণ করে।

আমরা ৪৪.৩ অংশে আরও দেখেছি শেষ পর্যন্ত ১৯৭৪ সালের ৫ই জুন পাটনায় গান্ধী ময়দানে এক

বিশাল জনসভায় তিনি জীবনের সব ক্ষেত্রে এক সর্বাত্মক বিপ্লবের ডাক দিলেন। একই সাথে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, মতাদর্শগত, শিক্ষাগত ও আত্মিক বিপ্লবের আহ্বান জানালেন। এই সর্বাত্মক বিপ্লবের সামগ্রিকভাবে সফল পরিণতি না হলেও একাংশে সার্থক হয়েছিল বলা যায়। ১৯৭৭ সালের মার্চে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী নির্বাচনে পরাজিত হলেন। জনতা দলের নতুন সরকার গঠিত হ'ল। জরুরী অবস্থা ও স্বৈরাচারী শাসন বাতিল করে ভারতে গণতন্ত্রকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা গেল।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে সর্বোদয় ও সর্বাত্মক বিপ্লবের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য সম্বন্ধে। Geoffrey Ostergaard মন্তব্য করেছেন, লক্ষ্যের দিক থেকে উভয়ের সাদৃশ্য আছে, কিন্তু পার্থক্য রয়েছে কৌশলের (Strategies) দিক থেকে। এই মন্তব্যকে ব্যাখ্যা করে বলা যায়, প্রথমতঃ উভয়েই রাষ্ট্রের মাধ্যমে নয়, জনগণের সচেতনতা ও স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছার মাধ্যমে লক্ষ্যে পৌঁছাতে চায়। দ্বিতীয়তঃ উভয়ই সামাজিক জীবনের সব দিকেরই পরিবর্তন চায়। তৃতীয়তঃ উভয়েই গান্ধীবাদী পঞ্চায়েত শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন চায়। কিন্তু কৌশলের দিক থেকে পার্থক্য রয়েছে। সর্বোদয়ী মানুষের বিবেকের কাছে আবেদন-নিবেদন করতে চান—হৃদয়ের পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষা করেন। কিন্তু সর্বাত্মক বিপ্লবী অহিংস হলেও বিপ্লবেরই পরিকল্পনা করেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে গান্ধী যেসব ব্যাপক সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন সেই জাতীয় আন্দোলন করতে সর্বাত্মক বিপ্লবী রাজী থাকেন।

এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত বামপন্থী রাজনৈতিক নেতা ও তাত্ত্বিক ই. এম. এস. নাম্বুদিরিপাদের মন্তব্যের উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর স্বৈরাচারী শাসনের অবসানের জন্য জয়প্রকাশের আহ্বানে সমস্ত ভারতব্যাপী যে গণ আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছিল তা নিঃসন্দেহে গান্ধী-পরিচালিত আইন অমান্য এবং সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সঙ্গে তুলনীয়।

সবশেষে বলা যায়, জয়প্রকাশের সর্বাত্মক বিপ্লব প্রথাগত বিপ্লবের (traditional revolution) মত সরকারের পরিবর্তন কেই একমাত্র লক্ষ্যবস্তু করে না — নতুন রাজনীতি ও নতুন মূল্যব্যবস্থা (a new polities and a new value-system) রচনা করতে চায়। এই মূল্য-ব্যবস্থায় ক্ষমতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না, গুরুত্ব দেওয়া হয় পারস্পরিক বিশ্বাস, আত্মসম্মান ও যৌথ প্রচেষ্টাকে। এ কথাও বলা যায়, সর্বাত্মক বিপ্লবের উদ্দেশ্য হল, ভারতীয় জনগণের নৈতিক পুনরুজ্জীবন। ১৯৪৮ সালে গান্ধী-হত্যার পরবর্তী সময়ে ধীরে ধীরে ভারতের রাজনীতির ও সমাজের নৈতিক চরিত্র ক্রমশঃ বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। ১৯৭০ -এর দশকে জয়প্রকাশ ঘোষিত সর্বাত্মক বিপ্লব বা নতুন মূল্য-ব্যবস্থা রচনার বিপ্লব দেশের রাজনীতিতে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিল।

৪৪.৪ জয়প্রকাশ : ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রকৃত ধারক ও বাহক

Dennis Dalton -এর মতে, জয়প্রকাশ নারায়ণকে বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী বিরচিত ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলা চলে। কারণ — প্রথমতঃ এই সব চিন্তাবিদদের মতই জয়প্রকাশ বৃহৎ রাষ্ট্রের প্রতি বিরাগ পোষণ করতেন। তাঁর সর্বোদয়ী গণতন্ত্রের ধারণা পঞ্চায়েত ও আঞ্চলিক সমিতি স্তরে। ক্ষমতা ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিল।

দ্বিতীয়তঃ এই সব চিন্তাবিদদের অনুসরণে তিনি সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য স্বীকার করেছিলেন। তাদের মতই তিনি সামাজিক পরিবর্তনের জন্য নির্ভর করেছিলেন জনগণের শক্তি ওপর, রাষ্ট্রের শক্তির ওপর

নয়। জনগণের শক্তি যাতে সত্যিই কার্যকর হতে পারে সেজন্য তিনি সর্বোদয়ী গণতন্ত্রের কাঠামো রচনা করেছিলেন।

তৃতীয়তঃ জয়প্রকাশের দর্শনের নৈতিক প্রকৃতি ঐ চিন্তাবিদদের সাথে তাঁর সাদৃশ্য স্পষ্ট করে তুলেছে। বিবেকানন্দ মন্তব্য করেছেন, সমস্ত রকমের শাসনব্যবস্থার কার্যকারিতা নির্ভর করে ''মানুষের ভালত্বের'' ("goodness of man") উপর। অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীও ব্যক্তির ''নৈতিক ও আত্মিক উন্নতি' ("moral and spiritual uplift") চাইতেন। জয়প্রকাশও একই সুরে কথা বলেছেন, তাঁর আদর্শ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র এমন এক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক গণতন্ত্র হবে যেখানে মানুষের পরিপূর্ণ নৈতিক উন্নতির সুযোগ থাকবে। অতএব জয়প্রকাশ নিঃসন্দেহে বিবেকানন্দ প্রমুখ মহামানবগণের বিরচিত ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রকৃত ধারক ও বাহক ছিলেন।

৪৪.৫ সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন

ভারতের রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে জয়প্রকাশ নারায়ণের মত নির্লোভ, সর্বস্বত্যাগী নেতা খুবই বিরল। জীবনে অনেকবার উঁচু সরকারী পদগ্রহণের প্রস্তাব পেয়েছেন; এমন কি ভারতের প্রধানমন্ত্রী হবার সুযোগও পেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সর্বদা সযত্নে নিজেকে ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে দূরে সরিয়ে রাখতেন। নির্লোভ, নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমের এক গৌরবোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিলেন জয়প্রকাশ।

তিনি জীবনে বারবার দেশপ্রেমের তাগিদে দুরন্ত সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসে তিনি দেশসেবার অভিনয় করতেন না। তিনি রাজস্থানের দেওলী কারাগার ক্যাম্পে বসে সহকর্মীদের উদ্দেশ্যে সশস্ত্র সংগ্রামের আহ্বান জানিয়ে চিঠি লেখেন এবং সেই চিঠি তাঁর স্ত্রীর মাধ্যমে বাইরে পাচারের চেষ্টা করেন। দেওয়ালীর রাতে হাজারীবাগ জেলের উঁচু পাঁচিল বেয়ে উঠে পালিয়ে যান, দুর্গম তরাই অঞ্চলে ''আজাদ দস্তা'' নামে গেরিলাবাহিনী তৈরী করেন। আবার নেপালী পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করলে অবিশ্রান্ত গুলিবৃষ্টির মধ্যেই সাথী গেরিলাদের সাহায্যে পালিয়ে যান। পরবর্তীকালে ১৯৭৫-৭৭ সালের জরুরী অবস্থার সময়ে বৃদ্ধ জয়প্রকাশ দুরারোগ্য কিডনীর অসুখে আক্রান্ত হয়ে অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় যেভাবে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সমগ্র জাতিকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাকে শৌর্যবীর্য ও দেশপ্রেমের চরম দৃষ্টান্ত বলা যেতে পারে।

রাজনীতিজ্ঞদের মধ্যে মতাদর্শ (ideology) সম্পর্কে সাধারণতঃ গোঁড়ামী থাকে। জয়প্রকাশের অভিনবত্ব হল, তাঁর মধ্যে বিন্দুমাত্র গোঁড়ামি ছিল না। তিনি নির্দিষ্ট কিছু রাজনৈতিক মূল্যবোধে (Political values) বিশ্বাস করতেন । যেমন, স্বাধীনতা, সাম্য এবং ভ্রাতৃত্ব। এগুলিকে ''আলোর নিশানা'' ("beacons of light") বলে অভিহিত করে এদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে একের পর এক মতাদর্শ পাল্টেএক মতাদর্শের সঙ্গে অন্য মতাদর্শের মিলন ঘটিয়ে তিনি এগিয়ে যেতেন। কিন্তু তাই বলে জয়প্রকাশ সুবিধাবাদী আপোষপন্থী আদৌ ছিলেন না। জীবনের প্রথম থেকে শেষ অবধি নানারকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েও তিনি নির্দিষ্ট মূল্যবোধে কখনও আস্থা হারান নি। এইভাবে রাজনৈতিক মতাদর্শের ক্ষেত্রে যথেষ্ট উদারতা, নমনীয়তা ও সৃজনশীলতার পাশাপাশি তাঁর চরিত্রের বিশাল উদারতা ও অসাধারণ দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া যায়।

জয়প্রকাশ বাস্তবসম্পর্কহীন পন্ডিত বা তাত্ত্বিক ছিলেন না। তিনি একাধারে রাজনৈতিক তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক নেতা ছিলেন। কোন তত্ত্ব রচনা করে তিনি বাস্তবক্ষেত্রে সেটি প্রয়োগ করতেন; বাস্তব প্রয়োগে সেই তত্ত্বের যে সব ত্রুটি ধরা পড়ত সেগুলি সংশোধন করে নিয়ে আবার নতুন তত্ত্ব রচনা করে বাস্তবে প্রয়োগ

করতেন। উদাহরণস্বরূপ, জয়প্রকাশ মার্ক্সবাদ বাস্তবে প্রয়োগ করে তার ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করে পরিবর্তী মতবাদ "গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র" রচনা করলেন। এইভাবে তত্ত্ব ও বাস্তবের ধারাবাহিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা জয়প্রকাশের কর্মকাণ্ডের আর এক অভিনব বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে।

এইভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেন বলে তাঁর তত্ত্বের এক বিশেষ বাস্তবমূল্যও রয়েছে। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, তাঁর রচিত তত্ত্বগুলির সামগ্রিক মূল্যায়ন করে বিশেষজ্ঞগণ এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছেন যে তিনি আধুনিক ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক তাত্ত্বিক (political theorist) ছিলেন। এই সিদ্ধান্তের সারবত্তা নিয়ে কোনও সংশয় বা দ্বিধার সুযোগই নেই।

১৯৭৫-৭৭ সালে জরুরী অবস্থা চলাকালীন ভারতীয় গণতন্ত্র পুরোপুরি একনায়কতন্ত্রে পরিণত হয়েছিল। সেই পরিস্থিতিতে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে জয়প্রকাশ সমগ্র জাতিকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। বলা হয়, গান্ধী বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীর কবল থেকে ভারতের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করেছিলেন; জয়প্রকাশ দেশীয় স্বৈরাচারীর করাল গ্রাস থেকে ভারতের স্বাধীনতা পুনর্জীবিত করেছিলেন।

সবশেষে এই আত্মত্যাগী মহান দেশপ্রেমিককে প্রণাম জানিয়ে কবিগুরুর কথায় তাঁর উদ্দেশ্যে বলি—

"কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আস
সাধক ওগো, প্রেমিক ওগো,
পাগল ওগো, ধরায় আস।।"

৪৪.৬ সারাংশ

দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে ভারতীয় রাজনীতিতে জয়প্রকাশ নারায়ণ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রেখেছিলেন। একাধারে রাজনৈতিক তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক নেতা, জয়প্রকাশ ছিলেন এক বিরল আত্মত্যাগী ও নির্লোভ দেশপ্রেমিক। তিনি নির্দিষ্ট কিছু মূল্যবোধে (স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব) বিশ্বাসী ছিলেন এবং সেই মূল্যবোধগুলিকে অর্জন করবার জন্য তিনি বারে বারে তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শকে পরিবর্তন করেছেন নির্দ্বিধায় এবং আশ্চর্য সাহসের সঙ্গে।

জয়প্রকাশের জীবনে ও চিন্তাধারায় গান্ধীর ক্রমবর্ধমান প্রভাব দেখা যায়। জয়প্রকাশের প্রচারিত শেষ দুটি মতবাদকে (সর্বোদয়-ভিত্তিক গণতন্ত্র ও সর্বাত্মক বিপ্লব) পুরোপুরি গান্ধীবাদই বলা চলে। তাঁর ৭৭ বছরের দীর্ঘ জীবন বস্তুতঃ শৌর্যবীর্য, আত্মত্যাগ ও সাংগঠনিক প্রতিভার এক অপূর্ব নিদর্শন।

তাঁর প্রচারিত প্রথম মতবাদ মার্ক্সবাদ কট্টরপন্থী মার্ক্সবাদ ছিল না। তাঁর মার্ক্সবাদী চিন্তাধারায় উদারনৈতিক গণতন্ত্র ও গান্ধীর চিন্তাধারায় পরিস্কার ছাপ পাওয়া যায়। পরবর্তী মতবাদ গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রে তিনি সমাজতন্ত্রের সঙ্গে গান্ধীবাদের এক অভিনব মিলন ঘটিয়েছিলেন। তাঁর মতে সমাজতন্ত্র মানুষের বৈষয়িক উন্নতির চেষ্টা করে। গান্ধীবাদ মানুষের নৈতিক উন্নতির চেষ্টা করে। উভয়ের মিলন ঘটলে মানুষের সামগ্রিক উন্নতি সম্ভব। সর্বোদয়ী গণতন্ত্রে জনগণ স্বেচ্ছায় সমাজতন্ত্রের আদর্শকে — সাম্য ও স্বাধীনতাকে — পারস্পরিক বোঝাপড়া, ভালবাসা ও আত্মত্যাগের ভিত্তিতে বাস্তবায়িত করবেন। পরবর্তী চিন্তাধারা সর্বাত্মক বিপ্লব লক্ষ্যের দিক থেকে সর্বোদয় চিন্তাধারার সঙ্গে অভিন্ন। কিন্তু কৌশলের (Strategies) দিক থেকে তাদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। সর্বোদয়ী

মানুষের বিবেকের কাছে আবেদন-নিবেদন করেন— হৃদয়ের পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষা করেন। কিন্তু সর্বাত্মক বিপ্লবী অহিংস বিপ্লব ও সত্যাগ্রহের আয়োজন করেন।

জয়প্রকাশ নারায়ণকে বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী বিরচিত ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রকৃত ধারক ও বাহক বলা চলে। জয়প্রকাশের রচিত তত্ত্বগুলির কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও এই সিদ্ধান্তে নিঃসন্দেহে আসা যায় যে তিনি আধুনিক ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক তাত্ত্বিক (Political theorist) ছিলেন। এই সর্বস্বত্যাগী অসামান্য দেশপ্রেমিককে ভারত কোন দিনই ভুলবে না।

৪৪.৭ অনুশীলনী

ক) জয়প্রকাশ রচিত সর্বোদয় ভিত্তিক গণতন্ত্র বিশ্লেষণ করুন।

খ) জয়প্রকাশ রচিত সর্বাত্মক বিপ্লব তত্ত্ব ব্যাখ্যা করুন।

গ) জয়প্রকাশকে কিভাবে ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক হিসাবে চিহ্নিত করা যায় ?

ঘ) জয়প্রকাশের কর্মজীবন ও চিন্তাধারায় সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন করুন।

৪৪.৮ গ্রন্থপঞ্জী

1. Allan Scarfe and Wendy Scarfe : "JP—His Biography" (New Delhi : Orient Longman, 1975).

2. Bimal Prasad ed. : "A Revolutionary's Quest" (Delhi, Bombay etc. : Oxford University Press, 1980).

3. Brahmanand ed. : "Towards Total Revolution", 4 vols. (Bombay : Popular Prakashan, 1978).

4. David Selbourne ed. : "In Theory and in Practice — Essays on the Politics of Jayaprakash Narayan" (Delhi : Oxford University Press, 1985).

5. Dennis Dalton : "The Ideology of Sarvodaya : Concepts of Politics and Power in Indian Political Thought" in "Political Thought in Modern India," ed. Pantham and Deutsch (New Delhi, Beverly Hills etc. : Sage, 1986).

6. Nitis Das Gupta : "The Social and Political Theory of Jayaprakash Narayan" (New Delhi : South Asian Publishers, 1997).

দ্রষ্টব্য, "Amrita Bazar Patrika", Calcutta, 17 July, 1977.

7. Jayaprakash Narayan : "A Plea for Reconstruction of the Indian Polity" (Varanasi : Akhil Bharat Sarva Seva Sangh, 1959, P. 80).

8. দ্রষ্টব্য Dennis Dalton : "The Ideology of Sarvodaya : Concepts of Politics and Power in Indian Political Thought."

একক ৪৫ □ মানবেন্দ্রনাথ রায়

গঠন

৪৫.০ উদ্দেশ্য
৪৫.১ প্রস্তাবনা
৪৫.২ প্রাথমিক পর্যায়
৪৫.৩ কমিন্টার্ন ও মানবেন্দ্রনাথ
৪৫.৩.১ লেনিন-রায় মতবিরোধ
৪৫.৪ মানবেন্দ্রনাথ ও ভারতীয় রাজনীতি
৪৫.৫ মার্ক্সবাদ ও মানবেন্দ্রনাথ
৪৫.৬ মানবেন্দ্রনাথ ও তাঁর নবমানবতাবাদ
৪৫.৭ দলহীন গণতন্ত্র
৪৫.৮ সারাংশ
৪৫.৯ অনুশীলনী
৪৫.১০ গ্রন্থপঞ্জী

৪৫.০ উদ্দেশ্য

ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে মানবেন্দ্রনাথ রায় (১৮৮৭ - ১৯৫৪) এক অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব। তিনি হ'লেন প্রথম তাত্ত্বিক যিনি মার্ক্সবাদী, যুক্তিবাদী ও বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতীয় রাজনীতি ও সমাজের গতিপ্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করেছেন। বর্তমান এককে আমরা মানবেন্দ্রনাথের চিন্তাধারায় বিভিন্ন দিকের সঙ্গে পরিচিত হব ও সেই সঙ্গে ভারতীয় রাজনীতিতে তাঁর স্থান নির্ণয়েরও একটা চেষ্টা করব। এখানে আমরা যে যে বিষয়গুলির উপর আলোকপাত করব, সেগুলি হ'ল :

- মানবেন্দ্রনাথের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী
- তাঁর চিন্তাশীলতা উন্মেষের বিভিন্ন পর্যায়
- কমিন্টার্ন ও মানবেন্দ্রনাথ
- ভারতীয় রাজনীতি ও মানবেন্দ্রনাথ
- মার্ক্সবাদ ও মানবেন্দ্রনাথ
- দলহীন গণতন্ত্র প্রসঙ্গে মানবেন্দ্রনাথ
- নবমানবতাবাদ

৪৫.১ প্রস্তাবনা

বৈচিত্র্যময় দেশ ভারত। রাজনৈতিক চেতনা ও চিন্তাশীলতার উন্মেষও এখানে বহুমুখী; সেই প্রাচীনকাল থেকে রাজনৈতিক চিন্তার বিভিন্ন পথে পরিক্রমা করেছেন অনেকেই। কিন্তু মানবেন্দ্রনাথের মতো এমন বিচিত্র ও ঘটনাবহুল জীবন ভারতীয় রাজনীতিতে বিরল। মানবেন্দ্রনাথের জীবন ও মনন ধারাকে মোটামুটি তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায় — (১) ছাত্র বয়সে দেশের জাতীয়তাবাদী সশস্ত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণ, (২) যৌবনে মার্ক্সবাদী আদর্শে দীক্ষা এবং (৩) পরিণত বয়সে পূর্ণ মানবতার আন্দোলনে নিজেকে নিয়োজিত করা। এগুলি কোনও বিচ্ছিন্ন ধারণা নয়, বরং পরস্পরসম্পৃক্ত। তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী শক্তি, অগাধ পাণ্ডিত্য-আর অজস্র অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে তিনি বার বার খুঁজে নিতে চেয়েছেন জীবনের মূল সুরটিকে ।

৪৫.২ প্রাথমিক পর্যায়

মানবেন্দ্রনাথ রায়ের পিতৃদত্ত নাম নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। ১৮৮৭ সালের ২১শে মার্চ ২৪ পরগণা জেলার আরবেলিয়া গ্রামে সংস্কৃত পণ্ডিত দীনবন্ধু ভট্টাচার্য্যের রক্ষণশীল পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন নরেন্দ্রনাথ ওরফে মানবেন্দ্রনাথ রায়। গোঁড়া ধর্মীয় পরিবারে জন্ম গ্রহণ করলেও ছেলেবেলা থেকেই রাজনীতি সম্পর্কে এক স্বচ্ছ ধারণা ছিল নরেন্দ্রনাথের। সাম্রাজ্যবাদী বিদেশী ব্রিটিশ রাজশক্তিকে এদেশে থেকে উৎখাত না করলে দেশে প্রকৃত স্বাধীনতা আসবে না তা' তিনি প্রথম থেকেই উপলব্ধি করেন। বিবেকানন্দ ও বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাধারা তাঁকে প্রভাবিত করে। সুরেন্দ্রনাথ ও বিপিন চন্দ্রের ওজস্বিনী ভাষণ, তিনি স্বদেশী মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হন। কিন্তু মডারেটদের আবেদন-নিবেদন নীতির পরিবর্তে আকৃষ্ট হন 'লাল-বাল-পালের' চরমপন্থী রাজনীতির ধারায়। শেষে অরবিন্দ ঘোষ, বারীন ঘোষ, যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখের আহবানে সাড়া দিয়ে বিপ্লবী গোষ্ঠী অনুশীলণী সমিতি, যুগান্তর দলের হয়ে গুপ্ত সশস্ত্র বিপ্লবী কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়েন, নরেন্দ্রনাথ। ১৯১০ সালে হাওড়া, ষড়যন্ত্র মামলা ও ১৯১৫ সালে কলকাতায় রাজনৈতিক ডাকাতির অভিযোগে কুড়িমাস কারারুদ্ধ থাকেন। শোনা যায়, এই সময় ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে তাঁর মনে এক নতুন ভাবের উদয় হয়। মুক্তির পর সন্ন্যাস গ্রহণ করে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগদান করেন ও পদব্রজে দেশ ভ্রমণ করেন। কিন্তু প্রকৃত শান্তি তিনি পাননি।

এরপর যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে সশস্ত্র বিপ্লবের কর্মকাণ্ডে জার্মানদের সাহায্যে বিদেশ থেকে অস্ত্র আমদানির (বাটাভিয়া থেকে সুন্দরবনে) চেষ্টা করতে গিয়ে ধরা পড়ে তিনি দূরপ্রাচ্যে পাড়ি দেন। চীন, জাপান, কোরিয়া প্রভৃতি বহু জায়গা ছদ্মবেশে ঘুরে অস্ত্র সংগ্রহের প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হন। তবে তাঁর সংযোগ ঘটে রাসবিহারী বসু, সান ইয়াৎ সেনের মত বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের সঙ্গে। এরপর নরেন্দ্রনাথ গোপনে পাড়ি দেন সুদূর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। এখানেই তিনি নতুন নাম নেন মানবেন্দ্র নাথ রায়। নিউ ইয়র্কে এসেই তাঁর সাক্ষাৎ হয় জাতীয়তাবাদী নেতা লালা লাজপত রায়ের সঙ্গে। এখানেই প্রথম অনেক প্রগতিশীল

সমাজবাদীর সংস্পর্শে এসে সমাজবাদী ভাবধারার প্রতি আকৃষ্ট হন। কিন্তু এখানে সরকারও তাঁকে দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করে। শেষে মেক্সিকোয় এসে আশ্রয় নেন।

মেক্সিকোতে তাঁর জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা হয়। এখানেই তাঁর পরিচয় হয় রুশ বিপ্লবী নেতা মিখাইল বোরোদিনের সঙ্গে, যাঁর তত্ত্বাবধানে মানবেন্দ্রনাথ মার্ক্সবাদ তথা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের আদর্শে দীক্ষিত হন; উত্তরণ ঘটে জাতীয়তাবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে। মার্ক্সের বস্তুবাদী ভাবনার প্রভাবে এসে তিনি উপলব্ধি করেন বিপ্লব কোনও সাধারণ আন্দোলন মাত্র নয়। শুধু মুষ্টিমেয় কয়েকজন জাতীয়তাবাদীর নেতৃত্বে ইংরেজ বিতাড়নের মধ্যে দিয়ে বিপ্লব সম্পূর্ণ হ'তে পারে না। বিপ্লবে যুক্ত করতে হবে আপামর জনগণকে, আনতে হবে আমূল পরিবর্তন আর্থ সামাজিক কাঠামোয়। তাই প্রয়োজন আছে বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার। বিপ্লব আসবে ধাপে ধাপে - প্রথমে সমাজবাদ ও তারপর সাম্যবাদ। তিনি আরও বুঝলেন বিপ্লব কোনও দেশের সীমানায় সীমাবদ্ধ নয়; চাই বিশ্বব্যাপী সামাজিক বিপ্লব।

১৯১৯ সালে রাশিয়ার বাইরে মেক্সিকোতে পৃথিবীর প্রথম কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করেন মানবেন্দ্রনাথ। সেইসঙ্গে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশন্যালের কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য হন।

৪৫.৩ কমিন্টার্ন ও মানবেন্দ্রনাথ

১৯২০ সালের জুলাই মাসে পেট্রোগ্রাদে বসে কমিন্টার্নের দ্বিতীয় কংগ্রেস। মানবেন্দ্রনাথ মেক্সিকোর প্রতিনিধি হিসাবে তাতে যোগদান করেন। এর আগে কিছুদিন বার্লিনে কাটাবার সুবাদে তিনি একদিকে যেমন বেশ কিছু ভারতীয় বিপ্লবীদের সাথে পরিচিত হন, তেমনি অন্যদিকে বার্ণষ্টাইন, কাউটস্কি, সেয়ার, থালহাইমার, রোজা লুক্সেমবার্গ প্রমুখ বহু প্রবীন ও নবীন কমিউনিস্টদের সান্নিধ্যে আসেন ও তাঁদের দ্বারাও প্রভাবিত হন। এই সময়ে লিখিত 'An Indian Communist Manifisto' (1920) গ্রন্থে মানবেন্দ্রনাথ তাঁর মার্ক্সবাদী ভাবনা-চিন্তা তুলে ধরেন। তিনি দেখান যে, সামাজিক বিপ্লব ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া রাজনৈতিক স্বাধীনতা মূল্যহীন। তাই সাধারণ মেহনতী মানুষের মুক্তির জন্য শ্রেণী সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তিনি এই গ্রন্থে ধারালো যুক্তি পেশ করেন।

৪৫.৩.১ লেনিন - রায় মতবিরোধ

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসেই মানবেন্দ্রনাথের সঙ্গে লেনিনের ইতিহাস বিখ্যাত বিতর্ক ঘটে। ঔপনিবেশিক অনুন্নত দেশগুলিতে কমিন্টার্নের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে লেনিন পেশ করেন তাঁর প্রখ্যাত 'Thesis on the National and Colonial Question' । লেনিনের বক্তব্য ছিল, পৃথিবীর বুকে যতদিন সাম্রাজ্যবাদ আধিপত্য করবে ততদিন দেশের সংগ্রামী জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে পশ্চিমী উন্নত দেশগুলির সর্বহারা আন্দোলনের মৈত্রীর সম্পর্ক থাকা বাঞ্ছনীয়। "The Communist Internationai must be ready to establish temporary relationship and

even alliances with bourgeois democracy of the colonies and backward classes." লেনিনের এই বক্তব্য মানবেন্দ্রনাথ পুরোপুরি মেনে নিতে পারেননি। মানবেন্দ্রনাথের বক্তব্য ছিল, ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে বুর্জোয়া শ্রেণী কোনও বৈপ্লবিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেনা। নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে তিনি দেখান যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর রণক্লান্ত সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি উপনিবেশগুলিতে আধিপত্য বজায় রাখার জন্য সেখানকার উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণীকে কিছু কিছু সুবিধা দিয়ে ওদের আনুকুল্য অর্জন করছে। ভারতবর্ষও এর ব্যতিক্রম নয়। ফলত, এই অধিবেশনে মানবেন্দ্রনাথ একটি পাল্টা থিসিস উপস্থাপিত করেন। তাঁর পরিষ্কার বক্তব্য ছিল জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়া শ্রেণীর রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিস্টদের কাজ হবে যুগপৎ গণবিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল ও সর্বপ্রকার শোষণমুক্ত এক সমাজ গঠনের জন্য প্রস্তুত হওয়া। তাঁর ভাষায় — "Two distinct movements which grow farther apart each day are to be found in the dependent countries. One is the bourgeois democratic nationalist movement with a programme of political independence under the bourgeories order. The other is the mass struggle of the poor and ignorant peasants and workers for their liberation from all forms of explaitation. তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে তিনি আরও অনুধাবন করলেন যে, এশিয়ায় ধনতান্ত্রিক উন্নয়ন ছাড়াই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব। এশিয়ায় বৈপ্লবিক সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাবার পক্ষপাতী ছিলেন মানবেন্দ্রনাথ। তাঁর মতে, এশিয়ায় বিপ্লব জয়যুক্ত না হ'লে ইউরোপেও তার বিজয়লাভ সম্ভব নয়; কারণ পরাধীন দেশগুলিতে অর্থনৈতিক শোষণের মাধ্যমে ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করে যাবে। তবে এই সমস্ত অঞ্চলে সমাজবাদী আন্দোলনের প্রকৃতি হবে স্বতন্ত্র, কারণ এখানকার বাস্তব পরিস্থিতি ও শক্তি-সম্পর্ক ভিন্ন ভিন্ন। রাশিয়া বা ইউরোপের কলাকৌশলগত প্রযুক্তি এখানে প্রযোজ্য নয়। এখান থেকেই যাবতীয় বিরোধের উৎস।

লেনিন অবশ্য রায়ের "non capitalist path of development"-এর তত্ত্ব মেনে নিলেও মানবেন্দ্রনাথের পুরো বক্তব্যের সাথে একমত হ'তে পারেননি। তবে ঔপনিবেশিক দেশ সম্পর্কে রায়ের অভিজ্ঞতা ও অখন্ডনীয় যুক্তির প্রশংসা না করে পারেননি। ফলে ঐ অধিবেশনে লেনিনের থিসিসের কিছু অংশ সংশোধিত হয় এবং অল্পবিস্তর সংশোধনের পর রায়ের থিসিসও 'Supplimentary Thesis হিসাবে গৃহীত হয়। পরবর্তীকালে এই বিতর্কের ফল হয় সুদূরপ্রসারী যার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় রুশ-চীন বিরোধে।

স্বাধীনচেতা মানবেন্দ্রনাথের সঙ্গে কমিন্টার্নের দূরত্ব ক্রমাগত বাড়তে থাকে, কারণ তাঁর মনে হয়, কমিন্টার্ন বিশ্ববিপ্লবের পরিকল্পনা থেকে সরে এসে মূলত সোভিয়েত কম্যুনিস্ট পার্টির লক্ষ্য পূরণের যন্ত্রে পরিণত হয়েছে। চীন-বিপ্লব প্রশ্নে এই বিরোধ আরও বাড়ে। কমিন্টার্নের প্রতিনিধি হিসাবে মাইকেল বোরোদিন এই সময় চীনে ছিলেন। কম্যুনিস্ট ও কুয়োমিনটাং -এর মধ্যে ঐক্যের প্রশ্নে কমিন্টার্নের নীতিকে

কার্যকর করার উদ্দেশ্যে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের নেতৃত্বে একটি দল চীনে যায়। মানবেন্দ্রনাথ চাইলেন কৃষি বিপ্লবের পথে চীন অগ্রসর হোক। অন্যদিকে বোরোদিন চাইলেন কমিউনিস্টরা কুয়োমিনটাং-এর বামপন্থী গোষ্ঠীর সঙ্গে একযোগে উত্তর চীনে পিকিং অভিযান শুরু করুক। মানবেন্দ্রনাথের অভিমত গৃহীত হ'লেও চীন বিপ্লবে সাফল্য আসেনি। কৃষি বিদ্রোহে চীনের কমিউনিস্টরা নিষ্ক্রিয় থাকে। বিপ্লব বিরোধিতার জন্য অভিযুক্ত হয় কমিউনিস্টরা। চীনে বিপ্লবের ব্যর্থতায় রায়ের সঙ্গে দূরত্ব বাড়ে কমিন্টার্নের। বামপন্থী ও জাতীয় বুর্জোয়াদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগের প্রশ্নেও লেনিনের সঙ্গে পুরোপুরি একমত হ'তে পারেননি রায়। এরপর ১৯২৭ সালে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের নিয়ে যুক্তফ্রন্ট গড়ার যে প্রস্তাব মানবেন্দ্রনাথ দেন তাও কমিন্টার্নের অনুমোদন পেল না। এরপর শ্রমিক কৃষক আন্দোলনের ক্ষেত্রে মানবেন্দ্রনাথ উগ্র পন্থা ছেড়ে মধ্য শ্রেণীর সহযোগিতার উদার আহ্বান জানান। এইভাবেই দুইয়ের মধ্যে ব্যবধান বাড়তেই থাকে। শেষ পর্য্যন্ত ১৯২৮ সালে মস্কোয় কমিন্টার্নের ষষ্ঠ কংগ্রেসে চীনের বিষয় নিয়ে মানবেন্দ্রনাথের 'decolonization theory' র তীব্র সমালোচনা করা হয়। কমিন্টার্নও তখন পূর্ব অনুসৃত নীতি থেকে সরে গিয়ে উগ্র বামপন্থী নীতি গ্রহণ করে। মানবেন্দ্রনাথ কমিন্টার্নে গৃহীত নীতিকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেনও শেষ পর্য্যন্ত বহিষ্কৃত হ'ল। বস্তুত এখানেই তাঁর কমিন্টার্ন জীবনের পরিসমাপ্তি।

৪৫.৪ মানবেন্দ্রনাথ ও ভারতীয় রাজনীতি

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকে মেক্সিকোর প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করলেও ভারতের জাতীয় সংগ্রামের প্রকৃতি ও অগ্রগতি সম্পর্কে তিনি যে কি মাত্রায় সচেতন ছিলেন তার প্রমাণ মেলে ১৯২২ সালে প্রকাশিত রায়ের লেখা 'India in Transition' গ্রন্থটিতে। শোনা যায়, এটি লেনিনের আগ্রহে ও পরামর্শেই লিখিত। এই বইটি প্রথম ভারতীয় বিপ্লবের মার্ক্সবাদী বিশ্লেষণ। বইটিতে উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণী ও যুদ্ধ বিধ্বস্ত সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তির মনোগতি সম্পর্কে এক সুন্দর তথ্য সমৃদ্ধ চিত্র তুলে ধরেন রায়। তিনি দেখান যে, ভারতীয় জনগণ একই সাথে বিদেশী প্রভু ও জাতীয় বুর্জোয়াদের প্রতিক্রিয়াশীল শোষণের শিকার এবং যুদ্ধের পর আপাত সংস্কারের মাধ্যমে বুর্জোয়া শক্তির সঙ্গে আপোস করে নিজেদের দুর্বলতাকে কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা চালাচ্ছে।

ভারতে বিপ্লবী আন্দোলন ও সংগঠনের উপযুক্ত পরিবেশ ও পরিস্থিতি না থাকায় প্রবাসে বসেই তাঁকে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের পরিকল্পনা করতে হ'ল। কয়েকজন শিক্ষিত উৎসাহী মুজাহির যুবককে সঙ্গে নিয়ে ১৯২০ সালে ১৭ই অক্টোবর তাসখন্দে থাকাকালীন ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন। পরে ১৯২২ সালে এর সদর দপ্তর বার্লিনে স্থানান্তরিত হয় এবং সেখান থেকে 'The Vanguard of Independence' নামে এক পত্রিকা সম্পাদন করেন। রায়ের প্রচেষ্টায় বোম্বাই, কলকাতা, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন শহরে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে ওঠে।

মনেপ্রাণে পুরোপুরি মার্ক্সবাদী মানবেন্দ্রনাথ গান্ধীজীর মধ্যযুগীয় দৃষ্টিভঙ্গী ও রক্ষণশীল নেতৃত্বের

সমালোচনা করেন। ১৯২১ সালে আমেদাবাদ কংগ্রেসে গৃহীত সিদ্ধান্তকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে বর্ণনা করেন। ১৯২২ সালে গয়া কংগ্রেসের আগে মস্কো থেকে সংগ্রামী আন্দোলনের এক কর্মসূচী পেশ করেন তাতে পূর্ণ স্বাধীনতা, ভূমি ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন, জমিদারী প্রথা বিলোপ, জাতীয়করণ, শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি প্রভৃতি কর্মসূচীর ডাক দেন।

১৯২৯ সালে লাহোরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার ঐতিহাসিক প্রস্তাব গ্রহণ করলে মানবেন্দ্রনাথ তাকে অভিনন্দিত করেন এবং সেই সঙ্গে এক বার্তায় বিপ্লবী কর্মপন্থা গ্রহণের জন্য আবেদন জানান। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় মানবেন্দ্রনাথ ছিলেন প্রধান অভিযুক্ত। কিন্তু সেই সময় তিনি বিদেশে থাকায় তাঁকে ধরা যায় নি। ১৯৩০ সালে তিনি গোপনে ভারতে চলে আসেন ও বিভিন্ন ছদ্মনামে ভারতের সর্বত্র ঘুরে নেহেরু, সুভাষচন্দ্র প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। উত্তর ও পশ্চিম ভারতে তিনি শ্রমিক, কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলেন। Action for Independence of India নামে একটি বৈপ্লবিক দল গঠিত হয়। ১৯৩১ সালের ২১শে জুলাই মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার জন্য মানবেন্দ্রনাথ গ্রেপ্তার হন ও ছয় বছরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। গান্ধীজীর সঙ্গে আদর্শগত বিরোধ থাকা সত্ত্বেও কারামুক্তির পর মানবেন্দ্রনাথ জাতীয় কংগ্রেসেই এক দৃঢ়চেতা সৈনিক হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৩৪ সালে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি গঠনে রায়পন্থীদের ছিল বিশিষ্ট ভূমিকা। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের লক্ষ্যে বামপন্থী ও জাতীয় বুর্জোয়াদের মধ্যে এক ধরনের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে মানবেন্দ্রনাথ কংগ্রেসকে এক বৈপ্লবিক শক্তিতে রূপান্তরিত করার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি অনুভব করেছিলেন যে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতির বিপ্লবের সাথে সাথে দরকার সাংস্কৃতিক বিপ্লব; কারণ দেশের মানুষ যতদিন যুক্তিবিমুখ, ধর্মান্ধ এবং কুসংস্কারে আচ্ছন্ন থাকবে ততদিন দেশের রাজনৈতিক পরিবর্তন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ণ সম্ভব নয়। ১৯৩৯ সালে কংগ্রেসের মধ্যেই র‍্যাডিকেল কংগ্রেস নামে একটি উপদলও গঠন করেছিলেন; সেটা কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব মোটেই সুনজরে দেখেন নি। আবার কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীরাও রায়ের বিপ্লবী কর্মপন্থার চেয়ে গান্ধীর নৈতিকপন্থায় বেশি আস্থাশীল ছিলেন কমিউনিস্টদের মধ্যেও অনেকেই তাঁকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করেন। এই পরিস্থিতিতে রায় ক্রমাগত একা হয়ে পড়েন। শেষ পর্য্যন্ত নিজের আদর্শকে বাস্তবায়িত করতে ১৯৪০ সালে কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে র‍্যাডিকাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি নামে নিজস্ব দল গড়ে তুললেন।

মার্ক্সবাদী হয়েও মার্ক্সীয় চিন্তাকে নির্বিচারে গ্রহণ না করে মানবেন্দ্রনাথ নিজের মত ও পথে পরিচালিত হয়েছিলেন। ভারতের জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের গতিপথ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি মনে করেছিলেন ভারতীয় বিপ্লব প্রথমে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব এবং পরে প্রলেতারিয়েত বিপ্লব না হয়ে দুইয়েরই সংমিশ্রণে সোস্যালিস্ট বিপ্লব হওয়াই সুবিধাজনক ও বাঞ্ছনীয়।

কোনও বিশেষ দেশ বা জাতিকে সমর্থন বা বিরোধিতা করে নয়, বিশ্বকে সর্বনাশা ফ্যাসিবাদের করাল গ্রাস থেকে মুক্ত করার জন্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সমস্ত ফ্যাসিবাদ বিরোধী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার

লিপ্ত হয়ে সাম্রাজ্যবাদও তার শক্তি হারাবে এবং তখন পরাধীন উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা অনিবার্যভাবেই আসবে। এই ব্যাপারে কমিউনিস্টরা একমত হ'লেও তিনি ভারতীয়দের সমর্থন বিশেষ পেলেন না। জনপ্রিয়তাও হারালেন।

'৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনকেও মানবেন্দ্রনাথ ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনের প্রচেষ্টাকে বাধা দেবার প্রয়াস হিসাবে নিন্দা করেন। এমনকি কংগ্রেস ও জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বকে ফ্যাসিবাদী বলতেও কুণ্ঠিত হন নি। তিনি কংগ্রেসের সুযোগ সন্ধানী, স্বার্থপর, বুর্জোয়া চরিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেন। তিনি জানান, নিরক্ষর, মূঢ়, ধর্মান্ধ দেশবাসীর আবেগ ও উন্মাদনাকে কাজে লাগিয়ে বুর্জোয়া শ্রেণী শুধু নিজেদের স্বার্থসাধনে তৎপর।

যুদ্ধ যখন মিত্রশক্তির অনুকূল হ'তে শুরু করে তখন স্বাধীনতা আসন্ন জেনে রায় স্বাধীন ভারতের আর্থিক কাঠামোর রূপরেখা কি রকম হবে তাই নিয়ে Peoples Plan নামে (১৯৪৪) এক পরিকল্পনা রচনা করেন। সেখানে গুরুত্ব পায় কৃষি উন্নয়ন, সমাজ সেবা আর আর্থিক স্বনির্ভরতা। এর একবছরের মধ্যেই উপস্থিত করেন স্বাধীন ভারতের জন্য এক সাংবিধানিক খসড়া বা Draft Constitution যেখানে স্বীকৃতি পেল মানুষের মৌলিক সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিসত্তার বিকাশ।

দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় জীবনের শেষ প্রান্তে এসে মানবেন্দ্রনাথ উপলব্ধি করলেন যে, সংসদীয় গণতন্ত্র বা সর্বহারার একনায়কত্ব কোনটিই মানুষকে নিরঙ্কুশ মুক্তির আস্বাদ দিতে পারে না। মার্ক্সবাদের বিরোধিতায় মার্ক্সীয় দর্শনকে অতিক্রম করে নিয়ে এলেন এক নতুন দর্শন, যার নাম র‍্যাডিকাল হিউম্যানিজম্ বা নব মানবতাবাদ, যার মূল মন্ত্র হ'ল যুক্তি, নৈতিকতা ও মুক্তি। রাষ্ট্রের বেদীমূলে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যকে বিসর্জন না দিয়ে তিনি ফিরিয়ে আনলেন মানবতাবাদী দৃষ্টিকে। রাষ্ট্রের বিলুপ্তিতে নয়, আস্থা প্রকাশ করলেন মানুষের কল্যাণকামী রাষ্ট্রে। তাঁর নতুন রাষ্ট্র প্রভুত্ববাদী বা জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র হবে না — থাকবে না সেখানে কোনও ব্যক্তি বা শ্রেণী বা পার্টির আধিপত্য। এই নতুন রাষ্ট্রের ভিত্তি হবে গণতন্ত্র, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, বিকেন্দ্রিত রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং সমবায়ী অর্থনৈতিক কাঠামো।

এই নবলব্ধ মানবতাবদের ভাবনাকে সামনে রেখে ১৯৪৬ সালে মানবেন্দ্রনাথ রচনা করেন Twenty Two Thesis বা বাইশ দলিল যার মাধ্যমে তিনি তুলে ধরেন পার্টি প্রথার মাধ্যমে প্রকৃত গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়, কারণ তাতে পার্টির আধিপত্য ও ক্ষমতা দখলই মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। ফলে, সমাজ ও সাধারণ মানুষের অকল্যাণ হয়; বিঘ্ন হয় মানবতাবাদী দর্শন ও রাজনীতির। তাই ১৯৪৮ সালে অনুষ্ঠিত পার্টির অধিবেশনে মানবেন্দ্রনাথ নিজেই ভেঙ্গে দেন তাঁর প্রতিষ্ঠিত র‍্যাডিকাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি। এরপর তিনি তাঁর দলহীন রাজনীতির আদর্শ দেশ ও বিদেশে প্রচারের চেষ্টা চালিয়ে যান। অবশেষে ১৯৫৪ সালে এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় মানবেন্দ্রনাথের জীবনাবসান হয়।

৪৫.৫ মার্ক্সবাদ ও মানবেন্দ্রনাথ

ভারতের জাতীয় রাজনীতির উপর মার্ক্সীয় বিশ্লেষণের সংগঠিত প্রয়োগ মানবেন্দ্রনাথ রায়ের আগে বিশেষ চোখে পড়েনি, যদিও নেহেরু, নেতাজী, জয়প্রকাশ প্রমুখ অনেকেই কম-বেশি সমাজবাদী চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এ দেশে সাম্যবাদী চিন্তার প্রসারে মানবেন্দ্রনাথের অবদান অসামান্য। এমনকি মানবেন্দ্রনাথই হ'লেন প্রথম ভারতীয় যিনি আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের প্রথম সারির নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ভারতে মার্ক্সবাদী বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ধারাটির তিনিই শ্রষ্টা। তাঁরই উদ্যোগে গঠিত হয় প্রথম ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। একটি ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে বুর্জোয়া রাজনৈতিক নেতৃত্বের বাধা ও নানা প্রতিকূলতাকে সহ্য করে কমিউনিস্ট আন্দোলনের ধারাটিকে তিনি এগিয়ে নিয়ে যান। কোনও ধর্মীয় বা নৈতিক ভাবনা নিয়ে নয় ভারতীয় সমাজ ও রাজনীতিকে পর্যবেক্ষণ করেছেন যুক্তিবাদী ও বৈজ্ঞানিক চেতনা নিয়ে। অসাধারণ বিশ্লেষণী শক্তি দিয়ে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন জাতীয় আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি, তার নেতৃত্বের বিবর্তন, ভারতীয় সমাজের শ্রেণী বিন্যাস, বিভিন্ন শ্রেণীর উত্থান, অবস্থান ও বিবর্তন। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে মানবেন্দ্রনাথ দেখান যে, আধুনিক ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী মূলত জমিদার শ্রেণীরই রূপান্তরিত রূপ এবং ব্রিটিশ শাসনের ফলশ্রুতি। তবে এদের অর্থনৈতিক অসন্তোষকেই ব্রিটিশ বিরোধী রাজনৈতিক সংগ্রামের হাতিয়ার করে গড়ে তুলতে হবে। গ্রামের শোষিত বঞ্চিত মানুষ কিভাবে একটি প্রলেতারিয়েত শ্রেণী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করছে তারও একটি চিত্র তুলে ধরেন রায়। তবে তিনি বিশ্বাস করতেন স্বরাজ এলে এইসব গরীব মেহনতি মানুষের অর্থনৈতিক স্বার্থের উন্নতি ঘটবে। তারা আগের থেকে খুশীতে থাকবে।

মানবেন্দ্রনাথ বস্তুবাদকে একটা দর্শন হিসাবে বিচার করেছেন। মার্ক্স বস্তুবাদে উৎপাদন-সম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। রায় একে আরও উন্নত ও সম্প্রসারিত করেছেন জীবনের শেষ প্রান্তে নিজস্ব অভিজ্ঞতার আলোকে। অতীন্দ্রিয় ভাববাদ সবসময়ই তাঁর কাছে পরিত্যাজ্য। মানবেন্দ্রনাথ মনে করেন, মার্ক্সবাদে মানুষের ভূমিকা ও তার চিন্তন প্রক্রিয়া উপেক্ষিত। রায় মনোজগৎকেও বস্তুর অন্তর্গত বলে মনে করেন, কারণ মানুষের আচরণ মনোবিজ্ঞানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যার ভিত্তি হ'ল শারীরবিদ্যা ও রসায়ন। চিন্তামস্তিষ্কের ক্রিয়া যা স্বাধীন গতিতে অগ্রসর হয় এবং যা পক্ষান্তরে পরিবেশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এটি ইতিহাসের জৈব প্রক্রিয়ার অন্তর্গত।

জীবনের শেষ প্রান্তে র‍্যাডিকাল হিউম্যানিজমের তত্ত্বে বিশ্বাসী মানবেন্দ্রনাথ মার্ক্সবাদকে পরিত্যাগ করেছিলেন বলে অনেকে মনে করেন। মার্ক্সবাদ কোনও স্থিতিশীল তত্ত্ব নয়। পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও নতুন অভিজ্ঞতার আলোকে তাকে নতুনভাবে ব্যবহার করাই যায়। সংস্কার ও সংশোধন মানেই বিচ্যুতি নয়; বরং বলা যেতে পারে, স্বাধীনতার পূজারী মানবেন্দ্রনাথ যত না মার্ক্সবাদের বিরোধী ছিলেন তার থেকেও

বেশি বিরোধিতা করেছেন মার্ক্সবাদী আধিপত্যবাদ, গোঁড়ামি ও বিভ্রান্তিকে। ১৯৪৭ সালেও তিনি মার্ক্সবাদকে মানবজ্ঞানের এক উচ্চমানের দর্শন হিসাবে অভিহিত করেছেন। তাঁর নবমানবতাবাদে তিনি উর্ধ্বে তুলে ধরতে চেয়েছেন স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও মানবতাবাদের পতাকাকে।

৪৫.৬ মানবেন্দ্রনাথ ও তাঁর নবমানবতাবাদ

সারাজীবন ধরে অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার পরিণতি স্বরূপ মানবেন্দ্রনাথ জীবনের শেষ পর্বে সন্ধান পেলেন এক নতুন জীবন দর্শনের, যার নাম Radical Humanism বা নবমানবতাবাদ। বিশ্বব্যাপী মানবতা, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের সংকট, সাম্যবাদী ভাবনার অপপ্রয়োগ, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার অবক্ষয় রায়কে উদ্বুদ্ধ করে মানবতাবাদী জীবনাদর্শে। এই দর্শনের মূল সূত্রগুলি হ'ল যুক্তি, নীতি ও মুক্তি। ইউরোপের রেনেসাঁ, মানবতাবাদের উজ্জ্বল ভাবনাগুলি ছিল তাঁর চিন্তাভাবনার প্রধান খোরাক। এরই প্রভাবে তিনি লাভ করলেন যুক্তিবাদ, বিচারবোধ, বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ ও নৈতিক মূল্যবোধের শিক্ষা; বুঝলেন মানুষই সব কিছুর একমাত্র পরিমাপক। স্বাধীনতার আকুতিই মানুষের অস্তিত্বের মূল কথা; আর সেই স্বাতন্ত্র্যবাদ মানুষের সৃজনশীলতাকে সম্মান করে। তিনি এই সিদ্ধান্তে আরও উপনীত হন যে, সারা বিশ্বের মানুষ একই মানবিক গুণসম্পন্ন হওয়ায় বিশ্ব সৌভ্রাতৃত্ব একটি স্বাভাবিক পরিণতি।

মানবেন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে প্রকৃতি, মানুষ এবং নৈতিকতা এক অচ্ছেদ্যবন্ধনে আবদ্ধ যার ভিত্তি হ'ল বিজ্ঞান সম্মত বস্তুবাদ। মানুষ প্রকৃতির অঙ্গ। যেহেতু প্রকৃতির গতিপথ নিয়মনির্দিষ্ট সেই কারণে মানুষের চিন্তা, অনুভূতি ইত্যাদিও নিয়মনির্দিষ্ট — উভয় ক্ষেত্রেই এক মৌলিক শৃঙ্খলা পরিলক্ষিত হয়। মানুষের নৈতিক আচরণের পিছনে তিনি কোনও অধ্যাত্মিক বা ঐশ্বরিক ব্যাখ্যা মেনে নিতে নারাজ; তিনি মনে করেন বস্তুবাদী নীতিতত্ত্বই এর উৎস আর কেবল নীতি-নির্ভর সমাজদর্শনই পারে বর্তমান সভ্যতার সংকট থেকে মানুষকে মুক্ত করতে। বস্তুত মানবেন্দ্রনাথ ভাব ও বস্তুর পারস্পরিক সম্পর্কে বিশ্বাসী।

৪৫.৭ দলহীন গণতন্ত্র

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে তাঁর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অবদান হ'ল দলীয় রাজনীতি বর্জন। নিজের অভিজ্ঞতায় তিনি দেখলেন, কি সংসদীয় গণতন্ত্র কি সমাজতন্ত্র সর্বত্রই ব্যক্তিস্বাধীনতা আজ তুচ্ছ ও গৌণ হয়ে পড়েছে। মানবেন্দ্রনাথ মনে করেন, সংসদীয় গণতন্ত্রে যে নির্বাচন হয় তার ফলে ক্ষমতার কাছে জনপ্রতিনিধিরা আত্মসমর্পণ করায় শাসনের উপর জনগণের আর কোনও নিয়ন্ত্রণ থাকে না। প্রতিনিধিদের দায়বদ্ধতা একধরনের প্রতারণা মাত্র। দলের কাছেই তাদের যাবতীয় দায়বদ্ধতা, মানুষের কাছে নয়। এর থেকেই উৎপত্তি যাবতীয় অনৈতিকতার। আর একনায়কতন্ত্র, তা সে যে ধরনেরই হোক্ না কেন গণতন্ত্রের বিকল্প হ'তে পারে না; কারণ তা' ব্যক্তিস্বাধীনতার পরিপন্থী। তাই মানবেন্দ্রনাথের আহ্বান দল ব্যবস্থার অবসানের মধ্যে দিয়ে এক সক্রিয় সচেতন স্বশাসিত নাগরিক রাজনীতি গড়ে তোলার। তিনি চেয়েছিলেন,

সাড়া দেশ জুড়ে গণ কমিটির ভিত্তির উপর গড়ে উঠবে পিরামিডাকৃতির রাষ্ট্রকাঠামো। সংসদ হবে তারই চূড়া। প্রতিটি নাগরিক দল-নিরপেক্ষ শিক্ষা ও প্রকৃত সমাজকল্যাণের চেতনা নিয়ে স্বাধীনভাবে ভোট দিয়ে গড়ে তুলবে তাদের নিজস্ব শাসনব্যবস্থা। তার ফলে রাষ্ট্রের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে জনগণের স্থায়ী কর্তৃত্ব। এইভাবে গড়ে উঠবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অনুকূল পরিবেশ। অবশ্য এক্ষেত্রে প্রশ্ন থেকেই যায় যে, এভাবেই শক্তিশালী ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা দলের প্রভাব বিস্তার ও আধিপত্য বজায় রাখার সম্ভাবনা নির্মূল হবে কি?

৪৫.৮ সারাংশ

পাণ্ডিত্য ও মননধারায়, রাজনৈতিক কর্ম ও বিপ্লবী সংগঠনে মানবেন্দ্রনাথ এক ব্যতিক্রমী চরিত্র। দেশ, কাল বা যুগের সীমানায় তিনি নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি। তাঁর মতো ব্যপক কর্মক্ষেত্র খুব কম মনীষীর জীবনেই দেখা যায়। স্বাধীনতা বা মুক্তির তীব্র আকাঙ্খা, নিয়ে কৈশোরে জাতীয়তাবাদ থেকে যৌবনে মার্ক্সবাদের মধ্যে দিয়ে অবশেষে নবমানবতাবাদে এসে তাঁর চিন্তন পরিণত রূপ লাভ করে। ভারতীয় রাজনীতিকে তিনিই প্রথম বৈজ্ঞানিক, যুক্তিবাদী ও বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিশ্লেষণ করেন। কোনও বাঁধাধরা ছকের গন্ডিতে আত্মসমর্পণ না করে এই অঞ্চলের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যাকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে (যা মূলত ইউরোপীয় ভাবধারায় প্রভাবিত) জোরের সঙ্গে উপস্থাপিত করার কৃতিত্ব তাঁর।

তবুও ভারতীয় রাজনীতিতে তিনি একজন বিতর্কিত পুরুষ। বলা হয়, চিন্তাধারার চাঞ্চল্যকর বিবর্তন সত্ত্বেও তিনি কোনও নতুন পথের সন্ধান দিতে পারেননি। তাঁর মানবতাবাদী চিন্তাধারাটি ভারতীয় ঐতিহ্যেরই অঙ্গ যা প্রকাশিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, গান্ধী, জয়প্রকাশ প্রমুখের ভাবনায়। আরও বলা হয়, মানবেন্দ্রনাথ রাজনৈতিক ও সামাজিক গতি-প্রকৃতির যতই নির্ভুল বিশ্লেষণ করে থাকুন না কেন সাংগঠনিক প্রচেষ্টায় তিনি সফল হ'তে পারেন নি। ফলে, তাঁর রাজনৈতিক জীবনে এসেছ একের পর এক ব্যর্থতা। সেই কারণে ভারতীয় রাজনীতিতে তিনি নিঃসঙ্গ নায়ক।

তবুও তাঁর চিন্তাধারার অবদানকে স্বীকৃতি দিতেই হবে। বর্তমান বিশ্বের প্রধান সংকট হ'ল মুক্তি আর মানবতার সংকট। আর সেখানে যুক্তি, নীতি ও মুক্তির আদর্শে রচিত মানবেন্দ্রনাথের, সমাজ দর্শন যে সে পথে আলো দেখাবেই সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

৪৫.৯ অনুশীলনী

১। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকে লেনিনের সঙ্গে মানবেন্দ্রনাথের বিতর্কের বিষয়টি উল্লেখ করুন।

২। ভারতীয় রাজনীতি সম্পর্কে মানবেন্দ্রনাথের ধারণাটি বিবৃত করুন।

৩। মানবেন্দ্রনাথ 'দলহীন গণতন্ত্রের' পথে কেন গেলেন ? এটির সম্ভাবনা সম্পর্কে আপনার ধারণা কি ?

৪। মানবেন্দ্রনাথের 'নব মানবতাবাদের' ধারণাটি আলোচনা করুন।

৫। মানবেন্দ্রনাথের উপর মার্ক্সবাদের প্রভাব সম্পর্কে একটি টীকা রচনা করুন।

৬। একজন সফল রাজনীতিক হিসাবে মানবেন্দ্রনাথ সম্পর্কে আপনার ধারণা কি ?

৪৫.১০ গ্রন্থপঞ্জী

১) M. N. Roy — India in Transition

২) M. N. Roy — New Humanism

৩) M. N. Roy — Politics, Power and Parties

৪) M. N. Roy — Scientific Politics

৫) M. N. Roy — Reason, Romanticism a Revolution

৬) G. P. Bhattacharya — Evolution of the Political Philosophy of M.N. Roy

৭) B. N. Dasgupta — M.N. Roy's Quest for Freedom.

৮) V. P. Verma — Modern Indian Political Thought

৯) সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় — বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা

১০) দেবাশীষ চক্রবর্তী — ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার ধারা।

একক ৪৬ ☐ জওহরলাল নেহরু (১৮৮৯-১৯৬৪)

গঠন

৪৬.০ উদ্দেশ্য
৪৬.১ প্রস্তাবনা
৪৬.২ জওহরলাল নেহরুর রাজনৈতিক জীবন
৪৬.৩ উদারনীতিবাদ ও জওহরলাল নেহরু
৪৬.৪ জওহরলাল নেহরু ও সমাজবাদ
৪৫.৪.১ সমালোচনা
৪৫.৫ অনুশীলণী
৪৫.৬ গ্রন্থপঞ্জী

৪৬.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করার পর আপনি জানতে পারবেন :

- জওহরলাল নেহরুর রাজনৈতিক জীবন প্রবাহ
- উদারনীতিবাদ সম্পর্কে জওহরলাল নেহরুর ধারণা
- সমাজবাদ সম্পর্কে জওহরলাল নেহরুর বক্তব্য

৪৬.১ প্রস্তাবনা

ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে যে ক'জন ব্যক্তিত্ব অমলিনভাবে বেঁচে থাকবেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হ'লেন জওহরলাল নেহরু (১৮৮৯-১৯৬৪)। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। গান্ধীর নেতৃত্বে যে স্বাধীনতা আন্দোলন পরাধীন ভারতে পরিচালিত হয়েছিল তার অন্যতম রূপকার ছিলেন তিনি। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের ধারায় যে উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ধারা প্রবহমান ছিল, আরও বহু বরেণ্য নেতৃবর্গের সঙ্গে এই ধারার শ্রেষ্ঠ রূপকার ছিলেন তিনি। স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসাবে এই উদারনৈতিক ভাবধারাকে সংবিধানের মাধ্যমে রূপায়িত করার চেষ্টা করেছিলেন তিনি। এরই সঙ্গে তিনি চেষ্টা করেছিলেন সমাজবাদ সম্পর্কে তাঁর ভাবনা-চিন্তার মেলবন্ধন ঘটাতে। একই সঙ্গে রাজনীতিবিদ ও দার্শনিক জওহরলাল নেহরুর প্রধান গ্রন্থসমূহ হ'ল : 'Soviet Russita : Letters from a Father to his daughter Glimpses of World History, The Discovery of India প্রভৃতি। এই এককে আমরা এই যুগপুরুষ সম্বন্ধে আলোচনা করব।

৪৬.২ জওহরলাল নেহরুর রাজনৈতিক জীবন

জওহরলাল নেহরুর জন্ম ১৪ নভেম্বর, ১৮৮৯ এলাহাবাদে। পিতা বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা মতিলাল নেহরু, মা স্বরূপরাণী। তাঁর শৈশব ও যৌবন অতিবাহিত হয়েছে পিতা-মাতার আর্থিক ঐশ্বর্য ও অগাধ স্নেহে। ধনী ইংরেজের জীবনযাত্রা ও আদবকায়দার অনুকরণে সন্তানকে গড়ে তুলতে হবে, এমনই ছিল মতিলালের ইচ্ছা। জওহর মানুষও হয়েছিলেন সেইভাবে। জীবনের প্রথম পনেরো বছর ইংরেজ গৃহশিক্ষকের কাছে শিক্ষালাভ করে তিনি চলে যান বিলেতে। প্রথমে হ্যারো স্কুল (১৯০৫-০৭), তারপর কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় (১৯০৭-১০) এবং শেষে লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স-এ (১৯১০-১২) তিনি পড়াশোনা করেছেন। লন্ডন থেকে ব্যারিস্টার হয়ে তিনি দেশে ফেরেন ১৯২২ সালে।

দেশে ফেরার পর কিছুদিন আইনব্যবসা করেছেন, কিন্তু এর চেয়ে বড় কিছু করা যায় কিনা তা নিয়ে মানসিক অস্থিরতা ছিল নিরন্তর। ১৯১৬ সালে কংগ্রেসের নক্ষৌ অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। বাল্যকাল থেকেই পিতা মতিলালের সঙ্গে রাজনৈতিক সভা-সমিতিতে তাঁর যাওয়ার অভ্যাস ছিল। ছাত্রজীবনে বিলেত প্রবাসকালে তিনি ইংল্যান্ডের র‍্যাডিকাল, প্রগতিশীল মতাদর্শ ও নেতৃবর্গের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগও পেয়েছিলেন। বার্নার্ড শ প্রমুখ মনীষীর ফেবিয়ান সমাজতন্ত্র তাঁকে তীব্রভাবে প্রভাবিত করেছিল। গান্ধীর সঙ্গে যখন তাঁর পরিচয় ঘটে তখন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে হোমরুল পর্ভ চলছে। ব্রিটিশ সরকার হোমরুলের নেত্রী অ্যানি বেশান্তকে নানাভাবে নির্যাতন এবং শেষে কারারুদ্ধ করে ১৯১৭ সালে। নেহরুর বেশান্তের ওপর ছিল অপরিসীম শ্রদ্ধা, বেশান্তের মুক্তির দাবিতে সোচ্চার হয়ে তিনি হোমরুল আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। এটাই তাঁর সক্রিয় রাজনৈতিক জীবনের শুরু বলা চলে। এসময়ে তিনি কংগ্রেসের নরমপন্থী রাজনীতির বিরোধিতা করে তিলক-বেশান্তের অনুসৃত রাজনৈতিক পন্থার পক্ষে কাজকর্ম শুরু করেন। এর কিছুদিন পরেই গান্ধীর নেতৃত্বে গড়ে ওঠে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন। জওহরলাল নিঃসঙ্কোচে গান্ধির অনুগামী হ'লেন। তাঁর নেতৃত্বের ছায়ায় নিজের সংগ্রামী জীবন গড়ে তুললেন।

১৯১৯ সালে দমনমূলক কালা-কানুন রাওলাট বিল পাশ হ'ল। গান্ধীজি সত্যাগ্রহ সভা প্রতিষ্ঠা করে এই আইনের বিরোধিতার জন্য আইন অমান্য আন্দোলনের ডাক দিলেন। সরকারের দমননীতি আরও নিষ্ঠুর হয়ে উঠল। পাঞ্জাবে ঘটল জালিয়ানওয়ালাবাগের জঘন্য হত্যাকান্ড। জওহরলাল তখন কংগ্রেস-কর্মী ছাড়াও পিতৃদেব প্রতিষ্ঠিত 'দ্য ইনডিপেন্ডেন্ট' পত্রিকার মুখ্য কর্ণধার। তীক্ষ্ণ ও তীব্র ভাষায় তিনি সরকারের সমালোচনার সঙ্গে সঙ্গে পাঞ্জাবে হত্যাকান্ড বিষয়ে জাতীয় কংগ্রেস যে অনুসন্ধান কমিটি তৈরি করেছিল তার সদস্য হিসেবে পাঞ্জাবের নানা স্থান ঘুরে সাক্ষ্য সংগ্রহ করেছিলেন। ১৯২০ সালে নেহরু এলাহাবাদ জেলা কংগ্রেসের সহ-সভাপতি নিযুক্ত হ'লেন। এরপর ধাপে ধাপে তিনি ১৯২৩-এ

সর্ব-ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সম্পাদক, ১৯২৮-এ সাধারণ সম্পাদক, ১৯২৯-এর লাহোর অধিবেশনে কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। এরপর আরও ছ'বার নেহরু কংগ্রেস-সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন — ১৯২৬-এ লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে, ১৯৩৭-এ ফৈজপুর অধিবেশনে, ১৯৪৬-এ আবুল কালাম আমাদের স্থলে, ১৯৫১-তে দিল্লি অধিবেশনে, ১৯৫৩-তে হায়দ্রাবাদে এবং ১৯৫৪-তে কল্যাণী অধিবেশনে। জওহরলালের আগে জাতীয় কংগ্রেসের সংগঠনিক কাজকর্মের ক্ষেত্রে তেমন কোনও শৃঙ্খলা ছিল না। খানিকটা এলেমেলো ও সাময়িক প্রয়োজন ভিত্তিক ছিল কাজকর্মের ধরন। জওহরলাল সাংগঠনিক কাজে শৃঙ্খলা আনেন এবং দলের হিসাবপত্র সঠিক পদ্ধতিতে রাখার ব্যবস্থাদি করেছিলেন। এর পাশাপাশি রাজনৈতিক গণসংগঠণ গড়ে তোলার প্রাথমিক অভিজ্ঞতা তাঁর শুরু হয় ১৯১৯-২১ এই দু'বছর উত্তরপ্রদেশের কৃষকদের দাবি নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার সময়। এই সময়ে অসহযোগ আন্দোলনেও তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েন। কারাবাসের অভিজ্ঞতাও শুরু হয়। ১৯২১ সালে প্রথম কারারুদ্ধ হন। পরবর্তী জীবনে মোট ন'বারে সবশুদ্ধ প্রায় নয় বছর তিনি জেলবন্দী ছিলেন।

মহাত্মা গান্ধীর প্রতি অনুগত থেকে নেহরু জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন। উদার নৈতিক জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতার মতাদর্শে তাঁর বিশ্বাস ছিল। স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় যুদ্ধরত সংগ্রামী মানুষের পক্ষে নেহরুর সমর্থন ছিল আকৃত্রিম। ফ্যাসিবাদ ও নাৎসিবাদের বিপক্ষে ভারতীয় প্রগতিশীলদের জেহাদকেও তিনি সংগঠিত করেছেন সুচারুভাবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুর হবার পর পোলান্ডে নাতসি আক্রমণের নিন্দার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিকে দিয়ে এই সিদ্ধান্তও নিতে বাধ্য করেছিলেন যে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ব্যতিরেকে ইংরেজদের যুদ্ধে সমর্থন করার কোনও প্রশ্ন ওঠে না।

ইংল্যান্ডের বহু প্রগতিশীল, সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিস্ট নেতা ও চিন্তাবিদদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল নেহরুর। রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের চিন্তাভাবনা ও কর্মোদ্যমগুলি সম্পর্কেও তাঁর উৎসাহ ও আগ্রহ ছিল অপরিসীম। ১৯৩৯ সালে জাতীয় কংগ্রেস ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটি গঠন করে। স্বাধীন ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য কী কী কার্যক্রম এবং কোন্ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করবে কংগ্রেস দল — সেসব বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করা ছিল এই কমিটির উদ্দেশ্য। নেহরু এই কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েছিলেন। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে নেহরু যে দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন, তা' ছিল সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের। সোবিয়েত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অনুকরণে তিনি চেয়েছিলেন এমন এক রাষ্ট্রায়ত্ত অর্থনীতি নির্মাণ করতে যেখানে ব্যক্তিগত বেসরকারি পুঁজির সঞ্চারণ থাকলেও তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে সরকার; তাছাড়া সরকারি কর্তৃত্বে তৈরি হবে এক ব্যাপক রাষ্ট্রায়ত্ত উৎপাদন ব্যবস্থা। বস্তুত, স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী নেহরুর চিন্তানুযায়ী কংগ্রেস দল এরকমই এক পরিকল্পনাধীন অর্থনীতির ভিত নির্মাণ করেছিলেন ব্যাপক ও দ্রুত শিল্পায়নের পথ গ্রহণ করতে, কারণ শিল্পায়নের গতির বিস্তার ঘটাতে না পারলে দেশের গরিবী দশা

ঘোচানোর অন্য উপায় তাঁর কাছে ছিল না। এই সূত্রেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, গান্ধীজির অর্থনৈতিক চিন্তার সঙ্গে জওহরলালের চিন্তার এক দুস্তর ও মৌলিক পার্থক্য দেখা দিয়েছিল। গান্ধীজির দৃষ্টিতে ভারতবর্ষের মতো সনাতন কৃষিপ্রধান দেশে ভারী শিল্পের প্রয়োজন সীমিত। কৃষির উন্নয়ন, সমবায়মূলক চাষবাস, অপরিগ্রহের আদর্শে উদ্বুদ্ধ শোষণহীন কৃষি-উৎপাদন কাঠামোতেই ভারতীয় মানুষের মুক্তির কথা চিন্তা করতে হবে; পশ্চিমী ব্যাপক শিল্পায়নের পথ ভারতের পথ নয়। কৃষির সাথে সাথে স্বয়ংসম্পূর্ণতার জন্য তৈরি করতে হবে অবশ্যই গ্রামীণ কুটির শিল্প, হস্তশিল্প কিংবা অ্যাগ্রো-ইন্ডাস্ট্রির প্রয়োজনে আধুনিক কিছু কিছু শিল্প। কিন্তু পশ্চিমের অনুকরণে শিল্পায়নের মাধ্যমে আধুনিকতার ধারা গান্ধী অনুমোদন করেন নি। নেহরুর অর্থনৈতিক চিন্তা যে সম্পূর্ণ উল্টো পথেই চলছিল তা বহু ক্ষেত্রেই প্রকাশ পেয়েছিল। এখানে ১৯৩৬ সালের এপ্রিলে লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে তাঁর সভাপতির ভাষণ থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যাক; 'কংগ্রেসের বর্তমান মতাদর্শের সঙ্গে সমাজবাদ কি খাপ খায়? আমরা মনে করি না খাপ খায়। দেশের দ্রুত শিল্পায়নে আমি বিশ্বাসী, আমার মতে একমাত্র সে পথেই জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান ভালভাবে উন্নত হ'তে পারে এবং দূর হ'তে পারে দারিদ্র্য। তবুও অতীতে আমি সর্বান্তঃকরণে খাদি কর্মনীতির সঙ্গে সহযোগিতা করেছি এবং আশা রাখি ভবিষ্যতেও করব কারণ আমি মনে করি খাদি ও পল্লীশিল্পের একটা নির্দিষ্ট স্থান আছে আমাদের এখনকার অর্থনীতিতে। .... কিন্তু ওইগুলিকে আমি দেখি আমাদের জীবন্ত সমস্যাগুলির সমাধান হিসাবে নয়, মধ্যবর্তী স্তরের সাময়িক পদ্ধতি হিসাবেই।' (ভাষণের এই অনুবাদ নেওয়া হয়েছে 'মুক্তির সংগ্রামে ভারত : আলেখ্য গ্রন্থ' থেকে)।

১৯৪৭ সালে ক্ষমতা হস্তান্তরের পর দেশে-বিদেশে নানা ঘটনার আবর্তে থেকে জওহরলাল দেশকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। যুদ্ধ দেশভাগ, মর্মান্তিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ইত্যাদির ফলে জনজীবন বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিল। ওদিকে কাশ্মীর, হায়দ্রাবাদ ইত্যাদি সামন্ত রাজ্যগুলির ভারতভুক্তির প্রশ্নে ক্রমাগত রাজনৈতিক জটিলতা বৃদ্ধি, উপজাতীয় সমস্যাগুলির বিদ্রোহ, গান্ধী হত্যা, সাম্প্রদায়িকতার বিস্তার ইত্যাদি আরও হাজারো সমস্যা স্বাধীন ভারতের সরকারি প্রশাসনকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল। পাশাপাশি ছিল দীর্ঘকালব্যাপী ঔপনিবেশিক লাঞ্ছনা জর্জরিত অর্থনীতির পুনর্গঠনের সমস্যা। আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে ক্রম-প্রসারমান ঠান্ডা যুদ্ধের আবহাওয়াও ছিল ভারতের প্রগতির পক্ষে এক বড় প্রতিবন্ধক। এসবের মোকাবিলা করতে করতেই দীর্ঘ সতেরো বছর নেহরুর প্রধানমন্ত্রীত্বের কাল শেষ হয়েছে। দেশীয় ক্ষেত্রে নেহরুর সময়কালে জমিদারি উচ্ছেদ আইন পাশ হয়েছে, সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে মুখ্য বিষয় করে তুলে ধরা হয়েছে এবং এক মিশ্র অর্থনীতির বুনিয়াদ তৈরি হয়েছে। ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠন, অস্পৃশ্যতাবিরোধী আইন, ভরী দেশীয় শিল্পের বেশ কিছুর জাতীয়করণ ইত্যাদিও উল্লেখযোগ্য। ১৯৫০ সালে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পুনর্গঠনের জন্য পরিকল্পনা কমিশন স্থাপনও নেহরুর চিন্তাপ্রসূত। বিদেশনীতির ক্ষেত্রে স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়েছিলেন দু'টি বিশেষ বিষয়ের প্রতি —

জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনে সহায়তা করা। মার্কিন-রুশ শিবিরের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে সমগ্র বিশ্ব জুড়ে যে অস্থিরতা তৈরি হয়েছিল পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে, সেসব যুদ্ধ-পরিস্থিতি আর্ন্তজাতিক শান্তি ও নিরপত্তাকে বারবার বিঘ্নিত করে তুলেছিল, নেহরুর নেতৃত্বে তৃতীয় বিশ্বের সদ্য-স্বাধীন দেশগুলি তারই মোকাবিলায় গড়ে তুলেছিল জোট নিরপেক্ষতার স্লোগান। বিশ্বের শান্তিবাদী আন্দোলনেরও অন্যতম নেতা ছিলেন তিনি। আণবিক অস্ত্রের উৎপাদন ও প্রসারের বিরুদ্ধে তাঁর নিরন্তর অভিযান বিশ্বের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। এতদ্‌সত্ত্বেও মৃত্যুর দু'বছর আগে ১৯৬২ সালে চিন-ভারত সীমান্ত যুদ্ধ তাঁকে বিহ্বল করেছিল এবং কাশ্মীর ও সাম্প্রদায়িক সমস্যার পটভূমিতে পাক-ভারত সম্পর্কের ক্রমাবনতিও তাঁর উদ্বেগ বাড়িয়ে তুলেছিল। ১৯৬৪ সালে জওহরলাল নেহরুর জীবনাবসান ঘটে।

৪৬.৩ উদারনীতিবাদ ও জওহরলাল নেহরু

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের ধারায় মূল যে-স্রোতটি বহমান ছিল, তা হ'ল উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ধারা। আরও বহু বরেণ্য নেতৃবর্গের সঙ্গে এই ধারার অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপকার ছিলেন জওহরলাল নেহরু। একথা কেবল স্বাধীনতা-প্রাপ্তির কাল পর্যন্ত প্রযোজ্য, তা কিন্তু নয়। স্বাধীনতার পর নব-ভারতের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোকেও গড়ে তুলেছিলেন নেহরু।

নেহরুর জাতীয়তাবাদের স্বরূপ কী — এই প্রশ্ন যদি উত্থাপন করা যায়, তাহলে বিষয়টিকে ঐতিহাসিক পটভূমিতে বিশ্লেষণ করতে হবে। মূলত বিংশ শতাব্দীতে এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদের উদ্ভব; কিছুটা সরল করে একথা বলা যায়। জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক বিকাশ ঘটেছিল প্রথমে ইংল্যান্ডে সপ্তদশ শতকে। স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণসার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যই অল্পে অল্পে জাতীয়তাবাদ তৈরি হ'তে শুরু করেছিল। ফরাসী দেশের সামন্ততান্ত্রিক স্বৈরাচারী রাজার শাসনের বিরুদ্ধে ফরাসী বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল। ফরাসী বিপ্লবেও জাতীয়তাবাদের বিচ্ছুরণ দেখা গেছে। আমেরিকাতে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেনের বিরুদ্ধে আমেরিকার স্বাধীনতা আন্দোলন মার্কিন জাতীয়তাবাদ সৃষ্টি করেছে। এই সবকটি দেশেই পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার বিকাশের সূত্রে উদারনীতিবাদ ও জাতীয়তাবাদী মনোভাব গড়ে উঠেছে, স্পষ্ট করেই সেকথা বলা যায়। ইটালি, জার্মানি, জাপান ইত্যাদি দেশগুলিতেও আধুনিক জীবনধারা প্রতিষ্ঠা পেয়েছে জাতীয়তাবাদী মতাদর্শের হাত ধরে। অতএব, ইউরোপ-আমেরিকায় সপ্তদশ শতক থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত সর্বপ্রধান ও সর্বশক্তিমান মতাদর্শ হ'ল জাতীয়তাবাদ এবং ওই মতাদর্শের অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল বিকাশমান পুঁজিবাদী উৎপাদন-ব্যবস্থা। সমাজের নতুন প্রগতিশীল উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত শ্রেণী জাতীয়তাবাদের মোড়কে তাঁদের অপ্রতিহত রাজনৈতিক-সামাজিক ক্ষমতা গড়ে তুলেছে।

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে যখন জাতীয়তাবাদ প্রধান শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল,

বিশেষত শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে নেহরু যখন আন্দোলনের হাল ধরলেন, তখন বিশ্বের ইতিহাসে এক চমকপ্রদ ঘটনা ঘটে গেছে— রুশদেশের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। সামন্ততন্ত্র ও পুঁজিবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সর্বকালের শোষিত সর্বহারা শ্রেণীর জাগরণ ঘটে গেছে। রুশ সমাজতন্ত্রে মতাদর্শ বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের প্রতিস্পর্ধী শক্তি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে চাইছে। এহেন এক পটভূমিতে আধুনিক বিলাতি শিক্ষায় শিক্ষিত এ বিশ্ব-ইতিহাস-সচেতন জওহরলাল ভারতের জাতীয় সংগ্রামে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। উপরন্তু, তিনি এসেছিলেন গান্ধীর হাত ধরে। গান্ধী এই সময়কাল থেকেই ভারতীয় জাতীয় সংগ্রামের গণভিত্তি রচনার কাজে মগ্ন ছিলেন। এতদিন কংগ্রেসের আন্দোলন ছিল শিক্ষিত, উচ্চবর্গ ও খানিকটা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর করতলগত। গান্ধী কৃষক-শ্রমিক-কারিগ শ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গে জাতীয়তার সংগ্রাম বা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের যোগসাধনে সচেষ্ট হ'লেন। কংগ্রেসের আন্দোলন এক নতুন চরিত্র ধারণ করল। নেহরু এরকম এক পর্বে তাঁর জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সমাজতান্ত্রিক — এই ঘোষণা করলেন। ঘোষণা সত্ত্বেও তাঁর জাতীয়তাবাদ কতখানি সমাজতান্ত্রিক হয়ে উঠতে পেরেছিল, তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। কারণ, এই শতকের বিশ-তিরিশ-চল্লিশের দশকে জাতীয় কংগ্রেস ছিল এক বিস্তৃত পরিসরের মঞ্চ — নানা ধারার আন্দোলন, নানা মতাদর্শের মানুষ এসে জড়ো হয়েছিলেন এই মঞ্চে। বিপ্লবী জাতীয়তাবাদ, (যাকে ইংরেজ শাসকরা বলতেন সন্ত্রাসবাদ) রক্ষণশীল জাতীয়তাবাদ, গান্ধীবাদ, সমাজতান্ত্রিক মনোভাব, কট্টর হিন্দু জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি নানা স্রোতের সম্মেলন কংগ্রেস। নেহরু সমাজতন্ত্রের পক্ষপাতী অথচ তিনি কংগ্রেসের অভ্যন্তরে ১৯৩৪ সালে যে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল তৈরি হয়, তার সম্পর্কে সংবেদনশীল হ'লেও তিনি তাতে যোগ দেন না। এই কালে সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ও তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের নেতৃত্ব স্বীকার করে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিও তৈরি হয়ে গেছে। নেহরু মার্ক্সবাদ বিষয়ে আগ্রহী, অনেক বিষয়ে তিনি মার্ক্সপন্থী, এমনকি রুশ সমাজতন্ত্রের পরীক্ষানিরীক্ষা সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত, অথচ তিনি ভারতের কমিউনিস্ট দলের সঙ্গে দূরত্ব রেখে চলেন। অন্যদিকে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে বিত্তবান ভূস্বামী, ব্যবসায়ী, শিল্পপতিদের স্বার্থের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর সংঘাত ঘটে কিন্তু সহাবস্থান মেনে নেন তিনি শেষ পর্যন্ত। তিনি গান্ধীজির প্রতি তীব্রভাবে অনুরক্ত, তাঁর নেতৃত্বের প্রতি অন্ধ আনুগত্য পোষণ করেন, অথচ গান্ধীদর্শনের সঙ্গে তাঁর মৌলিক পার্থক্যের কথা তিনি নিজেই বারবার ব্যক্ত করেন। এই অদ্ভুত স্ববিরোধের মধ্যে যেটা লক্ষ্যণীয় তা হ'ল এই যে, জওহরলাল বৌদ্ধিক দিক থেকে সমাজতান্ত্রিক চিন্তার শরিক হ'লেও বিচিত্র শক্তির আধার কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী নেতার ভূমিকা পালন করেছেন। কট্টর হিন্দু জাতীয়তাবাদের সঙ্গে যেমন লড়াই করতে হয়েছে, অন্যদিকে মুসলিম লীগের সঙ্গেও যুঝতে হয়েছে। উচ্চবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকারী দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসি নেতাদের সঙ্গে লড়তেও হয়েছে; আবার আপসও করতে হয়েছে পদে পদে। পুরোপুরি সমাজতান্ত্রিকের ভূমিকায় থাকলে এই আপস তাঁর পক্ষে সম্ভব হ'ত না। এই দিক থেকে বিচার করে বলা যায় যে, জওহরলাল ছিলেন কংগ্রেসের বিভিন্ন ধারার মধ্যে সমন্বয়কারী উদারনীতিবাদী।

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে নবভারতের রূপকার জওহরলাল নেহরু। স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে তাঁর নেতৃত্ব ছিল অবিসংবাদী। পাশ্চাত্যের উদারনৈতিক মানবতাবাদ ও আধুনিক সংসদীয় গণতন্ত্রের ধাঁচে গড়ে উঠেছে এই সংবিধান। গণসার্বভৌমত্ব, সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার, বহুদলব্যবস্থা, ব্যক্তিস্বাধীনতা, মৌলিক অধিকার, ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয় রাষ্ট্র, রাজতন্ত্রের বদলে প্রজাতন্ত্র, স্বাধীন নিরপেক্ষ আদালতের গুরুত্ব ইত্যাদি আধুনিক উদারনৈতিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয়েছে এই সংবিধানের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত। বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ ছিলেন সংবিধান রচয়িতা। গণপরিষদের সভাপতি এবং সংবিধানের খসড়া কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন ড. আম্বেদকার। এছাড়া ছিলেন বহু জাতীয়তাবাদী প্রখ্যাত আইন বিশেষজ্ঞ পন্ডিত ব্যক্তি ও রাজনীতিবিদরা। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই তৈরি হয়েছে ভারতীয় সংবিধান; কিন্তু গণ-পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিনিধিত্বকারী কংগ্রেস দলের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক নেতাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান ব্যক্তি ছিলেন পন্ডিত নেহরু। তাঁর উদারনৈতিক চেতনা, মানবতাবাদী দর্শন, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার প্রত্যয় এবং সর্বোপরি সমাজতান্ত্রিকতার স্বপ্ন সংবিধানের নানা ধারায় মূর্ত হয়ে উঠেছে।

রাজনীতির সঙ্গে ধর্মচেতনা মিশিয়ে ফেলার সর্বপ্রকার চেষ্টার বিরুদ্ধে ছিলেন জওহরলাল। বিজ্ঞাননিষ্ঠ বস্তুবাদী নেহরু মনে করতেন যে, ধর্ম ও রাজনীতির মেলবন্ধনে মধ্যযুগীয় মূল্যবোধগুলি তৈরি হয়। আধুনিক শিল্পসমৃদ্ধ মনুষ্য সভ্যতায় সেই মূল্যবোধের জাতীয়তাবোধ সম্পূর্ণ বেমানান শুধু নয়, চরম অনিষ্টকারী। নেহরু তাঁর রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ধর্মীয় চেতনাসম্ভূত দ্বিজাতিতত্ত্ব ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরুদ্ধে নিরন্তর লড়াই করেছেন। ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ধর্মনিরপেক্ষ করে তোলার জন্য তাঁর লড়াই যুগান্তকারী। কেবল ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা নয়, ভারতে জাতপাতের সমস্যা, জাতিভেদপ্রথা ভিত্তিক সাম্প্রদায়িক কলহও অতি প্রাচীন। নেহরু এবং এ-বিষয়ে আরেক সংগ্রামী পুরুষ আম্বেদকার জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র লড়াই করেছেন; সংবিধানে সেই লড়াইয়ের বেশ কিছু সাক্ষ্য রয়েছে।

গণতন্ত্র মানে বিচিত্র মতের সমাহার, বৈচিত্রের মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা। এর জন্য গণতন্ত্রের সর্বপ্রধান শর্ত হ'ল বাক্‌স্বাধীনতা ও মুদ্রণ যন্ত্রের স্বাধীনতাকে। পার্লামেন্টে বিরোধী দলগুলিকে যথাযথ সম্মান দেওয়া এবং জাতীয় সংকট মোচনে তাদের সাহায্য গ্রহণ করাও গণতন্ত্রের আদর্শ। পন্ডিত নেহরু তাঁর সতেরো বছর প্রধানমন্ত্রীত্বের কালে এই শর্তগুলি বিষয়ে যথেষ্ট সাবধানী ও শ্রদ্ধাবান ছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে এক বলিষ্ঠ সংসদীয় গণতন্ত্রের সোপান রচিত হচ্ছিল, একথা বলা হয়।

কিন্তু প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক পরিকাঠামো গড়ে না উঠলে উদারনৈতিক রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক কাঠামো তৈরি হ'তে পারে না। নেহরুর অর্থনৈতিক চিন্তা-ভাবনার সামান্য বিশ্লেষণ এক্ষেত্রে জরুরি। নেহরুর মূল ঝোঁক সমাজতন্ত্রের দিকে থাকলেও তিনি স্বাধীন ভারতে মিশ্র অর্থনীতির বনিয়াদ তৈরি

করেছিলেন। অর্থাৎ, রাষ্ট্রের নেতৃত্বে শিল্প-বাণিজ্য গঠনে তাঁর উৎসাহ যেমন প্রবল ছিল; তেমনি পাশাপাশি বেসরকারি পুঁজির ক্রমবর্ধমান সঞ্চরণেও তিনি বাধা দেননি। রাষ্ট্রায়ত্ত উৎপাদনের ক্ষেত্রেটিকে মজবুত করার জন্য তাঁর উদ্যোগেই কিছু ভারীশিল্পের জাতীয়করণ ঘটেছিল। ইস্পাত শিল্প, কয়লা শিল্প, বিদ্যুৎ, জীবনবীমা, রেলপথ ইত্যাদির জাতীয়করণ স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পরপরই ঘটেছে। বেসরকারি পুঁজির সঞ্চরণও যাতে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে থাকে তার ব্যবস্থাও নেহরুর অর্থনৈতিক কাঠামোর এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। অন্যদিকে, জমিদারি ব্যবস্থার বিলোপ, সামন্ত রাজন্যবর্গের রাজ্যলোপ, ভূসম্পত্তির ওপর সিলিং প্রথা ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। সব মিলিয়ে নেহরু যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটি গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন তাকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার লক্ষণযুক্ত উদারনৈতিক কাঠামো বলা সঙ্গত হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, নেহরু ভারতে এই ধরনের অর্থনীতি গড়ে তোলার জন্য সোবিয়েত প্রবর্তিত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার নীতি গ্রহণ করেছিলেন এবং ১৯৫০ সালে প্রতিষ্ঠিত পরিকল্পনা কমিশনকে ভারতের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের সর্বোচ্চ সংস্থা হিসাবে ক্ষমতা দিয়েছিলেন। ফলে পরিকল্পিত এক অর্থনীতির মাধ্যমে তিনি ভারতকে একদিকে দ্রুত শিল্পায়নের পথে নিয়ে গেলেন এবং মিশ্র অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করে উদারনৈতিক গণতন্ত্রের বনিয়াদ তৈরি করে গেছেন।

পণ্ডিত নেহরুর বিদেশ নীতিও তাঁর গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের আরেক বিশিষ্ট প্রকাশ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ঠাণ্ডা যুদ্ধের পরিবেশে আন্তর্জাতিক শান্তি আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা ঐতিহাসিক। এশিয়া-আফ্রিকার অনুন্নত ও উন্নতিশীল দেশগুলিকে তিনি উদ্বুদ্ধ করেছিলেন দ্বিমেরুবিভক্ত আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এক জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন গড়ে তুলতে। মূলত তাঁর চেষ্টা ও পরিকল্পনামত এই জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন গড়ে উঠেছিল এবং সেই আন্দোলন আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়ে ছিল। জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল বহুমুখী। পশ্চিমী পুঁজিবাদী দেশগুলির বিশ্বজোড়া সাম্রাজ্যবাদী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে এক বলিষ্ঠ প্রতিবাদ রচনা করা, উন্নতিশীল তৃতীয় বিশ্বভুক্ত দেশগুলির অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা তৈরি করা ইত্যাদি ছিল জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রধান কর্মসূচি। এসব কর্মসূচির মাধ্যমে পণ্ডিত নেহরুর যুদ্ধবিরোধী শান্তিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার বলিষ্ঠ মনোভাব এবং অপেক্ষাকৃতভাবে পিছিয়ে থাকা দেশগুলির আত্মমর্যাদা স্থাপনের গণতান্ত্রিক চেতনা পরিস্ফুট হয়েছে।

৪৬.৪ জওহরলাল নেহরু ও সমাজতন্ত্রবাদ

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, রাজনৈতিক জীবনের প্রায় শুরু থেকেই নেহরুর ঝোঁক ছিল অতি প্রবল। ১৯২৩-৩০ সালে লাহোর কংগ্রেসের সভাপতির অভিভাষণে জওহরলাল বলেছিলেন, পৃথিবীব্যাপী সমাজের সমগ্র কাঠামোর ভিতর সমাজবাদের দর্শন ক্রমশ পরিব্যাপ্ত হয়েছে এবং প্রায় একমাত্র বিতর্কিত

প্রশ্ন হচ্ছে এই দর্শন কত দ্রুত ও কী পন্থায় রূপায়িত হবে। ভারতকেও সেই পথে যেতে হবে যদি সে তার দারিদ্র্য ও অসাম্য দূর করতে চায়, যদিও সে তার নিজস্ব পন্থা বের করতে ও নিজস্ব জাতিগত প্রতিভা অনুসারে আদর্শকে গ্রহণ করতে পারে।' এই বক্তব্যই আরও জোরদার রূপে ব্যক্ত হয়েছিল ১৯৩৬ সালে লক্ষ্ণৌ ও ফৈজপুরের কংগ্রেসগুলিতে। প্রসঙ্গত মনে রাখতে হবে যে, ছাত্রজীবন থেকেই নেহরু মার্ক্সবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। ইংল্যান্ডের ফেবিয়ান সমাজতন্ত্রী ও গণতান্ত্রিক সমাজবাদীদের সঙ্গেও তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটেছিল। সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্রেও তাঁর প্রত্যক্ষত পরিচয় ঘটেছিল এবং সেখানকার পরিকল্পিত সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা স্বচক্ষে দেখে এসেছেন। মার্ক্সবাদী সমাজতন্ত্র সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ এর ফলে আরও বেড়ে গিয়েছিল। যদিও মার্ক্সবাদের সবকটি মৌল প্রত্যয়ের সঙ্গে তাঁর মতের মিল ছিল না। তিনি শ্রেণীযুদ্ধ ও হিংসায় বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেন নি। তিনি অনুসরণ করেছিলেন গণতান্ত্রিক সমাজবাদের শান্তিপূর্ণ আইনগত ধারায় সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন। এমনকি মার্ক্সবাদী দর্শনের মৌলিক ভিত্তি দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দর্শন সম্পর্কেও তাঁর দ্বিধা 'দ্য ডিসকভারি অব ইন্ডিয়া', নামক গ্রন্থে নেহরু স্পষ্ট করেই ব্যক্ত করেছেন — 'মার্ক্সবাদ আমাকে সম্পূর্ণ তুষ্ঠ করতে পারেনি অথবা আমার মনে যেসব প্রশ্ন উদয় হয় তার সবগুলির উত্তরও দিতে পারে না এবং প্রায় অজ্ঞাতসারে আমার মনে একটা অস্পষ্ট ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গি উঁকি দেয় যা অনেকটা বেদান্তের দৃষ্টিভঙ্গির কাছাকাছি। এটা মন ও বস্তুর পার্থক্য নয় বরং এমন একটা কিছু যা মনেরও বাইরে রয়েছে।'

সোবিয়েত দেশের শিল্পায়নের দ্রুতগতি, সমবায় প্রথায় কৃষি উৎপাদন, পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে অর্থনীতি ও সামাজিক ব্যবস্থার মৌলিক রূপান্তরের অভাবনীয় পরীক্ষা নেহরুকে মুগ্ধ করেছিল ঠিকই, কিন্তু তারই পাশাপাশি মার্ক্সবাদী পন্থায় সমষ্টিগত কর্তৃত্ব বা সরকারি কর্তৃত্বের যে চরম শৃঙ্খলা ও ক্ষমতা ব্যক্তির ওপর চাপিয়ে দেওয়ার নীতি, তা নেহরু মেনে নিতে পারেন নি। 'দ্য ডিসকভারি অব ইন্ডিয়া' - তেই তিনি লিখেছিলেন, 'আমি অতিমাত্রায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী এবং আমি কঠোর শৃঙ্খলার (Regimentation) চাইতে ব্যক্তির স্বাধীনতায় বিশ্বাসী'। এইসব কিছু থেকেই স্পষ্টত দেখা যাচ্ছে যে, নেহরু মার্ক্সবাদ থেকে প্রেরণা পেয়েছেন ঠিক কথা; কিন্তু তিনি মার্ক্সবাদী নন; বরং তাঁর বিভিন্ন রচনা, বিবৃতি, বক্তৃতা এবং কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, তিনি বিশ শতকের মধ্যভাগে ইংল্যান্ডের লেবার পার্টির কার্যক্রম ও তাঁদের দর্শন গণতান্ত্রিক সমাজবাদকে আশ্রয় করেই ভারতীয় সমাজের রূপান্তর ঘটাতে চান।

নেহরুর সমাজতান্ত্রিক চিন্তাভাবনা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির সভাপতি আচার্য নরেন্দ্র দেব বলেছিলেন, 'নেহরুর সমাজদর্শন সম্পর্কে আমাকে যদি এক কথায় উত্তর দিতে হয়, তাহলে আমি বলব যে, তাঁর দর্শন হ'ল গণতান্ত্রিক সমাজবাদ'। নেহরু ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামের পর্বে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মধ্যে সমাজতন্ত্রের দর্শন ঢোকাবার প্রাণপন চেষ্টা করেছেন; সর্বত্রই যে জয়ী হয়েছেন তা বলা না গেলেও একটা সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার আবহ তৈরি করতে পেরেছিলেন এটুকু বলা যায়। উদারনৈতিক গণতন্ত্র সমাজতান্ত্রিক পথে না গেলে যে প্রকৃষ্ট গণতান্ত্রিক সমাজ গড়ে উঠতে পারে

না — একথা খানিকটা প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। স্বাধীনতা-উত্তর যুগে নেহরু যে-উন্নয়ন প্রকল্পগুলি রচনা করেছিলেন ভারতীয় সমাজের পুনর্গঠনের জন্য সেগুলি ছিল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভিত্তিতে দ্রুত শিল্পায়ন, পরিকল্পনাভিত্তিক রাষ্ট্রায়ত্ত উৎপাদন ও বাণিজ্যের ক্ষেত্র (Public Sector) বিস্তৃত করে তোলা, সংসদীয় গণতন্ত্রের স্বচ্ছন্দ বিকাশ করা, নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ও সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা করা, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থার মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সমস্যার নিরসন করা এবং ভারতীয় ভূমিব্যবস্থার সার্বিক সংস্কারের দিকে এগিয়ে যাওয়া ইত্যাদি।

এই প্রকল্পগুলি রূপায়ণ করতে গিয়ে জওহরলালকে বিস্তর সমস্যার মুখোমুখি হ'তে হয়েছে। বিশেষত শাসক কংগ্রেস দলের মধ্যেই ছিল রক্ষণশীল দক্ষিণপন্থী নেতৃবর্গের নিরবচ্ছিন্ন বাধা। নেহরুকে সবসময়েই দলীয় ঐকমত্যের জন্য মাঝামাঝি রাস্তা নিতে হয়েছে, গ্রহণ করতে হয়েছে সমঝোতার পথ। ভারতীয় সমাজবিকাশের জন্য এই পথকে পুরোপুরি পুঁজিবাদী পথ বা পুরোপুরি সমাজতান্ত্রিক পথ — কোনটিই বলা যাবে না। সে-পথ ছিল গণতান্ত্রিক সমাজবাদের মতো এক উদারনৈতিক মধ্যপন্থা।

উন্নয়ন বিষয়ে নেহরুর দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মসূচি বিশ্লেষণ করে সূত্রাকারে নিম্নোক্ত বিষয়গুলির কথা বলা যায়। ১) দেশের সম্পদ বৃদ্ধির জন্য কৃষি ও শিল্পের ক্ষেত্রে নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন ব্যাপক ভূমি সংস্কার। স্বাধীনতার পরেই তাই জমিদারি ব্যবস্থা অবলুপ্ত করা হয়েছিল বিশেষ আইন প্রণয়ন করে। ভূসম্পত্তির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। আর শিল্পের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্যে বৃহদায়তন শিল্প নির্মাণে গতিবেগ তীব্র করা হ'ল রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে। বেশ কয়েকটি ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠা করা হ'ল বিদেশী রাষ্ট্রের সহায়তা নিয়ে। জাতীয় করণ করা হ'ল রেল, কয়লা, বীমা জাতীয় বেশ কয়েকটি শিল্প সংস্থা। ২) উৎপাদনের বিষয়ে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের ক্ষেত্র ও এক্তিয়ার বিস্তৃত করা হল বটে, কিন্তু বেসরকারি, ব্যক্তিগত মালিকানাধীন বিনিয়োগের ক্ষেত্রকেও টিকিয়ে রাখা হ'ল। তৈরি হ'ল মিশ্র অর্থনীতির বনিয়াদ। নেহরু বলেছিলেন, এই মিশ্র অর্থনীতি তৈরি করতে হবে এক মিশ্র মতাদর্শের ভিত্তিতে। এমনকি কিছু কিছু ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ও ব্যক্তি মালিকানার যৌথ উদ্যোগেও শিল্প রচনা করতে হবে। আর যেসব শিল্প-বাণিজ্য পুরোপুরি বেসরকারি মালিকের হাতে থাকবে, সেগুলিকেও লাইসেন্স ইত্যাদির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রাখবে সরকার। ৩) দ্রুত শিল্পায়নের জন্য চাই কারিগরি ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে শিক্ষিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মানবসম্পদ। এই মানবসম্পদ তৈরির জন্য প্রয়োজন দেশজোড়া প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা; শ্রমিকদের জন্য শিক্ষা ও কর্মসংস্কৃতি গড়ে তোলার নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলন। ৪) অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটাতে হবে সামাজিক ন্যায়ের ভিত্তিতে। এই ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত কর্মসংস্থানের আয়োজন করা যাতে বেকার সমস্যার সমাধান করা যায়। আর তারই পাশাপাশি দরকার ন্যায়ভিত্তিক সম্পদ-বন্টন ব্যবস্থা। জাতীয় সম্পদ বন্টনের জন্য চাই সমতার আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গি। ৫) নেহরুর মতে, এই পূর্ণাঙ্গ অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য চাই সঠিক পরিকল্পনা। রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার মূল কেন্দ্র হিসাবে পরিকল্পনা কমিশনকে তাই দেওয়া হ'ল পর্যাপ্ত ক্ষমতা। ছয়,

পরিকল্পিত অর্থনীতির দ্রুত রূপায়ণের জন্য চাই গণউদ্যোগ ও সর্বস্তরে গণঅংশগ্রহণের ব্যবস্থা। এই সূত্রেই তৈরি হ'ল ব্লক উন্নয়নের জন্য ব্লকস্তরে প্রশাসনিক কাঠামো, গ্রাম ও জেলাগুলির জন্য পঞ্চায়েতিরাজ ব্যবস্থা।

৪৬.৪.১ সমালোচনা

গণতান্ত্রিক সমাজবাদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নেহরুর এই পরিকল্পিত অর্থনীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থা স্বাধীন ভারতের নতুন এক কাঠামো তৈরি করেছিল ঠিকই, কিন্তু তাঁর স্বপ্ন যথাযথভাবে রূপায়িত হ'তে পেরেছিল, একথা বলা যাবে না। সমালোচকরা নানা দিক থেকে বিষয় নিয়ে বিবেচনা করে যেসব কথা বলেছেন, তার দুএকটা উল্লেখ করা যাক। প্রথমত, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের খ্যাতনামা অধ্যাপক ও গবেষক ভাস্বরি লিখেছেন যে, নেহরুর মিশ্র অর্থনীতি রাষ্ট্রায়াত্ত মালিকানার চাইতে অনেক বেশি ব্যক্তি মালিকানার পুঁজি তৈরি করেছে। দ্রুত ও ব্যপক শিল্পায়নের মোহে নেহরু এতোটাই আপ্লুত ছিলেন যে, ব্যক্তি মালিকের হাতে পুঁজির কেন্দ্রিভবন অনিবার্যভাবে ঘটেছে। তৈরি হয়েছে একচেটিয়া পুঁজি। দ্বিতীয়ত, নেহরুর প্রখ্যাত জীবনীকার এস. গোপাল লিখেছেন, দেশে প্রকৃত সামাজিক ন্যায্য প্রতিষ্ঠার জন্য উৎপাদন ও বন্টন প্রক্রিয়ার সুব্যবস্থা একই সঙ্গে ও একই তালে তৈরি করতে হবে; প্রযুক্তিগত উৎপাদনব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে দেশের সামাজিক কাঠামোর প্রয়োজনীয় রদবদল করতে হবে এবং উৎপাদনবৃদ্ধি ও সমতার আদর্শে বন্টনব্যবস্থাকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তুলতে হবে — কিন্তু নেহরুর পরিকল্পিত অর্থনীতি রূপায়ণের ক্ষেত্রে এসবের অনুপস্থিতি অত্যন্ত প্রকটভাবে ধরা পড়েছে। তৃতীয়ত, নেহরুর চিন্তায় উৎপাদনের পরিমাণ-বৃদ্ধির জন্য দ্রুত শিল্পায়ন এক মোহ তৈরি করেছিল। সনাতন কৃষিনির্ভর ভারতবর্ষে কৃষির ক্ষেত্রে যেসব অগ্রাধিকার স্বাধীনতা-উত্তর রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিতে প্রয়োজন ছিল, তাকে নেহরু ততোটা গুরুত্ব দেননি। ফলে সম্পদ বিলিব্যবস্থার ক্ষেত্রে অসাম্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। এসব সমালোচনা সত্ত্বেও সমাজবিজ্ঞানী মহলে এ-বিষয়ে কোনও দ্বিমত নেই যে, স্বাধীন ভারতের জাতিগঠনের প্রয়াসে ও রাষ্ট্রকাঠামোর আধুনিক ভিত গঠনে পন্ডিত জওহরলাল নেহরুর চিন্তা ও কর্মধারা এক বিশেষ উল্লেখ্যযোগ্য ইতিহাস।

৪৬.৫ অনুশীলণী

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১. জওহরলাল নেহরুর রাজনৈতিক জীবনের স্বরূপ ব্যাখ্যা করুন।

২. জওহরলাল নেহরুর উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক চিন্তার চরিত্র ব্যাখ্যা করুন।

৩. গণতান্ত্রিক সমাজবাদী হিসেবে নেহরুর চিন্তা ও কর্মকান্ড কী ও তা কতদূর সফল হ'তে পেরেছে?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী ঃ

১. নেহরু ও গান্ধীর অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর দু'টি পার্থক্য বর্ণনা করুন।

২. নেহরুর সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী বিষয়ে আচার্য নরেন্দ্র দেবের বক্তব্য বিশ্লেষণ করুন।

৩. মিশ্র অর্থনীতি বলতে নেহরু কী বুঝিয়েছিলেন ?

বিষয়মুখী প্রশ্নাবলী ঃ

১. জওহরলাল নেহরু লিখিত দু'টি বইয়ের নাম লিখুন।

২. দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ সম্পর্কে জওহরলালের দৃষ্টিভঙ্গী কোথায় পাওয়া যায় ?

৩. ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সোভিয়েত রাশিয়ার কোন্ পদ্ধতি নেহরু অনুকরণযোগ্য মনে করেছিলেন?

৪৬.৬ গ্রন্থপঞ্জী

১. V. Grover (ed.) Political Thinkers of Modern India, Volume on J. Nehru.

২. J. Nehru : The Discovery of India.

৩. K. P. Karnnakaran : The Phenomenon of Nehru.

একক ৪৭ ☐ সুভাষচন্দ্র বসু (১৮৯৭-১৯৪৫)

গঠন

৪৭.০ উদ্দেশ্য
৪৭.১ প্রস্তাবনা
৪৭.২ সুভাষচন্দ্র বসুর রাজনৈতিক জীবন
৪৭.৩ জাতীয়তাবাদ ও সুভাষচন্দ্র
৪৭.৪ সমাজতন্দ্র ও সুভাষচন্দ্র
৪৭.৫ অনুশীলণী
৪৭.৬ গ্রন্থপঞ্জী

৪৫.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করার পর আপনি জানতে পারবেন

- সুভাষচন্দ্র বসুর রাজনৈতিক জীবনের রূপরেখা
- জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র বসুর বক্তব্য ও
- সমাজতন্ত্র সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র বসুর ধারণা

৪৭.১ প্রস্তাবনা

ভারতের রাজনৈতিক ইহিহাসে যে ক'জন ব্যক্তিত্ব দীর্ঘস্থায়ী ছাপ রেখে গেছেন সুভাষচন্দ্র বসু তাঁদের অন্যতম। অনতিদীর্ঘ জীবনে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে তিনি এক অনন্য মাত্রা এনে দিয়েছিলেন। চিত্তরঞ্জন দাশের সহযোগী হিসাবে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে যে স্বাধীনতা সংগ্রামের শুরু করেন তিনি তা' শেষ হয় আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক হিসাবে ইংরাজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। শুধু প্রত্যক্ষ রাজনীতিই নয় দার্শনিক ও চিন্তাবিদ হিসাবেও সুভাষচন্দ্রের উল্লেখ দাবী রাখে। তাঁর রচিত 'তরুণের স্বপ্ন' ও Indian Struggle তদানীন্তন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উদ্বুদ্ধ করতে প্রভূত সাহায্য করেছিল। এই এককে আমরা জাতীয়তাবাদ এবং সমাজতন্ত্র সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র বসুর বক্তব্য আলোচনা করব।

৪৭.২ সুভাষচন্দ্র বসুর রাজনৈতিক জীবন

১৮৯৭ সালের তেইশে জানুয়ারি কটকে সুভাষচন্দ্রের জন্ম। পিতা জানকীনাথ বসু ছিলেন একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবী, মা প্রভাবতীদেবী ছিলেন ধর্মপ্রাণা মহিলা। কটকের র‍্যাভেনশ কলেজিয়েট স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান লাভ করে সুভাষচন্দ্র কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন, কিন্তু

১৯১৬ সালে কলেজের সাহেব অধ্যাপক ওটেনকে নিগ্রহ করার অভিযোগে তিনি বহিষ্কৃত হন এবং ১৯১৯ সালে স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে দর্শন বিষয়ে প্রথম শ্রেণীর স্নাতক ডিগ্রি নিয়ে বিলেতে যান আই. সি. এস হতে। সেখানে সসম্মানে আই. সি. এস পরীক্ষায় পাশ করেন, কিন্তু বিদেশী সরকারের গোলামি করবেন না — এই মনোভাব তৈরি হওয়ায় ১৯২১ সালে তিনি দেশে ফিরে আসেন এবং জাতীয় কংগ্রেসের আন্দোলনে যোগ দেন। ছাত্রজীবন থেকেই স্বাজাত্যবোধ তাঁর মধ্যে প্রবল ছিল। ওটেনসাহেব ভারতীয়দের বিষয়ে অপমানসূচক কথাবার্তা বলতেন বলেই সুভাষ তাঁর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে তিনি প্রবেশ করেন তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার অন্যতম অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা চিত্তরঞ্জন দাশের হাত ধরে। চিত্তরঞ্জনের সুযোগ্য শিষ্য ছিলেন তিনি। ১৯২১ সালে গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেবার পর সরকার তাঁকে ছমাসের জন্য কারারুদ্ধ করে। এরপর তাঁর সমগ্র রাজনৈতিক জীবনে মোট এগারোবার কারারুদ্ধ হয়েছেন এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তিনি মুক্তি পেয়েছেন ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য। কংগ্রেসে যোগ দেবার পর প্রথম দু'বছর অসহযোগ আন্দোলনে নিষ্ঠাবান কর্মীর দায়িত্ব পালন ছাড়া সুভাষ জাতীয় মহাবিদ্যালয়ে অধ্যক্ষতা, 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকা পরিচালনা ও কংগ্রেসের প্রচারবিভাগের অধিকর্তা হিসেবে কাজ করেছেন। এই সময়কালে চিত্তরঞ্জনের কাছে শিক্ষানবিশী ছাড়াও তিনি গান্ধীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য পেয়েছেন। ১৯২২ সালে গান্ধীজি অসহযোগ আন্দোলন হঠাৎ প্রত্যাহার করে নিলে চিত্তরঞ্জন ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল যে, ১৯১৯ সালের শাসন সংস্কার অনুযায়ী প্রাদেশিক কাউন্সিল বয়কট না করে বরং তাতে ঢুকে ভিতর থেকে কাউন্সিলকে অচল করে দেওয়ার নীতি গ্রহণ করা উচিত। গান্ধীজি ও কংগ্রেস নেতৃবর্গের সঙ্গে এ-বিষয়ে মতান্তরের ফলে ১৯২২ সালে চিত্তরঞ্জন-মতিলাল নেহরুর নেতৃত্বে স্বরাজ্য দল তৈরি হয়। ১৯২৪ সালে স্বরাজ্য দল প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আইনসভার নির্বাচনে আশাতীত সাফল্য লাভ করে শক্তিশালী দল হিসেবে স্বীকৃতি পায়। ওই বছরেই চিত্তরঞ্জন কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হন এবং সুভাষচন্দ্র কর্পোরেশনের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসারের পদ গ্রহণ করেন। এই সময়েই বাংলাদেশে বিপ্লবী জাতিয়তাবাদের কর্মীদের কাজকর্ম বৃদ্ধি পেয়েচিল, কংগ্রেস বা স্বরাজ্যদল সেসব কাজকর্মকে অনুমোদন না করলেও বিপ্লবীদের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের যোগাযোগ ছিল এবং সরকার সেই কারণেই তাঁকে ব্রহ্মদেশে নির্বাসিত করেছিলেন বছর দুয়েকের জন্য। বিপ্লবীদের সঙ্গে সুভাষের সম্পর্ক বরাবরই অক্ষুন্ন ছিল।

১৯২৭ সালে সুভাষচন্দ্র বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন। এর বেশ কিছু আগেই চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু হয়েছে। চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর সুভাষের বিভিন্ন বক্তৃতা ও কাজকর্মে যে মনোভাব ফুটে উঠেছিল তা হ'ল-এই যে, কংগ্রেসকে বিকল্প সরকারের মতো গড়ে তুলতে হবে। শ্রমিক

কৃষককে সচেতন করে আন্দোলনে শামিল করতে হবে এবং জনশিক্ষার বিস্তার ঘটাতে হবে। দেশ ও জাতিকে আত্মশক্তিসম্পন্ন করে তুলে ব্রিটিশ শাসনকে পঙ্গু করে দিতে হবে, তৈরি করতে হবে দেশীয় প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শক্ত কাঠামো। তিনি এই সময় থেকেই ডোমিনিয়ন স্টেটাসের পরিবর্তে পূর্ণ স্বরাজের কথাবার্তা বলতে শুরু করেছিলেন। ১৯২৭ সালের শেষের দিকে জওহরলালের সঙ্গে সুভাষ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন এবং ১৯২৮ সালে কলকাতার কংগ্রেস অধিবেশনে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অধিনায়ক হিসেবে তিনি এক অভূতপূর্ব সামরিক কায়দায় ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করেন। দেশের ছাত্র-যুবমহলে বিশেষ উদ্দীপনা তৈরি হয়। ১৯২৮-এর এই কংগ্রেসেই নেহরু ও সুভাষ পূর্ণ স্বরাজের প্রস্তাব নিয়ে আসেন, তবে কংগ্রেস তা, অবশ্য মেনে নেয় নি। ১৯২৯ সালে সুভাষ সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং ১৯৩০ সালে তিনি কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র হন।

তিরিশের দশক সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সময়। ১৯৩০ সালে তিনি গান্ধীর লবণ সত্যাগ্রহে যোগ দেন এবং কারারুদ্ধ হন। ১৯৩১ সালে গান্ধী-আরউইন চুক্তির মধ্য দিয়ে সত্যাগ্রহ প্রত্যাহৃত হ'লে সুভাষ মুক্তি পান, কিন্তু গান্ধীর সঙ্গে আরউইন চুক্তি বিষয়ে তাঁর মতপার্থক্য ঘটে এবং অচিরেই তাঁকে আবার আটক করা হয়। গান্ধীজির আইন অমান্য আন্দোলন মুলতবি ঘোষণার পর সুভাষচন্দ্র ও বিঠলদাস এক যুক্ত বিবৃতি প্রকাশ করেছিলেন। তাতে তাঁরা বলেছিলেন, 'আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ রেখে মহাত্মা গান্ধী শেষ যে কাণ্ড করলেন তাতে মেনেই নেওয়া হ'ল যে, কংগ্রেসের বর্তমান পদ্ধতি অচল। আমরা সুস্পষ্টভাবে মনে করি, রাজনৈতিক নেতা হিসেবে মহাত্মা গান্ধী ব্যর্থ। সুতরাং, সময় এসেছে এখন নতুন নীতির ওপর নতুন পদ্ধতিতে কংগ্রেসকে ঢেলে সাজাবার। কংগ্রেসকে পুনর্গঠিত করতে হ'লে নেতৃত্বের বদল হওয়া দরকার।' আরইউন চুক্তির বিরোধিতার কারণে তিনি গ্রেপ্তার হবার পর স্বাস্থ্যহানির কারণে বছরখানেকের মধ্যেই তিনি মুক্ত হন এবং চিকিৎসার কারণে বিদেশে চলে যান। প্রায় চারবছর ইওরোপের বিভিন্ন দেশে তিনি তখন ছিলেন এবং ভারতের স্বাধীনতার জন্য বিভিন্ন যোগাযোগ স্থাপন করেন। ১৯৩৩ সালে লন্ডনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল তৃতীয় ভারতীয় রাজনৈতিক সম্মেলন। ওই সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে সুভাষচন্দ্র সাম্যবাদী সংঘ গঠন ও তার কর্মসূচির কথা ঘোষণা করেন। এই প্রবাস-জীবনেই ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত হল তাঁর লেখা গ্রন্থ 'Indian struggle'।

সরকারি নির্দেশ অগ্রাহ্য করে ১৯৩৬ সালে সুভাষ দেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং গ্রেপ্তার হন। কিন্তু ১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক আইনসভা নির্বাচনে কংগ্রেস সাতটি রাজ্যে ক্ষমতায় এলে তিনি মুক্তি পান। এই সময়ে সুভাষচন্দ্রের জনপ্রিয়তা ছিল তুঙ্গে, তারই প্রভাবে ১৯৩৮ সালে হরিপুরা কংগ্রেস অধিবেশনে তিনি কংগ্রেস সভাপতির পদে নির্বাচিত হন। গান্ধীজির প্রস্তাবেই তিনি সভাপতি হয়েছিলেন কিন্তু গান্ধী-প্রদর্শিত পথ ও মতের সঙ্গে কিছু কিছু বিষয়ে মিল থাকলেও অমিলের অংশ ছিল বেশি। তিনি আপস-ভিত্তিক আন্দোলনের পরিবর্তে কংগ্রেসকে বিপ্লবী পথে পরিচালনা করার কথা বলতে থাকেন এবং এই সময়েই

তিনি কংগ্রেসের পক্ষে একটি জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠন করেছিলেন। এই পরিকল্পনা কমিটি গঠনের চিন্তার ক্ষেত্রে রুশ বিপ্লব ও সোবিয়েত অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বিষয়গুলির প্রভাব ছিল বলে অনেকেই মনে করেন। ১৯৩৯ সালে ত্রিপুরী কংগ্রেসে পট্টভি সীতারামাইয়াকে পরাজিত করে তিনি পুনর্বার সভাপতি পদে নির্বাচিত হন। এই কংগ্রেসে গান্ধী চাননি যে সুভাষ আবার সভাপতি হয়ে ফিরে আসেন, তিনি স্পষ্টভাবেই ঘোষণা করলেন যে সীতারামাইয়ার পরাজয় তাঁর পারজয়। বস্তুত সভাপতিপদে বৃত হওয়ার পর সুভাষ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সমর্থন পাননি এবং শেষ পর্যন্ত তিনি সভাপতিপদ থেকে ইস্তফা দেন। ১৯৩৯ সালের মে মাসে কংগ্রেসে ব্যক্তিপ্রাধান্যের বিপরীতে গণতান্ত্রিকতার ভিত প্রতিষ্ঠার জন্য এবং কংগ্রেসকে জনগণের বৈপ্লবিক হাতিয়ার হিসেবে গড়ে তোলার জন্য তিনি ফরোয়ার্ড ব্লক গঠন করেন। কংগ্রেসের অভ্যন্তরে বামপন্থী শক্তিগুলিকে একত্রিত করার জন্য তিনি Left Consolidation Committee এই সময় তৈরি করেছিলেন, কিন্তু সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। বস্তুত ভারতে বামপন্থী আন্দোলনে বহু গোষ্ঠী ও বিচিত্র মতাদর্শের অস্তিত্ব প্রায় জন্মলগ্ন থেকেই; কোনও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন তাই সফলভাবে গড়ে উঠতে পারেনি। কমিউনিস্ট ইন্ট্যারন্যাশনাল ও সোবিয়েত রাশিয়ার নেতৃত্বে পরিচালিত ছিলেন ভারতীয় কমিউনিস্টরা। কংগ্রেসের সোস্যালিস্ট নেতৃবর্গ, সুভাষচন্দ্র ও নেহরু সহ, গান্ধিজির নেতৃত্ব সম্পর্কে সংশয়ী ও কখনও প্রত্যক্ষ বিরোধী হ'লেও, কার্যত গান্ধীকে ছাড়তে চাননি। আর সংখ্যায় কম হলেও মানবেন্দ্রনাথ রায়ের গোষ্ঠী ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তিনি কমিনটার্ন থেকে বহিষ্কৃত এবং কংগ্রেসকে র‍্যাডিকাল চরিত্র দেওয়ার জন্য মতাদর্শ গঠনে সচেষ্ট ছিলেন। সমগ্র তিরিশের দশকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে এই বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলির মধ্যে টানাপোড়েন চলে এবং এক অদ্ভুত জটিলতা তৈরি হয়। ত্রিপুরী কংগ্রেসের পর শৃঙ্খলাভঙ্গের অপরাধে সুভাষ কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন এবং ১৯৪০ সালে রামগড় কংগ্রেস অধিবেশনকালে সুভাষের সভাপতিতে এক পাল্টা আপসবিরোধী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে তিনি হিন্দু-মুসলমানদের নিয়ে গঠিত এক অস্থায়ী সরক র গঠনের জন্য আন্দেলনের আহ্বান জানান। এক সশস্ত্র বিপ্লব গঠনের প্রস্তুতি বলা চলে একে। হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের দাবিকে ঘিরে আন্দোলনের সূত্রে সুভাষচন্দ্র আবার কারারুদ্ধ হন। এই কারাবাসকালেই তিনি অনুভব করেন যে, আইন অমান্য ও সন্ত্রাসবাদ গঠনই যথেষ্ট নয়, চাই বন্ধু বিদেশী রাষ্ট্রগুলির সক্রিয় সমর্থন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তখন শুরু হয়ে গেছে, যুদ্ধে ব্রিটিশ-বিরোধী শক্তিগুলির সাহায্য ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগঠিত করা যায় কিনা, তার চিন্তা তখন প্রবল সুভাষের মধ্যে। এই সময়েই ১৯৪১ সালের ১৭ জানুয়ারি নিজের গৃহে অন্তরীণাবস্থায় সরকারি দৃষ্টি এড়িয়ে তিনি কাবুল হয়ে বার্লিন চলে যান। বিদেশ থেকে সুভাষ স্বয়ং তাঁর অন্তর্ধানের কথা ঘোষণা করেন ১৯৪১-এর নভেম্বর মাসে। তিনি বলেন যে, শত্রুর শত্রুর সঙ্গে হাত মেলাতে হবে; তৈরি করতে হবে মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় সৈন্যদল। ১৯৪৩ সালে সিঙ্গাপুরে ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের নিয়ে তৈরি রাসবিহারী বসুর আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক হন সুভাষচন্দ্র। ১৯৪৩-এর

২১ অক্টোবর তিনি সিঙ্গপুরে প্রতিষ্ঠা করেন আজাদ হিন্দ সরকার। এর পরবর্তী ছয়মাস আজাদ হিন্দ ফৌজের অগ্রগতির ও সাফল্যের সময়। আজাদ হিন্দ বাহিনী ব্রিটিশরাজ থেকে ভারতকে মুক্ত করার জন্য ব্রহ্মদেশের সীমা অতিক্রম করে কোহিমা ও ইম্ফল পর্যন্ত অগ্রসর হয়, কিন্তু মহাযুদ্ধে মিত্রশক্তির জয় সুনিশ্চিত হয়ে ওঠার কারণে সুভাষকে পশ্চাদপসরণ করতে হয়। এর পরেই ১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্ট তাইপে-তে এক বিমান দুর্ঘটনায় সুভাষের মৃত্যু ঘটেছে বলে সংবাদ প্রচার করা হয়। তবে একনও পর্যন্ত সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু বিষয়ে এক প্রবল বিতর্ক রয়েছে।

৪৭.৩ জাতীয়তাবাদ ও সুভাষচন্দ্র

ইওরোপে জাতীয় রাষ্ট্র ও জাতীয়তাবাদের বিকাশ শুরু হয়েছিল রেনেসাঁস আন্দোলনের কাল থেকেই। পরে ফরাসি বিপ্লব ও আমেরিকার স্বাধীনতার যুগকে বলা যেতে পারে জাতীয়তাবাদ বিকাশের গুরুত্বময় কাল। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইওরোপেও রাজনৈতিক সংস্কৃতির সর্বাপেক্ষা জোরদার মতাদর্শ ছিল জাতীয়তাবাদ। এই জাতীয়তাবাদের দু'টি ধবন ছিল — নিজের দেশের রাজনৈতিক ঐক্য, অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা ও সাংস্কৃতিক বিকাশের জন্য জাতীয়তাবাদের এক সদর্থক প্রকাশ বিভিন্ন জাতিকে উদ্‌বোধিত করে তুলেছিল। ম্যাটসিনির ভাষায় তা' ছিল 'Nation is mission'। কিন্তু অপর আরেকটি দিকও তার ছিল। এ ছিল উগ্র জাতায়তাবাদের মদমত্ত আস্ফালন। পশ্চিমের ক্ষমতাশালী জাতীয় রাষ্ট্রগুলি নিজেদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য নিজেদের সাংস্কৃতিক প্রতাপ প্রতিষ্ঠার জন্য গড়ে তুলেছিল সাম্রাজ্যবাদ। সমাজবিজ্ঞানীরা তাই বলেছেন, আগ্রাসী জাতীয়তাবাদ হ'ল সাম্রাজ্যবাদের নামান্তর। এই আগ্রাসী জাতীয়তাবাদের নিষ্ঠুর নিস্পেষণে তৈরি হয়েছিল এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন উপনিবেশ। আর ওই ঔপনিবেশিকতা তৈরি বরেছিল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয়তাবাদ। ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদ ছিল এই জাতের।

পৃথিবীর সব দেশেই জাতীয়তাবাদ গড়ে ওঠার নিজস্ব ইহিতাস আছে। সে-দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সামাজিক-সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, ধর্মচেতনা, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বাতাবরণ অনুযায়ী একেক দেশের জাতীয়তাবাদ একেক বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করে। ভারতবর্ষে যেমন জাতীয়তাবাদের বিকাশ শুরু হয়েছিল ধর্মসংস্কার, সমাজসংস্কার, শিক্ষাসংস্কারের সূত্রগুলি ধরে। এসবের ভিত্তি ছিল অবশ্যই ব্রিটিশ বণিকদের সৃষ্ট নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। কিন্তু খেয়ালে রাখতে হবে যে, উনিশ শতকের শুরু থেকে এদেশে জাতিগঠনের যে-প্রয়াস তৈরি হয়েছিল তা রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলন হয়ে উঠেছিল উনিশ শতকের একেবারে শেষের দিকে। উনিশ শতকের শেষে ভারতবর্ষে রাজনৈতিক জাতীযতাবাদের যে-রূপ মূর্ত হয়ে উঠেছিল তাতে হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু ঐতিহ্যের অতীত গরিমার এক বিশেষ স্থান ছিল। ঐতিহাসিকেরা ওই পর্বের নাম তাই দিয়েছেন হিন্দু পুনরুত্থানবাদের যুগ। জাতীয়তাবাদ ও হিন্দুত্ব অনেক

ক্ষেত্রে একাকার হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ভারতবর্ষ নামক দেশটি তো আর হিন্দুর একার নয়। তার সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে সত্য, কিন্তু মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, খ্রীষ্টানরাও এই দেশের জনসমষ্টির এক বৃহদংশ। ফলে, হিন্দু জাতীয়তাবাদ থেকে ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদে পৌঁছুতে না পারলে ভারতের প্রকৃত স্বাধীনতাপ্রাপ্তি সম্ভব নয় — এই ধারণা গড়ে উঠেছিল অচিরেই। সুভাষচন্দ্র-নেহরু প্রমুখ জাতীয় নেতৃবর্গের জাতীয়তাবাদ এই শেষোক্ত গোত্রের।

সুভাষচন্দ্রের মানসিকতায় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ব্যবহারিক বেদান্ত গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। বিবেকানন্দের বাণী তাঁকে সেবাধর্মে উদ্বুদ্ধ করেছিল। কলেজ জীবনে যদিও তিনি বেদান্ত-বিরোধী বস্তু তান্ত্রিক দর্শন বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন, কিন্তু সুভাষের সারা জীবনের চেতনায় বিবেকানন্দের প্রভাব খুব প্রখর ছিল। অন্যদিকে ইওরোপের সদর্থক জাতীয়তাবাদী দর্শন, বিশেষত ম্যাটসিনি-গ্যারিবল্ডির আদর্শ, সুভাষকে অনুপ্রাণিত করেছে। আগ্রাসী জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ছিল প্রবল। যদিও তাঁর স্বাধীনতা-যুদ্ধে কৌশলগত পন্থা হিসেবে জার্মানি-ইটালি-জাপানের (আগ্রাসী জাতীয়তাবাদের চূড়ান্ত রূপ যাদের মধ্যে দেখা গেছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর্বে) সাহচর্যের কথা আমরা সকলেই জানি। তিনি ফ্যাসিবাদ ও সাম্যবাদের মধ্যে মিলনের কথাও বলেছেন কখনও কখনও। তথাপি সামগ্রিক বিচারে সুভাষচন্দ্রের জাতীয়তাবাদকে আগ্রাসী জাতীয়তাবাদের কোঠায় ফেলা যাবে না।

জওহরলাল নেহরুর মতো সুভাষচন্দ্রের জাতীয়তাবাদের প্রধান ভিত্তি ছিল সমতার আদর্শ, অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উন্নতির জন্য দ্রুত শিল্পায়ন। সমাজতন্ত্র ছাড়া গণতন্ত্র সম্ভব নয় — এই চিন্তাও তাঁর জাতীয়তাবাদী চেতনায় পরিব্যাপ্ত ছিল। জাতীয়তার বৈশিষ্ট্য স্বীকার করে নিয়ে সমাজতন্ত্র গড়ে তুলতে হবে — একথাও খুব স্পষ্ট করে বলেছিলেন সুভাষচন্দ্র। ১৯৩১ সালের ৪ জুলাই তারিখে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস সভাপতির অভিভাষণে সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, 'আমার মনে কোনও সন্দেহ নেই যে, একমাত্র সমাজতন্ত্রই ভারতের এবং পৃথিবীর জনগণকে মুক্তি দিতে পারে। ভারতকে অন্যান্য জাতির অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিতে হবে। সেই প্রণালীটিকে নিশ্চিতই হ'তে হবে ভারতের প্রয়োজন ও পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। যে কোনও তত্ত্বকে বাস্তবে রূপায়িত করতে হ'লে ভূগোল এবং ইতিহাসকে একেবারে উপেক্ষা করা যায় না। যদি তা কেউ করে সে ব্যর্থ হবেই।' এই জাতীয়তাকেন্দ্রিক সমাজতন্ত্রের চেতনা আরও স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে সুভাষচন্দ্রের হরিপুরা কংগ্রেসে সভাপতির বক্তৃতায় — 'কংগ্রেসের লক্ষ্য হ'ল স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষ, যে-ভারতবর্ষে কোনও শ্রেণী বা গোষ্ঠী বা সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নিজের স্বার্থে অপরকে শোষণ করবে না এবং যেখানে ভারতীয় জনগণের সামগ্রিক মঙ্গল ও অগ্রগতির জন্য জাতির সকলে সম্মিলিতভাবে সহযোগিতা করবে। সর্বজনীন স্বাধীনতার ঐক্য ও পারস্পরিক সহযোগিতার এই লক্ষ্য কোনও মতেই ভারতীয় জীবনচর্চার বহুল বৈচিত্র ও সাংস্কৃতিক

রূপভেদের অবদমন বোঝাবে না। যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি তথা প্রতিটি গোষ্ঠী তার সামর্থ্য ও প্রবণতা অনুযায়ী অবাধে বিকাশ লাভের সুযোগ ও স্বাধীনতা পেতে পারে তার জন্য ঐ বৈচিত্র্য ও সাংস্কৃতিক রূপভেদকে রক্ষা করতেই হবে।'

জাতীয় ঐক্যচিন্তা ও আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য—এই দুই বিষয়েই সুভাষের মনোযোগ ছিল সমানভাবে প্রখর। 'মূল জাতীয় স্রোত' - এর অস্পষ্ট ধারণা অন্যান্য জাতীয়তাবাদী নেতাদের মতো সুভাষকে আচ্ছন্ন করেনি। আঞ্চলিক ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রয়োজনকে তিনি খুব গুরুত্ব সহকারে ভেবেছিলেন। অশেষ বৈচিত্র্যপূর্ণ ভারতবর্ষে এই আঞ্চলিকতার গুরুত্ব যে অপরিসীম, তা স্বাধীনতা-পরবর্তী যুগে প্রতি পদে অনুভূত হচ্ছে।

সুভাষচন্দ্রের জাতীয়তাবাদ বিষয়ে এক মনোজ্ঞ প্রবন্ধ লিখেছেন অধ্যাপক প্রশান্তকুমার ঘোষ। এই প্রবন্ধের উপসংহারে অধ্যাপক ঘোষ সুভাষের জাতীয়তাবাদের বৈশিষ্ট্যগুলিকে সূত্রকারে চিহ্নিত করেছেন। সেটি আমাদের প্রণিধানযোগ্য :

'জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্রের ধারণার মূল উপাদানগুলির সংক্ষিপ্তসার এভাবে দেওয়া যেতে পারে। প্রথমত, সুভাষচন্দ্র সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামী (militant) জাতীয়তাবাদের সমর্থক, কিন্তু উগ্র, সংকীর্ণ, আগ্রাসী বা হিন্দু জাতীয়তাবাদের তিনি বিরোধী। দ্বিতীয়ত, তাঁর মতে, জাতীয়তাবাদী কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত দেশের দরিদ্র, অবহেলিত, শ্রমজীবী মানুষের জন্য বঞ্চনামুক্ত সমাজ গড়ার প্রয়াস। তৃতীয়ত সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তন কোনও দেশের সমাজ বা অর্থব্যবস্থার অন্ধ অনুকরণে সম্ভব হবে না; ভারতের বাস্তব অবস্থাকে স্বীকার করেই এই পরিবর্তন আনা সম্ভব। চতুর্থত, ভারতের জাতীয় ঐক্যের বনিয়াদ হবে এদেশের বহুধাবিভক্ত সংস্কৃতির যথার্থ ও কার্যকর স্বীকৃতি। এ-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, স্বাধীনতার পরে (বিশেষত ১৯৫০-এর সংবিধান প্রবর্তনের পরে) কেন্দ্রিকতার যে প্রবণতা জাতীয় সংহতির মুখ্য অবলম্বন বলে প্রচারিত হয়ে এসেছে, ভারতীয় ঐক্য সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের ধারণা ছিল তার বিপরীত। পঞ্চমত, স্বাধীন ভারতে জাতীয় ঐক্য অক্ষুন্ন রাখার জন্য সুভাষচন্দ্র যে দীর্ঘমেয়াদি ও স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার কথা বলেছেন তার মধ্যে ঘনিষ্ঠতর যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজন যেমন স্বীকৃত, তেমনই সর্বজনগ্রাহ্য ভাষা ও লিপি ব্যবহার এবং জাতীয় শিক্ষানীতি গ্রহণের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবও প্রবলভাবে সমর্থিত। এ-বিষয়ে তাঁর দূরদর্শিতা সমসাময়িক অন্য অনেক নেতার তুলনায় তাঁকে স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। ষষ্ঠত, জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিক সংগঠনের মধ্যে বাস্তবসম্মত উপায়ে যোগসূত্র রচনার কথা তাঁর তত্ত্বে স্বীকৃত। হরিপুরা কংগ্রেসে সভাপতির অভিভাষণে তিনি স্বাধীন ভারতবর্ষের বৈদেশিক নীতির যে আভাস দেন তাতে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতিগুলির মধ্যে সহযোগিতার আহ্বান ছিল।'

৪৭.৪ সমাজতন্ত্র ও সুভাষচন্দ্র

জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যন্তরে যে বামপন্থী সমাজবাদী ধারা গড়ে উঠেছিল সুভাষচন্দ্র ছিলেন তার এক অন্যতম কান্ডারী। ১৯৩৪ সালে কংগ্রেসের ভিতরেই এক উপদল তৈরি হয়েছিল কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি নামে। জয়প্রকাশ নারায়ণ, আচার্য নরেন্দ্র দেব প্রমুখ সমাজতন্ত্রীরা ছিলেন তার কর্ণধার। এঁদের চিন্তাভাবনার সঙ্গে বহুলাংশে একমত হ'লেও সুভাষ কিংবা নেহরু ওই সমাজতন্ত্রী দলে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দেননি; কিন্তু চিন্তাভাবনার দিক থেকে তাঁদের সঙ্গে সুভাষের বিরোধ তেমন কিছু ছিল না। বরং ১৯৩৯ সালে ত্রিপুরী কংগ্রেসে দলের সভাপতি নির্বাচনের সময় দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসীদের সঙ্গে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে এই সমাজবাদী বামপন্থী গোষ্ঠীগুলিই সুভাষচন্দ্রকে জয়ী করেছিল। এর অব্যবহিত পরেই সুভাষচন্দ্র যখন কংগ্রেসের অভ্যন্তরে ফরোয়ার্ড ব্লক নামক উপদলটি তৈরি করেন তখন তার কর্মসূচীতেও সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা বিশেষ স্থান লাভ করে।

সুভাষচন্দ্র মূলত জাতীয়তাবাদী। কিন্তু উদারনৈতিক পুঁজিবাদী গণতন্ত্রে বিশ্বাস স্থাপন করেন নি। প্রচলিত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভারতের মতো অনুন্নত দেশের প্রগতি সম্ভব নয় বলে তিনি মনে করতেন। তাঁর বক্তব্য ছিল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজবাদী ভিত্তিতে অর্থনৈতিক সংস্কার সম্ভব নয়। এই কারণে পূর্ণ কর্তৃত্বসম্পন্ন রাষ্ট্রব্যবস্থা আমাদের তৈরি করতে হবে। পশ্চিমী পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলিতে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের ধাঁচে সরকার আমাদের কাম্য নয়, বরং সোবিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের মতো দলীয় এক নায়কত্বে জবরদস্ত রাষ্ট্রকর্তৃত্ব ভারতের পক্ষে প্রয়োজন তার অর্থনৈতিক ও সামাজিক পুনর্গঠনের জন্য। সোবিয়েতের পরিকল্পিত অর্থনীতির ধারণাটিও সুভাষচন্দ্রকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। ১৯৩৮ সালে কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। ওই কমিটি গঠনের চিন্তার ক্ষেত্রে এবং তার কর্মসূচি নির্ধারণের ক্ষেত্রে রুশবিপ্লব ও সোবিয়েত রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাজকর্মের সরাসরি প্রভাব ছিল বলে মনে করা হয়। কমিটি গঠনের প্রস্তাব করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, 'পুনর্গঠনের কথা বলতে গেলে আমাদের প্রধান সমস্যা হচ্ছে কী করে দেশ থেকে দারিদ্র্য দূর করা যাবে। সেজন্য চাই জমিদারি প্রথা সমেত আমাদের ভূমিব্যবস্থার আমূল সংস্কার। কৃষকদের ঋণমুক্ত করতে হবে এবং গ্রামবাসীদের সহজে ঋণ পাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। উৎপাদনকারী ও ভোগকারীর উভয়ের উপকারের জন্য সমবায় আন্দোলনের প্রসার প্রয়োজন। ভূমি হ'তে উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে, কৃষিকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।'

ভূমিব্যবস্থার সংস্কারের পাশাপাশি দ্রুত শিল্পায়নের পথে ভারতকে অগ্রসর হ'তে হবে সমাজবাদী পথে, একথাও সুভাষচন্দ্র ওই সময়ে হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতির অভিভাষণে বিস্তারিতভাবে বলেছেন।

তাঁর বক্তব্য ছিল 'অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের জন্য কৃষির উন্নতিই যথেষ্ট নয়। রাষ্ট্রের মালিকানায় ও নিয়ন্ত্রণে শিল্পোন্নয়নের এক ব্যাপক প্রকল্প অপরিহার্য হবে। যে পুরাতন শিল্প-ব্যবস্থা বিদেশে ব্যাপক উৎপাদন ও স্বদেশে বৈদেশিক শাসনের ফলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে তৎস্থলে একটি নতুন শিল্পব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। পরিকল্পনা কমিশনকে যত্নসহকারে বিবেচনা করে স্থির করতে হবে কুটির শিল্পগুলির মধ্যে কোনগুলি আধুনিক কলকারখানার প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও পুনরুজ্জীবিত করা উচিত হবে এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে বৃহৎ শিল্পকে উৎসাহিত করা হবে।' উল্লেখ্য বিষয় এখানে এই যে, দ্রুত ও ব্যাপক শিল্পায়নের পরিকল্পনায় সুভাষচন্দ্র দেশীয় কুটির শিল্পগুলির পুনরুজ্জীবনের কথাও গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেছেন। এই সূত্রে তিনি গান্ধীর খাদি-শিল্প পরিবর্ধনের কথাও বলেছেন। যদিও গান্ধীর শিল্পায়ন বিরোধী অর্থনৈতিক চিন্তাকে তিনি মানেন নি।

আমূল ভূমিসংস্কার ও ব্যাপক শিল্পায়নের জন্য চাই জবরদস্ত রাষ্ট্রকর্তৃত্ব — এরকম এক সমাজবাদী চিন্তা লালন করেছেন বরাবর সুভাষচন্দ্র। এই ধরনের চিন্তার সূত্রেই তাঁর 'The Indian Struggle' গ্রন্থে তিনি মন্তব্য করেছেন যে, ফ্যাসিবাদ ও সাম্যবাদের মধ্যে সমন্বয় করেই ভারতের জাতীয়তাবাদ ও সমাজবাদের ভিত্তি করতে হবে। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, সুভাষ উক্ত গ্রন্থটি লিখেছিলেন ১৯৩৪ সালে। এর চারবছর বাদে ১৯৩৮ সালের জানুয়ারিতে ব্রিটিশ কমিউনিস্ট দলের নেতা রজনীপাম দত্তের এক প্রশ্নের উত্তরে সুভাষ বলেছিলেন, 'তিন বছর আগে ওই বই লেখার পর থেকে আমার রাজনৈতিক ধারণা আরও পরিণতি লাভ করেছে। আমি সত্যি যা বলতে চেয়েছিলাম তা এই যে, ভারতবর্ষে আমরা চাই জাতীয় স্বাধীনতা, এবং তা, লাভ করার পর সমাজতন্ত্রের দিকে আমরা এগিয়ে যেতে চাই। কমিউনিজম ও ফ্যাসিবাদের মধ্যে সমন্বয়ের উল্লেখ করে এই কথাই বোঝাতে চেয়েছিলাম। সম্ভবত যে ভাষায় আমি তা প্রকাশ করেছি তা তেমন সন্তোষজনক হয় নি। তবে আমার দিক থেকে একথাও বলে রাখা উচিত যে, যখন আমি বইটি লিখেছিলাম তখনও ফ্যাসিবাদ তার সাম্রাজ্যবাদী অভিযান শুরু করেনি এবং আমার কাছে তা মনে হয়েছিল জাতীয়তাবাদের একটা উগ্র সংস্করণ।' (প্রশান্তকুমার ঘোষের প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত)।

কমিউনিজম ও ফ্যাসিবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হবে — একথার মধ্যেই নিহিত আছে এই সত্য যে, এই দুই মতাদর্শের কোনওটিকেই সুভাষ পুরোপুরি গ্রহণ করেন নি। ফ্যাসিবাদ থেকে যেদু'টি উপাদান সুভাষচন্দ্রের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়েছিল, তা' হ'ল জাতীয়তাবাদ (তার উগ্ররূপ নয় কখনই) এবং রাষ্ট্রের পূর্ণ কর্তৃত্বে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের চিন্তা। সুভাষচন্দ্রের সমাজবাদকে তাই জাতীয়তাবাদী সমাজতন্ত্র বলেও আখ্যায়িত করায়। কমিউনিজম বা সাম্যবাদ যে তাঁর কাছে পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য ছিল না, তা' বহুক্ষেত্রেই তিনি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মার্ক্সবাদী সাম্যবাদ বিরোধিতার কারণগুলি হ'ল এরকম—

(ক) কমিউনিস্টরা জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করে না। পক্ষান্তরে ভারতীয় সংগ্রাম মূলত একটি জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম।

(খ) কমিউনিস্টরা ধর্মে অবিশ্বাসী ও নাস্তিক। রাশিয়ায় প্রাক্‌বিপ্লবকালে জারের স্বেচ্ছাচারকে চার্চ সমর্থন করত বলে কমিউনিস্টদের সঙ্গে চার্চ ও ধর্মের বিরোধিতা। ভারতে রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক না থাকায় মানুষের সঙ্গে ধর্মের কোনও সংঘাত নেই।

(গ) কমিউনিস্টরা ইতিহাসের অর্থনৈতিক নির্দেশ্যবাদে (economic determinism) অতি বেশি বিশ্বাসী। কমিউনিস্টদের অর্থনৈতিক তত্ত্বের কিছুটা গুণগ্রাহী হলেও ভারত ইতিহাসকে কেবলমাত্র অর্থনীতির দিক থেকে দেখে না।

(ঘ) কমিউনিস্টরা শ্রেণীসংঘর্ষ ও শ্রমিকদের উপর সর্বাধিক প্রাধান্য দেয়। ভারত শ্রেণীসংঘর্ষ চায় না এবং কৃষিপ্রধান দেশ বলে এখানকার চাষীদের স্বার্থ শ্রমিকদের সমতুল্য। মার্ক্সবাদের বিরুদ্ধে এসব আপত্তির কথা লিখেছেন সুভাষচন্দ্র তাঁর 'The Indian Struggle' -এ । তবে একই সঙ্গে একথাও লিখেছেন যে, মার্ক্সবাদ মানবসভ্যতার এক শ্রেষ্ঠ অবদান।

৪৭.৫ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নবলী :

১. সুভাষচন্দ্র বসুর রাজনৈতিক জীবন ও তাঁর মতামত ব্যাখ্যা করুন।

২. সুভাষচন্দ্রের জাতীয়তাবাদের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করুন।

৩. সুভাষচন্দ্রের সমাজতন্ত্রবাদের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নবলী :

১। সুভাষচন্দ্রের 'সাম্যবাদ' বলতে কী বোঝেন ?

২। ভারতের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে হরিপুরা কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্রের মত কী ছিল?

৩। জার্মাণীর সহযোগিতা গ্রহণের স্বপক্ষে সুভাষচন্দ্রের কী যুক্তি ছিল?

৪। সুভাষচন্দ্র ও গান্ধীর মধ্যে মতবিরোধের কারণ কী ?

বিষয়মুখী প্রশ্নবলী :

১। সুভাষচন্দ্র কী কারণে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বহিষ্কৃত হন ?

২। কেন সুভাষচন্দ্র আই. সি. এস. পদ গ্রহণ করেন নি ?

৩। ত্রিপুরী কংগ্রেসে সভাপতিপদে সুভাষচন্দ্র কাকে পরাজিত করেন ?

৪। সুভাষচন্দ্রের লিখিত দু'টি বইএর নাম করুন।

৪৭.৬ গ্রন্থপঞ্জী

১. V. Grover (ed) Political Thinkers of Modern India, Volume on S.C. Bose,

২. সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় : বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা, দ্বিতীয় খন্ড

৩. জাতীয়তাবাদ ও বাঙালী চিন্তাবিদ, সম্পাদনা সত্যব্রত রায়চৌধুরী, আশসকুমার বসু গ্রন্থভূক্ত প্রশান্তকুমার ঘোষের প্রবন্ধ 'সুভাষচন্দ্র ও জাতীয়তাবাদ'।

একক ৪৮ □ রামমনোহর লোহিয়া

গঠন

৪৮.০ উদ্দেশ্য
৪৮.১ প্রস্তাবনা
৪৮.২ সংক্ষিপ্ত জীবনী
৪৮.৩ লোহিয়ার ইতিহাস চেতনা
 ৪৮.৩.১ লোহিয়ার দৃষ্টিতে শ্রেণী ও বর্ণ
 ৪৮.৩.২ ধনতন্ত্র সম্পর্কে লোহিয়া
 ৪৮.৩.৩ ধনতন্ত্রবাদ ও সাম্যবাদ : একই সভ্যতার দু'টি রূপ
 ৪৮.৩.৪ সমাজতান্ত্রিক সভ্যতা
 ৪৮.৩.৫ নতুন সমাজতান্ত্রিক সভ্যতার বৈশিষ্টসমূহ
 ৪৮.৩.৬ সভ্যতার বাস্তব রূপায়নে পন্থা ও পদ্ধতি
৪৮.৪ চিন্তানায়ক লোহিয়া
৪৮.৫ সারাংশ
৪৮.৬ অনুশীলনী
৪৮.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৪৮.০ উদ্দেশ্য

এই অধ্যায়ে আমরা ভারতীয় সমাজবাদী চিন্তানায়ক ডাঃ রামমনোহর লোহিয়ার মৌলিক চিন্তা-ভাবনার সাথে পরিচিত হব। এই অংশে আমরা তাঁর চিন্তাধারার যেসব দিকগুলির আলোচনা করব সেগুলি হল —

- লোহিয়ার ইতিহাস দর্শন
- শ্রেণী ও বর্ণ সম্পর্কে লোহিয়া
- ধনতন্ত্রে বিকাশ সম্পর্কে লোহিয়ার ধারণা
- সমাজতন্ত্রিক সভ্যতার প্রকৃতি

৪৮.১ প্রস্তাবনা

স্বাধীনতা সংগ্রামের মৌলিক পটভূমিকায় ভারতবর্ষে সমাজবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত। কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি (সি. এস. পি) গঠনের মধ্য দিয়ে এই আন্দোলন প্রথম সংহত রূপ লাভ করে। প্রথমদিকে যে সব সমাজবাদী চিন্তনায়কদের অবদান ভারতীয় সমাজবাদী চিন্তাধারাকে পুষ্টিদান করেছিল তাদের মধ্যে জয়প্রকাশ নারায়ণ, আচার্য্য নরেন্দ্র দেব, অচ্যুত পট্টবর্ধন, মিনু মাসানী, অশোক মেহতা ও ডা. রামমনোহর লোহিয়ার নাম উল্লেখযোগ্য। পার্টির মধ্যে নতুন চিন্তার উন্মেষ হওয়ায় এই সব নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন পথ ধরে চলতে আরম্ভ করলেন। জয়প্রকাশ গেলেন সর্বোদয়ের পথে, মাসানী ধরলেন উদারনীতির পথ, অশোক মেহতা কংগ্রেসী গণতন্ত্রে আকৃষ্ট হ'লেন, পট্টবর্ধন বেছে নিলেন অধ্যাত্মবাদের পথ, নরেন্দ্র দেব শেষ পর্য্যন্ত আত্মনিয়োগ করলেন মার্ক্সবাদে। আর যিনি অন্য কোনও পথে না গিয়ে সোশ্যালিজম্‌কেই (Socialism) ইতিহাসসম্মত দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করলেন তাঁর নাম হ'ল ডা. রামনোহর লোহিয়া।

৪৮.২ সংক্ষিপ্ত জীবনী

স্বাধীনতা সংগ্রামী পিতা হীরালাল লোহিয়ার একমাত্র পুত্র রামমনোহর লোহিয়া ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ শে মার্চ উত্তরপ্রদেশের আকবরপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে মাতৃহারা রামমনোহর তাঁর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা বিভিন্ন এলাকায় সম্পন্ন করেন। পিতার সঙ্গে ১৯২১ সালে জাতীয় কংগ্রেস সম্মেলনে যোগদান করেন ও প্রথম গান্ধীজীর সাক্ষাৎ লাভ করেন। ১৯২৯ সালে কলকাতার বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য ১৯৩০ সালে ইংল্যান্ড যাত্রা করেন। পরে সেখান থেকে জার্মানী চলে যান। ১৯৩২ সালে হামবোল্ট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে পি. এইচ. ডি উপাধি লাভ করে ১৯৩৩ সালে ভারতে ফিরে আসেন।

১৯৩৪ সালে কংগ্রেস শ্যোসালিস্ট পার্টি গঠনকারীদের অন্যতম ছিলেন রামমনোহর লোহিয়া। সেই সঙ্গে দায়িত্ব নেন 'কংগ্রেস সোস্যালিস্ট' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্পাদনার। ২৬ বছর বয়সে নেহেরুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে কংগ্রেসের বিদেশ নীতি বিভাগের সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। রচনা করেন প্রথম পুস্তিকা 'The Struggle for Civil liberties'। জাতীয় কংগ্রেসের যুদ্ধ বিরোধী আন্দোলনে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহী হিসাবে লোহিয়া এক বছর কারাদন্ড ভোগ করেন।

১৯৪২ সালে কংগ্রেসের ভারত ছাড়ো আন্দোলনে আত্মগোপনকারী নেতাদের মধ্যে অন্যতম রামমনোহর সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং গুপ্তজীবনে বোম্বাই এবং কলকাতা থেকে স্বাধীন বেতার

কেন্দ্র পরিচালনা করেন। ১৯৪৪ সালে গ্রেপ্তারের পর ব্রিটীশ সরকার লাহোর দুর্গে লোহিয়ার উপর অমানুষিক অত্যাচার ও নিষ্পেষণ করে।

১৯৪৬ সালে কারামুক্তির পরই গোয়ার মুক্তি আন্দোলনে প্রথম সত্যাগ্রহী হিসাবে লেহিয়াজী ১৯৪৭ সালে কারাবরণ করেন এবং গোয়া থেকে নিষ্কাসিত হন।

১৯৪৮ সালে গান্ধীজীর হত্যার পরই জয়প্রকাশ, আচার্য্য নরেন্দ্র দেব, অশোক মেহতা সহ লোহিয়াজী কংগ্রেস ত্যাগ করে পুরোদস্তুর সোস্যালিস্ট পার্টি গঠন করেন।

১৯৫২ সালে নেপালের রাজার রাণাশাহীর বিরুদ্ধে নেপালী কংগ্রেসের স্বাধীনতা সংগ্রামে লোহিয়া সক্রিয় সমর্থন জানান। ঐ বছরই সোস্যালিস্ট পার্টির পাঁচমারী সম্মেলনে লোহিয়া কমিউনিজম্ ও ক্যাপিটালিজমের থেকে সমাজবাদী দর্শনের মৌলিক পার্থক্যের বুনিয়াদ রচনা করেন।

১৯৫৪ সালে ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন রাজ্যে থানু পিল্লাইয়ের মুখ্যমন্ত্রিত্বে প্রজা সোস্যালিস্ট সরকার নিরস্ত্র কৃষক আন্দোলনকারীদের উপর গুলি চালালে লোহিয়াজী এর তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং সরকারকে পদত্যাগ করতে আহ্বান জনান, যদিও তাঁর সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়। ১৯৫৫ সালে হায়দরাবাদে তিনি নতুন করে সোস্যালিস্ট পার্টি গঠন করেন।

১৯৬২ সালে চীনের ভারত আক্রমণের প্রতিবাদ করেন। উত্তর প্রদেশের ফরাকাবাদ জেলার উপনির্বাচনে কংগ্রেসকে পরাজিত করে ১৯৬০ সালে লেহিয়া প্রথম লোকসভায় প্রবেশ করেন। ১৫ বছর কংগ্রেস শাসনে সর্বপ্রথম নেহেরু সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হয়। সোস্যালিস্ট ও প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টির মিলনে সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টি গঠিত হয় ১৯৬৪ সালে। বস্তুত ১৯৬২ থেকে ১৯৬৭ সাল পর্য্যন্ত দেশের সর্বত্র লোহিয়াজীর 'কংগ্রেস হঠাও, দেশ বাঁচাও' আন্দোলনের পরিণাম হিসাবে ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে মাত্র ৮টি রাজ্যে কংগ্রেস সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। আজীবন সংগ্রামী, আপোষহীন এই নেতার জীবনদীপ নির্বাপিত হয় ১৯৬৭ সালের ১২ই অক্টোবর।

৪৮.৩ লোহিয়ার ইতিহাস চেতনা

লোহিয়ার কাছে ইতিহাস শুধু কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ঘটনার বর্ণনা মাত্র নয়। তিনি বিশ্বাস করতেন ইতিহাসের একটা নিজস্ব গতি বা pattern আছে। মার্ক্সের মতে, মানব সভ্যতার ইতিহাস ক্রমাগত উন্নতির ইতিহাস। এই ক্রমবিকাশের পথে প্রথমে আসে আদিম সাম্যবাদী ব্যবস্থা, তারপরে আসে দাস ব্যবস্থা, তারপরে সামন্ততন্ত্র, সামন্ততন্ত্রের পরে আসে পুঁজিবাদ এবং পুঁজিবাদের চরম বিকাশ ঘটার পর পৃথিবীতে আসবে সমাজতন্ত্র; অবশেষে সমাজতন্ত্রবাদের সর্বোচ্চ স্তরে আর্বিভাব ঘটবে উন্নত ধরনের সাম্যবাদ। এই ধরনের মতবাদকে linear view of hintorical progress বলা হয়।

কিন্তু লোহিয়া এই ধরনের ব্যাখ্যার সমালোচনা করে বলেন, বিশ্বের সমস্ত যুগের সমস্ত অঞ্চলের ইতিহাসকে এইভাবে তিন চারটি নির্দিষ্ট ধাপে বিভক্ত করা যায় কিনা সন্দেহ। ইতিহাসের জটিল গতির এ যেন এক অতি সরলীকৃত ব্যাখ্যা। ইতিহাসকে যেন জোর করে একটি ছকে টেনে আনার প্রচেষ্টা।

গভীর অনুসন্ধানী বিশ্লেষণের মাধ্যমে লোহিয়া উপলব্ধি করেছেন যে এ যাবৎ বিশ্বে কেবল একটি মাত্র মানব সভ্যতাই বিকশিত হয়ে চলেছে তা নয়। বিগত দুই শতাব্দী ধরে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্য্যের ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে অনেক প্রাচীন সভ্যতার সন্ধান পাওয়া গেছে, যেমন - মিশরীয় সভ্যতা, সিন্ধু সভ্যতা ইত্যাদি। এই সকল সভ্যতার উদয় যেমন হয়েছে, ধীরে ধীরে তাদের অবলুপ্তিও হয়েছে। সভ্যতার উত্থান পতনকে মেনে নিয়েই লোহিয়া তাঁর ইতিহাস দর্শনের মূলসূত্রগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন।

লোহিয়ার বিশ্লেষণ অনুযায়ী, প্রত্যেক সভ্যতা প্রথম দিকে উন্নতির পথে এগিয়ে যায়, তারপর সাময়িক স্থিতাবস্থা এলেও পরবর্তী সময়ে তা অনিবার্যভাবে পতনের দিক ধাবিত হয়েছে — ইতিহাস চক্র এই নিয়মেই আবর্তিত হয়ে চলেছে। কোনও সভ্যতা যখন উন্নতি বা সমৃদ্ধির পথে বিকশিত হ'তে থাকে তখন সেই সমৃদ্ধির লভ্যাংশ ভাগ করে নেওয়ার জন্য সমাজের আন্তর্গত বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে যে সক্রিয় প্রচেষ্টা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে লোহিয়া তাকেই শ্রেণী সংগ্রাম আখ্যা দিয়েছেন।

সভ্যতাগুলির পতনের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে লোহিয়া দেখেছেন যে, প্রতিটি সভ্যতার অন্তর্নিহিত ত্রুটিই এর জন্য দায়ী। আজ পর্য্যন্ত বিশ্বে যতগুলি সভ্যতার আবির্ভাব হয়েছে তাদের মধ্যে কোনও সভ্যতাই মানুষের সর্বাঙ্গীন উন্নতির চেষ্টা না করে তার কোনও না কোনও বিশেষ দিকের প্রতি জোর দিয়েছে; তা ছাড়া সমগ্র মানবসমাজকে কেন্দ্র করেও কোনও সভ্যতা গড়ে ওঠে নি। লোহিয়ার ভাষায় total efficiency -র পরিবর্তে partial efficiency কে সন্ধান করায় প্রতিটি সভ্যতাই একটি বিশেষ দিকে maximum efficiency অর্জনের চেষ্টা করেছে এবং অন্যদিকগুলিকে উপেক্ষা করেছে। এইভাবে একপেশে উন্নতির জন্য সমাজ তার আভ্যন্তরীণ ভারসাম্য হারিয়ে Dinosours -এর মত নিজের শরীরের চাপে নিজেরই মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়; তার পতন হয়ে পড়ে অনিবার্য। বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার ক্ষমতাও তার থাকে না।

৪৮.৩.১ লোহিয়ার দৃষ্টিতে শ্রেণী (class) ও বর্ণ (caste)

কোনও সভ্যতা যখন উন্নতি বা সমৃদ্ধির পথে বিকশিত হ'তে থাকে তখন সেই সমৃদ্ধির লভ্যাংশ ভাগ করে নেওয়ার জন্য সমাজের অন্তর্গত বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে যে সক্রিয় প্রচেষ্টা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে লোহিয়া তাকেই শ্রেণীসংগ্রাম আখ্যা দিয়েছেন। এর ফলে গোষ্ঠীগুলির অবস্থান নির্দিষ্ট থাকে না, তাদের উন্নতি বা অবনতি ঘটে। এই সচলতা বা গতিশীলতাই হ'ল শ্রেণী বা গোষ্ঠীগুলির বিশেষত্ব।

কিন্তু এই উন্নতির চরমসীমায় পৌঁছানোর পর যখন আর অগ্রসর হ'তে পারে না তখন শুরু হয় পতনের অধ্যায়। তবে, সাময়িকভাবে এই পতন রোধ করবার চেষ্টা করা হয় শ্রেণীকে (Class) বর্ণে (Caste) পরিণত করার প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে। Justice বা ন্যায়নীতির নামে একটি সামাজিক কাঠামোতে প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীগুলিকে বেঁধে তাদের অবস্থান নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় তখন, লোহিয়ার ভাষায় পরিণত হয় Caste-এ। Class -এর সচলতা তখন আর আমরা Caste - এ পাই'না। বস্তুত লোহিয়ার মতে, কোনও সভ্যতার পতন যখন শুরু হয় তখন শ্রেণী সংগ্রাম বন্ধ হয়ে যায় ও বর্ণাবস্থা শুরু হয়। আর এই বর্ণাবস্থার সাহায্যে সভ্যতা সাময়িকভাবে অচলাবস্থার মাধ্যমে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখলেও, শেষ পর্য্যন্ত অনিবার্যভাবে পতনের পথে ধাবিত হয়। তাঁর ভাষায়, "Internally all human history has been an internal movement between castes and classes, between classes solidifying into castes and castes rousing into classes." (Wheel of History - P. 38) অর্থাৎ, আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সমাজ বিবর্তন এইভাবে শ্রেণী থেকে বর্ণ আবার বর্ণ থেকে শ্রেণীতে রূপান্তরের ইতিহাস। তাই শ্রেণী সংগ্রামের বাস্তবতাকে অস্বীকার না করলেও মার্ক্সের মতো তিনি বিশ্বাস করেন না যে, কেবল শ্রেণীসংগ্রামের পথেই সভ্যতার অগ্রগতি ঘটেছে।

ভিতরের এই সংঘাত ছাড়াও লোহিয়া বাইরের জগতের সাথে এক ধরনের সংগ্রামের কথা বলেছেন। সেটি হ'ল জাতিতে জাতিতে, অঞ্চলে অঞ্চলে সংগ্রাম যার ফলে সভ্যতার কেন্দ্রবিন্দু একস্থান থেকে অন্যস্থানে স্থানান্তরিত হয়। লোহিয়া একে Continental shift নামে অভিহিত করেছেন। এই তত্ত্ব অনুযায়ী যে অঞ্চলে একবার সভ্যতার উদ্ভব ও পতন ঘটেছে পরবর্তীকালে সেই অঞ্চলেই আবার নতুন সভ্যতার আর্বিভাব ঘটবে তা নয়। একটি বিশেষ ধরনের সভ্যতার পতনের পর সেই অঞ্চলেই অন্য এক দিকের উপর জোর দিয়ে আর এক বিশেষ ধরনের সভ্যতার আবির্ভাব ঘটার সম্ভাবনা খুবই কম।

৪৮.৩.২ ধনতন্ত্র সম্পর্কে লোহিয়া

লোহিয়ার মতে, মার্ক্স ধনতন্ত্রকে কেবল পশ্চিম ইউরোপীয় ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করেছেন। এ কথা সত্য যে ধনতন্ত্র প্রথমে পশ্চিম ইউরোপেই বিকশিত হয় ও পূর্ণতা লাভ করে। কিন্তু এর ব্যাখ্যা হিসাবে মার্ক্স কেবল সমাজের অর্ন্তনিহিত কারণকেই দায়ী করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎপাদন সম্পর্কের কারণে পুঁজিবাদী দেশে দু'টি পরস্পর বিরোধী শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে — একদিকে বিপুল ধনসম্পদের অধিকারী অল্প সংখ্যক পুঁজিপতি শ্রেণী এবং অন্যদিকে থাকে সমস্তরকম বিষয় সম্পদ থেকে বঞ্চিত, দরিদ্র, নিষ্পেষিত সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণী। উদ্বৃত্ত মূল্যের মাধ্যমে পুঁজিবাদী শোষণের ফলে একদিকে যেমন সম্পদের কেন্দ্রিভবন ঘটবে তেমনি আবার সেখানে দেখা যাবে শ্রমের সামাজিকীকরণ ও শ্রমিকদের দৈন্যদশার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি। এইভাবে শেষ পর্য্যন্ত শ্রেণী সংগ্রাম তীব্র আকার ধারণ করলে

একদিন বিপ্লবের মাধ্যমে সর্বহারা শ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে সাম্যবাদী সমাজের ভিত্তি রচনা করবে।

কিন্তু লোহিয়া লক্ষ্য করেছেন যে, ইংল্যান্ড বা জার্মানীর মতো পুঁজিবাদী দেশে দু'টি শ্রেণীর মধ্যে বৈষয়িক তারতম্য যথেষ্ঠ থাকলেও সাধারণভাবে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা ধীরে ধীরে উন্নতির দিকেই যায়। বরং দারিদ্র্য ও দুর্দশা বেড়ে চলে ভারতবর্ষের মতো উপনিবেশগুলিতে। মার্ক্সের মতে, পুঁজিবাদী দেশের অভ্যন্তরে মালিক শ্রেণীর সম্পদ বৃদ্ধির সাথে সাথে শ্রমিক শ্রেণীর দারিদ্র্য ও শোষণ বেড়ে চললেই সৃষ্টি হবে বিপ্লবের পরিস্থিতি। কিন্তু কার্যত লোহিয়া দেখলেন যে, পুঁজিবাদী দেশের শ্রেণী-সম্পর্ক সেইভাবে যাচ্ছে না।

মার্ক্সবাদীদের মতে, 'উদ্বৃত্ত মূল্য' বা ব্যক্তিগত মুনাফাই হ'ল শ্রমিক শ্রেণীর শোষণের একমাত্র কারণ। অন্যদিকে লোহিয়ার ধারণা হ'ল আভ্যন্তরীণ কারণের সঙ্গে সঙ্গে ধনতন্ত্রের বিকাশের একটি বাহ্যিক কারণও উপস্থিত। পাশ্চাত্যের উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির বর্তমান অস্বাভাবিক অগ্রগতি ও ধনসম্পদের মূলে সেই সমাজের আভ্যন্তরীণ রসদ ও দ্বন্দ্বই দায়ী নয়, সেই সঙ্গে আছে তাদের উপনিবেশিক শোষণ এবং উপনিবেশগুলি থেকে সংগৃহীত বিপুল ধনরাশি ছাড়া ধনতন্ত্রের বিকাশই ছিল একপ্রকার অসম্ভব। লোহিয়ার মতে, এই সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ছাড়া বিশ্বে বর্তমান ধনতন্ত্র বিকাশ লাভ করত না। লোহিয়ার ভাষায়, "In order, therefore to understand capitalist development, it will be necessary to think of capitalist economy as consisting not alone of an internal circle represented by the West European economy but of two circles an internal European circle and an external world circle, from which the internal West European circle draws its dynamic, surplus value, its exploitation, its sucking and 'so on'. (Marx, Gandhi and Socialism – P. 96)। বিষয়টি যে মার্ক্সের অজানা ছিল তা নয়, তবে তিনি কখনই এটিকে ধনতন্ত্র বিকাশের অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করেন নি।

৪ ৮.৩.৩ ধনতন্ত্রবাদ ও সাম্যবাদ : একই সভ্যতার দু'টি রূপ

লোহিয়ার মতে, আধুনিক সভ্যতা ধনতন্ত্র ও সাম্যবাদের সমন্বয়ে গঠিত। একটি আরেকটির থেকে মৌলিকভাবে স্বতন্ত্র — এ দাবি লোহিয়ার কাছে অযৌক্তিক। তাঁর মতে, ধনতন্ত্র এবং কমিউনিজমের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও তারা একই সভ্যতার দু'টি রূপ মাত্র। তাদের মধ্যে সব থেকে বড় পার্থক্য উৎপাদনের উপকরণের মালিকানার। ধনতন্ত্রে যেখানে উৎপাদনের উপাদানের ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত, অন্যটিতে রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠিত। এই পার্থক্য ছাড়া, লোহিয়ার মতে, তাদের অজস্র সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

উভয় ক্ষেত্রেই আমরা দেখি বিজ্ঞান ও উন্নত কারিগরী জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে বিপুল মূলধন ভিত্তিক জটিল ও বৃহদায়তন কলকারখানা স্থাপন করে অপেক্ষাকৃত কম খরচে ব্যাপক আকারে পণ্য উৎপাদন ও ক্রমাগত উৎপাদন বৃদ্ধি করে যাওয়ার তীব্র প্রচেষ্টা। উভয়েরই ধারণা অর্থনৈতিক সমস্যাই হ'ল প্রধান এবং অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে পারলে অন্যান্য সমস্যার সমাধানও সম্ভব। লোহিয়া আরও আশ্চর্য্য হয়েছেন এই কারণে যে, ধনতন্ত্রবাদ এবং সাম্যবাদ উভয় তত্ত্বের মধ্যে আন্তর্জাতিকতার দাবি থাকা সত্ত্বেও বাস্তবে তাদের কোনটির মধ্যেই নেই বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গী। অর্থনৈতিক সমস্যার কথা ভাবলেও তা' কেবল নিজের দেশের নাগরিকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ; সমস্ত পৃথিবীর মানুষের দুঃখ দুর্দশা নিয়ে তাদের কোনও মাথাব্যাথা নেই। বিশেষত, তৃতীয় দুনিয়ার অনুন্নত দুর্বল রাষ্ট্রগুলির সমস্যাকে উপলব্ধি করার ও তাকে দূর করার মনোভাব কাজের মধ্যে নেই। এইভাবে অর্থনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের তাগিদে বর্তমান সভ্যতা অস্বীকার করেছে জীবনের অন্যান্য দিকগুলিকে।

বস্তুত, লোহিয়ার মতে, ধনতন্ত্রবাদ এবং সাম্যবাদ উভয় মতবাদই গড়ে উঠেছে উন্নত পাশ্চাত্য ইউরোপের প্রেক্ষাপটে যেখানে উৎপাদিকা শক্তি উন্নত, বিজ্ঞান ও কারিগরী জ্ঞান উন্নত, রয়েছে ধনসম্পদের বিপুল ভাণ্ডার আবার সেই তুলনায় জনসংখ্যাও কম। অন্যদিকে, লোহিয়া দেখিয়েছেন, ভারত সহ বিশ্বের দুই তৃতীয়াংশের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। দারিদ্র্যপীড়িত এই অঞ্চলগুলির প্রধান সমস্যা হ'ল তার বিপুল জনসংখ্যা এবং স্বল্প মূলধন। সুতরাং, এখানে ধনতন্ত্রবাদী বা কম্যুনিস্ট দেশে প্রচলিত উৎপাদন যন্ত্র অনুকরণ করে সাফল্যের আশা কম। আবার, সাম্রাজ্যও নেই যা শোষণ করে বাইরে থেকে সম্পদ সংগ্রহ করবে। তার সঙ্গে রয়েছে বিপুল জনসংখ্যার সমস্যা। তাই লোহিয়া তৃতীয় বিশ্বের সমস্যা সমাধানে Capitalism বা Communism উভয়ের 'equal irrelevance' এর তত্ত্বের অবতারণা করেছেন।

৪৮.৩.৪ সমাজতান্ত্রিক সভ্যতা

তাই লোহিয়া স্বপ্ন দেখেন এক নতুন সভ্যতার। বিশ্বের সমস্ত মানুষকে নিয়ে মানুষের সর্বাঙ্গীন বিকাশের সংকল্প নিয়ে এই সভ্যতার আবির্ভাব ঘটবে। এ সভ্যতা ধনতন্ত্রবাদ বা সাম্যবাদের অংশ বিশেষ হবে না। এই সভ্যতা কেবল শ্রেণী বা বর্ণের আভ্যন্তরীণ সংগ্রামেরই অবসান ঘটাবে না। সেইসঙ্গে রোধ করবে আঞ্চলিক সভ্যতার প্রবণতাকে। এই নতুন সভ্যতাকেই লোহিয়া নাম দিয়েছেন 'Socialist Civilization বা সমাজতান্ত্রিক সভ্যতা, যার আবির্ভাব ঘটবে বর্তমান সভ্যতার পীঠস্থান পশ্চিম ইউরোপে নয়, বিশ্বের অনুন্নত অনগ্রসর এই দুই তৃতীয়াংশে। এই সভ্যতাগুলির বৈশিষ্ট্যও হবে নতুন, সৃষ্টি করবে নতুন পরিচালিকা শক্তির।

৪৮.৩.৫ নতুন সমাজতান্ত্রিক সভ্যতার বৈশিষ্ট্যসমূহ

এই নতুন সভ্যতা ধনতন্ত্র বা সাম্যবাদ কারোর উৎপাদন শক্তি ও প্রযুক্তির উপর নির্ভর না করে সৃষ্টি

করবে তার নতুন অর্থনৈতিক ভিত্তি। এখানে এমন এক ধরনের প্রযুক্তি প্রয়োজন যা হবে একাধারে স্বল্প মূলধন উপযোগী, যা একই সঙ্গে বহুলোকের কর্মসংস্থানে সক্ষম অথচ আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী জ্ঞান সমন্বিত। লোহিয়া এর উত্তর খুঁজে পেলেন Small unit machine technology বা ক্ষুদ্রায়তন যন্ত্র শিল্পের মধ্যে।

শুধু নিজের দেশের জনগণের আর্থিক স্বচ্ছলতার জন্য higher and higher standard of living এর পরিবর্তে এই সভ্যতা গ্রহণ করবে 'decent standard of living throughout the world' এর আদর্শ যা কেবল অর্থনৈতিক লক্ষ্যই নয় সেইসঙ্গে জীবনের অন্যান্য সাধারণ লক্ষ্য, যেমন স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, নৈতিক ন্যায়পরায়ণতা, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, মানসিক শান্তি অর্জনে প্রয়াসী হবে।

গান্ধীজীর মতো তিনিও ঘৃণা করতেন ক্ষমতার কেন্দ্রিভবনকে। Small unit machine technology-র মাধ্যমে অর্থনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণের আদর্শ গ্রহণ করার সাথে সাথে লোহিয়াও রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রিকরণকেই (decentralization) আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছেন এবং সেই আদর্শের সন্ধান পেয়েছেন 'four pillar state' বা চৌখাম্বা রাষ্ট্রের ধারণায়। এই রাষ্ট্রব্যবস্থা মূলত চারটি স্তরে বিভক্ত — গ্রাম পঞ্চায়েত, জেলাস্তরে সরকার, প্রাদেশিক বা রাজ্য সরকার এবং সর্বোচ্চস্তরে কেন্দ্রীয় বা জাতীয় সরকার। এরা প্রত্যেকেই একদিকে যেমন স্বতন্ত্র ক্ষমতাসম্পন্ন হবে তেমনি আবার পরস্পরের উপর নির্ভরশীলও হবে।

বিশ্বব্যাপী এক নতুন মানব সভ্যতা স্থাপনের আদর্শে অনুপ্রাণিত লোহিয়া তাঁর দৃষ্টিকে শুধু নিজের দেশের গন্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ না রেখে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন সমগ্র বিশ্বে। আর তাই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের মানুষের মধ্যে সহযোগিতার পথ প্রশস্ত করতে লোহিয়া তাঁর চৌখাম্বা রাষ্ট্রের আদর্শের সঙ্গে আরেকটি স্তম্ভ যুক্ত করতে চেয়েছেন; সেটি হ'ল বিশ্বরাষ্ট্র বা World State। বর্তমানে সরকারী পর্যায়ে সহযোগিতার যে রীতি প্রচলিত আছে তা লোহিয়াকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। কারণ, এর মধ্যে দাতা ও গ্রহীতার সম্পর্ক আছে যা মানুষে মানুষে ব্যবধান সৃষ্টি করে। স্বেচ্ছামুলক আন্তর্জাতিক বাহিনী (Voluntary International Brigades) গঠন করে তার মাধ্যমে গঠনমুলক কাজ করার দিকেই লোহিয়ার ঝোঁক ছিল বেশি।

৪৮.৩.৬ সভ্যতার বাস্তব রূপায়ণের পন্থা ও পদ্ধতি

নতুন সমাজতান্ত্রিক সভ্যতার প্রকৃতি বর্ণনা করেই লোহিয়া ক্ষান্ত হন নি। এই সভ্যতা কিভাবে অর্জন করা যাবে তার পদ্ধতি সম্পর্কেও লোহিয়া বিচার বিবেচনা করেছেন। তিনি মনে করেন, ইতিহাস আপনাথেকেই (automatically) বিশ্বকে এই সভ্যতা প্রদান করবে না। বর্তমান সমাজব্যবস্থার প্রকৃতিকে

সম্যকভাবে বিশ্লেষণ করে নীতিনিষ্ঠভাবে মানুষকে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে এই পরিবর্তন আনতে। আবার মার্ক্সের মতো সাম্যবাদী সমাজস্থাপনের দায়িত্ব কোনও নির্দিষ্ট শ্রেণীর হাতে ছেড়ে দিতেও নারাজ। লোহিয়ার ইতিহাস চিন্তনে মানুষের সচেতন ইচ্ছাশক্তি ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টার একটি স্বতন্ত্র ভূমিকা স্বীকৃত। সমাজতান্ত্রিক সভ্যতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ সমস্ত মানুষের সমবেত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই ইতিহাসের উত্থান পতনের চক্রাকারগতির পরিবর্তনসাধন সম্ভব।

সমাজের মৌলিক পরিবর্তনের পদ্ধতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে লোহিয়া শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক পথে ক্ষমতা অর্জনের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে সাম্যবাদীরা নিরন্তর সংগ্রামের পক্ষপাতী; অন্যদিকে গান্ধীজী জোর দিয়েছেন গঠনমূলক কাজের উপর, আবার গণতান্ত্রিক সমাজবাদীরা সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। লোহিয়া মনে করেন, এই তিনটি নীতি পরস্পর বিরোধী তো নয়ই, বরং পরস্পরের পরিপূরক। তাই তাঁর ঘোষিত আদর্শ হল 'spade, vote and Jail' যেখানে গঠনমূলক কাজের প্রতীক হল spade, পার্লামেন্টরী গনতন্ত্রের প্রতীক হ'ল vote যেখানে শান্তিপূর্ণ উপায়ে নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের আশা আকাঙ্খা প্রতিফলিত হয় এবং সর্বশেষে Jail এর অর্থ সত্যাগ্রহ ও কারাবরণ। অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তিনি গান্ধীজীর প্রদর্শিত অহিংস সত্যাগ্রহের পথকেই বরণ করে নিয়েছেন। তবে বাস্তব অবস্থার বিচারে প্রয়োজনে সাময়িকভাবে অহিংসনীতি ত্যাগ করতেও পিছুপা ছিলেন না। এখানেই তাঁর বিশেষত্ব।

এখানে উল্লেখ্য এই যে, ক্ষমতা দখলের উপর জোর দিলেও ছলচাতুরী, মিথ্যা প্রবঞ্চনা, দুর্নীতি ও হানাহানির মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের চেষ্টাকে তিনি বরাবর নিন্দা করেছেন। উদ্দেশ্যে ও উপায়ের সম্পর্কে সম্বন্ধে লোহিয়া গান্ধীজীর মতামতকেই গ্রহণ করেছেন। তাঁর doctrine of immediacy -তে লোহিয়া জানিয়েছেন যে, প্রত্যেকটি কাজকে তার তাৎক্ষনিক ফলাফল বা immediate test দ্বারা বিচার করতে হবে। বর্তমান পন্থা-পদ্ধতি সঠিক না হ'লেও শেষ ফলাফল ভাল হবে, অর্থাৎ শুধু remote test দ্বারা সব কাজকে সমর্থন করার পক্ষপাতী লোহিয়া নন। আমরা যা পেতে চাই আর বর্তমানে যা করি এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা জরুরী।

৪৮.৪ চিন্তানায়ক লোহিয়া

পশ্চিমী সংস্পর্শে আসার পরই আধুনিক ভারতীয় রাজনৈতিক চিন্তাধারা বিকাশ লাভ করে। যদিও আমাদের জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ ঔপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে গেছেন, কিন্তু চিন্তায় ও মতবাদে তাঁরা পশ্চিমী ধারণা সমূহকেই আদর্শ হলে মেনে নিতেন এবং বিশ্বাস করতেন এই পথেই আসবে ভারতের প্রগতি। সমাজবাদও এর ব্যতিক্রম নয়। সমাজবাদের উদ্ভব ইউরোপে এবং ইউরোপের প্রেক্ষাপটেই তার বিকাশ। পরে তা' ছড়িয়ে পড়ে ভারত সহ বিশ্বের অন্যান্য অংশে। ভারতীয় সমাজবাদী

চিন্তানায়কগণ স্বাভাবিক কারণেই সমাজবাদের ইউরোপীয় মডেলটিকেই — তা' সে সাম্যবাদ বা গণতান্ত্রিক সমাজবাদ যাই হোক না কেন আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেন।

লোহিয়ার কৃতিত্ব এইখানেই যে, তিনি হচ্ছেন সেই বিরল সমাজবাদী যিনি সমাজবাদকে শুধু জীবনে আদর্শ হিসাবে গ্রহণই করেন নি, তাকে ইউরোপীয় শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে একটি বিশ্বজনীন রূপদান করেছিলেন। তাঁর চেতনায় শুধু ইউরোপ নয়, ছিল তৃতীয় বিশ্বসহ গোটা দুনিয়া। স্পষ্টবাদী, স্বাধীনচেতা একজন তুখড় ও সক্রিয় রাজনীতিবিদ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সল্পজীবনে বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন যেগুলি তাঁর সৃজনধর্মী চিন্তাশক্তির স্বাক্ষর বহন করে। তাত্ত্বিক নেতা বলতে যা বোঝায় লোহিয়া তা' কোনওদিনই ছিলেন না। কিন্তু কোনও স্বীকৃত তত্ত্বকে বিনা বিচারে অন্ধভাবে অনুকরণ করার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। তাঁর লক্ষ্যই ছিল বর্তমান বিশ্বের অর্ন্তদ্বন্দ্ব ও বিরোধকে খুঁজে বের করে তাকে যুগোপযোগী ও প্রাসঙ্গিক করে পেশ করা। ব্যক্তিগতভাবে মার্ক্স ও গান্ধী উভয়ের চিন্তাধারাই তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। দু'জনের কাছ থেকেই তিনি গ্রহণ করেছেন প্রচুর, কিন্তু অন্ধভাবে অনুকরণ করেননি কাউকে। এখানেই তাঁর স্বকীয়তা।

৪৮.৫ সারাংশ

সম্ভবত রামমনোহর লোহিয়া হ'লেন একমাত্র ভারতীয় সমাজবাদী চিন্তানায়ক যিনি সোস্যালিস্ট চিন্তাধারাকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পাশ্চাত্যের অনুকরণ প্রবণতা থেকে মুক্ত করে নিজস্ব পরিচয়ে উদ্ভাসিত করেন। তাঁর চিন্তার স্বকীয়তার পরিচয় মেলে তাঁর ইতিহাস দর্শনে, তাঁর শ্রেণী ও বর্ণের অভিনব ব্যাখায়। তাঁর সব থেকে বড় কৃতির এই যে, তিনি সাম্যবাদ ও ধনতন্ত্রবাদ - দু'টি মতবাদকেই একই সভ্যতার দু'টি রূপ বলে বর্ণনা করেছেন। ইউরোপের প্রেক্ষাপটে এদের জন্ম হ'লেও তৃতীয় বিশ্বের সমস্যার সমাধানে এরা কতখানি অপারগ তা তিনি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন। এর জন্য চাই নতুন সভ্যতা, নতুন রাস্তা, নতুন পথ। বিশ্বজনীন এই সভ্যতাই লোহিয়ার সমাজতান্ত্রিক সভ্যতা।

৪৮.৬ অনুশীলনী

১) ইতিহাসের চক্রাকার গতি বলতে লোহিয়া কি বুঝিয়াছেন? এই চক্রাকার গতির পরিবর্তন কি ভাবে সম্ভব বসে তিনি মনে করেন?

২) শ্রেণী ও বর্ণ সম্বন্ধে লোহিয়ার ধারণা ব্যাখ্যা করুন।

৩) লোহিয়া কি কারণে ধনতন্ত্রবাদ ও সাম্যবাদকে একই সভ্যতার দু'টি রূপ বলে বর্ণনা করেছেন?

৪) নতুন সমাজতান্ত্রিক সভ্যতার প্রকৃতি কিরূপ হবে বলে লোহিয়া মনে করেন?

৫) সংক্ষেপে আলোচনা করুন :

ক) 'Small unit-machine technology' সম্পর্কে লোহিয়া

খ) লোহিয়ার doctrine of immediacy

গ) লোহিয়ার শ্লোগান 'Spade, vote and jail'.

৪৪.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১) R. M. Lohia : Marx, Gahdhi and Socialism (Hydrabad, Navhind, 1963).

২) R. M. Lohia : Wheel of History

৩) N. C. Mehrotra : Lohia : A Study

৪) V. K. Arora : Rammanohar Lohia and Socialism in India (New Delhi, Deep and Deep, 1984)

৫) M. Arunugam : Socialist Thought in India : The contribution of Rammonhar Lohia (New Delhi, Sterling, 1978)

৬) C. Chandhuri : Rammanohar Lohia and the Indian Socialist Thought (Calutta Minerva, 1993)

(b) Small unit machine technology, ...

(c) ... doctrine of immediacy

(d) Essence of Spade, Vote and Jail

REFERENCES

1) R. M. Lohia : Marx, Gandhi and Socialism (Hyderabad: Navahind, 1963).

2) R. M. Lohia : Wheel of History

3) N. C. Mehrotra : Lohia : A Study

4) A. K. Arora : Rammanohar Lohia and Socialism in India (New Delhi: Deep and Deep, 1984)

5) M. Arumugam : Socialist Thought in India: The Contribution of Rammanohar Lohia (New Delhi: Sterling, 1978)

6) ... Chandhari : Rammanohar Lohia and the Indian Socialist Thought (Calcutta: Minerva, 197...)

মানুষের জ্ঞান ও ভাবকে বইয়ের মধ্যে সঞ্চিত করিবার যে একটা প্রচুর সুবিধা আছে, সে কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু সেই সুবিধার দ্বারা মনের স্বাভাবিক শক্তিকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলে বুদ্ধিকে বাবু করিয়া তোলা হয়।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারতের একটা mission আছে, একটা গৌরবময় ভবিষ্যৎ আছে, সেই ভবিষ্যৎ ভারতের উত্তরাধিকারী আমরাই। নূতন ভারতের মুক্তির ইতিহাস আমরাই রচনা করছি এবং করব। এই বিশ্বাস আছে বলেই আমরা সব দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে পারি, অন্ধকারময় বর্তমানকে অগ্রাহ্য করতে পারি, বাস্তবের নিষ্ঠুর সত্যগুলি আদর্শের কঠিন আঘাতে ধূলিসাৎ করতে পারি।

—সুভাষচন্দ্র বসু

Any system of education which ignores Indian conditions, requirements, history and sociology is too unscientific to commend itself to any rational support.

—Subhas Chandra Bose

Price : Rs. **150.00**

(*NSOU* -র ছাত্রছাত্রীদের কাছে বিক্রয়ের জন্য নয়)

Published by : Netaji Subhas Open University, DD-26, Sector-1, Salt Lake City, Kolkata-700 064 and
Printed at : Royal Hlaftone Co., 4, Sarkar Bye Lane, Kolkata-700 007